মাঙ্গলিক।

বর্ষচক্র ফিরে আসে; করিয়া প্রণতি
চরণে সঁপিনু পুনঃ সকল শকতি!
তোমার সেবায় মাতঃ আনন্দসরসে
রাখিও মগন মোরে এ নব বরষে!

রাত্রি-জাগরণ।

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে।)

(১)

প্রিয়তম ভাবী পতি
"ইরেন" সুধীর শান্ত
ইরেন সুশীলা বালা
পরে' কৃষ্ণ শোক-বাস ;
তেয়াগিল অলঙ্কার,
কেবল অঙ্গুলে তার
যে অঙ্গুরী স্মৃতিরূপে
কোনো বসন্তের রাতে
সেই যুবকের হাতে
সে রাতের স্মৃতি-চিহ্ন
—ইহাই রাখিল শুধু
কে কি করে নাহি দেখে,
তারি আশে থাকে বসি'
যখন শুনিল "রজে"
উৎসবের মাঝে তার
একটি ছাড়িল শ্বাস,
হইয়া তৎপর কাজে
কুঞ্চিত অলক তার
কনক-কৌটায় পূরি'
কেহ তারে না পারিল
তখনি সে গেল রণে

গেল যবে চলিয়া সংগ্রামে
—বিন্দু অশ্রু নাহিক নয়ানে,
পবিত্র-চরিত সুবিমল,
রাখে বক্ষে ক্রুশটি কেবল,
বীণাটিরে করিল বর্জ্জন ;
অঙ্গুরীটি করিল ধারণ—
"রজে" তারে করে সমর্পণ।
স্মর-বাণে হয়ে হতজ্ঞান
সঁপে বালা হৃদি মন-প্রাণ।
এই সেই অঙ্গুরীটি তার ;
ত্যজি' আর সব অলঙ্কার।
কে কি বলে নাহি শোনে কাণে
চেয়ে থাকে তারি পথ-পানে।
পরাজয় দেশের প্রথম,
বক্ষে যেন বাজিল বিষম ;
কিন্তু বীর-পুরুষের ন্যায়
প্রিয়া-কাছে লইল বিদায়।
এক গুচ্ছ করিয়া কর্ত্তন,
বক্ষ মাঝে করিল স্থাপন।
গৃহ-মাঝে রাখিতে ধরিয়া,
ক্ষুদ্র এক সৈনিক হইয়া।

সে যুদ্ধের পরিণাম
কিন্তু সে ইরেন-বালা
প্রতিদিন থাকে বসি'
কখন আসিবে ডাক্
ডাকের পেয়াদা আসে
—পত্র আর নাহি দেয়
যখন ডাকের লোক
হতাশ হইয়া বালা
পূর্ব্বে সে পাইত পত্র
রজের নিকট হতে
ফরাসী সৈন্যের সাথে
কোন পলাতক-হতে
—যুদ্ধে মরে নাই রজে
বিদ্রোহী অশ্রুরে বালা
সাহসে করিয়া ভর
ধর্ম্ম কর্ম্মে দিয়া মন
কাঙাল দরিদ্রগণে
যুদ্ধে যার পুত্র হত
তখন সে প্যারিসের
বিষ-ক্ষত-সম যেন
দেশময় হয়ে ব্যাপ্ত
শত্রু-অশ্বারোহী করে
গ্রাম-চিকিৎসক, আর
প্রতি সন্ধ্যা ইরেনের
মৃত্যুর কাহিনী বলে
শত্রু হাতে কে মরিল

যা' হইল জানে লোক সব,
একাকিনী নিস্তব্ধ নীরব
নিজ গৃহ-গবাক্ষের ধারে,
এক দৃষ্টে তাহাই নেহারে।
স্কন্ধে লয়ে চিঠির থলিয়া,
ধীরে ধীরে যায় সে চলিয়া।
ক্রমে হয় দৃষ্টির বাহির,
ছাড়ে শুধু নিঃশ্বাস গভীর।
কিন্তু সে গো বহুদিন আর
পায় নাহি কোনো সমাচার।
রুদ্ধ সে যে "মেজ্"-নগরীতে ;
বালা শুধু পারিল জানিতে
এই কথা করিয়া শ্রবণ
কোন মতে করিল দমন।
কোনরূপে রহে প্রাণে-প্রাণে
থাকে সদা ঈশ্বরের ধ্যানে।
দেখিবারে যায় সে নিয়ত,
তত্ত্ব লয় তার বিশেষতঃ।
সুভীষণ অবরোধ-কাল ;
শত্রুদের আক্রমণ জাল
ক্রমে পশে ইরেনের গ্রামে,
লুটপাট্ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে।
তথাকার বৃদ্ধ পুরোহিত
গৃহ-কক্ষে হয়ে উপস্থিত
—মুখে নাহি আর অন্য কথা—
দেয় শুধু তাহারি বারতা।

কিন্তু তবু ভাবে বালা রজে তার আছে নিরাপদে,
মেজ্-নগরীর মাঝে সৈন্য-সাথে আছে অবরোধে।
শেষ পত্রে সে জেনেছে যুদ্ধে রজে হয়নি আহত,
মনে ভাবে, রজে তার নিরাপদে থাকিবে সতত।
এইরূপ প্রণয়ের আশা বাণী শুনি' বল পায়
জপ-মালা* হাতে বালা থাকে শুধু তারি প্রতীক্ষায়।

(২)

একদিন প্রাতে বালা নিদ্রা হতে চমকিয়া জাগে ;
ঘন পল্লবের তলে অদূরে উদ্যান প্রান্তভাগে
শত্রুদল পশি' করে মুহুর্মুহু বন্দুক আওয়াজ ;
শিহরিয়া উঠে বালা কিন্তু তাহে পায় মনে লাজ ;
তার ইচ্ছা সেও হয় রজে-সম বীর সাহসিক,
তাই এই ভীরুতায় আপনারে দিল শত ধিক।
পরে চিত্ত করি' শান্ত পরি' নিজ শোকের বসন,
প্রাত্যহিক পূজার্চ্চনা বিধি মতে করি' সমাপন
গৃহ হতে অবতরি' পথ মাঝে দাঁড়াইল আসি,
মুখে শুধু আছে লাগি মধুময় একটুকু হাসি।
"কি হয়েছে?"—কিছু নয় একটা সামান্য মারামারি ;
সেনাদলে নহে ভুক্ত কতিপয় হেন শস্ত্রধারী
আচম্বিতে আক্রমিল এক দল গুপ্ত-শত্রু দলে,
—সন্ধান লইতে যাঁরা এসেছিল তথা তলে-তলে।
এবে তারা করিয়াছে তথা হতে দূরে পলায়ন,
আবার এখন সব নিস্তব্ধ পূর্ব্বের মতন।

* রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে জপ-মালা ব্যবহার আছে

বলে বালা "করা চাই
আহতের সেবা তরে
সংস্থাপন যুদ্ধ-হাসপাতাল
না করি' বিলম্ব ক্ষণকাল।"
কেন না, দেখিল বালা
—গুলি গেছে কাঁধ ফুঁড়ি'—
একজন শত্রু-সৈন্য-নেতা
আহত সে পড়ি' আছে সেথা।
উঠায়ে আনিল যবে
—পাণ্ডুর, মুদিত-নেত্র—
সেই সে যুবক যোদ্ধৃবরে
ক্ষত-হতে বেগে রক্ত ঝরে।
ইরেন না শিহরিয়া,
না করিয়া মুখে হায় হায়,
যে ঘরে বসিত রঙ্গে
আসি' তার পাণি-প্রার্থনায়
—সেই ঘরে সযতনে
যুবকেরে করায় শয়ন,
বৃদ্ধ ভৃত্যে রুক্ষ দেখি'
ধমকিয়া করিল শাসন।
বাঁধি দিল ক্ষতস্থান
আসি' যবে চিকিৎসক পটু,
ইরেন সুধীর শান্ত
না প্রকাশি' উদ্বেগ একটু
সাহায্য করিল তারে
যেন চির-অভ্যস্ত সেবায়।
এদিকে আহত যুবা
শুয়ে সেই আরাম-শয্যায়
কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ নেত্রে
সবিস্ময়ে চাহে তার পানে,
ইরেন শিয়রে তার
আছে বসি' আনত নয়ানে;
পরে চাহি' ভৃত্য কাছে
একটুকু পুরাণো কাপড়
করিল প্রস্তুত তাহে
ক্ষত পটি ইইয়া তৎপর
সাক্ষাৎ করুণা যেন
—এইরূপে করে আর্ত্ত-সেবা,
যে রমণী সেই দেবী
দোঁহা-মাঝে ভিন্ন বল' কেবা?
সেই দিন সন্ধ্যাকালে
চিকিৎসক আইল আবার,
রোগীকে দেখিয়া বলে
চুপি চুপি, "রক্ষা পাওয়া ভার।"
ইরেনের ওষ্ঠাধর
হ'ল এবে ঈষৎ স্ফুরিত
বলে বালা "যুবকের
মৃত্যু তবে হবে কি নিশ্চিত?"
"নিশ্চিত কেমনে কব?
এইমাত্র বলিবারে পারি,
দেখিব করিয়া চেষ্টা
যাতে এবে জ্বর যায় ছাড়ি'।

এই ঔষধিতে মোর বহু রোগী করেছি আরাম,
কিন্তু তবু, যদি কেহ রোগী-পাশে বসি অবিরাম
শুশ্রূষা করিতে পারে সারা রাত করি' জাগরণ
তবেই হইতে পারে রক্ষা এই রোগীর জীবন।
"আমিই করিব তাহা" —"তুমি না. তুমি না সুকুমারি
আছে তব লোকজন" —"বৈদ্যরাজ! তারা যে আমারি
তাছাড়া রজেও এবে বন্দী হয়ে আছে গো বিদেশে
হয়তো আহত রণে, হয়তো গো কোনো নারী এসে
করে সেথা সেবা তার; তাই বলি, শোনো বৈদ্যরাজ!
শুধিব আমি সে ধার বিদেশীর সেবা করি' আজ।"
"আচ্ছা তাই হোক্ তবে" —বলে সেই বৈদ্য পুরাতন,
"রোগী পাশে বসি' তুমি করো তবে রাত্রি জাগরণ।
শোনো বলি. যদি আসে পুনর্ব্বার জ্বরের আবেশ
নিশ্চয় তাহ'লে জেনো তখনি হইবে সব শেষ।
এই ঔষধি তুমি পিয়াইবে ঘণ্টায় ঘণ্টায়
কাল পুনঃ আসি' আমি দেখিব, কি ফল হয় তায়।
এই কথা বলি' বৈদ্য গেল চলি' আপনার ঘরে,
ইরেন জাগিয়া রাত থাকে বসি' রোগীর শিয়রে।

(৩)

ক্ষণপরে সেই যুবা ইরেনের পানে ফিরি'
করি' নেত্র অর্দ্ধ-উন্মীলিত
বলে এই কথাগুলি "ভেবে ছিল বৈদ্যরাজ
আমি বুঝি ছিলাম নিদ্রিত;
কিন্তু শুনিয়াছি সব, সর্ব্বান্তঃকরণে তাই
ধন্যবাদ দেই গো তোমায়,

নিজ তরে নহে তত যত সেই বালা-তরে
যে আছে গো মোর প্রতীক্ষায়।
ইরেন বলিল ; "দেখ, হয়োনা উদ্বিগ্ন তুমি,
ঘুমাও—বিশ্রাম প্রয়োজন"।
সে বলিল "নাগো দেবি, একটি গোপন কথা
আগে তোমা বলিব প্রথম।
এক অঙ্গীকারে আমি আছি বদ্ধ, পালিব তা'
এখনিগো মরিবার আগে"।
"যদি গো সান্ত্বনা পাও —বল সেই কথা তুমি
যে কথাটি হৃদে তব জাগে"।
"সেই যুদ্ধে...পাপ-যুদ্ধে... গত মাসে, মোর হাতে
হত হয় এক ফরাশিস্।"
বিবর্ণ হইল মুখ ইরেনের, চকিতে তা'
কমাইল প্রদীপের শিষ্।
পুনঃ আরম্ভিল যুবা "তোমাদের সৈন্যগণ
ছিল কোনো গড়বন্দি স্থানে,
তাহাদের অকস্মাৎ আক্রমিব বলি' মোরা
আইলাম তাদের সন্ধানে।
গভীর আঁধার রাতে নিঃশব্দে পশিনু মোরা
ঝাউ-বৃক্ষ পরদা-আড়ালে,
দেখিনু, প্রবেশ-দ্বারে প্রহরী সৈনিক এক
পাহারা দিতেছে তৎকালে ;
পশ্চাৎ হইতে আমি বসাইয়া দিনু তার
পৃষ্ঠদেশে মোর তলোয়ার,
পড়িল সে তৎক্ষণাৎ, ডাক্ দিবে অন্য জনে
সে সময়ো নাহি ছিল তার।

যে কুটীরে ছিল তারা দখল করিনু মোরা
হত্যা করি' সকল জনায় ;
কি ভীষণ সেই দৃশ্য, মৃতদেহ স্তূপাকৃতি,
শোনিতের নদী বহে যায় ।"
ইরেন ঢাকিল আঁখি ; 'বাহিরিনু যবে মোরা
রক্তময় সেই স্থান হতে,
সহসা উদিল শশী বিদারিয়া মেঘজাল,
সে-আলোকে দেখিলাম পথে
করিতেছে একজন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌
কণ্ঠশ্বাস বহিতেছে ক্লেশে ;
—এ সেই প্রহরী সেনা দিয়াছিনু বসাইয়া
অসি মোর যার পৃষ্ঠদেশে ।
দেখি কষ্ট দূল মোর জানু পাতি' তার কাছে
চাহিনু করিতে তার সেবা ;
সে বলিল, "বৃথা এবে... মরিব এখনি আমি
...সেনাধ্যক্ষ ?...বল তুমি কেবা ?"
"ঠিক্‌, আমি তাই বটে ; বল' কি করিতে পারিব
এ সময়ে তব উপকার ?"
রক্তময় বক্ষ হতে বার করি কৌটা এক
বলে "দিও স্মৃতিচিহ্ন তার ।"
"ই ..ই...ই...ই" কিন্তু আর কথা নাহি হল শেষ
ফুরাইল অন্তিমের শ্বাস ।
নিজ প্রেয়সীর নাম আমার নিকটে যুবা
না পারিল করিতে প্রকাশ ।
কনক-কৌটার গায়ে দেখিলাম তাহার সে
কুল-চিহ্ন রয়েছে খোদিত,

তাহার প্রণয়ী জনে　　ভাবিনু খুঁজিয়া পাব
কোন উচ্চকুলে সুনিশ্চিত।
"এই লও, রাখো ইহা,　　কিন্তু আগে এই কথা
মোর কাছে কর অঙ্গীকার
—আমার মৃত্যুর পর　　আমার হইয়া তুমি
লবে এই কর্ত্তব্য-ভার।"
বিদেশী-যুবক হতে　　ইরেন লভিল যেই
স্বর্ণ-কৌটা রতন-খচিত,
তাহাতে দেখিল সেগো　　রজের কুলের চিহ্ন
সুস্পষ্ট রয়েছে অঙ্কিত।
দেখিয়া ইরেন-বালা　　মরমে পাইয়া ব্যথা
অকস্মাৎ হ'ল বজ্রাহত;
বলে তবু বিদেশীরে　　"ঘুমাও নিশ্চিন্ত হয়ে,
করিব গো তব কথামত।"

(৪)

আহত যুবক সেই　　বলি' সে গোপিন কথা
নিদ্রা যায় পাইয়া সান্ত্বনা;
এদিকে গো ইরেনের　　থরথর কাঁপে বক্ষ,
চক্ষে ছোটে অনলের কণা।
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্ হয়ে　　শিয়রে দাঁড়ায়ে রয়,
নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রুধার;
হত তার প্রিয়তম;　　হোথা সেই পাপ-অসি;
হেথা সেই কৌটাটি গো তার।
আর সেই কৌটাটিও　　বিবর্ণ হইয়া গেছে
সিক্ত হয়ে বুকের রকতে;

নিহত করেনি তারে সম্মুখ-সমরে অরি,
বধিয়াছে তারে পিছু হতে।
এদিকে ঘুমায় সুখে সুকোমল শয্যা-পরে
সেই তার ঘাতক নিষ্ঠুর;
ইরেন বলিল কিনা 'সেই হত্যাকারী জনে
"নিদ্রা যাও, করি' চিন্তা দূর!"
একি গো বিধির ফের, যেই জন ইরেনের
পতিঘাতী দারুণ অরাতি,
তাহারি শুশ্রূষা-তরে —পুত্র কাছে যেন মাতা
ইরেন্ জাগিছে দিবা রাতি!
পিয়ায় ঔষধি তারে নিয়মিত যথাকালে
যাতে তার রক্ষা হয় প্রাণ;
আর ওই হত্যাকারী ঘুমায় বিশ্বস্ত ভাবে
লভি' সুখে আতিথ্যের স্থান।
গুমরিয়া কত রবে, না মানে সংযম আর,
ক্রমে বালা হারাইল বল;
হত্যা-কথা ভাবে যত ক্রমে তার উঠে জ্বলি'
নিদারুণ বিদ্বেষ-অনল।
"যে অসিতে বর্ব্বর বধিয়া পতিরে মোর
সুখশান্তি করেছ হরণ,
সেই অসি লয়ে আমি দিব কি বসায়ে বুকে?
—হরিব কি পাপিষ্ঠ জীবন?
কিসের কর্ত্তব্য মোর কেন আমি দেই ওরে
নিদ্রা, শান্তি, আরাম, আরোগ্য?
ভাঙিয়া ফেলি এ শিশি, —কেন যাই বাঁচাইতে
ওর এই পরাণ অযোগ্য?

একবার যদি আমি　　ঔষধি করিগো বন্ধ,
বাঁচিবে না উহার পরাণ,
ঘণ্টাখানেকের তরে　　পড়ি যদি ঘুমাইয়া
কে পারে করিতে ওরে ত্রাণ?
"ছি ছি ছি, এ পাপ কথা　　কেন রে আসিল মনে?"
এই বলি কাঁদিল ললনা;
মনোমাঝে বুঝাবুঝি　　চলিতেছে এইমত
হেনকালে আহত সে জনা—
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন　　সহসা জাগিয়া উঠি,
বলে "মরি ঘোর পিপাসায়।"
তখন ইরেন-বালা　　ইষ্টদেব-মূর্ত্তি-পানে
একদৃষ্টে একবার চায়;
তারপর শিশি-হতে　　ঔষধি ঢালিয়া পাত্রে
আহতেরে করিল অর্পণ;
ঔষধি করিয়া পান　　আবার মুমূর্ষু দেহে
পুন যেন লভিল জীবন।
তখন ইরেন-বালা　　বলে; "প্রভু! ধন্য তুমি
ভাগ্যে তুমি দিলে এ সুমতি;
আর একটু হ'লে যেগো　　আতিথ্য-ধরম লঙ্ঘি'
রসাতলে হ'ত মোর গতি"।
পরদিন প্রাতঃকালে　　রোগীরে দেখিতে পুন
এল সেই বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ;
দেখিল ইরেন-বালা　　রোগীর শিয়রে বসি,
ঠিকমত করে সব কাজ।

দেখিল, কম্পিত-হাতে পিয়ায় ঔষধি তারে,
শুশ্রূষার ত্রুটি নাহি লেশ ;
কিন্তু দ্যাখে সবিস্ময়ে, —মনের উদ্বেগে তার
পলিত হইয়া গেছে কেশ॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অযোধ্যার উপহার।

(১)

অখিল বাবু কাঁছারি হইতে বাড়ী আসিবামাত্র গৃহিণী তাঁহাকে অযোধ্যার সকল গুণের কথা বলিয়া দিলেন।

অখিল বাবু সে দিন একটা মোকর্দ্দমা হারিয়া আসিয়াছিলেন। বিপক্ষ উকীল তাঁহাকে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিঁধিয়া দিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার মেজাজটা অত্যন্ত বিগড়িয়া ছিল। তাহার উপর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন এই ব্যাপার! গৃহিণী চক্ষুযুগল জবাবর্ণ ও পক্ষ্মরাজি জলসিক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। অখিল বাবু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। অদূরে একজন ঝি যাইতেছিল, অযোধ্যাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এক মিনিট পরে অযোধ্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার চক্ষু অন্যদিনের মত আনত নহে। গোঁফযোড়াটা সে উত্তমরূপে পাকাইয়া জর্ম্মণ সম্রাটের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া দিয়াছে। তাহার মস্তকে পাগড়ী। বাড়ীতে সচরাচর অযোধ্যা পাগড়ী পরে না,—কিন্তু কোনও

কারণে তাহার মেজাজটা যখন অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠে, তখনি সে তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া লয়। মনে বীরত্বের ভাব জাগিয়া উঠিলে বাহিরে তাহার চিহ্ন-প্রকাশের ইচ্ছা স্বাভাবিক।

অযোধ্যার আকার প্রকার দেখিয়া বাবুর ক্রোধবহ্নি আরও প্রখরতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি আত্মস্থ হইয়া শান্তভাবে অথচ কঠোরস্বরে জজের রায় পড়ার মত ধীরে ধীরে বলিলেন—

"অযোধ্যা, তুই অনেক কালের চাকর। কিন্তু পুরোণো হয়ে কোথায় ভাল হবি না যতই বুড়ো হচ্চিস্, ততই তোর বজ্জাতি বাড়ছে। মনিব বলে যে একটা সমীহ কি ভয় ডর তা তোর নেই। হাড় জ্বালাতন করে তুলেছিস্। তুই পুরোণো চাকর বলে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর না। তুই যা। এই পয়লা তারিখ থেকে তোর জবাব দিলাম।"

অযোধ্যা মাথা নাড়িয়া, উদ্ধতভাবে অবজ্ঞাপূর্ণস্বরে উত্তর করিল—"যো হুকুম মহারাজ, হম্ রাজিকা সাথ চলা যায়েঙ্গে। আপ জবাব নেহি দেতেঁ তো খুদ্ হম্ আজ ইস্তাফা দেনেকো তৈয়ার হুয়া থা।" অযোধ্যার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল।

কেহ না মনে করেন যে অযোধ্যা বাঙ্গালা কহিতে জানে না। সে এ বাড়ীতে আঠারো বৎসর চাকরি করিয়াছে—প্রায় বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গলা কহিতে পারে। কিন্তু রাগিলে সে আর বাঙ্গলা কহিত না। বাঙ্গলা ভাষাটা ভালমানুষীর ভাষা; তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণুজাতির ভাষা। অযোধ্যা কেন,—অনেক বাঙ্গালীও প্রবল ক্রোধের সময় বাঙ্গলা কহিতে পারেন না—হিন্দী বা ইংরাজী কহিয়া থাকেন।

অযোধ্যার এ দুর্ব্বিনীত উক্তিতেও অখিলবাবু আত্মহারা হইলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীরভাবে বলিলেন—"বেশ। কিন্তু খবরদার, আর যেন এসে যুটিস্‌নে। বার বার তিনবার কসুর মাফ করেছি—আর করব না। এবার এলে আর কিছুতেই রাখব না। এই শেষ।"

অযোধ্যা বলিল—"নেহি গরীব পরবর, আওর নেহি আওয়েঙ্গে। হমছি দিকদারী হো গিয়া—"

তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া, দুয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, ঘূর্ণিত চক্ষে বাবু বলিলেন—"যাও।"

অযোধ্যা যাইতে যাইতে তাহার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করিয়া লইল—"থক্ গিয়া। নৌক্রী আওর নেহি করেঙ্গে। যো কিয়া সো কিয়া—বস্ অব্ হদ্ হো চুকা।"

অখিল বাবু চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া ঝিকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে আজ্ঞা করিলেন। অন্যদিন অযোধ্যাই তাঁহার তামাক সাজিত।

(২)

বেলা দ্বিপ্রহর—চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অখিল বাবু কাছারি গিয়াছেন—ছেলেরা কলেজে—গৃহিণী পালঙ্কে নিদ্রামগ্না।

আজ শীতটা কিছু বেশী। অযোধ্যা বারান্দায় রৌদ্রে বিছানা টানিয়া একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই আসিতেছে না। খুকী তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাকাচুল তুলিয়া দিতেছে।

খুকী বলিল—"অযুধা, তুই কেন যাবি ভাই?" অযোধ্যা বলিল—"তোর বাবা যে হামায় ছোড়ায় দিয়েছে ভাই।"

কাল পয়লা তারিখ, অযোধ্যা কাল যাইবে। খুকী জিজ্ঞাসা করিল—"আবার কবে আসবি অযোধ্যা?"

অযোধ্যা বলিল—"আর কেন আসব দিদি? এবার যাব আর আসব না।"

খুকী অযোধ্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"না অযুধা, তোকে আসতে হবে।"

অযোধ্যা বলিল—"আচ্ছা ভাই, তোর যখন সাদি হবে, তখন তুই হামায় খৎ লিখিস্, হামি আসব।"

খুকী দুঃখিত স্বরে বলিল—“আমি কি লিখতে জানি ?”

“দাদাবাবুকে বলবি,—দাদাবাবু লিখে দেবে তোর খৎ।”

অযোধ্যা কিয়ৎক্ষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বলিল—“তুই হামার সাদিতে যাবিনে ভাই ?”

খুকী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—“দূর পোড়ারমুখো,—তোকে আবার সাদি করবে কে ? তুই যে বুড়ো হয়ে গেছিস্।”

অযোধ্যা বলিল—“দূর পোড়ারমুখী, হামি বুঢ়া হব কেন ?”

অযোধ্যার মাথার চুল পাকাইতে পাকাইতে খুকী বলিল—“না তুই বুড়ো নস্! আমি যেন আর কিছু জানিনে! সেদিন দিদি, মা, সবাই বলছিল!”

“কি বলছিল ?”

“বলছিল অযুধ্যা ড্যাকরার বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে, বলে কি না বিয়ে করব। ওকে কেউ বিয়ে করলে ত ও বিয়ে করবে।”

অযোধ্যা বলিল—“আরে দেখিস্ দেখিস্, যখন সাদি হবে তখন সবাই কি বলে দেখিস্।”

খুকী বলিল—“অযুধ্যা, তুই কেন সাদি করবি ভাই ?

“নইলে আমায় কে ভাত রেঁধে দেবে দিদি ?”

এই উত্তরে অযোধ্যার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস লুকাইত ছিল। যে তিনবার কর্ম্মচ্যুত হইয়া দেশে গিয়াছিল, পুনরায় যখনি হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল,—আসিয়া বলিয়াছিল,—“হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয় মা, তাই চলে এলাম।” বাল্যকালে অযোধ্যার একবার বিবাহ হইয়াছিল। অযোধ্যা যখন অখিল বাবুর কর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত হয়,—তখন তাহার স্ত্রী জীবিত ছিল, এখন সে বহু বৎসর ধরিয়া বিপত্নীক।

খুকী জিজ্ঞাসা করিল—“সত্যি এবার বিয়ে করবি অযুধা ?”

“সত্যি না ত কি ঝুট্ বলছি ?”

"ক হাজার টাকা পাবি ?"

অযোধ্যা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"টাকা মিল্‌বে ; আউর টাকা দেনে পড়ি রাকুসী! একি বাঙ্গালীর সাদি ?"

"গহনাও দিতে হবে ?"

"গহনাভি দেনে পড়ি না ত কি! বহুত রুপিয়া খরচ রে দিদি বহুত রুপিয়া খরচ" বলিয়া অযোধ্যা পুনর্ব্বার নিদ্রার চেষ্টা করি লাগিল।

খুকী কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তাহার পর আগ্রহের স্বরে বলিল "অযুধা, তোর বউকে আমি একটা গহনা দেব।"

অযোধ্যা হাই তুলিয়া বলিল—"কি গহনা দিবি ভাই ?"

খুকী বলিল—"কেন? আমার সোনার বালা রয়েছে সাড়ে তি ভরির সে ত আর আমার হাতে হয় না, সেই বালা তোর বউয়ের জন্যে দেব এখন নিয়ে যাস্।"

অযোধ্যা হাসিল। বলিল—"আগে কনিয়া ঠিক হোক্,—তখ বালা দিস্, তাবিজ দিস্, মল দিস্,—সব দিস্।"

খুকী বলিল—"না তুই বালা যোড়াটা আমার নিয়ে যা।" বলিয়া তাড়াতাড়ি খুকী উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালা দুইটি আনিয়া বলিল—"রেখে দে এই বেলা। মা উঠলে জানতে পারলে হয় ত দিতে দেবে না।"

অযোধ্যা বলিল—"বালা কোথা থেকে নিয়ে এলি রাকুসী ?"

"কেন, বালা কোথায় থাকে আমি জানিনে বুঝি ?"

"যা যা বালা যেখানে ছিল রেখে আয়।" বলিয়া অযোধ্যা হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল।

খুকী বালা দুইটি বাজাইয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া গান করিতে লাগিল। অযোধ্যা বলিল—"যা রেখে আয় বলছি, হারিয়ে ফেলবি ত মুস্কিল্ হবে।"

খুকী কোনও কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। অযোধ্যা শেষবার একবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিল।

(৩)

খুকী তাহার মার ঘরে গিয়া দেখিল, মা তখনও নিদ্রিত। পালঙ্কের উপর হইতে তাঁহার রাশিকৃত চুল মেঝেতে লুঠাইয়া পড়িয়াছে।

খুকী তাহার পর পূজার ঘরে গিয়া, কোশা হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া, চরণামৃত পান করিল। পান করিয়া, ঘাড়টি বাঁকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিল—আঃ। ঘরের কোণে বিড়ালটা বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। খুকী পূজার ফুল এক মুঠা লইয়া, আস্তে আস্তে বিড়ালটার কাছে গিয়া, নমো নমো বলিয়া তাহার মাথায় একটি একটি করিয়া ফুল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিড়াল মস্তকে শীতলস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। কাতরতাসূচক একটি "মেও" শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পূজাভঙ্গ হইল দেখিয়া ভক্ত খুকী বিড়ালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ৎক্ষণ ধাবিত হইল। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, কবাটে শিকল দেওয়া রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা টুল বুকে করিয়া আনিয়া দুয়ারের কাছে রাখিল। টুলের উপর উঠিয়া শিকল ধরিয়া টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই খুলিতে পারিল না। তখন নামিয়া ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক টুকরা কয়লা কুড়াইয়া পাইবামাত্র, তাহার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখা দিল। কয়লাটি লইয়া খুকী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। স্নানের স্থানে অনেকক্ষণ জল পড়ে নাই—বেশ শুকাইয়া ছিল। সেই শুষ্ক স্থানে কয়লাটি দিয়া খুকী কয়েকটা ঘর আঁকিল এবং প্রত্যেক ঘরে একটা করিয়া ক লিখিয়া দিল। তাহার পর, টব হইতে ঘটি করিয়া জল লইয়া, ধীরে ধীরে স্বরচিত চিত্রের উপর ঢালিতে লাগিল। অন্ততঃ বিশ ঘটি জল ঢালিবার পর

নিরস্ত হইল। একটু শীতও করিতে লাগিল। তখন খুকী বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। গিয়া দেখিল অযোধ্যা দিব্য নাসিকাধ্বনি করিতেছে।

খুকী আস্তে আস্তে অযোধ্যার বিছানায় বসিল। তাহার কোমরে একটি চাবি বাঁধা ছিল, সাবধানে সেটি খুলিয়া লইল। অযোধ্যার দেবদারু কাঠের বাক্সটি কোথায় থাকিত, তাহা খুকী জানিত। বাক্সটি খুলিয়া বালা দুইটি আস্তে আস্তে সব জিনিষের নীচে লুকাইয়া রাখিল। অন্যান্য নানা দ্রব্যের মধ্যে সে বাক্সে টিনে বাঁধানো,—পৃষ্ঠদেশে গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত একখানি আর্সি ও একটি কাঠের চিরুণী ছিল। খুকী নিজের চুলটা একটু আঁচড়াইয়া লইল। শেষে বাক্স বন্ধ করিয়া চাবিটি আবার পূর্ব্বমত অযোধ্যার কোমরে বাঁধিয়া রাখিল।

(৪)

পরদিন প্রভাতে সকাল সকাল আহার করিয়া, গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, বাবুকে প্রণাম করিয়া, দাদাবাবু ও খুকীর নিকট সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিল। খুকী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—গৃহিণীও বারম্বার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

অযোধ্যার গ্রাম মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে দশ ক্রোশ পথ। মুঙ্গের হইতে একখানি গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া অযোধ্যা বাড়ী গেল।

এই মুঙ্গেরে সে প্রথম অখিল বাবুর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। সে কি আজিকার কথা! অখিল বাবু তখন নূতন আইন পাশ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরে তাঁহার উত্তমরূপ পশার জমিলে তিনি হাইকোর্টে গেলেন। যাইবার দিন এই মুঙ্গের ষ্টেশনে গাড়ী চড়িবার গোলমালে অখিল বাবুর প্রথম পুত্র সতীশ হারাইয়া যায়। কেল্লার ফটকের নিকট অশ্বত্থ গাছের নিম্নে দাঁড়াইয়া সতীশ কাঁদিতেছিল, অযোধ্যাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। বাবু খুসী হইয়া তাহাকে

নিজের নূতন বিলাতী জুতাজোড়াটা বখ্‌শিশ দিয়াছিলেন। সে সকল কথা মনে পড়িল। তাহার পর সেই সতীশ কলিকাতায় জ্বরবিকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমানে রাত্রি জাগিয়া একুশ দিন অযোধ্যা সতীশের শুশ্রূষা করিয়াছিল। শবদাহ করিয়া আসিয়া অখিল বাবু অযোধ্যার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—"অযুধা—একবার তুই আমার হারাছেলে খুঁজে দিয়েছিলি,—এবার খুঁজে নিয়ে আয়।"—সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে অষ্টাদশ বৎসর যাহাদের সহিত কাটিয়াছে, তাহাদের সহিত বন্ধন এবার চিরদিনের তরে ছিন্ন হইল। অযোধ্যার গাড়ী অনেকদূর অবধি গঙ্গার ধার দিয়া গেল। পথ যখন বাঁকিল, গঙ্গা দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইলেন,—তখন অযোধ্যা যোড়হস্তে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনের একটা কামনা নিবেদন করিল।

বাড়ী হইতে অনেকমাস অযোধ্যা কোনও পত্রাদি পায় নাই। বাড়ীতে তাহার শুধু এক বৃদ্ধা চাচি ছিল, আর কেহই ছিল না। এত দিন সে চাচি বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াই গিয়াছে, মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে অযোধ্যা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, দরজায় তালা বন্ধ। প্রতিবেশীগৃহে সন্ধান করিতে গেল। শুনিল তাহার চাচি ছয়মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। —পাড়ার বিজ্ঞলোকেরা পরামর্শ করিয়া, "অযোধ্যা মাহতো, মকাম কলকত্তা" এই ঠিকানা দিয়া, দামড়িলালের দ্বারা তাহাকে (বেয়ারিং) পত্রও লিখাইয়াছিল,—কিন্তু সে পত্র মাস দুই পরে ফিরিয়া আসে এবং বেচারা দামড়িলালের এক আনা পয়সা জরিমানা দিতে হয়। অযোধ্যাকে তাহারা পরামর্শ দিল, দামড়িলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অযোধ্যা যেন তাহার সেই এক আনা পয়সার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।

চাবি লইয়া অযোধ্যা বাড়ী আসিল। দুয়ার খুলিয়া দেখিল, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট বড় নানাজাতীয় আগাছা জন্মিয়াছে।

ঘর খুলিল,—বহুকাল বন্ধ থাকায় ঘরের মেঝে অত্যন্ত সাঁৎসেঁতে হইয়া গিয়াছে। খাটিয়ার একটা পায়ার আধখানা উইপোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। গোটাকতক ইন্দুর ও আরসুলা হঠাৎ আলো দেখিয়া খড় খড় শব্দে পলাইয়া গেল।

অযোধ্যা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, চাবি আবার বন্ধ করিয়া, একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় লইল। কর্ম্ম গিয়াছে—এ কথা তাহাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারিল না;—বলিল, ছুটি লইয়া আসিয়াছি।

তাহারা অযোধ্যাকে অভ্যর্থনা করিয়া তামাক দিল। সে তামাক দুই টার্ন টানিয়াই, খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া, অযোধ্যা হুঁকা নামাইয়া রাখিল। বাবুর বাড়ী অম্বুরীর তামাক খাইয়া খাইয়া তাহার পরকাল গিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অযোধ্যা মজুর নিযুক্ত করিয়া বাড়ী ঘর দুয়ার পরিষ্কার করাইল। লোকে বলিল অযোধ্যা চাকরি করিয়া আমির হইয়া আসিয়াছে। নহিলে, যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেরা মজুরী করিয়া দেহপাত করিয়াছিল, সে কখনও দিনে দুই আনা হিসাবে মজুর নিযুক্ত করে!

নিজের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া অযোধ্যা অন্নপাক করিল। আহারান্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া রেড়ীর তেলে প্রদীপ জ্বালাইল। সে ম্লান আলোক দেখিয়া কেবলি তাহার প্রভুগৃহের বিদ্যুৎ আলোক মনে পড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন গেল—মাস কাটিল। পাড়ার লোকে ক্রমাগত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কতদিনের ছুটি, আবার কবে কলিকাতা যাইতে হইবে? সে বলে, এই যাইব এবার দিন কতক পরে। অযোধ্যা একাকী থাকে,—কাহারও সঙ্গে মেশে না। তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রতিবেশিগণকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সহিত হাস্য-

মোদ করিতে অযোধ্যার প্রবৃত্তিই হয় না। সে নিজের ঘরে নীরবে বসিয়া থাকে,—আর কেবল ভাবে। অখিল বাবুর ছেলেমেয়েগুলিকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছিল,—তাহার মনটি অষ্টপ্রহর কলিকাতার সেই প্রিয় গৃহখানিতে পড়িয়া থাকে।

এইরূপে দুই মাস কাটিলে অযোধ্যা স্থির করিল,—দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখিয়া সকলের সংবাদ আনাইতে হইতেছে। ইংরাজিতে চিঠি লিখাইতে হইবে। গ্রামে কেহ ইংরাজী জানিত না। এ অঞ্চলে ইংরাজি জানিত কেবল খড়কপুরের পোষ্টমাষ্টার। গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ উত্তম গব্যঘৃত সংগ্রহ করিয়া, দুই ক্রোশ দূরে খড়কপুরে গিয়া, পোষ্ট-মাষ্টারকে উপঢৌকন দিয়া, অযোধ্যা তাহার দ্বারা কলিকাতায় চিঠি লিখাইয়া আসিল।

সপ্তাহ পরে দাদাবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। যে পেয়াদা এ চিঠি আনিয়া অযোধ্যাকে দিল, অযোধ্যা তাহাকে মাচা হইতে একটা বিলাতী কুমড়া পাড়িয়া বখশিশ করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ পাগড়ী বাঁধিয়া খড়কপুরে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের দ্বারা চিঠি পড়াইল।

দাদাবাবু তাহার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। বাড়ীর সকলে খুসী হইয়াছেন। ৫ই বৈশাখ খুকীর বিবাহ। অযোধ্যার জন্য খুকীর ভারি মন কেমন করে।

চক্ষের জল মুছিয়া অযোধ্যা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাবিল দশটা টাকা মনি অর্ডার করিয়া সে দাদাবাবুকে পাঠাইয়া দিবে,—দাদাবাবু যেন অযোধ্যার হইয়া খুকীর বিবাহে তাহাকে এক খানি রঙীন কাপড় কিনিয়া দেন।

টাকা বাহির করিবার জন্য অযোধ্যা বাক্স খুলিল। এ বাক্স সে বাড়ী আসিয়া অবধি একদিনও খুলে নাই। বাক্স খুলিয়া দেখিল, সোণার বালা।

দেখিয়া প্রথমটা সে অবাক্ হইয়া গেল। চিরুণীখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, তাহাতে খুকীর ছুইগাছি লম্বা চুল লাগিয়া রহিয়াছে। তখন সমস্ত বুঝিতে পারিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাহার পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইল না। পরদিন সে ঘরে দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া কলিকোতা যাত্রা করিল।

বড়বাজারে তাহার এক পরিচিত মহাজন ছিল। তাহার আড়তে গিয়া অযোধ্যা কয়েকদিবস রহিল। কিছু সোনা কিনিয়া, খুকীর বালা জোড়াটা ভাঙ্গিয়া ভাল করিয়া বড় করিয়া গড়াইয়া লইল।

নিজের জন্যও বস্ত্রাদি খরিদ করিল। একখানি ধূতি হরিদ্রায় রঞ্জিত করিল। গোলাপী রঙের একটি পাগড়ী তৈয়ারি করিল। উৎসববেশ পরিধান করিয়া, পাতলা লাল কাগজে মুড়িয়া বালা দুগাছি লইয়া, অযোধ্যা ৫ই বৈশাখ অপরাহ্নসময়ে অখিল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল।

বাটীর সকলেই তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। খুকী বালা পরিয়া আমোদে আটখানা। অখিল বাবু আসিয়া বলিলেন—"অযুধ্যা তুই আমার চিঠি পেয়েছিস্ ?"

অযোধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"দাদাবাবুর চিঠি ?"

"দাদাবাবুর কেন ? আমার চিঠি। খুকীর বিয়েতে আমি তোকে এক সপ্তাহ হল নেমন্তন্ন করে রেজিষ্টারি চিঠি লিখেছি,—গাড়ীভাড়ার জন্যে দশ টাকার নোট পাঠিয়ে দিয়েছি,—সে তুই পাস নি ?"

গৃহিণী বলিলেন—"ও কি দেশে ছিল নাকি ? ও এই কলকাতায় ছিল, খুকীর জন্যে বালা গড়াচ্ছিল।"

বালার কথা শুনিয়া বাবু রাগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন "তুই গরীব মানুষ খেতে পাস্ নে, অত টাকা খরচ করতে গেলি কেন ? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তোর ?"

অযোধ্যা তখন হাসিয়া হাসিয়া বাক্সার ইতিহাস বলিল।

গৃহিণী বলিলেন—"বটে! তাই বলি খুকীর পুরোণো বালাযোড়াটা গেল কোথা! আলমারিতেই রেখেছিলাম, না সিন্দুকেই ছিল ঠিক কর্‌তে পারিনে।"

অখিল বাবু বলিলেন—"তা বেশ। খুকীরই জিৎ।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যা নিজের রঙ্গীন পাগড়ীটি খুলিয়া সন্তর্পণে উঠাইয়া রাখিয়া বিবাহ বাড়ীর কার্য্যে মাতিয়া গেল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এতদ্দেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা তাহারই নিদারুণ উপসংহার। দক্ষিণাপথে প্রবল-প্রতাপ মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুত্থান কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সূচিত করিয়া আসিতেছিল; এবং যদিও মুসলমানগণ ক্ষণিক উত্তেজনাভরে পাণিপথে মহারাষ্ট্রজাতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তথাপি সেই ভয়াবহ সংঘর্ষের মর্ম্মান্তিক আঘাতে তাঁহাদিগের বিশাল সাম্রাজ্যের দৃঢ়ভিত্তি যেরূপ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, হীনান্তঃসার মোগলজাতি আর তাহার সংস্কার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানাস্থানে প্রধানতঃ বঙ্গদেশে চাতুরী-কুশল, পরাক্রান্ত ইংরাজ জাতির অভ্যুদয় হইল, এবং সময় আসন্ন

দেখিয়া মুসলমানগণ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন; পরে কিছুকাল পেন্‌সন্‌ ভোগ করিয়া মুসলমান জাতি অধুনা তনুত্যাগ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, বিলাসিতাই জাতীয় অবনতির প্রকৃষ্ট রাজপথ। এই সুবিস্তৃত সরল পথটী অবলম্বন করিয়াই মোগলজাতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; এবং অধুনাতন মুসলমানগণও এই পথের পথিক হইয়া আজ এবম্বিধ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। দারিদ্র্যের করাল নিষ্পেষণে, অন্নহীন শূন্য-উদরের গভীর মর্ম্মকাতরধ্বনি উত্থিত করিয়া, সমগ্র ভারতভূমি কাঁপাইয়া যাহারা আজ শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় মরিতেছে, তাহাদিগের অধিকাংশই মুসলমান!

তাই দেখিয়া আজ মুসলমানের মোহ-নিদ্রা একটু একটু করিয়া অপসৃত হইতেছে। কিন্তু সে বঙ্গদেশে নহে। বঙ্গীয় মুসলমানের এখনও সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নাই। হইলে, আজ প্রতি সহস্রে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ৩৭ জন মাত্র দেখিয়া আমাদিগকে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইত না। প্রতিবেশী হিন্দুর প্রতি সহস্রে পঞ্চ-শতাধিক শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তুলনা করিতে গেলে, গণিত শাস্ত্রের সূক্ষ্ম হিসাবে এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমানের অস্তিত্ব আর অনুভব করিয়া উঠিতে পারা যায় না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আরও লক্ষিত হইবে যে, এই ৩৭ জন শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে ন্যূনাধিক ৩০।৩২ জন শুধু স্বর্গীয় মহাত্মা মহম্মদ মোহসিনের অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়াই এই আধুনিক বহুব্যয়সাধ্য শিক্ষা লাভ করিয়াছেন*। এক্ষণে ইউনিভার্সিটী কমিশনের মারাত্মক প্রস্তাব গুলির প্রতি যদি গবর্ণমেণ্ট কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন (ঈশ্বর না করুন!), তাহা হইলে

* কেন না, যাঁহাদিগের "ঘরে খাবার" আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যত দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী, অর্দ্ধাশনে বা অনশনে দিনযাপী মুসলমানেরাই উদরের দায়ে কায়ক্লেশে বিদ্যাশিক্ষার্থ অগ্রসর হন।

ভবিষ্যতে দরিদ্র বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ প্রতি দশ সহস্রে ১টী করিয়া মুসলমান বালককে "শিক্ষিত" স্তম্ভে তুলিয়া দিয়াই আপনাকে চরিতার্থ করিবে। আর আশা কোথায়?

এই বিলাসিতায় উৎসর্গিতসর্ব্বস্ব, আলস্যপরায়ণ, পৌরুষবিহীন, অদৃষ্টবিশ্বাসী, অধঃপাতিত হতভাগ্য বঙ্গীয় মুসলমানগণের অবস্থা, প্রতিবেশী হিন্দুগণ আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা মুসলমান জাতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন; (প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক আছে কি?)—শুধু মুখেই সে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সাহিত্যেও তাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন; দরিদ্র, নিঃসহায়, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, প্রতিবেশীর উপর করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করা, সে ত দূরের কথা!

প্রাচ্য হিন্দু এবং প্রতীচ্য খ্রীষ্টান, এই দুই প্রধান জাতির সহিত মুসলমানের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে; আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যে, এতদুভয় জাতিরই নিকট মুসলমানজাতি নিতান্ত হেয়; কিন্তু কেন, তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। আরবজাতিকে শুধু নির্ব্বাসিত করিয়াই স্পেন ক্ষান্ত হয় নাই; ঘৃণার তাড়নায় সেই আরবজাতি-সমুদ্ভূত জ্ঞান এবং সভ্যতার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিষবৎ বোধ হইয়াছিল, পদাঘাতে তাহা বিদূরিত করিয়া, অজ্ঞানতা ও বর্ব্বরতার অন্ধকূপের ভিতর উচ্ছৃঙ্খলবেগে প্রবিষ্ট হইল, এবং আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। নির্ম্মলতায় পাছে মুসলমানের গন্ধ অনুভূত হয়, এই ভয়ে স্পানিয়ার্ডগণ স্নানাদি ত কখনও করিতই না, অধিকন্তু, আরব-জাতি-প্রতিষ্ঠিত স্নানাগার গুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখে নাই; এবং সর্ব্বাংশে মুসলমানের বিপরীতাচরণ করিয়া ঘৃণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনমানসে, সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মূরীয় নগরগুলি আবর্জ্জনাপূর্ণ, কদর্য্য পূতিগন্ধময় নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল!

এই বীভৎস ঘৃণার স্রোত সমগ্র ইয়ুরোপে প্রবাহিত হইয়া মহা মহম্মদের চরিত্রে কলঙ্ক, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারব্রতে শঠতা এবং নী আরোপণ করিয়াছে; এবং তাঁহার প্রচারিত মহাগ্রন্থ "কোরাণ", Forgery of the Celestial Document," নামে অভি করিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই; অসভ্যতা, বর্ব্ব নৃশংসতা, অত্যাচার-প্রিয়তা, যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি শ্রুতিমধুর, গুণব পদগুলি কেবল মুসলমান নৃপতিবৃন্দেরই উপর প্রযুজ্য বলিয়া নি করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি এবং ধর্ম্মের সহিত বয়ঃ তুলনায় ইস্‌লাম নিতান্তই শিশু; ইহার অবালকসুলভ শাস্ত্রবল শস্ত্রবল, বয়োজ্যেষ্ঠ জাতিসমূহের চক্ষে কি বালকের বৃদ্ধসম আচর ন্যায় অসহনীয় গাত্রদাহের উদ্দীপক হইয়া পড়িয়াছিল? এবং কি এ সংক্রামক বিজাতীয় ঘৃণা?

উল্লিখিত খ্রীষ্টান-রোচক বিশেষ বিশেষ পদাবলীতে মুসলমানগণে একছত্র অধিকার কি না, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে কিন্তু রাজগুণের দোষরাশির পরিমাণ লইয়াই যদি জাতীয় সততার বিচ করিতে হয়, তাহা হইলে ঘৃণাবিকৃতচিত্ত, একদেশদর্শী ইউরোপ ঐতিহাসিকের উপর আমরা কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ নির্ভর করি পারি না।

প্রত্যেক মনুষ্যের দুইটী করিয়া দিক্ আছে, সাদা আর কাল ইচ্ছা করিলে যে কোন একটা মানুষের, কাল দিকটার উপর আর গাঢ় মসী ঢালিয়া দিয়া তাহাতে বিভীষিকার অবতারণা করিয়া, জগতে চক্ষে তাহাকে ঘৃণিত, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়া দেওয়া যায়। আবা তাহার সাদা দিকটী পরিষ্কার শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলে কাল দিকটা আর নজরেই আসে না; অথবা যদিও আসে, তথাপি জগৎ সেই সাদা দিকটার উপর এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, সেটু

উপেক্ষা বা ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারে না। এক নেপোলিয়নের কথা তুলিলেই দেখা যায় যে, ইংরাজ ও মার্কিন লেখকগণ সেই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষকে কি প্রকার বিভিন্ন চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমানজাতির ভাগ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধ সমালোচকবৃন্দ তাঁহার প্রতি অসামান্য উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই বিদেশীয় বিরুদ্ধ সমালোচকবৃন্দই হিন্দুর মুসলমান-বিদ্বেষের মূল। আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায় মুসলমানজাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করেন, তাহা কেবল বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের ঘৃণাবিকৃত অতি-রঞ্জিত বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে। শিশুকাল হইতেই তাঁহারা শিখিয়া আসিতেছেন, "কোরাণের মতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বল এবং অস্ত্র-প্রয়োগে পাপ নাই, বরং পুণ্য আছে;" সুতরাং নৃশংসতার একটা মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে গেলেই, "এক হস্তে কোরাণ, অন্য হস্তে শাণিত তরবারিধারী মুসলমানের" একটা ভয়াবহ বিকট চিত্রই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের মানসপটে চিত্রিত হইয়া উঠে, এবং কঠোর অত্যাচারীর আদর্শস্থলের অধিকার হইতে কচিৎ দুই একটী মোগল সম্রাট অব্যাহতিলাভ করিতে সক্ষম হন। কালেভদ্রে যদি কখনও দেশীয় অথবা বিদেশীয় উদারমতি ঐতিহাসিকের দুই একটী পক্ষপাত-দোষশূন্য অভিমত তাঁহাদের চক্ষে পড়িয়া যায়, তথাপি সেই আজন্ম-বর্দ্ধিত বিকৃতজ্ঞান মুসলমান জাতির উপর সুবিচার করিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইতে চাহে না। ইহা কালের অলঙ্ঘ্যনীয় ধর্ম্ম।

শুধু হিন্দু কেন, মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তও শিক্ষাগুণে ঐরূপ বিকৃত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা নিতান্ত কম নহে। হয় ত কোথায়ও কোথায়ও হইয়াও পড়িয়াছে। আপনার সম্পত্তি পরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিয়া মুসলমান-সমাজ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন,

এই বীভৎস ঘৃণার স্রোত সমগ্র ইয়ুরোপে প্রবাহিত হইয়া মহাপুরুষ মহম্মদের চরিত্রে কলঙ্ক, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারব্রতে শঠতা এবং নীচস্বার্থ আরোপণ করিয়াছে; এবং তাঁহার প্রচারিত মহাগ্রন্থ "কোরাণ", "A Forgery of the Celestial Document," নামে অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই; অসভ্যতা, বর্ব্বরতা, নৃশংসতা, অত্যাচার-প্রিয়তা, যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি শ্রুতিমধুর, গুণবাচক পদগুলি কেবল মুসলমান নৃপতিবৃন্দেরই উপর প্রযুজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি এবং ধর্ম্মের সহিত বয়ঃক্রম-তুলনায় ইস্লাম নিতান্তই শিশু; ইহার অবালকসুলভ শাস্ত্রবল এবং শস্ত্রবল, বয়োজ্যেষ্ঠ জাতিসমূহের চক্ষে কি বালকের বৃদ্ধসম আচরণের ন্যায় অসহনীয় গাত্রদাহের উদ্দীপক হইয়া পড়িয়াছিল? এবং তাই কি এ সংক্রামক বিজাতীয় ঘৃণা?

উল্লিখিত খ্রীষ্টান-রোচক বিশেষ বিশেষ পদাবলীতে মুসলমানগণেরই একছত্র অধিকার কি না, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু রাজগুণের দোষরাশির পরিমাণ লইয়াই যদি জাতীয় সততার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে ঘৃণাবিকৃতচিত্ত, একদেশদর্শী ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের উপর আমরা কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি না।

প্রত্যেক মনুষ্যের দুইটী করিয়া দিক্ আছে, সাদা আর কাল। ইচ্ছা করিলে যে কোন একটা মানুষের কাল দিকটার উপর আরও গাঢ় মসী ঢালিয়া দিয়া তাহাতে বিভীষিকার অবতারণা করিয়া, জগতের চক্ষে তাহাকে ঘৃণিত, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়া দেওয়া যায়। আবার তাহার সাদা দিকটী পরিষ্কার শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলে, কাল দিকটা আর নজরেই আসে না; অথবা যদিও আসে, তথাপি জগৎ সেই সাদা দিকটার উপর এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, সেটুকু

উপেক্ষা বা ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারে না। এক নেপোলিয়নের কথা তুলিলেই দেখা যায় যে, ইংরাজ ও মার্কিন লেখকগণ সেই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষকে কি প্রকার বিভিন্ন চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমানজাতির ভাগ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধ সমালোচকবৃন্দ তাঁহার প্রতি অসামান্য উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই বিদেশীয় বিরুদ্ধ সমালোচকবৃন্দই হিন্দুর মুসলমান-বিদ্বেষের মূল। আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায় মুসলমানজাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করেন, তাহা কেবল বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের ঘৃণাবিকৃত অতি-রঞ্জিত বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে। শিশুকাল হইতেই তাঁহারা শিখিয়া আসিতেছেন, "কোরাণের মতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বল এবং অস্ত্র-প্রয়োগে পাপ নাই, বরং পুণ্য আছে;" সুতরাং নৃশংসতার একটা মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে গেলেই, "এক হস্তে কোরাণ, অন্য হস্তে শাণিত তরবারিধারী মুসলমানের" একটা ভয়াবহ বিকট চিত্রই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের মানসপটে চিত্রিত হইয়া উঠে, এবং কঠোর অত্যাচারীর আদর্শস্থলের অধিকার হইতে কচিৎ দুই একটী মোগল সম্রাট অব্যাহতিলাভ করিতে সক্ষম হন। কালেভদ্রে যদি কখনও দেশীয় অথবা বিদেশীয় উদারমতি ঐতিহাসিকের দুই একটী পক্ষপাত-দোষশূন্য অভিমত তাঁহাদের চক্ষে পড়িয়া যায়, তথাপি সেই আজন্ম-বর্দ্ধিত বিকৃতজ্ঞান মুসলমান্ জাতির উপর সুবিচার করিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইতে চাহে না। ইহা কালের অলঙ্ঘ্যনীয় ধর্ম্ম।

শুধু হিন্দু কেন, মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তও শিক্ষাগুণে ঐরূপ বিকৃত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা নিতান্ত কম নহে। হয় ত কোথায়ও কোথায়ও হইয়াও পড়িয়াছে। আপনার সম্পত্তি পরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিয়া মুসলমান-সমাজ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন,

আপনাদের জাতীয় আদর্শ পরে বিকৃত করিয়া দিতেছে, তরকমা শিশুগণকে তাহাই গ্রহণ করাইতেছেন, পরের হস্তে আপনার ধর্ম্মে অতিমাত্র সঙ্কীর্ণ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও বিচলিত হইতেছেন না তাহার সংস্কার করিতে এখনও অগ্রসর হইতেছেন না, ঘৃণিত অপমানিত, লাঞ্ছিত হইয়াও সগৌরবে বিলাসিতার ক্রোড়ে মস্ত রাখিয়া, স্বনামধন্য "নবাবের জাতি" নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা তাহারই শাস্তি, বিধির অখণ্ডনীয় সূক্ষ্ম বিচার

কিন্তু সাহিত্য এবং কাব্যালোচনাচ্ছলে এ হেন দুর্দ্দশাগ্রস্ত, পতি প্রতিবেশীর উপর চিরস্থায়ী অত্যাচার করিয়া হিন্দুগণ সুবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতির ভাগ অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছে। লাভের মধ্যে, সম-সুখ-দুঃখভাগী আপন প্রতিবেশীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করায় একটা নিষ্ঠুর আনন্দ; আনন্দটুকু উপভোগ করিবার প্রবল তৃষ্ণাটাও বিদেশীয় সমালোচক বৃন্দই যে তাঁহাদের চিত্তে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষতি ইহাতে কে কতটা দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধের আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয় স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিবেন।

এই স্থানে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিও ইত্যগ্রে বঙ্গসাহিত্যজগতে ইহা লইয়া একবার যৎকিঞ্চিৎ বিফল আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তথাপি তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য নিঃশেষিত না হওয়ায় আমরা পুনর্ব্বার ঐ কথার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমাদিগের ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া সুবিচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের নামোল্লেখ করিতে গেলে স্বনামখ্যাত

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়। দুঃখের বিষয়, তাঁহারই গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ হইতে মুসলমান বিদ্বেষ অতি পরিষ্কার-রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। ইহাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রাজসিংহ" খানি যেন বিশেষ করিয়া মুসলমানকেই অপদস্থ করিবার জন্য, মুসলমানের অন্তঃকরণে শেল বিদ্ধ করিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানির প্রতি পৃষ্ঠা মুসলমান-বিদ্বেষ-বিষে পরিপূর্ণ। মিতাচারী এবং জিতেন্দ্রিয় সম্রাট্ অওরঙ্গজেব, যৌবন প্রাপ্তির পর জীবনে যিনি কখনও আমিষ-ভক্ষণ করেন নাই, নির্ম্মল জলই যাঁহার একমাত্র পানীয় ছিল, তাঁহাকে কি প্রকার জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ নরপিশাচের চিত্রে চিত্রিত করা হইয়াছে। আর তাঁহার স্নেহময়ী ধর্ম্মপরায়ণা কন্যা জেবউন্নিসা, ধর্ম্মালোচনা, কাব্যালোচনা, কোরাণপাঠ এবং ঈশ্বরপ্রেমের কবিতা রচনাই সংসারে যাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল, স্বয়ং অওরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসরক্ষণ যাঁহার নিকট কোরাণ শ্রবণে এবং ধর্ম্মতর্কে অতিবাহিত করিতেন, রাজদরবারে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন কূটতর্ক উত্থিত হইলে মীমাংসার্থ যাঁহার নিকট ফকির ও দরবেশগণ সমবেত হইতেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয়া মহাকবি জেবউন্নিসাকে গভীর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া, তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে নির্গত করা হইয়াছে,—"জাহান্নামও মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই, খোদাও জানিতাম না, দীনও জানিতাম না"!—হায় ভাগ্য!

এতদ্ভিন্ন রওশন-আরা প্রভৃতি বাদসাহের অন্যান্য পরিজনবর্গের চরিত্রে "বিচারশূন্য, বাধাশূন্য, তৃপ্তিশূন্য" ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আরোপিত হইয়াছে। উড়িয়াদিগের কলঙ্কের কথা, হাঁড়ি না ফেলিয়া কুকুর মারার কথা, প্রভৃতি নীচ প্রবাদবাক্যের সহিত ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটের কল্পিত কার্য্যকলাপের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বাদসাহ-জাদীকে রূপনগরের ভূঁইয়ার মেয়ের বন্দিনী করিয়া, তাঁহাকে "হিন্দুর

আপনাদের জাতীয় আদর্শ পঙ্কে বিকৃত করিয়া দিতেছে, তরলমতি শিশুগণকে তাহাই গ্রহণ করাইতেছেন, পরের হস্তে আপনার ধর্ম্মের অতিমাত্র সঙ্কীর্ণ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও বিচলিত হইতেছেন না, তাহার সংস্কার করিতে এখনও অগ্রসর হইতেছেন না, ঘৃণিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হইয়াও সগৌরবে বিলাসিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, স্বনামধন্য "নবাবের জাতি" নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন! বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা তাহারই শাস্তি, বিধির অখণ্ডনীয় সূক্ষ্ম বিচার!

কিন্তু সাহিত্য এবং কাব্যালোচনাচ্ছলে এ হেন দুর্দ্দশাগ্রস্ত, পতিত প্রতিবেশীর উপর চিবস্থায়ী অত্যাচার করিয়া হিন্দুগণ সুবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতির ভাগ অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছে। লাভের মধ্যে সম-সুখ-দুঃখভাগী আপন প্রতিবেশীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করায় একটা নিষ্ঠুর আনন্দ; এ আনন্দটুকু উপভোগ করিবার প্রবল তৃষ্ণাটাও বিদেশীয় সমালোচক-বৃন্দই যে তাঁহাদের চিত্তে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষতি ইহাতে কে কতটা দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধের আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয় স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিবেন।

এই স্থানে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিও ইত্যগ্রে বঙ্গসাহিত্যজগতে ইহা লইয়া একবার যৎকিঞ্চিৎ বিফল আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তথাপি তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য নিঃশেষিত না হওয়ায় আমরা পুনর্ব্বার ঐ কথার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমাদিগের ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া, সুবিচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের নামোল্লেখ করিতে গেলে স্বনামখ্যাত

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়। দুঃখের বিষয়, তাঁহারই গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ হইতে মুসলমান বিদ্বেষ অতি পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হইতেছে। ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "রাজসিংহ" খানি যেন বিশেষ করিয়া মুসলমানকেই অপদস্থ করিবার জন্য, মুসলমানের অন্তঃকরণে শেল বিদ্ধ করিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানির প্রতি পৃষ্ঠা মুসলমান-বিদ্বেষ-বিষে পরিপূর্ণ। মিতাচারী এবং জিতেন্দ্রিয় সম্রাট্ অওরঙ্গজেব, যৌবন প্রাপ্তির পর জীবনে যিনি কখনও আমিষ-ভক্ষণ করেন নাই, নির্ম্মল জলই যাঁহার একমাত্র পানীয় ছিল, তাঁহাকে কি প্রকার জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ নরপিশাচের চিত্রে চিত্রিত করা হইয়াছে। আর তাঁহার স্নেহময়ী ধর্ম্মপরায়ণা কন্যা জেবউন্নিসা, ধর্ম্মালোচনা, কাব্যালোচনা, কোরাণপাঠ এবং ঈশ্বরপ্রেমের কবিতা রচনাই সংসারে যাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল, স্বয়ং অওরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসরক্ষণ যাঁহার নিকট কোরাণ শ্রবণে এবং ধর্ম্মচর্চাতে অতিবাহিত করিতেন, রাজদরবারে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন কূটতর্ক উত্থিত হইলে মীমাংসার্থ যাঁহার নিকট ফকির ও দরবেশগণ সমবেত হইতেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয়া মহাকবি জেবউন্নিসাকে গভীর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া, তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে নির্গত করা হইয়াছে,—"জাহান্নামও মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই, খোদাও জানিতাম না, দীনও জানিতাম না"!—হায় ভাগ্য!

এতদ্ভিন্ন রওশন-আরা প্রভৃতি বাদসাহের অন্যান্য পরিজনবর্গের চরিত্রে "বিচারশূন্য, বাধাশূন্য, তৃপ্তিশূন্য" ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আরোপিত হইয়াছে। উড়িয়াদিগের কলঙ্কের কথা, হাঁড়ি না ফেলিয়া কুকুর মারার কথা, প্রভৃতি নীচ প্রবাদবাক্যের সহিত ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটের কল্পিত কার্য্যকলাপের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বাদসাহজাদীকে রূপনগরের ভূঁইয়ার মেয়ের বন্দিনী করিয়া, তাঁহাকে "হিন্দুর

ঘরের অস্পর্শীয়া শূকরী," এবং "হিন্দু পরিচারিকামণ্ডলীর চরণ-কলঙ্ককারী কীট," বলিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়া গালি দেওয়া হইয়াছে। "সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব"; * সত্য, কিন্তু ঘৃণার তাড়নায় এরূপ অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলার অন্তরালে, মুসলমানের অন্তরে শেল বিদ্ধ করিয়া বিকট হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একটা জঘন্য প্রবৃত্তি আছে বলিয়া স্বতঃই আমাদের ধারণা হয়।

অওরঙ্গজেব "মহাপাপিষ্ঠ" ছিলেন—আমরা মুসলমানেরা তাহা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সে আলোচনা বারান্তরে করিব।

অওরঙ্গজেবের দোষের মধ্যে, তিনি ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। যদিও হিন্দুদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার একটা মহা রাজনৈতিক ভ্রান্তি হইয়াছিল বলিতে হইবে, এবং যদিও এই মহাভ্রান্তিই ভবিষ্যতে মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার একটা প্রধানতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি, কেবল এই বিষয় ভিন্ন অন্য কোন দিক্ হইতে তিনি তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই, ইহা মুক্ত-কণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যান্য লেখকবৃন্দও মুসলমানকে হাতে পাইলে আর ছাড়েন নাই। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা আকবর, হিন্দুর নিকট হইতে যিনি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা," এই দুর্লভ সুনাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন, ঔপন্যাসিক হারাণ রক্ষিত মহাশয় তাঁহার চরিত্রে "শঠতা, কপটতা, এবং লম্পটতার" দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া মুসলমানের ছিদ্রান্বেষণ-প্রিয় হিন্দুর কিরূপ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাহা তাঁহার "মন্ত্রের সাধনে" দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমবাবুও মহাত্মা আকবরের নামে রাজপুতনীকে দিয়া একবার ঝাড়ু মারাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন;

* ভারতী, ১৩০৭, কার্ত্তিক, "মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গলা শিক্ষা" দ্রষ্টব্য।

সুকবি নবীন বাবু "পলাসীর যুদ্ধে" অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক সিরাজের চরিত্রে যে দুর্ব্বহভার কলঙ্কপরম্পরা অর্পণ করিয়া সাহিত্যজগতে "নাম" করিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থে তাহার সুযোগ্য প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।* বঙ্কিম বাবু তাঁহার কবিতায় "আরবী বানর, পারসী পামর, ঘোরীয় বানর" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া কলিযুগে নূতন রামায়ণের সূত্রপাত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত মুসলমানকে "ছাগল দেড়ে, নেড়ে, মিয়ামোল্লা কাছা খোল্লা, নরাধম নীচ" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া, কবিত্বশক্তির অতি ক্ষোভনীয় অপচয় করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

বাহুল্য-ভয়ে অপরাপর দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইতে আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। ভরসা করি, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছি। বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গলা-সাহিত্যে যোগদান করেন না বলিয়া হিন্দুগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলুন দেখি, মুসলমানেরা বাঙ্গলা-সাহিত্য পড়িবে কি কেবল গালি খাইবার জন্য? অবশ্য ভাল চিত্র যে নাই এমন নহে, তবে মন্দের তুলনায় তাহা এত অল্প যে, সেটুকু ছেলে-ভুলান ছলমাত্র বলিয়া মনে হয়। বিদেশীয় ঐতিহাসিকের গালি সহ্য হয়, কিন্তু সমদুঃখভাগী প্রতিবেশীর গালি সহ্য হয় না। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র যদি একটু রহিয়া সহিয়া, একটু রাখিয়া ঢাকিয়া মুসলমান বিদ্বেষ ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলে কর্ত্তব্য বোধে আজ আমাদিগকে

* যদিও জগতের চক্ষে অক্ষয় বাবুর সিরাজ, নবীন বাবুর লোক-প্রসিদ্ধ দুর্দ্দমনীয় লম্পট সিরাজের স্থান কবে অধিকার করিয়া তাঁহার শ্রম সফল করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। বঙ্গ-সাহিত্য অদ্যাপি হতভাগ্য সিরাজকেই বঙ্গ-নারীকুলের দৃঢ় অবরোধভাগ্যের প্রধান নিয়ামকরূপে নির্দ্দেশ করিতে কসুর করিতেছে না। (ভারতী, ১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ, ১৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাঁহার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া ম্রিয়মাণ হইতে হইত না। কিন্তু তিনি যেমন মুসলমানের ভালটুকুর প্রতি অন্ধ হইয়া মন্দটুকু লইয়াই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, আমরা অবশ্যই সেরূপ অবিচার কথনই করিব না। তাঁহার গুণ গাহিতে, সাহিত্য গুরু বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে, হিন্দু অপেক্ষা আমরা পশ্চাৎপদ হইব না, যদি তাঁহারা আমাদিগের বিচার-প্রার্থনার প্রতি কর্ণপাত করিতে কুণ্ঠিত না হন। মুসলমানের দুর্ভাগ্য, যে সে সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন লেখকবৃন্দের আক্রমণমুখে যোগ্য প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না, তাই অসহায় অবস্থায় পাইয়া, তাঁহারা এই সকল অযথা কুৎসা রটনা করিয়া মুসলমানের অন্তঃকরণে এরূপ স্থায়ী ক্ষোভদানে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বদ্ধ, দুর্ব্বল প্রতিবেশীর উপর এতাদৃশ অত্যাচার করিয়া কি তাঁহারা সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন? তাহার ফলে আজ উভয় জাতিকেই পরস্পরের নিকট হইতে গঞ্জনা ভোগ করিতে হইতেছে। এক্ষণে ইহার প্রতীকারের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে। কালধর্ম্মে যাহা একবার প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা খণ্ডন করিতে হইলে মহাপুরুষের প্রয়োজন—আমরা ত কীটানুকীট।

বিগত ১৩০৭ সালের কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী সাহেবের "The Vernacular Education in Bengal" নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত বক্তৃতার সুযোগ্য সমালোচনা করিয়াছেন। পাঠ্য-পুস্তক সম্বন্ধে সৈয়দ সাহেবের অভিমতগুলি রবিবাবু যুগপৎ সমর্থন এবং প্রতিপাদন করিয়া আমাদের আর বলিবার কিছুই রাখেন নাই। কিন্তু তিনি সাহিত্যে ব্যক্তিগত-বিদ্বেষের গুরুত্বলাঘব করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হিন্দুর মুসলমান-বিদ্বেষের বেলায় খাটে কি না

তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। রবিবাবু লিখিয়াছেন, "থ্যাকারের গ্রন্থে ফরাসী-বিদ্বেষ পদে পদে দেখা যায়, কিন্তু ইংরাজি-সাহিত্যপ্রিয় ফরাসী পাঠক "থ্যাকারের গ্রন্থকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন না।" এ কথার প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, ফরাসী-ইংরাজে যে সম্বন্ধ, ভারতে হিন্দু-মুসলমানে সে সম্বন্ধ নহে। রবিবাবুই সেই প্রবন্ধের অন্যত্র বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা-মুসলমানের সহিত বাঙ্গালী-হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এ কথা যেন আমরা কখনও না ভুলি।" ফরাসী-ইংরাজে সে রক্তের সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। শুধু সাহিত্যের রসোপভোগের জন্য ফরাসীরা ইংরাজের বিদ্বেষ উপেক্ষা করিতে পারেন, কেন না, সাহিত্যের সে ব্যক্তিগতঘৃণাবিদ্বেষ, "ডোভার" পার হইয়া তাঁহাদিগের গায়ে আঁচড় লাগাইতে পারিবে না। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের কথা ঢের স্বতন্ত্র। কেন না, বর্ষার সময়ে একের চালের ধারা অন্যের উঠানে পড়ে। সুতরাং হিন্দুর মুসলমান-বিদ্বেষের কথা কাণে শুনিয়া এবং সাহিত্যে পড়িয়া মুসলমানেরা ফরাসীদিগের ন্যায় তাহা উপেক্ষা করিবে কেমন করিয়া? রবিবাবু আইরিশদের প্রতি ইংরাজের বিদ্বেষের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ ইংরাজ-আইরিশের অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর, কেন না, দুইটী সুখী প্রতিবেশী অপেক্ষা দুইটী দুঃখী প্রতিবেশীর হৃদয়ের টান অনেক বেশী, অন্ততঃ হওয়াটা উচিত।

ঐ প্রবন্ধের উপসংহার কালে রবিবাবু মুসলমান সুলেখকবৃন্দ হইতে যে ক্ষোভের প্রতীক্ষা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাহা আমাদের নিকট বিরোধমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে সেরূপ প্রতীক্ষা ইংরাজের মুখে আইরিশদিগের সম্বন্ধে অধিকতর শোভা পাইত। হিন্দুগণ মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিয়া যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর আবার মুসলমানগণ যদি হিন্দুর

অন্তরে ক্ষোভদান করিয়া বিরোধের উপর বিরোধ চাপাইতে বসে তাহা হইলে আমাদের "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার" স্বপ্ন কস্মিন্‌কালেও সফল হইবে না। কিন্তু হিন্দু সুলেখকগণ যদি মুসলমান-বিদ্বেষভাব সাহিত্যে এত পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া, ইংরাজের ফরাসী এবং আইরিশ বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত অনুকরণ না করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানকে আজ একই গৃহে আবদ্ধ বৈরীভাবাপন্ন দুই সহোদর ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বাস করিতে হইত না; এবং রবিবাবুকেও আজ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে সাহিত্যসমরে আহ্বান করিতে হইত না।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দু ভ্রাতৃগণ যদি একতা প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান-ঘৃণা অন্তর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সাহিত্যের এই চিরস্থায়ী বিদ্বেষ-শূলের তীক্ষ্ণতার লাঘব করিতে, মুসলমানগণের সহিত একযোগে, একপ্রাণে যেন তাঁহারা যত্নবান হন; কেবল মাত্র মুসলমানের যত্ন ও চেষ্টায় ততখানি হইয়া উঠা অসম্ভব। যদিও সাহিত্য হইতে তাহা এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলা যাইতে পারে না, তথাপি তাহার একদেশ-দর্শিতা এবং ন্যায়-বিচারহীনতার কথা একবার হিন্দুর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরাও ভবিষ্যতের অদৃষ্টগর্ভে "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার" একখানি প্রতিমূর্ত্তির সুস্পষ্ট ছায়া দেখিয়া উৎসাহিত হইতে পারিব। কাল সে প্রতিমূর্ত্তির প্রাণদান করিবে।

শ্রীইমদাদল হক।

বঙ্গের নষ্ট শিল্পোদ্ধার।

সমগ্র ভারতে শিল্প-বিদ্যার অবনতি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কংগ্রেসের পৃষ্ঠ-পোষকগণ, অনেক দেশহিতৈষী মহাত্মা এবং কখনও কখনও গভর্ণমেণ্ট এই সকল নির্ব্বাণোন্মুখ শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন তাহাও সম্বাদপত্র পাঠে জানিতে পারি। কেহ কেহ দেশী দ্রব্য ব্যবহারে, কেহ বা বিদেশী দ্রব্য অব্যবহারে এই সকল দেশী শিল্পের উন্নতি করিতে প্রয়াস পান। আমরা আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাই যে, যে সকল স্থানে "স্বদেশী ভাণ্ডার" বা দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, তথায় যথেষ্ট পরিমাণে দেশজাত দ্রব্য পাওয়া যায় না। স্বদেশী ভাণ্ডারের অধ্যক্ষগণকে বলিতে শুনিয়াছি "মহাশয় আমরা জিনিষ যোগান দিতে পারি না।" যখন এদেশের শিল্পজাত দ্রব্য এদেশের সকলে ব্যবহার করিতেন, বিলাতি কাপড়, ছাতা, জুতা ইত্যাদি যখন এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানা হইত না, তখন দেশী কারিগরে কি করিয়া এই বিরাট অভাব মোচন করিত—আর আজকালই বা কেন তাহারা অক্ষম হইল? বিলাতি কাপড় আমদানী হইবার পূর্ব্বে যে এদেশের লোকে নগ্ন থাকিত না তাহা সকলেই বলেন। নানাবিধ জামার কাপড়, রকম রকম শীতবস্ত্র ছিল না তাহা স্বীকার করি—কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র অভাবে যে ইতর সাধারণ সকলে লজ্জা রক্ষা করিতে পারিত না তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তখন দেশের সাধারণের উপযোগী যে বস্ত্র নির্ম্মিত তাহা স্থূল, অমসৃন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী; এখন সাধারণের ব্যবহার্য্য যে বস্ত্র বিলাত হইতে আমদানী হয় তাহা মসৃন, চিক্কণ কিন্তু অল্পকাল স্থায়ী। এখন সে প্রকার স্থূল দেশী কাপড় আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্তরে ক্ষোভদান করিয়া বিরোধের উপর বিরোধ চাপাইতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার" স্বপ্ন কস্মিন্‌কালেও সফল হইবে না। কিন্তু হিন্দু সুলেখকগণ যদি মুসলমান-বিদ্বেষভাব সাহিত্যে এত পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া, ইংরাজের ফরাসী এবং আইরিশ বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত অনুকরণ না করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানকে আজ একই গৃহে আবদ্ধ বৈরীভাবাপন্ন দুই সহোদর ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বাস করিতে হইত না; এবং রবিবাবুকেও আজ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে সাহিত্যসমরে আহ্বান করিতে হইত না।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দু ভ্রাতৃগণ যদি একতা প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান-ঘৃণা অন্তর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সাহিত্যের এই চিরস্থায়ী বিদ্বেষ-শূলের তীক্ষ্ণতার লাঘব করিতে, মুসলমানগণের সহিত একযোগে, একপ্রাণে যেন তাঁহারা যত্নবান হন; কেবল মাত্র মুসলমানের যত্ন ও চেষ্টায় ততখানি হইয়া উঠা অসম্ভব। যদিও সাহিত্য হইতে তাহা এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলা যাইতে পারে না, তথাপি তাহার একদেশ-দর্শিতা এবং ন্যায়-বিচারহীনতার কথা একবার হিন্দুর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরাও ভবিষ্যতের অদৃষ্টগর্ভে "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার" একখানি প্রতিমূর্ত্তির সুস্পষ্ট ছায়া দেখিয়া উৎসাহিত হইতে পারিব। কাল সে প্রতিমূর্ত্তির প্রাণদান করিবে।

শ্রীইমদাদল হক।

বঙ্গের নষ্ট শিল্পোদ্ধার।

সমগ্র ভারতে শিল্প-বিদ্যার অবনতি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কংগ্রেসের পৃষ্ঠ-পোষকগণ, অনেক দেশহিতৈষী মহাত্মা এবং কখনও কখনও গভর্ণমেণ্ট এই সকল নির্ব্বাণোন্মুখ শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন তাহাও সম্বাদপত্র পাঠে জানিতে পারি। কেহ কেহ দেশী দ্রব্য ব্যবহারে, কেহ বা বিদেশী দ্রব্য অব্যবহারে এই সকল দেশী শিল্পের উন্নতি করিতে প্রয়াস পান। আমরা আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাই যে, যে সকল স্থানে "স্বদেশী ভাণ্ডার" বা দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, তথায় যথেষ্ট পরিমাণে দেশজাত দ্রব্য পাওয়া যায় না। স্বদেশী ভাণ্ডারের অধ্যক্ষগণকে বলিতে শুনিয়াছি "মহাশয় আমরা জিনিষ যোগান দিতে পারি না।" যখন এদেশের শিল্পজাত দ্রব্য এদেশের সকলে ব্যবহার করিতেন, বিলাতি কাপড়, ছাতা, জুতা ইত্যাদি যখন এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানা হইত না, তখন দেশী কারিগরে কি করিয়া এই বিরাট অভাব মোচন করিত—আর আজকালই বা কেন তাহারা অক্ষম হইল? বিলাতি কাপড় আমদানী হইবার পূর্ব্বে যে এদেশের লোকে নগ্ন থাকিত না তাহা সকলেই বলেন। নানাবিধ জামার কাপড়, রকম রকম শীতবস্ত্র ছিল না তাহা স্বীকার করি—কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র অভাবে যে ইতর সাধারণ সকলে লজ্জা রক্ষা করিতে পারিত না তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তখন দেশের সাধারণের উপযোগী যে বস্ত্র জন্মিত তাহা স্থূল, অমসৃন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী; এখন সাধারণের ব্যবহার্য্য যে বস্ত্র বিলাত হইতে আমদানী হয় তাহা মসৃন, চিক্কণ কিন্তু অল্পকাল স্থায়ী। এখন সে প্রকার স্থূল দেশী কাপড় আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রাচীনদিগের নিকট শুনিয়াছি সেকালে বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র "সুচেন" কাপড় নামক এক প্রকার কাপড় পাওয়া যাইত। সে কাপড় ইতর-সাধারণে ব্যবহার করিত। তাহার পরিসর অল্প, জমী খুব স্থূল এবং এক জোড়া কাপড়ে দুই বৎসর কাল বেশ কাটিয়া যাইত। সে কাপড় ছিন্ন হইতে আরম্ভ হইলেও ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ছয় মাস কাটিয়া যাইত। আজকাল মধুপুর, আশানসোল অঞ্চলে ধাঙ্গরদিগের যে প্রকার পরিধেয় দেখিতে পাওয়া যায়, সুচেন কাপড় কতকটা সেই প্রকারের ছিল। তবে ধাঙ্গরদিগের কাপড়ের ন্যায় এত স্থূল ও অল্পপরিসর ছিল না। উড়িষ্যায় এখনও এই সুচেন জাতীয় কাপড় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার মধ্যবিত্ত লোকের এই সুচেন কাপড় নিত্য ব্যবহার্য্য বা "আট-পৌরে" ছিল। এই সুচেন কাপড়ের দাম এখনকার বিলাতি কাপড়ের অপেক্ষা অধিক ছিল না। চার টাকা পাঁচ টাকা দামের দেশী কাপড় মধ্যবিত্ত লোকে পোষাকি বলিয়া ব্যবহার করিতেন, সেইজন্য তখনকার পোষাকি আটপৌরে কাপড়ের মধ্যে ব্যবধানটা বেশ সুস্পষ্ট ছিল।

যখন বিলাতী জিনিষের প্রথম সম্মোহিনী দীপ্তি ভারতের নয়নকে ঝলসিত করিয়া দিল—যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র আসিয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিল, তখন দরিদ্র লোকে দেখিল যে "বাবু" হইতে হইলে আর চার পাঁচ টাকার কাপড় কিনিতে হইবে না। দুই টাকা জোড়া বিলাতী কাপড় দেশী ছয় টাকা জোড়া কাপড়ের অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর; সুতরাং দুই টাকাতেই যথেষ্ট পরিমাণে বাবুগিরি করিতে পারা যায়। দুই টাকা ব্যয় করিয়া সুচেন কাপড় পরিলে সাধারণে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু দুই টাকার বিলাতি কাপড় পরিলে তাহার আর্থিক অবস্থা অনায়াসে গোপন করিতে পারা যায়। যে সময় ভারতের লোকে নিজের দারিদ্র্য সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইত না—সে সময় কাটিয়া গিয়াছে। এখন সকলেই

নিজের অবস্থা অপেক্ষা উন্নত অবস্থাশালীর ন্যায় দাঁড়া দস্তুর দেখাইতে ব্যগ্র। এখন দুই টাকার বিলাতি কাপড় থাকিতে কে দুই টাকার সুচেন কাপড় পরিধান করিয়া সাধ করিয়া নিজের দারিদ্র্য জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া রাখিবে?

বিলাতী কাপড়ের আর এক সুবিধা, যে কাপড় নিত্য-ব্যবহার্য্য সেই কাপড়ই আবার রজকালয় হইতে পরিস্কৃত করিয়া আনিলে পোষাকি হইয়া যায়। এখন একজন মজুর যে কাপড় পরিয়া ইটের ঝুড়ি মাথায় লইয়া চলিয়া যায়, এক পয়সা বা দুই পয়সা খরচ করিয়া সেই কাপড় ধোয়াইয়া লইলে সে অনায়াসে রাজসভাতেও উপস্থিত হইতে পারে। সুচেন কাপড়ে তাহা হইত না। তাহাকে "শত ধৌতেন" পোষাকী করিতে পারা যাইত না। সেইজন্য সুচেন কাপড়ের আদর কমিয়া গেল। যে সুচিরা কাপড় বুনিত তাহাদের অন্ন উঠিয়া গেল, তাহারা মাকু ছাড়িয়া কেহ বা লাঙ্গল ধরিল আবার কেহ বা কলম ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে কুণ্ঠিত হইল না। তখন প্রতি পল্লীগ্রামে ৫.৬ ঘর সুচি কাপড় বুনিয়া সংসার প্রতিপালন করিত, আজকাল তাহারা তাঁত ছাড়িয়া পরের বাড়ি দাস্য বৃত্তি বা কৃষি-কার্য্য করিয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে সুচেন কাপড় নষ্ট হইল তাহার জন্য দায়ী কে? কাহার দোষে এই স্থূল নিত্যব্যবহার্য্য বস্ত্র আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে ভারতের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই জন্য সমাজের নিকট দায়ী। আমরা দেখিতে পাই যে অশিক্ষিত লোকে শিক্ষিত লোকের আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষার অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রাচীন কালেও এই অনুকরণ বৃত্তি যথেষ্ট ছিল। তখনকার শিক্ষিত এবং ভদ্রসম্প্রদায় যে প্রকার বেশ-ভূষা ব্যবহার করিতেন, ইতর-সাধারণেও সেই প্রকার বেশভূষা ব্যবহার করিত। মহারাজা নবকৃষ্ণের যে জীবনী বাহির হইয়াছে তাহাতে

মহারাজার একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। যে বেশে মহারাজার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে, সে বেশ পরিধান করিতে আজকালকার একজন বেহারাও কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যে শিখা, অনাবৃত কলেবর, স্কন্ধে একখানা উত্তরীয়, পরিধানে এক খানা ধুতি এবং পদে কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) এই বেশ-ভূষাতে সজ্জিত হইয়া তখনকার বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কায়স্থকুল-তিলক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন—ভ্রমণে কেন না মহারাজার পশ্চাতে একজন ছত্রধর একটা প্রকাণ্ড ছত্র মহারাজার মাথার উপর ধরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিপ্রতিপত্তি-শালী বিদ্বান বলিয়া পরিচিত এবং অগাধ ধনসম্পত্তির অধীশ্বর যখন এই দরিদ্রজনোচিত পোষাক পরিধানে ইতস্ততঃ করিতেন না, তখন অপর সাধারণ লোকে যে তাঁহার অপেক্ষাও হীন বেশ পরিধান করিয়া সন্তুষ্ট হইত তাহা বলা বাহুল্য। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই বেশভূষা ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও কায়স্থকুলতিলক মহারাজ নবকৃষ্ণ যে পোষাক ব্যবহার করিতেন তাহা সাধারণের অনুকরণীয় হইলেও মহার্ঘ্য ছিল না। সুতরাং ইতরসাধারণ তাহা ব্যবহার করিতে কষ্ট পাইত না।

কিন্তু আজকাল শিক্ষিত ও ভদ্রগণ যে প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করেন তাহা সাধারণের অনুকরণীয় হওয়াতে বড় গোলযোগ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিক্ষিত ভদ্রলোকের অনুকরণ করা কতকটা স্বাভাবিক। সকল দেশেই এবং সকল সময়েই আমরা তাহার প্রমাণ পাই। ইউরোপে দরিদ্র রমণীরা ধনবতী "লেডীদের" অনুকরণে তৎপর হইয়া কি ভয়ানক ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ে। স্ত্রীর পোষাকের ব্যয় স্বামীর পক্ষে সময়সময় অসহ্য হইয়া উঠে। প্রাচীন কালের সংস্কৃত-শিক্ষিত ভদ্রলোকের পোষাক আর আজ কালিকার

ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্রলোকের পোষাকের তুলনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে বেশভূষায়—বিলাসিতার জন্য আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় কত দায়ী। আজকাল যে সকল শিক্ষিত স্বদেশ-হিতৈষী দেশী বস্ত্রাদি ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং সাধারণকে দেশী দ্রব্য ব্যবহারে পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা করযোড়ে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা নিজে যে সকল দেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা কি তাঁহাদের অনুকারী ইতর সাধারণ সকলের পক্ষে সুপ্রাপ্য? তাঁহারা কি পূর্ব্বের ন্যায় ২৲ টাকা জোড়া স্থূল বস্ত্র ব্যবহার করেন—না ৪।৫ অথবা ছয় টাকা মূল্যের দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন? দরিদ্রদিগের এই প্রকার মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করিবার সুবিধা নাই অথচ তাঁহারা স্বাভাবিক অনুকরণ বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন; সুতরাং তাঁহারা শিক্ষিত বাবুদিগের সূক্ষ্ম মসৃণ বস্ত্রের অনুকরণে বিলাতী সুলভ অথচ সূক্ষ্ম ও মসৃণ বস্ত্র ব্যবহার করেন। ইহার জন্য আমরা এই অশিক্ষিত বা দরিদ্রগণকে দোষ দিতে পারিনা। যদি স্বদেশ-হিতৈষী বাবুরা একটু স্থূল বা অমসৃণ বস্ত্র পরিধাণ করিতে কষ্টবোধ করেন তাহা হইলে এই গরীববেচারাগণ কেন মোটা কাপড় পরিতে কষ্ট বোধ না করিবে? বর্ত্তমান শিক্ষিত স্বদেশ-হিতৈষী কাহাকেও ত আজকাল, স্থূল, অমসৃণ দরিদ্র-সুলভ বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিতে পাইনা। ৪।৫ টাকা মূল্যের বস্ত্র কয়জন নিত্যব্যবহার্য্য করিতে সক্ষম? কাযে কাযেই দেশীয় শিল্প উদ্ধারের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সমস্ত জনসাধারণের তুলনায় মুষ্টিমেয় মাত্র। দেশের শিল্প ও শিল্পী রক্ষা দুই দশ জন ধনবানের কার্য্য নহে। দেশের যদি দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণের সহানুভূতি পাইবার কোনও উপায় না থাকে, তাহা হইলে কয়জন ধনবান দেশের তাঁতিকুলকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন? বিলাতী দ্রব্যের আমদানীতে আমাদের দেশজ যে সকল দ্রব্য মাটী হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বস্ত্রই

প্রধান, সেইজন্য আমরা প্রধানতঃ বস্ত্র ও তাঁতীদিগের কথাই বলিতেছি। দেশে সুলভ বস্ত্র উৎপন্ন করিতে পারিলেই যে আমরা বিলাতি বাজারকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইতে সক্ষম হইব তাহা কেহ স্বপ্নেও মনে করিবেন না! দেশী সুলভ বস্ত্র যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোকগণ গ্রহণ না করিবেন, ততদিন দেশী বস্ত্র হাজার সুলভ হইলেও সাধারণমধ্যে আদর পাইবে না। বিলাতের ন্যায় পরিষ্কার ও মসৃণ বস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিই।—যদি এখনকার শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ আবার সুচেন কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে বোধ হয় ১০।১৫ বৎসর মধ্যেই ম্যাঞ্চেষ্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র আমাদের দেশে আর তাদৃশ আদৃত হইবে না। ১০।২০ জন ধনবানে দলবদ্ধ হইয়া Joint Stock Company স্থাপন পূর্ব্বক ম্যাঞ্চেষ্টারের ন্যায় কাপড়ের কল সংস্থাপন করা আমাদের পক্ষে এখন দুরাশা মাত্র। Bengal Match Factory এবং বেঙ্গল প্রভিন্সাল রেলওয়ে হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে সে প্রকার যৌথ কারবার চলিতে এদেশে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে—কতকাল পরে সে দিন আসিবে তাহার স্থিরতা নাই! চাই কি ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিলে দেশী তাঁতিগণ তাঁতের কার্য্য বিস্মৃত হইবে! সেই দিন আসিবার পূর্ব্বে যদি দেশী তাঁতিগণকে রক্ষাকরা কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে স্থূল সূত্রে স্থূল বস্ত্র বয়ন করাইয়া লইয়া শিক্ষিতগণ পরিধান করিতে আরম্ভ করুন, দেখিবেন তাঁহাদের অনুকরণে আবার দেশমধ্যে স্থূল বস্ত্রের আদর বাড়িবে। কিন্তু শিক্ষিত ও ধনী-সম্প্রদায় এই সুচেন কাপড় পরিধানে প্রবৃত্ত না হইলে অনুকরণ-তৎপর দরিদ্র বাঙ্গালী কিছুতেই বিলাতি কাপড়ের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। নিত্য-ব্যবহার্য্য স্থূল বস্ত্রের অপ্রচলনে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায় শিল্পী একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সূক্ষ্ম শিল্প যাহা পূর্ব্বে দরিদ্রের পক্ষে সুলভ ছিল না এবং এখনও নাই, তাহাও ক্রমে লোপ পাইতেছে। মুরশিদাবাদে হস্তিদন্তের কারুকার্য্যের অবনতি হইয়াছে। বিলাত হইতে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আসে না। তবে বাঙ্গলায় এই জগৎ বিখ্যাত শিল্পের অবনতির কারণ কি? মুসলমান রাজত্বে ঢাকায় যে প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র জন্মিত, এখন তাহা জন্মে না। শান্তিপুর, ফরাষডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানেও পূর্ব্বের মত সূক্ষ্ম বহুমূল্য বস্ত্র উৎপন্ন হয় না। তাহার জন্য আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারিকে দায়ী করিতে পারি না। তাহার কারণ অন্য প্রকার। লেখকের নিবাস ফরাষডাঙ্গায়—এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ফরাষডাঙ্গার তন্তুবায়দিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকাতে দেখিতে পাই যে শিক্ষিত লোকের অবহেলাতে অশিক্ষিত লোক তাহাদের অবস্থাহীনতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেই হীনতা হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় পুত্রপৌত্রাদিগণকে হীন তন্তুবয়নের কার্য্য পরিত্যাগ করাইয়া শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম "চাকরি"র উপযোগী শিক্ষা প্রদান করে। পূর্ব্বে ফরাষডাঙ্গায় যে প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হইত এক্ষণে তাহা হয় না। ফরাষডাঙ্গায় "কাঁচি" কাপড় বয়ন করিবার কারিগর বোধ হয় ১০।১৫ জনের অধিক আছে কি না সন্দেহ। যাহারা আছে তাহাদেরও উপযুক্ত "সাক্রেদ" নাই। সেই কয়জন প্রাচীন তন্তুবায় লীলা-সম্বরণ করিলে চন্দননগরের কাঁচি কাপড় একেবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা। এই সকল তন্তুবায় অপুত্রক নহে, অনেকেরই উপযুক্ত পুত্রসন্তান আছে কিন্তু সেই সকল পুত্র সন্তানেরা ইংরাজী পড়িয়া চাকরি করিতেছে। চন্দননগরে এখন ১০০ নম্বর অপেক্ষা অধিক নম্বর সুতায় কেহ কাঁচি কাপড় বুনিতে পারে না, কিন্তু পূর্ব্বে ১১০ নম্বর সুতায় কাঁচি কাপড় বুনিবার কারিগর ছিল। সাধারণ ফরাষডাঙ্গায় ধুতি ও সাড়ি এখন ১৫০ নম্বরের অধিক নম্বরের সুতায় হয় না, কিন্তু পূর্ব্বে ৩০০ নম্বরের

সুতাতেও হইত। এই সকল সূক্ষ্ম বস্ত্র ক্রেতার অভাবে লোপ পায় নাই। ৩০০ নম্বরের সুতার কাপড়ের ক্রেতা পূর্ব্বাপেক্ষা বরং ২।৪ জন বাড়িয়াছে বলিতে পারা যায়, কিন্তু ৩০০ নম্বর দূরে থাক ২০০ নম্বরের সুতায় কাপড় বুনিবার কারিগর আজকাল নাই। বিলাস বৃদ্ধির সহিত এই সকল অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের আদরও বাড়িবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আজকাল এই প্রকার বস্ত্র আর জন্মায় না।

ফরাষডাঙ্গায় কাপড়ের পাড় পূর্ব্বে সাদা সিধা হইত। "মতি", "চুড়ি", "রেল", "কোকিল", "কাশি" ইত্যাদি সরল রেখায় যত প্রকার পাড় হইতে পারে তাহা হইত কিন্তু এক্ষণে ২।৪ জন কল্কা বা ফুলদার পাড়ও বুনিতে শিক্ষা করিয়াছে। শ্রীরামপুরের নিকট খরসরাই গ্রামে অনেক তন্তুবায়ের বাস। তাহাদের মধ্যে ২।১ জন শান্তিপুর এবং ঢাকায় গিয়া ফুলদার পাড় বুনিতে শিখিয়া আসিয়াছে। এবং তাহাদের ২।৪ জন সাক্রেদ ফরাষডাঙ্গায় কাপড়ে ফুলদার পাড় বুনিতেছে। লেখকের প্রতিবাসী একজন তন্তুবায় এই প্রকার অতি সুন্দর ফুলদার পাড় প্রস্তুত করে। তাহার দুইটি পুত্র আছে, জ্যেষ্ঠ প্রায় ২০ বৎসরের এবং কনিষ্ঠ ১৮ বৎসরের। ঐ দুই ভ্রাতা ৪।৫ বৎসর ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া এক্ষণে কলিকাতায় এক সওদাগরী আফিষে চাকরিতে ঢুকিয়াছে। তাহাদের বেতন যথাক্রমে ১৫৲ এবং ১২৲ টাকা। কলিকাতা হইতে চন্দননগরে যাতায়াতের ব্যয় মাসিক ৭৲ টাকা। সুতরাং ঐ দুই ভ্রাতারা ২৭৲ টাকা উপার্জ্জন করে এবং ১৪৲ টাকা পাথেয় দেয়, ১৩টি টাকা মাত্র প্রতি মাসে তাহারা গৃহে দিতে পারে। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু বেতন বৃদ্ধির সহিতই যে বালকদ্বয়ের বাবুগিরি বাড়িবেনা তাহার নিশ্চয়তা কি? তাহার পিতা স্কন্ধে কেবল গাত্রমার্জ্জনী লইয়া ৩।৪ ক্রোশ দূরে গ্রামান্তরে কুটুম্ব বাড়ি যাইতে সঙ্কোচ অনুভব করে না, কিন্তু তাহারা ইতিমধ্যেই পাদুকা ও

জামাবিহীন হইয়া পল্লী মধ্যে বিচরণ করিতে লজ্জিত হয়। এখন বালকদ্বয় অগত্যা তৃণ-কুটীরে অবস্থান করে কিন্তু আরও দুই চার বৎসর পরে ইষ্টকালয় ভিন্ন তাহাদের মন উঠিবে না। অন্ততঃ প্রতি-বাসীর ইষ্টকালয়ের প্রতি তাহারা ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিবে।

সূত্রধর, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতিরা কেবল ভদ্র হইবার আশায় ভদ্রলোকের সহিত মিশিতে পারিবে, অন্যান্য ভদ্রজাতি তাহাদিগকে "বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিবে, এই প্রলোভনে জাতি-ব্যবসায় পরিত্যাগ করে। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন একজন কুম্ভকার-পুত্র আমাদের নীচের শ্রেণীতে পড়িত। তাহার পিতা একজন বেশ ভাল কারিগর ছিল। ৫।৬ বৎসর অধ্যয়নের পর সেই বালকের পিতৃ-বিয়োগ হইল। অগত্যা তাহাকে বাধ্য হইয়া স্কুল ছাড়িয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল। কিন্তু চাকরী জুটাইতে পারিল না। দায়ে পড়িয়া পিতৃব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে নাই সুতরাং মাটির কায করিতে পারিল না। অবশেষে যখন অন্নাভাবে হাহাকার করিতে লাগিল, তখন পাড়ার এক ধনবান লোক অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে ৮৲ টাকা বেতন দিয়া অনশনের হাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিলেন। এই কুম্ভকারের পূর্ব্ব-পুরুষেরা জাতি-ব্যবসায়ে থাকিয়া যে প্রকার পূজার দালান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা এখনকার একজন ৩০০৲ টাকা বেতনের কেরাণীর পক্ষে স্বপ্নাতীত। পূর্ব্বে কুম্ভকার নির্ম্মিত দ্রব্যের যাহা মূল্য ছিল এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ এমন কি তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থকৃচ্ছ্রতা বোধ হয় ১০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আহার্য্যের দুর্ম্মূল্যতা যে ইহার অন্যতম কারণ তাহা সত্য কিন্তু বিলাস-প্রিয়তাই এই ব্যয়-বৃদ্ধির প্রধান কারণ। শিল্পী অপেক্ষা শিক্ষিত অর্থাৎ চাকুরে বাবুরা অধিক পরিমাণে বিলাসপ্রিয়। শিল্পীর সন্তানেরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে প্রথমেই "ভদ্র" হইবার আশায় বেশ-

বিন্যাসে বিশেষ মনোযোগ দেয়, সুতরাং তাহাদের ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালের শিক্ষিত ভদ্রলোকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জ্ঞানে যতই উন্নত হউন না কেন, আচার ব্যবহারে সকলেই যৎপরোনাস্তি সরল ও সাদাসিধা ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহারা অশিক্ষিত শিল্পীগণের সহিত অসঙ্কোচে বসবাস করিতেন। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন বা দিগ্বিজয়ী ন্যায়ালঙ্কারেরা মিস্ত্রি দাদার কি কামার খুড়ার দাওয়ায় বা কারখানায় ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া সংসারিক সুখ-দুঃখের কথা কহিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সুতরাং সেই কামার-খুড়া বা মিস্ত্রিদাদা আপনাদের অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিতে পাইত না। যখন তাহারা জাতি ব্যবসায়ে থাকিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জন তাহার দাওয়াতে পদরেণু দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তখন তাহার জাতি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া "ভদ্র" হইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। শুনিয়াছি ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক কামারের দোকানে বসিয়া ধূমপান করিতে দেখিয়া কলিকাতার কোনও শিক্ষিত ধনবান ব্যক্তি কুণ্ঠা প্রকাশ করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমি কামারের দোকানে বসিয়া তামাক খাই বলিয়া তোমার যদি মাথা কাটা যায়, তাহা হ'লে তুমি আমার সঙ্গে আর মিশওনা।"

যে দিন শিক্ষিত ভদ্রলেকেরা এই প্রকার অশিক্ষিত শিল্পীদের সহিত মিশিতে ঘৃণা বোধ করিলেন, সেই দিন হইতে বাঙ্গলায় শিল্পের যথার্থ অবনতি হইতে আরম্ভ হইল। সেই সময় হইতে শিল্পীরা শিল্প ছাড়িয়া, লেখাপড়া শিখিয়া বাবু হইতে আরম্ভ করিল। সেই দিন হইতেই তন্তুবায়, সূত্রধর, কামার, কুমারের ছেলেরা ভদ্র হইবার জন্য জাতি-ব্যবসা পরিত্যাগ করিল। কেবল রাজার নিকট উৎসাহ না পাইয়া আমাদের দেশের সূক্ষ্ম শিল্প নষ্ট হয় নাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের

আন্তরিক সহানুভূতি না পাইয়াও শিল্পীরা ক্ষুণ্ণ মনে শিল্প পরিত্যাগ করিয়াছে।

লেখকের প্রতিবাসী এক সূত্রধর একবার কলিকাতার কোনও ধনবান সূত্রধরের গৃহে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে আগমন করে। গৃহস্বামী বেশ ধনবান, শিক্ষিত এবং খুব মোটা বেতনের চাকুরে। তাঁহার গৃহে অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্য ভদ্র শূদ্রগণের আগমন হইয়াছিল। যে কক্ষে এই সকল শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, গৃহস্বামীও সেই কক্ষে বসিয়া তাঁহাদের সহিত একই হুঁকায় ধূমপানে মগ্ন ছিলেন। সেখানে অশিক্ষিত ছুতার মিস্ত্রির প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমাদের পাড়ার মিস্ত্রি একটু forward ও স্পষ্টবক্তা ছিল। সে যখন দেখিল যে তাহার স্বজাতি গৃহস্বামী সেই কক্ষে বসিয়া আছেন তখন সে নিঃসঙ্কোচে সেই গালিচা মণ্ডিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিল। ধূমপানের জন্য একজন অভ্যাগত "ভদ্র" লোকের নিকট হইতে স্বর্ণ-মণ্ডিত হুঁকা লইতে উদ্যত হইলে, "ভদ্র" লোকটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া হুঁকাটি গৃহস্বামীর হস্তে দিলেন। মিস্ত্রিও বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহস্বামীর নিকট হইতে হুঁকা লইয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়েরা, আপনারা একটা বিচার করুন। আমিও ছুতার আর আমাদের কর্ম্ম-কর্ত্তাও ছুতার। এই বাবুটি আমাকে ছুতার বলে জানেন, তবে আমি মিস্ত্রি বলে আমার হাতে হুঁকা না দিয়া কর্ম্ম-কর্ত্তাকে হুঁকা দিলেন—কেন না আমি ছুতার মিস্ত্রি আর উনি ছুতার বাবু। আমি আমার বাবার ব্যবসায়ে স্বাধীন থেকে পয়সা রোজকার করি; আর ছুতার বাবু সাহেবের পায়ে তেল দিয়ে খোষামোদ করে চাকরি করেন। আজ যদি সাহেব যাও বলে তা হলে কাল সাহেবের পায়ে জড়িয়ে পড়ে একমুঠা ভাতের জন্য লালায়িত হয়েন, আর কারও বাপের সাধ্য নাই আমায় "যাও" বলে. কারণ আমি ছুতার মিস্ত্রি, আমি কারও

বাপের চাকর নই। আমার অসুখের সময় ল্যাজেরাস সাহেব আমার বাড়িতে গিয়ে সম্বাদ নিয়ে ছিলেন। এখন আপনারা বিচার করুন আমি ছুতারের ছেলে ছুতার হয়ে ভাল কায করেছি কি, এই ছুতরের ছেলে ছুতর বাবু হয়ে ভাল করেছেন ?”

যদি এই ছুতার মিস্ত্রির এরূপ আত্ম-সম্মান বোধ না থাকিত, তাহা হইলে সে যে ভদ্র হইবার লোভে পুত্রকে ছুতার গিরি ছাড়াইয়া চাকরির জন্য শিক্ষা দিত তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

আজকাল সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির কার্য্য উন্নতি করিবার জন্য অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ সন্তানগণ টেকনিকাল বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষা বিপর্য্যয়ে একটা শুভফল আশা করা যায়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থের ছেলে টেক্‌নিকাল স্কুলে পড়িয়া লোহা ও পিত্তলের কল কব্জা করিতেছে দেখিলে আর কর্ম্মকার পুত্র ৩টা পাশ দিয়া স্কুলে মাষ্টারী বা ডাক্তারী করিতেছে এরূপ হইবে না। বহু শতাব্দীর ব্যবহারে এবং ব্যবসায় ভেদে একটা “জাতি” হইয়া পড়িয়াছে—কথায় বলে,

“বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া
কুছ্ না জানে ত থোড়া থোড়া।”

সূত্রধরের পুত্র বা তাঁতির পুত্র জন্মাবধি ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতার কারখানায় বসিয়া যদৃচ্ছা পিতার কার্য্য দর্শন করিয়া অনেকটা জ্ঞান সঞ্চয় করে, এবং কবিরাজের পুত্রও বাল্যকাল হইতে পিতার নিকটে বসিয়া অনেক গাছ-গাছড়া, অনুপান, পথ্যাপথ্য শিখিয়া থাকে। পরে উত্তরকালে তাঁতঘর হইতে বা ছুতারের কারখানা হইতে তাঁতি ও ছুতারের পুত্র বাহির হইয়া চিকিৎসক সৃষ্ট হওয়া এবং কবিরাজ পুত্র টেকনিকাল স্কুলে পড়িয়া মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার অবাঞ্ছনীয় ঘটনার লাঘব হইলে ভাল হয়। টেকনিকাল স্কুলে সূত্রধরের

পুত্র কাঠের কার্য, কর্ম্মকারের পুত্র লোহার কায ও কুম্ভকারের পুত্রগণ মাটির কায শিখিবে এরূপ ব্যবস্থা হইলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই অল্পশ্রমে অধিক ফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

আমরা শিল্পীর সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার বিরোধী নাহ। তাহাদিগকে তাহাদের ব্যবসায় চালাইবার জন্য আবশ্যক মত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু শিক্ষা দিয়া তাহার ব্যবসায়চ্যুত করিতে বলি না। পূর্ব্বে যে ছুতার মিস্ত্রির উল্লেখ করিয়াছি সে ফরাসডাঙ্গায় "ল্যাজেরস্" কোম্পানির কারখানায় একজন শ্রেষ্ঠ মিস্ত্রি ছিল। আমরা বাল্যকালে তাহার কারখানায় অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছি। একদিন দেখিলাম যে মিস্ত্রি একখানা গোলাকার তক্তা লইয়া তাহার ধারে ধারে খড়ির দাগ দিতেছে এবং আবার তাহা মুছিয়া ফেলিতেছে। কি করিবে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে "এটা একটা ছ পায়া টেবিলের টপ—এটা ছ বথরায় ভাগ করতে হবে।" তখন আমরা বোধ হয় এণ্ট্রান্সক্লাসে পড়িতাম। মিস্ত্রির কথা শুনিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃত্তের মধ্যে সম ষড়্‌ভুজ অঙ্কিত করিবার প্রণালী দ্বারা সেই বৃত্তকে সম ষষ্ঠভাগে বিভক্ত করিয়া দিলাম। ক্রমে ক্রমে তাহাকে বৃত্ত মধ্যে সম-ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ ও ষষ্ঠ ভুজ এবং বৃত্তাভাস (Ellipse) অঙ্কিত করিবার কৌশল শিখাইয়া দিলাম। এই অঙ্কশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ মিস্ত্রিরা চিরকাল বহু সময় ব্যয় করিয়া কম্পাসের বাহুদ্বয় একটু একটু আকুঞ্চন বা প্রসারণ করিয়া এই প্রকার বৃত্তকে ভাগ করিয়া লইত। জ্যামিতির এই সামান্য সাহায্যটুকু পাইয়া তাহার যে কত পরিশ্রমের লাঘব হইল তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য।

যে সকল শিক্ষিত স্বদেশ-হিতৈষী লোক দেশী শিল্পীগণের উন্নতি কামনা করেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলে সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, অশিক্ষিত শিল্পীগণকে এই প্রকারে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিলে

তাহাদের যথেষ্ট শ্রম লাঘব হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের জমীদার রাজারা দেশে দুর্ভিক্ষ থাকা সত্ত্বেও বিদেশের বিলাস ব্যসনে ধন করিলে যে সকল স্বদেশ-হিতৈষী ইংরাজী সম্বাদ পত্রে বা সভা সমিতি লম্বা লম্বা স্লাপ দিয়া ধনবানদিগের মূর্খতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে সেই সকল স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণকেও কি সাধারণে এই ধন দিগের ন্যায় মূর্খ বলিয়া গণনা করিতে পারে না? দেশের শিল্পী-সম্প্র মধ্যে বিদ্যা বিস্তারের যথেষ্ট আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা কে ইংরাজীতে সম্বাদপত্রের কলেবর পুষ্টি করেন, তাঁহারা আর বিদে বা বিলাসে ধনব্যয়ী ধনীগণের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে কি? য কিছু প্রভেদ থাকে তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদা করিবে।

একবার একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার বাবু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলে "ইউরোপে এক lever হইতে কত বড় বড় crane এবং তাহা হইতে কত দৃশ্যতঃ অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর আবহমা কাল প্রচলিত ঢেঁকি সেই ঢেঁকিই রহিল। উহার উন্নতিও নাই অবনতি নাই।" অশিক্ষিতা স্থূলবুদ্ধি কৃষক রমণীর নিত্য ব্যবহার্য্য যন্ত্র ঢেঁকি উন্নতি করিতে হইলে, যন্ত্র বিজ্ঞানে বিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকের আবশ্যক কিন্তু এরূপ শিক্ষিত লোকে ঢেঁকিকে ঢেঁকি বলিয়াই ঘৃণা করেন, উন্নতি করিবেন কি?—লাঙ্গল, চরকা, কুলা প্রভৃতিরও এই দশা।

তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় শিল্পী আমাদের অত্যাবশ্যকীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্বর্ণকার, চিত্রকর ইত্যাদিকে আমরা বিলাস শিল্পী বলিয়া গণনা করি। এই উভয়বিধ শিল্পই আমাদের শিক্ষিত লোকের রুচির দোষে বা অবহেলাতে নষ্ট হইতেছে। শিল্পীশ্রেণীকে হীন বলিয়া ঘৃণা করিলে তাহারা আর কিছুতেই শিল্পী হইয়া থাকিবে না। এক্ষণে আমাদের

শিক্ষিত শ্রেণীর উচিত যে এই সকল শিল্পী শ্রেণীতে অবাধে মিশিয়া মিশিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে শিক্ষিত "চাকুরের" অবস্থা অপেক্ষা স্বাধীন শিল্পীর অবস্থা হীন বা ঘৃণার্হ নহে। শিক্ষিতগণের উচিত যে অশিক্ষিত শিল্পীগণকে তাহাদের সাধ্যমত এবং আবশ্যক-মত শিক্ষাদান করিয়া শিল্পীদিগের ব্যবসায়ের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া দেওয়া। আমাদের দেশের "শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ" নিজের দৃষ্টান্তে যাহাদিগকে বিকৃত করিয়াছেন, অদূরদর্শিতায় যাহাদের অবস্থাকে হীন বলিয়া, ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিয়াছেন—আজ আবার তাহাদেরই উন্নতির জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের বিধানটা ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ-রক্ষার্থে গভর্ণমেণ্ট দেশী তাঁতীদিগের প্রতিকূল অনেক বিধান প্রচার করিয়াছেন তাহা স্বীকার করি, বিলাতী সুলভ বস্ত্র দেশী বস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু বিলাতী বস্ত্রের ব্যবহার কাহাদের দৃষ্টান্তে হইয়াছে? শিক্ষিত শ্রেণীর বেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কি দরিদ্রলোকে বাবু সাজিতে আরম্ভ করে নাই? শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটা বক্তৃতা করিয়া অথবা দুইটা প্রবন্ধ লিখিয়া এই পাপ হইতে মুক্ত হইবেন না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে শিক্ষিত লোককে আবার দরিদ্র-সুলভ পোষাক পরিয়া দরিদ্রের সহিত মিশিতে হইবে। শিক্ষিতগণ যদি পূর্ব্ব-পুরুষগণের অনুকরণে হৃদয়ের বিস্তার কিছু বৃদ্ধি করিতে পারেন, যদি ৩টা পাশ বা ৪টা পাশ করিয়াও মিস্ত্রি দাদার ও কুমোর খুড়ার কারখানায় অনাবৃত দেহে বসিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহাদের কার্য্য-কলাপ, সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদির সম্বাদ লইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের শিল্পীরা "বাবু" হইবার বৃথা প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন জাতি অবস্থা ও ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকিবে। নতুবা যত দিন এই শিল্পী

তাহাদের যথেষ্ট শ্রম লাঘব হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের জমীদারগণ বা রাজারা দেশে দুর্ভিক্ষ থাকা সত্ত্বেও বিদেশের বিলাস ব্যসনে ধনব্যয় করিলে যে সকল স্বদেশ-হিতৈষী ইংরাজী সম্বাদ পত্রে বা সভা সমিতিতে লম্বা লম্বা স্লাপ দিয়া ধনবানদিগের মূর্খতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন, সেই সকল স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণকেও কি সাধারণে এই ধনবান দিগের ন্যায় মূর্খ বলিয়া গণনা করিতে পারে না? দেশের শিল্পী-সম্প্রদায় মধ্যে বিদ্যা বিস্তারের যথেষ্ট আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা কেবল ইংরাজীতে সম্বাদপত্রের কলেবর পুষ্টি করেন, তাঁহারা আর বিদেশে বা বিলাসে ধনব্যয়ী ধনীগণের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে কি? যদি কিছু প্রভেদ থাকে তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিপক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

একবার একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার বাবু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "ইউরোপে এক lever হইতে কত বড় বড় crane এবং তাহা হইতে কত দৃশ্যতঃ অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর আবহমান কাল প্রচলিত ঢেঁকি সেই ঢেঁকিই রহিল। উহার উন্নতিও নাই অবনতিও নাই।" অশিক্ষিতা স্থূলবুদ্ধি কৃষক রমণীর নিত্য ব্যবহার্য্য যন্ত্র ঢেঁকির উন্নতি করিতে হইলে, যন্ত্র বিজ্ঞানে বিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকের আবশ্যক। কিন্তু এরূপ শিক্ষিত লোকে ঢেঁকিকে ঢেঁকি বলিয়াই ঘৃণা করেন, উন্নতি করিবেন কি?—লাঙ্গল, চরকা, কুলা প্রভৃতিরও এই দশা।

তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় শিল্পী আমাদের অত্যাবশ্যকীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্বর্ণকার, চিত্রকর ইত্যাদিকে আমরা বিলাস শিল্পী বলিয়া গণনা করি। এই উভয়বিধ শিল্পই আমাদের শিক্ষিত লোকের রুচির দোষে বা অবহেলাতে নষ্ট হইতেছে। শিল্পীশ্রেণীকে হীন বলিয়া ঘৃণা করিলে তাহারা আর কিছুতেই শিল্পী হইয়া থাকিবে না। এক্ষণে আমাদের

শিক্ষিত শ্রেণীর উচিত যে এই সকল শিল্পী শ্রেণীতে অবাধে মিশিয়া মিশিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে শিক্ষিত "চাকুরের" অবস্থা অপেক্ষা স্বাধীন শিল্পীর অবস্থা হীন বা ঘৃণার্হ নহে। শিক্ষিতগণের উচিত যে অশিক্ষিত শিল্পীগণকে তাহাদের সাধ্যমত এবং আবশ্যক-মত শিক্ষাদান করিয়া শিল্পীদিগের ব্যবসায়ের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া দেওয়া। আমাদের দেশের "শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ" নিজের দৃষ্টান্তে যাহাদিগকে বিকৃত করিয়াছেন, অদূরদর্শিতায় যাহাদের অবস্থাকে হীন বলিয়া, ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিয়াছেন—আজ আবার তাহাদেরই উন্নতির জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের বিধানটা ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ-রক্ষার্থে গভর্ণমেণ্ট দেশী তাঁতীদিগের প্রতিকূল অনেক বিধান প্রচার করিয়াছেন তাহা স্বীকার করি, বিলাতী সুলভ বস্ত্র দেশী বস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু বিলাতী বস্ত্রের ব্যবহার কাহাদের দৃষ্টান্তে হইয়াছে? শিক্ষিত শ্রেণীর বেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কি দরিদ্রলোকে বাবু সাজিতে আরম্ভ করে নাই? শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটা বক্তৃতা করিয়া অথবা দুইটা প্রবন্ধ লিখিয়া এই পাপ হইতে মুক্ত হইবেন না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে শিক্ষিত লোককে আবার দরিদ্র-সুলভ পোষাক পরিয়া দরিদ্রের সহিত মিশিতে হইবে। শিক্ষিতগণ যদি পূর্ব্ব-পুরুষগণের অনুকরণে হৃদয়ের বিস্তার কিছু বৃদ্ধি করিতে পারেন, যদি ৩টা পাশ বা ৪টা পাশ করিয়াও মিস্ত্রি দাদার ও কুমোর খুড়ার কারখানায় অনাবৃত দেহে বসিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহাদের কার্য্য-কলাপ, সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদির সম্বাদ লইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের শিল্পীরা "বাবু" হইবার বৃথা প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন জাতি অবস্থা ও ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকিবে। নতুবা যত দিন এই শিল্পী

সম্প্রদায় দেখিবে যে পাশকরা কোট পরা বাবুরা নিরক্ষর নগ্নকায় সম্প্রদায়কে ঘৃণা ও অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়া থাকেন ততদিন শিল্পীগণ কিছুতেই জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বাবু ও ভদ্র হইবার লোভ সম্বরণ করিবেনা এবং সমাজ-হিতৈষীগণের ও গভর্ণমেণ্টের শত চেষ্টাতেও দেশের শিল্পীর পুনরুদ্ধার হইবে ন। শিল্পীকে বাঁচাইয়া না রাখিলে শিল্পকে রাখিবে কে ?

উপসংহারে আমরা আর একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। কলজাত দ্রব্যাদি ভারতে প্রস্তুত হইলেও তাহাতে আমরা বিশেষ লাভ বলিয়া মনে করিতে পারি না। একে ত যে সকল কল এখন বর্ত্তমান আছে তাহার অধিকাংশ মূলধনীই সাহেব; সুতরাং সেই সকল কলের লভ্যাংশ সাহেবেরই প্রাপ্য। সেই সকল কলজাত দ্রব্য ব্যবহার করিলে সাহেবদিগেরই ধন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। কলে কুলি, মজুরগণ অতি সামান্যই পাইয়া থাকে। তারপর দেশী লোকে এই প্রকার কলের মূল ধনী হইলেও কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট ধনীরই ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহাতে দেশের টাকা দেশে থাকিয়া যায় বটে, কিন্তু দশের টাকা একের হইয়া থাকে। একটা কাপড়ের কলে সহস্র সহস্র তন্তুবায়ের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে ফরাষডাঙ্গায় একটা চট্ বুনিবার কারখানা ছিল; তাহার সত্তাধিকারী একজন সাহেব হইলেও প্রায় ৩।৪ শত চট্‌বোনা তাঁতি তাহাতে প্রতিপালিত হইত কিন্তু এদেশে চটের কল হইলে সেই সকল তাঁতির অন্ন গেল। যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতিতে যদি শত শত লোকের অন্ন উঠিয়া গিয়া একজনকে ক্রোড়পতি করে, তাহা হইলে সে উন্নতি সমাজের হিতকারী নহে। দেশে কল বসাইয়া বস্ত্র ও কল কব্জা প্রস্তুত করিলে দেশের শিল্প রক্ষা করা হয় না, ধন রক্ষা করা হয় বটে। বুঝিতে পারিতাম যদি ১০ হাজার তাঁতিতে মিলিয়া একটা কাপড়ের কল করে এবং কলজাত লভ্য যদি ১০ হাজার অংশে বিভক্ত

হইয়া সকলের ভাগে পড়ে তাহা হইলে কলে অনেকের উপকার হইতেছে মনে করি—নচেৎ ১০ হাজার তাঁতির অন্ন মারিয়া ২ শত কুলি মজুরকে কায়ক্লেশে খাইতে দিয়া, ৫।৭ জন মূলধনীতে টাকাটা ভাগ করিয়া লইলে সমাজের উন্নতি হয় না।

ইংলণ্ডে এই প্রকার কল বৃদ্ধির সহিত শ্রমজীবীর যে প্রকার কষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সকলেই বলেন যে ইংলণ্ডের সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রমজীবীদিগের অবস্থা ভাবিয়া চঞ্চল হইয়াছেন। সামাজিক শান্তি রক্ষা করিতে হইলে যন্ত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে ৫ জনের মুখের গ্রাস কড়িয়া লইয়া একজনের মুখে তুলিয়া দিলে চলিবে না। Greatest good to the greatest number কিসে হয় তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে মদ্যপান।

সকল দেশেই পণ্ডিতগণ মদ্যপানকে কদাচার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ইদানীং এমত বিশ্বাসও আছে যে নৈতিক হিসাবে নিন্দনীয় হইলেও স্বাস্থ্য হিসাবে মদ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে বস্তুতঃ মদ্যের এমন কোনও গুণ নাই যাহাতে স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি সাধিত হইতে পারে। আমরা মনে করি মদ্যে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি,—কিন্তু ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকেরা উহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ সহযোগে মদ্যকে সর্ব্ব-প্রকারে স্বাস্থ্যের অনুপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি বিশ্বজগতে এমন স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না যথায় মদ্য কোনো না কোনো প্রকারে ব্যবহৃত হয় না। জ্ঞানের চক্ষে যাহাই হউক—নীতিবিৎ যাহাই বলুন না কেন—সকল কথা উপেক্ষা করিয়া মনুষ্য চিরদিনই মদ্যপান করিয়া আসিতেছে। যে নিরানন্দ মন্থর গতিতে জীবনের আগ্রহ অলস হইয়া আইসে, তাহাতে বেগ-সঞ্চার করিবার ক্ষমতা যাহার আছে সেই মদ্যকে কর্ম্মক্লান্ত মনুষ্য কখনও ত্যাগ করিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে মদ্যপানের এত উদাহরণ আছে যে তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ সোমরস নামক সুরা পান করিতেন—আপনাপন দেবতাকে সুরা নিবেদন করিতেন—সর্ব্ব-সাধারণের ব্যবহারের জন্য সুরা প্রকাশ্য স্থলে বিক্রয় হইত। শৌত্রামনি এবং বাজপেয় নামক যজ্ঞে সুরাই প্রধান আহুতি রূপে ব্যবহৃত হইত।

সোমরস সুরা বলিয়া বিশ্বাস করেন না এরূপ লোক অনেক আছেন। তাঁহারা বলেন সুরায় যে উত্তেজক শক্তি আছে সোমরসে তাহার লেশ-মাত্র ছিল না। কিন্তু বৈদিক বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখিলে এবং সোম-রসের প্রস্তুত প্রণালীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে সোমরসকে সুরা ব্যতীত অন্য কিছুই মনে হয় না।

> "পানসং দ্রাক্ষমাধুকং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবং
> মাধ্বীকং সৈরমারীষ্টং মৈরেয়ং নারিকেলজং
> সমানানি বিজানীয়াৎ মদ্যানেকাদশৈবতু
> দ্বাদশন্তু সুরামদ্যং সার্ব্বসাধমং স্মৃতং।"

ভারতবর্ষে সুরাপানের আধিক্য হইতে কুফল ফলিতে আরম্ভ হইলে পণ্ডিতগণ সুরাপানের বিরুদ্ধে নিষেধ বিধির প্রচলন করিলেন। যজ্ঞের কোন অঙ্গহানি করিলেন না বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সুরা-পান এককালেই নিবারণ করিলেন। তাঁহারা বিধি করিলেন "মদ্যমপেয়-

মগ্রাহ্যং" এবং বলিয়া দিলেন "মদ্যপান এবং ব্রহ্মহত্যা উভয়ই সমান পাপ।" শ্রুতির মার্গানুসারে স্মৃতিও এই ব্যবস্থা দিলেন যে সুরাপান পঞ্চমহাপাতকের অন্যতম।

কথিত আছে শুক্রাচার্য্য প্রথমে মদ্যপানের বিরুদ্ধে কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিষ্যগণ কচের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মদ্যের সহিত গুরুকে আহার করাইয়াছিল। চৈতন্য হইলে তিনি সকল কথা বুঝিয়া মদ্যপানকেই সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া জানিতে পারিলেন— এবং মদ্যপানকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন—

"যো ব্রাহ্মণোহদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎসুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ
অপেত ধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্লোকেগর্হিতঃ স্যাৎপরে চ।"

যদুবংশে মদ্যপের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণও ঐরূপ অভিশাপ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উল্লিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে মহর্ষিগণ মদ্যপানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত প্রধান মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য মদ্যপান ব্রাহ্মণের পক্ষে অমার্জ্জনীয় বিবেচনা করিতেন বলিয়াই নিয়ম করিয়াছেন—

"সুরাম্বুঘৃত গোমূত্রপয়সামগ্নি সন্নিভং
সুরা পোহন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি।"
সুরা পশ্চার্দ্রবাসসা চাগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেত্।"
"সুরাপানে ব্রাহ্মণো রূপ্যতাম্রসীসকানা মন্যমতগ্নিকল্পং পীত্বা
শরীরত্যাগাৎ পূয়ন্তে।"

"পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেত্
ইহৈব সা শুনী গৃধ্রী শূকরী চোপজায়তে।"*

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল প্রায়শ্চিত্ত বিধির উল্লেখ আছে তাহাও উল্লিখিত গুলি অপেক্ষা কোনও অংশে মৃদু নহে। তথাপি প্রাচীন

ঋষি ও মহাত্মাপ্রমুখ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সুরাপানে বিরত থাকিতেন। বর্ত্তমান যুগেও এরূপ ব্যক্তি বিরল নহেন। বৃদ্ধগণ, ঋষিগণ এবং ধর্ম্মপ্রবীন ব্যক্তিগণ তখনও মদ্য পান করিতেন না—এখনও করেন না। কিন্তু মদ্য-পায়ীর সংখ্যা এখনও যেমন আছে—প্রাচীনকালেও সেই প্রকার ছিল। প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার বহুল উদাহরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মনুর সময়ে মদ্যপান প্রবৃত্তির এরূপ বেগ ছিল তিনি বিরোধী হইয়াও তাহার পূর্ব্ব নিয়ম শিথিল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

"ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে"

মদ্য মাংস ভক্ষণে কোন দোষ নাই। ইহাই জীবের প্রবৃত্তি। তবে নিবৃত্তির মত মহাফলদায়ক অন্য কিছুই নাই।

রাজন্য এবং বৈশ্যের পক্ষে গৌড়ীমদ্যপান শাস্ত্রসঙ্গত। ব্রাহ্মণ কোন মদই পান করিবেন না। শূদ্রের পক্ষে কোন বিশেষ বিধি নাই।

মহাভারতে মদ্যপান সম্বন্ধে উদাহরণের অভাব নাই, যতগুলি রথী আছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই মদ্যপায়ী ছিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে বৃষ্ণিবংশে বলরাম, কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন ইহারা তিন জনেই ঘোর মদ্যপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে স্ত্রীগণও মদ্যপান ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্বে রৈবতক পর্ব্বতে অর্জ্জুনের নিমন্ত্রণ সভায় মদ্যের প্রবাহ বহিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন বহুস্থানে "মদিরায়ত নেত্র" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"উভৌ মধ্বাসবক্ষীবৌ উভৌ চন্দন চর্চ্চিতৌ
উভৌ পর্য্যঙ্ক রথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জ্জুনৌ।"

বিরাট মহিষী সুদেষ্ণা তৃষাতুরা হইয়া দ্রৌপদীকে মদ্য আনিবার জন্য কীচকের গৃহে পাঠাইবার কালে এই কথা বলিতেছেন—

"পর্ব্বনি ত্বং সমুদ্দিশ্য সুরামন্নং চকারয়
তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারী তবান্তিকং।
উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সৈরিন্ধ্রি, কীচকস্য নিবেশনং
পানমানয় কল্যাণি পিপাসামাং প্রবাধতে।"

মৌষল পর্ব্বে বারুণীমদোন্মত্ত যাদবগণ কিরূপে পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন তাহার বিশদ বিবরণ আছে।

"বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিত চেতসাং
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃ পঞ্চাবশেষিতাঃ।"

রামায়ণে মদ্যপানের অনেক কাহিনী বিবৃত আছে। বশিষ্টদেব একদা বিশ্বামিত্রকে সুরা দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ, আশ্রমে সমাগত ভরত এবং তাঁহার সৈন্যবৃন্দকে মদ্য দিয়া সন্তুষ্ট করেন। রামচন্দ্র যখন তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হয়েন তখন তিনি বৎসতরী বধ করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তবে বনবাসী রামচন্দ্রকে সুরা অর্পণ করেন নাই।

এখনকার মত পূর্ব্বেও বিপদে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত দেবতায় পূজা মানসিক করা একটা পদ্ধতি ছিল। সীতাদেবী দক্ষিণারণ্যে প্রেরিত হইবার সময়ে গঙ্গার অপর পারে যাইবার কালে দেবতার কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"সুরাঘটসহস্রেন মাংসভূতোদনেন চ
যক্ষ্যে ত্বা প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা।"

যমুনা পার হইবার কালে তিনি বলিয়াছিলেন—

স্বস্তিদেবি তরামিত্বাং পারয়েন্মে পতিব্রতম্
যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ।"

ভরত-বিলাপে উক্ত আছে—

"বারুণো মদগন্ধশ্চ.....ন প্রবাতি সমন্ততঃ।"

মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ভারতে এই মদ্যপান প্রবৃত্তির অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু মদ্য ব্যবহার রহিত হইতে শুনা যায় নাই; জাতক এবং অবদান মদ্যপগণের প্রেতোচিৎ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। একটি প্রণয়-কাহিনীর অন্তর্গত কোনও দৃশ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত পুরমহিলা প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের পার্শ্বে ভৃত্যেরা সুরাপাত্র হস্তে উপস্থিত আছে। অন্য একস্থানে বর্ণিত আছে যে প্রণয়ী সুরাপাত্র হাতে লইয়া প্রিয়াকে পান করিতে অনুরোধ করিতেছে। নাগানন্দ নামক নাটকে মদ্যপায়ীর মত্ততায় পূর্ণ একটি সমগ্র দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। এই মদ্যপায়ী মহিষী-সহচরীর প্রণয়ী।

কালিদাসের সময়ে মদ্যপান অতিমাত্রায় প্রচলিত ছিল। মৎসজীবী নগরকোটালকে অঙ্গুরীয়কের মূল্যসমান অর্থ দান করিলে নগরকোটাল আনন্দিতচিত্তে কহিল "আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব কাদম্বরী সাক্ষী হউক। চল শুঁড়ীর দোকানে যাই।"

রঘুর দিগ্বিজয়কালে যৌদ্ধবর্গ নারিকেলাসব পান করিয়াছিল। অন্য স্থলে "কাবেরী মদ্যগন্ধে পূর্ণা হইয়াছিল।" পারস্য জয় কালে সৈন্যগণ মদ্যপানের দ্বারা বিজয়শ্রম দূর করিয়াছিল। "হিমালয়ের স্ফটিকহর্ম্ম্য এমন সুন্দর যে তাহা পানভূমির যোগ্য" বিবেচিত হইয়াছে। অন্যত্র বর্ণিত আছে "চসকোত্তরা রণভূমি রক্তবহুলা হইয়া মৃত্যুর পানভূমি স্বরূপ বিরাজ করিতেছিল।" রঘুবংশে নবমসর্গে মদ্যপায়িনী প্রিয়ার বিরহে অজ বিলাপ করিতেছেন—

"সুবদনা বদনাসব সম্ভৃতন্তদনুবাদিগুণ কুসুমোদ্গমঃ"

শিশুপালবধে আছে—

"ককুষ্কিকন্যা বক্ত্রান্তর্বাসলব্ধাধিবাসয়া
মুখামোদং মদিরয়া কৃতানুব্যাধমুদ্বমন্।"

• বলরাম কথা কহিবার কালে ককুদ্মি কন্যার মুখগন্ধসংযুক্ত মদ্যের গন্ধ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল।

সাহিত্য হইতে এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দুর্গা অসুরকে বলিতেছেন—

"তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ় মধুযাবৎ পিবাম্যহং।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ হইতে স্পষ্টতঃ ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাচীন ভারতে মদ্যপান অতিমাত্রায় প্রচলিত ছিল।

অতঃপর তন্ত্র হইতে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু উদাহরণ দিতেছি।

পার্ব্বতী মহাদেবের মুখে তন্ত্রগুলি শ্রবণ করেন। কথিত আছে বিশ্বহিতে ভগবান্ শঙ্কর পৃথিবীতে তন্ত্রের প্রচার করেন। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি এই তন্ত্রের উপর। এই তন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী বিগত পনের শত বৎসর ধরিয়া ভারতভূমে প্রচলিত আছে। চির-প্রচলিত বৈদিক ধর্ম্মকে তন্ত্র আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল। বেদের সেই বিরাট ঈশ্বর তন্ত্র খড়্গে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া গেলেন। তখন শৈব, শাক্ত ইত্যাদি কত শ্রেণীর ধর্ম্ম আসিয়া ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিল।

বৈদিক মন্ত্র যাহা কিছু আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও তন্ত্রের ভিতর দিয়া আমাদের কাছে আসিয়াছে। শেষোক্ত দুই ধর্ম্মকে "সম্মোহিনা" বলিয়া বৈষ্ণবেরা যে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় অন্যায় নহে।

পঞ্চমকার বিশিষ্ট শাক্ত পূজাপ্রণালীতে মদ্যই প্রধান অঙ্গ। কৌলগণ কিরূপে পূজা করিয়া থাকেন তাঁহা পাঠকগণ অবগত আছেন। তাঁহাদের মোক্ষলাভের মূল মন্ত্রই হইতেছে—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

মদ্যপান কর, মদ্য পান কর, ভূতলে পড়িয়া গিয়া পুনরায় উঠিয়া

মদ্য পান কর—আর তোমার পুনর্জন্ম হইবে না। তাঁহাদের পূজার পুষ্পে মদ্য সংযোগ না করিলে পূজা অসিদ্ধ। চক্রে বসিয়া মদ্যপানও বোধ হয় পাঠকের অবিদিত নাই। আমার এক পরিচিতের গৃহে শক্তি পূজা হইয়াছিল। গভীর রাত্রিতে পূজার দালানের পার্শ্বে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। চক্রে মদ্যপান শেষ হইলে তাঁহাকে এক পাত্র সুরা দেওয়া হয়। তিনি পান করিতে সম্মত না হওয়ায় পুরোহিত বলিয়াছিলেন—কি! আমার চক্রের অপমান করিতে তোর সাহস হইল। তোর সর্ব্বনাশ হইবে। উপাসনায় এ উন্মত্ততা একাগ্রতাজনিত কি সুরাজনিত পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

কতকগুলা মন্ত্র আছে যাহার দ্বারা কৌলগণ মদ্য শোধন করিয়া লন। লেখকের গৃহে একবার দুই জন তান্ত্রিক যোগিনী আইসেন। তাঁহারা প্রতিদিন মড়ার খুলি করিয়া মদ্য পান করিতেন। মন্ত্র দ্বারা শোধন করিয়া লইতেন, বলিতেন গন্ধ নাই, কিন্তু গন্ধে সে ঘরের কাছে যাওয়া যাইত না। বিদায়ের দিন মাত্রা এত বাড়াইয়াছিলেন যে মদে বিহ্বল হইয়া অনেক বিলম্বে বাহির হইলেন। বলা বাহুল্য মন্ত্র দ্বারা মদ শোধিত হইলেও তাঁহারা গাড়ী ফেল্ করিয়াছিলেন।

যে কৌলিক মদ্য শোধন না করিয়া পান করে, তাহার মহাপাতক হয়। সে ব্রহ্মহা বলিয়া নিন্দিত হয়, এবং তজ্জন্য পরলোকে তাহার শাস্তি হইয়া থাকে। কিন্তু "সংস্কৃতাং তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জ্বলদগ্নিবত্"

মাতৃকাভেদ তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীর কাছে সুরার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন—

> "ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ংবদে
> ব্রাহ্মণ পরমেশানি যদি পানাদিকং চরেত্।"

হে প্রিয়ংবদে ব্রাহ্মণ যদি পানাদি আচরণ করেন তবে তাঁহার মোক্ষ হইয়া থাকে। (সুধু মোক্ষ নহে আবার মহামোক্ষ।)

"তত্ক্ষণাৎ শিবরূপোহসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে
তোয়ে তোয়ং যথা লীনং তৈজসং তৈজসে যথা"

জলে যেমন জল মিশায়, তেজে যেমন তেজ মিশায় সেই ব্রাহ্মণও তৎক্ষণাৎ শিবরূপ হইয়া যায়। হে শৈলজে! ইহা সত্য ইহা সত্য।

"ঘটে ভগ্নে যথাকাশং তাপৌ বায়ুর্যথা প্রিয়ে
তথৈব মদ্য পানেন ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণি প্রিয়ে॥"

ঘট ভগ্ন হইলে তন্মধ্যস্থ আকাশ যেমন আকাশে মিশায়—বায়ু যেমন বায়ুতে মিশায়, তেমনি হে প্রিয়ে মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মে মিলাইয়া যায়।

"মদ্য পানং বিনা দেবি তত্ত্বজ্ঞানং ন লভ্যতে
অতএব হি বিপ্রস্তু মদ্য পানং সমাচরেৎ।"

মদ্যপান ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। অতএব বিপ্র মদ্যপান করিবে।

"দেবানামমৃতং ব্রহ্ম্য তদেব লৌকিকী সুরা
সুরত্বং ভোগ মাত্রেণ সুরাতেন প্রকীর্ত্তিতা।"

দেবতার সুধা ব্রহ্ম এবং পৃথিবীর সুধা সুরা। ইহা ভোগ করিলে সুরত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়াই ইহার নাম সুরা।

কামাখ্যাতন্ত্রের আদেশও ঐ প্রকার। ঐ তন্ত্রে কথিত আছে—

"কালিকা তারিণী দীক্ষাং গৃহীত্ব মদ্য সেবনং
ন করোতি নরো যস্তু স কলৌপতিতো ভবেত্।"

তারিণী কালিকার মন্ত্র দীক্ষিতা হইয়া যে নর মদ্য পান করে না, সে কলিতে পতিত হয়।

বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোম বহিস্কৃতঃ
অব্রাহ্মণঃ স এবোক্তঃ স এব হস্তিমূর্খকঃ।

যে বৈদিক এবং তান্ত্রিক জপহোম অধিকার প্রাপ্ত হয় না—সে অব্রাহ্মণ এবং হস্তিমূর্খ।

এই সমস্ত মদ্যের স্তুতিগীত যিনি রচনা করিয়াছেন তিনি যে অত্যন্ত মদ্যপ্রিয় ছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি? মদ্যপ যে মদ্যের যশোকীর্ত্তন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই সকল মদ্যপ-তান্ত্রিক-গণ যে প্রায় সমগ্র বর্ত্তমান হিন্দু-ধর্ম্মকে মদ্যের প্রভায় রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সংসার।

প্রথম দৃশ্য।

দুরদালান।

সরযূ ও বামা।

সরযূ। কি যে করবে, মা, তা কিছু বুঝতে পারচি না। বাড়ী থেকে কুড়ি দিন আসতে না আসতে যে এমন সর্ব্বনাশ হ'বে, তা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।

বামা। তুমি মা কেন যেতে দিলে?

সরযূ। কি করবো বল, পেটের দায়ে মানুষকে সব করতে হয়। এখন মনে হচ্চে তিনি কাছে থেকে আমাদের না খেয়ে মরাও ভাল ছিল। আমি পোড়াকপালী কেন তাঁকে যেতে দিলুম?

বামা। চুপ কর মা, কেঁদ না।

সরযূ। আমি কি ক'রে চুপ করবো? তিনি বড় আশা করে বিদেশে গেছেন, যে ফিরে এসে সকলের হাসিমুখ দেখবেন। তিনি এলে, আমি কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াবো?—কেমন করে তাঁকে মুখ দেখাব? মাকে খুন করে গেল, ঠাকুরঝিকে যে কে কোথায় নিয়ে গেল, তার কোন খপর পেলুম না। না জানি এতদিন কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার কেন মরণ হলো না?

বামা। বালাই, ও কথা বলতে নেই।

সরযূ। ও পাড়ার খুড়শ্বশুর, যাঁর হাতে হাতে আমাদের সঁপে দিয়ে গেলেন, আমাদের কপালদোষে শয্যাগত। রামরতন, যার উপর আমাদের অনেক ভরসা ছিল, সে আজও চৈতন্য পায় নি, যদি রক্ষা পায় তো পুনর্জ্জন্ম! শাশুড়ী নেই, ননদ নেই, স্বামী বিদেশে, এই নির্জ্জনপুরীতে আমি একলা মেয়েমানুষ শুধু তোমার মুখ চেয়ে কাটাচ্চি। তুমি আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার কেউ ছিলে।

বামা। ওকি কথা—আমি আর তোমার কি করেছি মা?

সরযূ। এই যে আজ সাতদিন হাতে একটী পয়সাও নেই, কে আমাদের অন্ন দিচ্ছে? কে আমার জীবনের প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে? রাত্রিকালে একলা মেয়েমানুষ ভয় পাব বলে কে আমার কাছে শুয়ে থাকে? সেই কাল রাত্রে কে আমার মুখে জল দিয়ে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়েছিল? কে মার সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল? সব তুমি। তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তা এ জীবনে কখন ভুলবো না।

বামা। মানুষ কিছু করতে পারে না। সব সেই হরি করেন। আমরা শুধু নিমিত্ত মাত্র।

সরযূ। এখন যদি আমার একটী অনুরোধ রাখ—

বামা। সে কি মা! তুমি এত কিন্তু হচ্ছ কেন?

সরযূ। তুমি যদি জীবনকে মানুষ কর, যদি প্রতিজ্ঞা কর, যে তিনি দেশে ফিরে এলে তাঁর ধন তাঁকে ফিরে দেবে, তা হলে আমার যে ধারে চক্ষু যায়, চলে যাই, কিম্বা—

বামা। ছি ছি, ও কথা তুমি মনের কোণেও স্থান দিও না।

সরযূ। না স্থান দিয়ে করবো কি! এই দুধের বালকের হাত ধরে কার দ্বারস্থ হবো? খাই না খাই, লোকের মাথা গোঁজবারও একটা স্থান থাকে, আমার তাও গেল। আমি কোথা যাব? বোসেরা পরশু দিন বাড়ীতে ঢোল দিয়ে গেছে, আজ বাদে কাল গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে। হে মা দুর্গে! শেষকালে গাছতলা সার করলে!

বামা। কেঁদ না মা, কেঁদ না। ভাবনা কি? যিনি জীব দিয়েছেন, তিনি আহার আশ্রয় দেবেনই দেবেন।

সরযূ। কেন গেলে—কেন গেলে? আমি মেয়েমানুষ, এখন কি করি? এ বিপদে কি করে রক্ষা পাই? দুধের বাছার হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লো! কি করে তার জীবনরক্ষা করি? ভিক্ষে করতেও যে জানি না, তবে কি করবো? কেমন করে তোমার গচ্ছিত ধন তোমায় ফিরিয়ে দেব?

বামা। চল না মা, তোমায় বাপের বাড়ী রেখে আসি? প্রিয়বাবু যতদিন না ফিরে আসেন, ততদিন সেখানে থাকবে।

সরযূ। বাপের বাড়ীতে আমার কেউ নেই—সেখানে যাব না। তোমাকে যে দুপুরবেলা খুড়শ্বশুরের বাড়ী পাঠিয়েছিলুম, তিনি কি বললেন?

বামা। সে কথা কি বলবো মা, নববাবু রাজি হলেন না।

সরযূ। তুমি তাঁকে ভাল করে বলেছিলে? বলেছিলে কি, যে আমি একটু আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি রাঁধুনি হয়ে থাকতে চাই?

বামা। সব বলেছিলুম।

সরযূ। তিনি কি বললেন?

বামা। বললেন, আমি অনেক টাকা দিয়েছি আর পারবো না। আজ-কালের বাজারে দু-দুটো পেট প্রতিপালন করা কি সহজ কথা? তায় আমি ছাপোসা মানুষ।

সরযূ। সত্যি, তিনি অনেক করেছেন। এমন উপকার মানুষে মানুষের করে না। কিন্তু আমি গেরস্থর বউ, যাব কোথা? মা! তুমি একবার আমার সঙ্গে চল, আমি তাঁর বাড়ী যাব, তাঁর পায়ে ধরে কাঁদবো, তাঁদের বাড়ী দাস্যবৃত্তি করবো, তিনি আমার জীবনকে একমুঠো অন্ন দিন, আমাকে একটু আশ্রয় দিন। তারপর তাঁকে চিঠি লিখলে তিনি নিশ্চয়ই চলে আসবেন।

বামা। যাবে যাও, কিন্তু কিছু যে হয়, তা বোধ হয় না।

সরযূ। ভাল, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

বামা। যেও না মা! আমার একটা কথা শোন, সেখানে যেও না, অপমানিত হবে। তোমার অপমান আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারবো না।

সরযূ। তবে আমি কি করবো?

বামা। তোমার কাছে কিম্বা দূরে, কোন আত্মীয়স্বজন নেই?

সরযূ। কাছে কেউ নাই, তবে অনেক দূরে আমার এক খুড়তুতো ভগ্নী আছে। সে আমায় বড় ভালবাসে। তার কাছে যেতে পারলে সে আমায় যত্ন করে রাখে। কিন্তু সে অনেক দূর, সেখানে কি করে যাব?

বামা। সে দেশ কোথায়?

সরযূ। ঘাটাল, শুনেছি নাকি কলিকাতা হতে জাহাজে ক'রে যে হয়।

বামা। ঘাটাল! তা এতক্ষণ বলনি কেন? আমার যে ভায়ের বা সেখানে। অনেক দূর বটে। আমার ভাই দিন কতক হ এসেছে, আমাকে একবার নিয়ে যেতে চাচ্চে, তা বে আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমার ভাই সঙ্গে যাবে, তোমা বোনের বাড়ী রেখে আসবো।

সরযূ। আমি কি করে যাব, আমার হাতে ত একটী পয়সাও নেই গাড়ী ভাড়া, জাহাজ ভাড়া, কোথায় পাব?

বামা। ক্ষ্যাপা মেয়ে বলে কিগো! আমার সঙ্গে যাবে তোমার আবা পয়সার দরকার কি?

সরযূ। সাধে বলেছিলুম, আর জন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে। নইলে তুমি কেন আমার এত উপকার করবে!

বামা। এর আর উপকার কি? মানুষ মানুষের যদি এটুকু না করবে, তবে যে তার মনিষ্যি জন্মই বৃথা।

সরযূ। তবে কবে যাবে?

বামা। বেশী দেরি করবার দরকার কি, কালই যাই চল না?

সরযূ। তা বেশ; তবে একটা কথা এই, যে আমি রামরতনের স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ের কথা কয়েছিলুম, সে আমাকে কোথাও যেতে বারণ করে; তাদের বাড়ী থাকতে বলে, আলাদা রেঁধে খেতে বলে; আরও বলে, যে রামরতন ভাল হলে তার পর যা হয় হবে।

বামা। তাতে তোমার মত কি?

সরযূ। আহা! বেচারা ত আমাদের জন্য মরণাপন্ন হয়েছে। তার হালগরু বেচে ডাক্তার খরচ চলচে। তার উপর আমি

তাদের ঘাড়ে চাপবো ! তারা দু-দুটো পেট চালাতে কোথায় পাবে ?

বামা। তা বটে ত !

সরযূ। কিন্তু এক একবার ভাবচি, তার কথা শুনবো কি না। তুমি কি বল ?

বামা। আমার মতে গরীবদের উপর আর চাপ দিয়ে কাজ নেই। তুমি ঘাটালেই চল।

সরযূ। তবে তাই যাব, তুমি যা ভাল বিবেচনা করবে, আমি তাই করবো।

বামা। কাল রাত পোহালেই যেতে হবে, তৈয়ারি হয়ে নিও।

সরযূ। তৈয়ারা আর কি হব ? দু একখানা কাপড় সঙ্গেই নেব। আর এক আধখানা বাসন যা আছে, তোমার বাড়ীতে নিয়ে রেখ।

বামা। আমি এখন যাই, দাদাকে বলে আসি। রাত্রে আসবো এখন। হ্যাঁ, দেখ একটা কথা বলি, রামরতনের পরিবারকে কি মেয়েকে একথা বলে কাজ নেই, তা হলে হয়ত যেতেই দেবে না।

সরযূ। তা হলে তিনি টের পাবেন কি করে ? চিঠি লিখবেন কি করে ?

বামা। বোকা মেয়ে যেন কি ? ঘাটালে পৌঁছে তাঁকে চিঠি লিখে জানালেই হবে। আর এদের বল্লেই বা তিনি টের পাবেন কি করে।

সরযূ। তা বটে।

বামা। তবে এখন আমি আসি। যা বল্লুম ভুলো না। রাত্রে আমি আবার আসবো এখন।

সরযূ। ঘাটাল, শুনেছি নাকি কলিকাতা হতে জাহাজে ক'রে যেতে হয়।

বামা। ঘাটাল! তা এতক্ষণ বলনি কেন? আমার যে ভায়ের বাড়ী সেখানে। অনেক দূর বটে। আমার ভাই দিন কতক হলো এসেছে, আমাকে একবার নিয়ে যেতে চাচ্চে, তা বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমার ভাই সঙ্গে যাবে, তোমাকে বোনের বাড়ী রেখে আসবো।

সরযূ। আমি কি করে যাব, আমার হাতে ত একটী পয়সাও নেই, গাড়ী ভাড়া, জাহাজ ভাড়া, কোথায় পাব?

বামা। ক্ষ্যাপা মেয়ে বলে কিগো! আমার সঙ্গে যাবে তোমার আবার পয়সার দরকার কি?

সরযূ। সাধে বলেছিলুম, আর জন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে। নইলে তুমি কেন আমার এত উপকার করবে!

বামা। এর আর উপকার কি? মানুষ মানুষের যদি এটুকু না করবে, তবে যে তার মনিষ্যি জন্মই বৃথা।

সরযূ। তবে কবে যাবে?

বামা। বেশী দেরি করবার দরকার কি, কালই যাই চল না?

সরযূ। তা বেশ; তবে একটা কথা এই, যে আমি রামরতনের স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ের কথা কয়েছিলুম, সে আমাকে কোথাও যেতে বারণ করে। তাদের বাড়ী থাকতে বলে, আলাদা রেঁধে খেতে বলে; আরও বলে, যে রামরতন ভাল হলে তার পর যা হয় হবে।

বামা। তাতে তোমার মত কি?

সরযূ। আহা! বেচারা ত আমাদের জন্য মরণাপন্ন হয়েছে। তার হালগরু বেচে ডাক্তার খরচ চলচে। তার উপর আমি

তাদের ঘাড়ে চাপবো! তারা দু-দুটো পেট চালাতে কোথায় পাবে?

বামা। তা বটে ত!

সরযূ। কিন্তু এক একবার ভাবচি, তার কথা শুনবো কি না। তুমি কি বল?

বামা। আমার মতে গরীবদের উপর আর চাপ দিয়ে কাজ নেই। তুমি ঘাটালেই চল।

সরযূ। তবে তাই যাব, তুমি যা ভাল বিবেচনা করবে, আমি তাই করবো।

বামা। কাল রাত পোহালেই যেতে হবে, তৈয়ারি হয়ে নিও।

সরযূ। তৈয়ারী আর কি হব? দু একখানা কাপড় সঙ্গেই নেব। আর এক আধখানা বাসন যা আছে, তোমার বাড়ীতে নিয়ে রেখ।

বামা। আমি এখন যাই, দাদাকে বলে আসি। রাত্রে আসবো এখন। হ্যাঁ, দেখ একটা কথা বলি, রামরতনের পরিবারকে কি মেয়েকে একথা বলে কাজ নেই, তা হলে হয়ত যেতেই দেবে না।

সরযূ। তা হলে তিনি টের পাবেন কি করে? চিঠি লিখবেন কি করে?

বামা। বোকা মেয়ে যেন কি? ঘাটালে পৌঁছে তাঁকে চিঠি লিখে জানালেই হবে। আর এদের বল্লেই বা তিনি টের পাবেন কি করে।

সরযূ। তা বটে।

বামা। তবে এখন আমি আসি। যা বল্লুম ভুলো না। রাত্রে আমি আবার আসবো এখন।　　[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুলিডিপো।

বামা, সরযূ ও জীবন।

জীবন। কখন সেখানে যাব মা? কখন মাসীমাকে দেখবো মা?

বামা। এতক্ষণ ত সেখানে যেতুম বাবা, পোড়ারমুখোরা যে ধরে আনলে।

সরযূ। আমাদের ছেড়ে দেবে ত?

বামা। দেবেনা ত কি? এ কি মগের মুল্লুক না কি?

সরযূ। এরা ধরে কেন?

বামা। সে কথা আর কেন বল? শুনেছ ত মুখপোড়াদের সঙ্গে জাহাজ চড়ে, বছর বছর কত বিদকুটে বেয়ারাম আসে। এবার নাকি পেলেগ বলে কি ছাই একটা এসেছে।

সরযূ। হ্যাঁ, ওঁর মুখে শুনেছি বটে, সেই জন্যে লোক জনকে পথে ঘাটে ধরে আটকে রাখে। আমাদের কি পেলেগে ধরেছে?

বামা। দেখদেখি একবার অনাছিষ্টি কাণ্ড! বেয়ারামকে কি গ্রেপ্তার করা যায় গা? কেবল লোকের উপর জুলুম বই ত নয়। কারুর সর্ব্বনাশ, আর কারুর বা পৌষ মাস। লোকে রোগের ভয়ে যত ব্যতিব্যস্ত হচ্চে, পেলেগওলাদের পকেট ততই ভরতি হচ্চে। কোম্পানির চোখের উপর এই সব হচ্চে গা?

সরযূ। কোম্পানি ত লোকের ভালর জন্যেই এই সব করেছে। বেয়ারাম যাতে না বাড়তে পায়, তাই ত কোম্পানির ইচ্ছে। তবে যাঁদের হাতে ভার দেয়, তারা যদি অত্যাচার করে, তা হলে কোম্পানি করবে কি? এই দেখ না, লোকের ভালর জন্যে প্রত্যেক গ্রামে পুলিশ আছে; কিন্তু পুলিশের লোক

প্রায়ই অত্যাচারী হয়, তাতে কি কোম্পানির দোষ দিতে হবে ?

বামা। তা নয় ত কি মা ? এই যে জমিদার মশাইরা নগদ চার টাকা মাইনে দিয়ে গোমস্তা রাখেন। তাঁরা কি জানেন না, যে কোন ভদ্রলোক অত অল্প মাইনেয় পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না। তবে তাঁরা গোমস্তাদের প্রজাপীড়ন করে পয়সা নিতে, একরকম বলে দেন কি না ? অল্প মাইনের মুখ্যু পুলিশের হাতে কোম্পানি কি ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে বল দেখি ? সে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে কোম্পানিই দায়ী নয় ত কি ? এই যে আমাদের মিছিমিছি ধরে আনলে, কেন ? কিছু টাকার পিত্তেসে বই ত না ? আ মর মুখপোড়ারা, আমরা কি টাকার মানুষ ?

সরযূ। আমাদের কবে ছেড়ে দেবে ?

বামা। শুনেছি ত আজ বা কাল। ডাক্তার সাহেব এসে নাড়ী টিপে দেখবে, তার পর আর একজন সাহেব এসে কত ভয় দেখাবে, যেতে একরকম মানাই করবে।

সরযূ। কেন, মানা করবে কেন ?

বামা। ওদের ইচ্ছে নয়, যে এখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে লোক যায়। পাছে লোকের আঁচল ধরে বেয়ারাম চালান হয়, ওদের এই ভয়। সেই জন্যে কত ভয় দেখাবে, মিছিমিছি বলবে, "দেখ সেখানে যাচ্চ, কিন্তু খুব খাটতে হবে, আর পাঁচ টাকা বই মাইনে পাবে না।"

সরযূ। মাইনে কিসের ?

বামা। আহা ! বোকা মেয়ে বোঝে না। এই রকম করে ভয় দেখাবে, তাতে যদি তুমি যেতে না চাও।

সরযূ। তুমি এত জানলে কি করে?

বামা। আমি যে ঘাটাল যেতে এ রকম প্রায়ই ভুগি। তোমাকে যত কিছু বলুক না কেন, তুমি বলো, "আমি যাব।"

সরযূ। তুমি ভাগ্যি বলে দিলে, আমি ত এসব কিছু জানতুম না।

বামা। হ্যাঁ দেখ, আমার সন্দেহ হয়, যে রমেন বোস তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করচে।

সরযূ। ওমা সে কি কথা গো!

বামা। ভয় কি মা? আজ একবার আপিস ঘরের ওধারটায় গিছলুম, হঠাৎ রমেন বোসের নাম শুনে থম্‌কে দাঁড়ালুম। তার পরই তোমার নাম শুনতে পেলুম, আর বামুন বামুন করে কি বললে।

সরযূ। কি হবে? কোথায় যাব?

বামা। সে উপায় ঠাউরেছি। সাহেব এসে তোমাকে যদি কোথায় বাড়ী, কি জাত, এই সব জিজ্ঞাসা করে, তুমি মিছেকথা বলো। বলো, যে বাড়ী মেদিনীপুর কি বাঁকুড়া জেলায়, আর জাত বলো বাগ্দী।

সরযূ। আমি সাহেবের সঙ্গে কি করে কথা কইব? মিছে কথা কেমন করে বলবো?

বামা। কি করবে মা। বিপদে পড়লে সব করতে হয়। আমি কাছে থাকব, তোমার কিছু ভয় নেই। আমি যা যা বললুম, এই কথাগুলি বললেই আজ বা কাল ছেড়ে দেবে। কেমন পারবে ত?

সরযূ। পারবো না ত আর কি করবো বল? এতও অদৃষ্টে ছিল!

বামা। এখান থেকে একবার বেরুতে পারলে, আর কোন ভয় নেই।

সরযূ। আচ্ছা, লোকেরা ত আমাদের খুব যত্ন করচে।

বামা। তা করবে না? আমি গিয়ে ওদের বললুম, যে ভদ্রলোকের মেয়ের যেন কোন কষ্ট না হয়।

সরযূ। তোমার কাছে আমি কেনা হয়ে রইলুম।

জীবন। মা! ক্ষিধে পাচ্ছে।

বামা। এস বাবা এস, খাবার দিইগে এস।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

সুলতানপুর চা-বাগান।

হারাধন ও অন্যান্য কুলিগণ।

১ম-কু। আমার ভাই আর সাত দিন আছে। এই ক'টা দিন যদি বাঁচি, তবে বোধ হয় এই নরকযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাব।

২য়-কু। সে আশায় ছাই দাও। এ গোলোকধাঁধা হিসেব, একবার ঢুকলে বার হওয়া কিছু শক্ত।

১ম-কু। কেন? আমার এগ্রিমেণ্ট ত শেষ হয়ে এসেছে।

২য়-কু। শেষ হয়ে থাকে, আবার দিতে হবে?

১ম-কু। আমার প্রাণ গেলেও আর দেব না।

২য়-কু। পেয়াদায় দেয়াবে বাবা, পেয়াদায় দেয়াবে।

৩য়-কু। আচ্ছা বন্ধু! তুমি আবার এগ্রিমেণ্ট দিলে কেন?

২য়-কু। আমার গেরো, না দিয়ে আর কি করবো বল? তোমরা কি ঠাউরে বসে আছ যে, আমি সক করে এগ্রিমেণ্ট দিলুম?

৩য়-কু। কেন দিলে বল না?

২য়-কু। তবে কি আর সাধে বলছিলুম, যে চা-বাগানগুলো গোলোক-

কাছে সেলাম করে দাঁড়িয়ে বিদেয় চাইলুম, সাহেব একটু মুচকে হাসলেন।

১ম-কু। সাহেব হাসলে!

২য়-কু। সত্যিই সাহেব হাসলেন। হাসি দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। সাহেব বললেন, বেশ, কাল তুমি বাড়ী যাও, কিন্তু তোমাকে দেনা দিয়ে যেতে হবে।

৪র্থ-কু। তোর মত আহাম্মুক ত কোথাও দেখলুম না, তুই দেনা করলি কেন?

২য়-কু। একেবারে অতটা গরম হয়ো না, আগে সব শোন। সাহেবের কথা শুনে আমি ত অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। সাহেব বললেন, যে আমার নামে ৫৪৸০ আনা দেনা আছে, সেই দেনা শোধ ক'রে তবে যেতে হবে।

২য়-কু-নী। আচ্ছা, তুই কি রোজ মদ খেতিস্?

২য়-কু। আহা! স্থির হয়ে শোনই না। দেনার কথা শুনে আমি ত হতভম্ব হয়ে গেলুম, কিন্তু সাহেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হ'ল না। বড় সর্দ্দার হাজির ছিল, সাহেবের ইঙ্গিতে সে আমাকে সমস্ত বুঝিয়ে দিলে।

৩য় কু। কি বোঝালে?

২য়-কু। আমাদের মাইনে পাঁচ টাকা, অর্থাৎ দিন দশ পয়সা হিসাবে, কিন্তু আমরা পুরো খাটলে তবে দশ পয়সা পাব।

১ম-কু-নী। পুরো খাটুনি কি?

২য়-কু। তাই ত বলছি। তোমাদের ঐ যে ছোটখাট টুকরিটী, ঐটী ভরে চা-পাতা তুলতে হবে, আর পুরুষদের প্রত্যহ ষোল নল জমি কোপাতে হবে। চার হাতে এক নল, এমন ষোল নল এই শক্ত মাটী কোপাবে, তবে দশটী পয়সা পাবে।

১ম-কু। ও বাবা !

২য়-কু। পুরো রোজ কিংবা দেড় রোজ খাটুনি, দুচারটে ষণ্ডা ধাঙ্গড় বা মুণ্ডা ছাড়া, প্রায় কারুই অদৃষ্টে হয় না। আমি কায়েতের ছেলে, সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেছিলুম—

৩য়-কু। তবে তুমি কেন এখানে এলে ?

২য়-কু। পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছিলুম, তার ফল ভুগছি। ছেলেবেলায় লেখাপড়া না শিখে বিগড়ে গেলুম, বাড়ীতে রোজই সকলে যাচ্ছেতাই বলতো। একদিন রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম, ভাবলুম যদি চাকরি করে পয়সা রোজগার করতে পারি, তবে বাড়ী ফিরবো। পথের মাঝে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি আমাকে দয়া করে চাকরি করে দিতে স্বীকার করে, এইখানে পাঠিয়ে দিলেন।

১ম-কু। তবে সে বেটা আড়াকাটী ?

২য়-কু। তার আর সন্দেহ আছে ? বেটারা এই রকম ভদ্রলোক সেজে, আমার মত কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেচে তা ভগবানই জানেন। হে ঈশ্বর ! যাদের হ'তে আমাদের চোখে রাত্রিদিন জল পড়ছে, তাদের সর্ব্বনাশ কি হবে না ? যে বিশ্বাসঘাতকেরা মানুষকে ভুলিয়ে এনে পশুর মত তাদের বেচে বড়মানুষ হচ্চে, তাদের কি আমাদের মত কাঁদতে হবে না ?

৪র্থ-কু। তোর দেনার কথা বল, শুনি।

২য়-কু। আগেই বলেছি, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, আমার কোন পুরুষে কোদাল ধরেনি। প্রথম প্রথম ৩।৪ নল জমির বেশী কোপাতে পারতুম না, আজকাল তবু ১০।১২ নল কোপাই। কাজেই প্রথম প্রথম আমার রোজকার দিন ৩৪ পয়সা ছিল, আজকাল ৭।৮ পয়সা হয়েছে।

১ম-কু। তাতে দেনা হলো কেন ?

২য়-কু। আমাদের প্রত্যহ যে সুখাদ্য চাল দেওয়া হয়, তার দামই ৫।৬ পয়সা। আর সত্যি সত্যি শুধু চাল মানুষ খেতে পারে না। তেলটা, কি নুনটা, কি একটা কিছু আনাজ দরকার হয়ই হয়। কাজেই একটা মানুষের খেতে ৭।৮ পয়সা পড়ে যায়। রোজকার যদি ২।৩ পয়সা হয়, তাহলে আমার খাই-খরচে দেনা হবে না ত কি ?

১ম-কু। সর্ব্বনাশ! দেনার কথা শুনে তুমি কি বললে ?

২য়-কু। বলবো আর কি ছাই ভস্ম। নিরুপায় হয়ে আমাকে আর এক বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিতে হলো।

১ম-কু। তবে কি মৃত্যু না হলে আমরা ছাড়া পাব না ?

২য়-কু। গতিক তাই বটে, তবে যদি পুরো খাটতে পার, তাহলে যাবার সময় দু-দশ টাকা নিয়েও যেতে পার।

১র্থ-কু। আচ্ছা, এখান থেকে পালালে হয় না ?

২য়-কু। চুপ কর, অমন কথা মুখে এনো না। বাতাসেরও কান আছে। যদি এ কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তাহলে আর পিটের চামড়া থাকবে না।

৩য়-কু। পালিয়েই ব যাবে কোথা ? পাহারা বা কুকুরের হাত এড়িয়ে যদি বেরুতেই পার, তাহলে পথ ঘাট জান না, এই বুনো দেশে বাঘ ভাল্লুকের হাতেই প্রাণ যাবে, কিম্বা পুলিশে ধরে জেল খাটিয়ে, ফের এইখানে পৌছে দেবে।

২য়-কু-নী। আচ্ছা, আর এক কাজ করলে হয় না ? চল না কেন আমরা সকলে মিলে ম্যাজিষ্টর বাহাদুরের কাছে নালিশ করিগে।

২য়-কু। কি বলে নালিশ করবে ?

১ম-কু। কেন আমাদের ভুলিয়ে ধরে এনে, জোর করে এখানে রেখে দিয়েছে।

২য়-কু। তোমরা ত স্বইচ্ছায় এগ্রিমেণ্ট দিয়ে এখানে এসেছ।

৩য়-কু। সে ত আমাদের ভুলিয়ে এগ্রিমেণ্ট নিয়েছে।

২য়-কু। ভুলিয়ে নিক আর যাই করুক, কোম্পানির লোক ত তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছে যে, তোমরা ইচ্ছে করে এখানে খাটতে আসছো কি না?

২য়-কু-নী। কই, আমাকে ত কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। শুনলুম, আমার বদলে আর একজনকে সাজিয়ে এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল।

২য়-কু। ও কথা বলতে গেলে উল্টে তোমার সাজা হয়ে যাবে। তুমি যা বলছো, তা ত আর প্রমাণ করতে পারবে না।

৪র্থ-কু। আচ্ছা, আমরা যদি বলি, যে আমাদের মিছামিছি এই রকম করে মারে।

২য়-কু। কুলির কথায় বিশ্বাস কি? তোমরা কি মনে কর, যে আমাদের কথায় সাহেবের সাজা হবে, আর আমাদের মার খাওয়া বন্ধ হবে? শুধু ম্যাজিষ্ট্রেট কেন, সকল লোকের মনেই বিশ্বাস আছে, যে একটু আধটু শাসন না হলে, এই ৫০০'৭০০ কুলিকে খাটান চলে না।

৩য়-কু। এ কি একটু আধটু শাসন? এ কি শুধু মার?

২য়-কু। সে ত আমরা বুঝলুম, আর কে বুঝবে? দেখ, সাহেবেরা আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না। আমাদের যে অন্তঃকরণ আছে, আমাদের যে সুখদুঃখ ভোগের ক্ষমতা আছে, এ কথা তারা একেবারেই ভুলে যায়। পশু অপেক্ষাও আমাদের হীন প্রাণী মনে করে। আচ্ছা, তোমরাই বল দেখি, যে ছোট সাহেব প্রায়ই আমাদের মেরে মেরে আধমারা করে, সেই

১ম-কু। তাতে দেনা হলো কেন?

২য়-কু। আমাদের প্রত্যহ যে সুখাদ্য চাল দেওয়া হয়, তার দামই ৫।৬ পয়সা। আর সত্যি সত্যি শুধু চাল মানুষ খেতে পারে না। তেলটা, কি নুনটা, কি একটা কিছু আনাজ দরকার হয়ই হয়। কাজেই একটা মানুষের খেতে ৭।৮ পয়সা পড়ে যায়। রোজকার যদি ২।৩ পয়সা হয়, তাহলে আমার থাই-খরচে দেনা হবে না ত কি?

১ম-কু। সর্ব্বনাশ! দেনার কথা শুনে তুমি কি বললে?

২য়-কু। বলবো আর কি ছাই ভস্ম। নিরুপায় হয়ে আমাকে আর এক বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিতে হলো।

১ম-কু। তবে কি মৃত্যু না হলে আমরা ছাড়ান পাব না?

২য়-কু। গতিক তাই বটে, তবে যদি পুরো খাটতে পার, তাহলে যাবার সময় দু-দশ টাকা নিয়েও যেতে পার।

৪র্থ-কু। আচ্ছা, এখান থেকে পালালে হয় না?

২য়-কু। চুপ কর. অমন কথা মুখে এনো না। বাতাসেরও কান আছে। যদি এ কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তাহলে আর পিটের চামড়া থাকবে না।

৩য়-কু। পালিয়েই বা যাবে কোথা? পাহারা বা কুকুরের হাত এড়িয়ে যদি বেরুতেই পার, তাহলে পথ ঘাট জান না, এই বুনো দেশে বাঘ ভাল্লুকের হাতেই প্রাণ যাবে, কিম্বা পুলিশে ধরে জেল খাটিয়ে, ফের এইখানে পৌঁছে দেবে।

২য়-কু-নী। আচ্ছা, আর এক কাজ করলে হয় না? চল না কেন আমরা সকলে মিলে ম্যাজিষ্টর বাহাদুরের কাছে নালিশ করিগে।

২য়-কু। কি বলে নালিশ করবে?

১ম-কু। কেন আমাদের ভুলিয়ে ধরে এনে, জোর করে এখানে রেখে দিয়েছে।

২য়-কু। তোমরা ত স্বইচ্ছায় এগ্রিমেণ্ট দিয়ে এখানে এসেছ।

৩য়-কু। সে ত আমাদের ভুলিয়ে এগ্রিমেণ্ট নিয়েছে।

২য়-কু। ভুলিয়ে নিক আর যাই করুক, কোম্পানির লোক ত তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছে যে, তোমরা ইচ্ছে করে এখানে খাটতে আসছো কি না?

২য়-কু-নী। কই, আমাকে ত কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। শুনলুম, আমার বদলে আর একজনকে সাজিয়ে এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল।

২য়-কু। ও কথা বলতে গেলে উল্টে তোমার সাজা হয়ে যাবে। তুমি যা বলছো, তা ত আর প্রমাণ করতে পারবে না।

৪র্থ-কু। আচ্ছা, আমরা যদি বলি, যে আমাদের মিছামিছি এই রকম করে মারে।

২য়-কু। কুলির কথায় বিশ্বাস কি? তোমরা কি মনে কর, যে আমাদের কথায় সাহেবের সাজা হবে, আর আমাদের মার খাওয়া বন্ধ হবে? শুধু ম্যাজিষ্ট্রেট কেন, সকল লোকের মনেই বিশ্বাস আছে, যে একটু আধটু শাসন না হলে, এই ৫০০।৭০০ কুলিকে খাটান চলে না।

৩য়-কু। এ কি একটু আধটু শাসন? এ কি শুধু মার?

২য়-কু। সে ত আমরা বুঝলুম, আর কে বুঝবে? দেখ, সাহেবেরা আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না। আমাদের যে অন্তঃকরণ আছে, আমাদের যে সুখদুঃখ ভোগের ক্ষমতা আছে, এ কথা তারা একেবারেই ভুলে যায়। পশু অপেক্ষাও আমাদের হীন প্রাণী মনে করে। আচ্ছা, তোমরাই বল দেখি, যে ছোট সাহেব প্রায়ই আমাদের মেরে মেরে আধমারা করে, সেই

তার কুকুরটীকে কত যত্ন করে, ঘোড়াটীকে কত আদর করে, ভুলেও ত কখন এক ঘা চাবুক মারে না !

১ম-কু। আচ্ছা, বড় সাহেব এমন শিবতুল্য মানুষ, ছোট সাহেবটা এমন কেন ?

২য়-কু-নী। চল না, বড় সাহেবের কাছে গিয়ে সকলে কেঁদে পড়ি।

২য়-কু। যার পিটের দুপুরু চামড়া, সেই এ কার্য্যে অগ্রসর হবে। বড় সাহেব আর কি করবেন ? ছোট সাহেবকে বকবেন, আর ছোট সাহেবের মারের বহর দুনো হয়ে দাঁড়াবে।

৩য়-কু। তবে আমরা কি করবো ? কার কাছে দুঃখ জানাবো ? কার কাছে নালিশ করবো ?

২য়-কু। শুধু চোখের জল ফেল, আর ভগবানের কাছে নালিশ কর। একদিন না একদিন, আমাদের চখের জলের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়বেই পড়বে।

৪র্থ-কু। দেখ, রবিবার তেল কিনতে হাটে গিছ্‌লুম, সেখানে শুনলুম, যে এবার আসামে যে লাট এসেছে, সে নাকি আমাদের হয়ে খুব লড়চে।

২য়-কু। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। আমাদের মত কৃতদাসদের জন্য যাঁর প্রাণে একটুও দয়া হবে, ঈশ্বর তাঁর ভাল করবেনই করবেন। কিন্তু তিনি যে লড়ে বড় একটা কিছু সুবিধে করতে পারবেন, তা বোধ হয় না। শেষ না তাঁকেই বিদেয় নিতে হয়।

৩য়-কু। কেন ?

২য়-কু। সে কথায় তোমার আমার মত লোকের দরকার নেই।

১ম-কু-নী। আচ্ছা, ঐ যে একটী নূতন কুলিনী ছেলে সঙ্গে করে এসেছে, তাকে কি বোধ হয় ?

২য়-কু। ও যে ভদ্রলোকের মেয়ে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৩য়-কু-নী। আহা! এসে অবধি রাত্রিদিন কাঁদচে। ছেলেটা যেন ননীর পুতুল। পোড়ারমুখো আড়কাটী কোন প্রাণে ওদের এখানে পাঠালে?

২য়-কু। কিন্তু ওর সমূহ বিপদ। সর্দ্দার থেকে কেরাণীবাবু ডাক্তার বাবু পর্য্যন্ত, সকলেরই নজর ওর দিকে। তার উপর ছোট সাহেব পরশুদিন দেখে গেছে।

২য়-কু নী। তাহলেই চূড়ান্ত হয়েছে। এখানে কাঁচা বয়েস নিয়ে কোন মেয়েমানুষ যে ধর্ম্ম রেখে যাবেন, সে যোটী নেই।

হারু। ওহোঃ বামা রে!

১ম-কু। ও বাবা! এ আবার কেরে?

২য়-কু। একজন নূতন কুলী। হ্যাঁ হে, বামা তোমার কে হয়?

হারু। সে কথা আর—ওর নাম কি—ভুলোনা বাবা, এখনি আমি—ওর নাম কি—ভীরমী যাব?

১ম-কু। ভীরমী যেতে গেলে কেন? সে তোমার কে হয়, বলতে কিছু দোষ আছে কি?

হারু। দোষ আর কি? সে আমার— ওর নাম কি—সে আমার—ওর নাম কি—ওহোঃ! তোর মনে এই ছিল বামা? তুই আমাকে —ওর নাম কি—এখানে না পাঠিয়ে শুনে একশবার—ওর নাম কি—তাই বললি না কেন?

১ম-কু। তাই কি হে?

হারু। হুঁ, আমাকে নিতান্ত—ওর নাম কি—বোকা, পেয়েছ কি না? আমি তোমাদের—ওর নাম কি—বলে দিই, আর তোমরা আমাকে—ওর নাম কি—তাই বলতে থাক।

(ভুলুর প্রবেশ।)

ভুলু। আরে এই শালারা, তোরা সব ছুটি পেয়েছিস্ না কি, যে খালি গল্প করচিস্? কাম কম হলে পিট থেকে চামড়াখানি ছাড়িয়ে লেব। (হারুর প্রতি) তুই শালা হাঁ করে কি দেখছিস্? কাম কর। (বেত্রাঘাত)

হারু। ওহোঃ বামারে!

ভুলু। হাঃ হাঃ হাঃ! এখানে বাবাও নেই, আর মাও নেই, আছে ভুলু সর্দ্দার।

(সরযূ ও জীবনের প্রবেশ।)

তুই মৌগি ছেলেটাকে নিয়ে বেড়াতে গি'ছলি না কি? দেখছিস্, বেত দেখছিস্?

জীবন। মা! সরে এস, তোমাকে মারবে।

সরযূ। আমি কায করছিলুম, বড় সর্দ্দার আমাকে ছেলে আনতে বললে।

ভুলু। কেন, তোর ছেলে কোথা গি'ছলো? মরে ছিল না কি?

সরযূ। বালাই! বালাই! হা ঈশ্বর!

ভুলু। চুপ করে আছিস যে?

সরযূ। আমার ছেলের জ্বর হয়েছে, তাই শুয়েছিল। বড় সর্দ্দার বললে যে, ছেলেকে নিয়ে আয়, নইলে ওকে বেত মেরে তুলে আনবো। তাই আমি ছেলেকে আনতে গি'ছলুম।

ভুলু। জ্বোথার হ'ক, চাই মরি যাক, কাম করতে হবে। পর মরি গেলে, ঐ ভাগাড়ে রেখে আসবো।

৪র্থ-কু। ওরে সাবধান, ছোট সাহেব আসছে।

ভুলু। এই,—ঠিক রহো; কাম কিও।

জীবন। মা! পালিয়ে এস, সাহেব আসছে। ওকে দেখলে বড় ভয় করে মা!

সরযূ। চুপ কর বাবা, কায কর।

জীবন। পারি না যে মা!

সরযূ। কি করবে বাবা! কায করতে না দেখলেই চাবুক মারবে।

(বুল সাহেবের প্রবেশ।)

বুল। এই শালা, নূতন কুলি সব কেমন কাম করচে?

ভুলু। এতনা আচ্ছা হোতা নেই সাব।

বুল। কাহে নেই আচ্ছি হোতা you bloody শুয়ার কি বাচ্ছা? এক মাহিনাকা যাস্তি হোগিয়া, আচ্ছা হায় নেই। (চাবুক আঘাত) আচ্ছি হোয়েগা।

ভুলু। (সেলাম করিয়া) হাঁ সাব, হোগা।

বুল। You dam son of a bitch! টোম কেয়া ডেকটা? (একজন কুলিকে পদাঘাত) you woman! টোমড়া টুকড়ি ডেখাও। কাহে এট্টা কমটী কাম হুয়া? (২য় কুলিনীকে কশাঘাত)

২য়-কু। ও সাহেব! আর করবো না সাহেব! তোমার পায়ে পড়ি সাহেব!

বুল। I shall make you dance you vixen (পুনঃ পুনঃ কশাঘাত)

২য়-কু। বাবা রে, মা রে, গেলুম রে!

বুল। ডেক সড়ডার! মাগী কেমন গান করিটে করিটে নাচিতেছে! হাঃ হাঃ হাঃ! (সরযূর নিকট অগ্রসর হইয়া) টুমি কি কড়িটেছ গা Beauty? টুমি মট্‌কে কাপড় ডাও কেন? Really thou art a jewel. সড়ডার! ইস্কো আটা কাম ডেও, চৌঠা কাম ডেও। ইস্কো মার মট।

ভুলু। যো হুকুম সাব।

বুল। ইয়াড রাখ। টাহা না হইলে টোমকো গারডমে ডেগা, টান

খাওয়ায়েগা। (জীবনের প্রতি) Thou cur ! you have'nt done anything. Take this for your impudence.

(প্রহার)

সরযূ ! সাহেব ! তোমার পায়ে পড়ি, ওকে মের না। ওঁর জ্বর হয়েছে; তুমি আমাকে মার।

বুল। ও টোমার লেড়কা। হাম জানটা নেহি। আচ্ছা, শালা-লোক কাম কিও, হাম যাটা। [প্রস্থান।

সরযূ। ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হলো !

১ম-কু। ভয় নেই, মূর্চ্ছা গেছে, একটু জল আনতে পার ?

ভুলু। এই ছুটীকা ঘণ্টী হুয়া, যা, সব খা লেও।

সরযূ। হা ভগবান্ ! তোমার মনে এই ছিল !

২য়-কু। নাও, কোলে করে তুলে নাও, নিয়ে ঘরে চল।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীমনোমোহন গোস্বামী।

আহূত।

ভারতি ! তোমার অযুত ভক্তে
আজিকে যখন ডেকেছ
বরাভয় ভরা চারু আঁখি দুটি
আঁখি পরে যবে রেখেছ
কর্ম্ম পিপাসী শত সন্তানে
বিশ্ব-বিজয় বল বন্ধনে
তোমার সেবা মধু নন্দনে
গৌরব ছায়ে ঢেকেছ,
কর্ম্ম হীনেরে তোমার আজিকে
কর্ম্ম আগে ডেকেছ !

নিদা মথিয়া ঝঙ্কৃত তব
আহ্বানে ঘন বাঁশী গো
সুপ্ত মুগ্ধ দুয়ারে দুয়ারে
আঘাতিয়া গেছে আসি গো !
মর্ম্মে মর্ম্মে বেজেছে বেদনা
বিশ্ব শিহরি জেগেছে চেতনা
নীলিমা বিদারি উঠেছে কত না
বিজয়-কেতন রাশি গো !
নিদ্রিত আজি শুনেছে তোমার
আহ্বান ঘন বাঁশী গো !

মঙ্গল তব অঞ্চল বায়ে
উৎসরে জয়-কাহিনী
ঘন দুন্দুভি সঙ্গীতে ছুটে
সহস্র হৃদি-বাহিনী

মর্ম্মে মর্ম্মে উথলি উথলি
রজনী শেষের তমসা উজলি
হোমাগ্নি শিখা উঠিয়াছে জ্বলি
আলস্য রাশি-দাহিনী
চঞ্চল তব অঞ্চল বায়ে
উচ্ছ্বাসে গীতি কাহিনী !

উৎসাহ শিখা জ্বলে ললাটিকা
ভক্ত ললাট শিখরে
জয় জয় জয় জননী বাণীতে
তপ্ত ধমনী শিহরে !
ডেকেছ জননী ডেকেছ আমার
কণ্টকিয়া এ চিত কান্তার
আহ্বান ভেরী গুরু ঝঙ্কারে
অভয় ছন্দে বিহরে
চরণ রেণুকা জ্বলে ললাটিকা
ভক্ত ললাট শিখরে !

রমাসুন্দরী।*

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ঝি—অ ঝি ?"

কোনও উত্তর নাই। শ্যামচাঁদ ঝাড়ন হস্তে প্রখরভাবে টেবিল, চেয়ার, ছবি প্রভৃতি কক্ষস্থিত আসবাবগুলি হইতে ধূলা ঝাড়িয়া যাইতে লাগিল। সে এ বাড়ীর খানসামা, চাকর মহলে তাহার আধিপত্য অপরিসীম। ঝি আসেনা দেখিয়া একটু উচ্চে,—শ্যামচাঁদ আবার হাঁকিল—"অ ঝী—"

ঝি এবার প্রবেশ করিল। বলিল—"অত করে চেঁচাচ্ছ কেন? হয়েছে কি?" এ ঝিটির বয়স অল্প, রংটাও পরিষ্কার। শ্যামচাঁদ তাহার প্রতি চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল—"এদিকে এস দিকিন।"

ঝি কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—"কি?"

শ্যামচাঁদ মেঝের একটা স্থান দেখাইয়া বলিল—"ঝাঁট দিয়েছ—এই খানটায় কুচি কাগজগুনো কার জন্যে রেখে গেছ?"

ঝি কাগজের টুকরাগুলি খুঁটিয়া লইয়া বলিল—"বাবা বাবা! একটু কাগজ পড়ে আছে ত কি হয়েছে?"

শ্যামচাঁদ তখন স্বর নামাইয়া বলিল—"ঝি, এ কাগজ কে কুচিয়ে ফেলেছে জান?"

"না।"

"আমি এখনি কুচিয়ে ফেলেছি। তোমায় একটু বক্‌বার জন্যে।"

ঝি একটু কুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল—"খপদ্দার আমার সঙ্গে চালাকি করো না বলছি" বলিয়া ঝি সবেগে চলিয়া যাইতেছিল। শ্যামচাঁদ বলিল—"ঝি শোন শোন।"

ঝি দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিল—"কি আবার?"

"বামুন ঠাকুরকে বল লুচি ভাজতে; বাবুর চান হয়েছে। আর চায়ের জিনিষ সব এনে দাও।"

---

* এই গল্পটি বিগত বৎসরের "ভারতী"তে "সুন্দরী" নামে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন আমি অবগত ছিলাম না যে ঐ নামেরই আর একখানি উপন্যাস তাহার কয়েকমাস পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই "সুন্দরী" প্রণেতার অনুরোধ ক্রমে এই সংখ্যা হইতে আমার গল্পের নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলাম।—লেখক।

ঝি চলিয়া গেলে সিঁড়িতে লালবাঁধা নাগরা জুতার শব্দ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকওয়ালার আবির্ভাব হইল। সে ব্যাগ হইতে একখানি রেজিষ্টারি চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"বাবু নবগোপাল বন্দোপাধ্যায়। বাবু কোথায় ?"

শ্যামচাঁদ বলিল—"বাবু গোসলখানায়" বলিয়া ডাকওয়ালার হস্ত হইতে পত্র লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

ডাকওয়ালা বলিল—"রেজিষ্টারি চিঠি। বাবুর সই চাই।"

শ্যামচাঁদ বলিল—"দাও আমি সই করে দিচ্চি।"

ডাকওয়ালা কহিল—"বাপিরে,—রেজিষ্টারি চিঠি—মালিক ভিন্ন কারু হাতে দেবার হুকুম নেই।"

শ্যামচাঁদ হস্ত দ্বারায় দুয়ার দেখাইয়া বলিল—"তবে ঐ বাইরে গিয়ে চুপ করে বসে থাক। বাবুর আসতে এখনও দেরি আছে।"

"অনেক দেরী ?"

"ঢের দেরী।"

"তবে দাও, চটপট করে সই করে দাও। দেখো যেন কোনও গোল হয় না।"

শ্যামচাঁদ তখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিজ নাম সহি করিয়া লিখিল—"বকলম শ্রীনব গোপাল বন্দোপাধ্যায়।"—"বকলম" শব্দের অর্থটা তাহার পরিস্কার ধারণা ছিল না।

ডাকওয়ালা চলিয়া গেলে শ্যামচাঁদ পত্রখানি এ পিঠ ওপিঠ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে ঝি চায়ের দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ করিল। চিঠিখানি শ্যামচাঁদ দুই হাতে নাড়িয়া ঝির পানে চাহিয়া বলিল—"বেশ মুচ মুচ করছে—নোট আছে।"

ঝি বলিল—"কত টাকার নোট ?"

শ্যামচাঁদ চিঠিখানি হাতে রাখিয়া ভার অনুমান করিতে করিতে নিজের মত বলিল—"শো দুই টাকার হবে।" শ্যামচাঁদের অসাধারণ অনুমান ক্ষমতা দেখিয়া ঝি চমৎকৃত হইয়া গেল।

ঘড়িতে নয়টা বাজিল। এই গৃহখানি ভবানীপুরে অবস্থিত। কিয়দ্দূরে রসারোড্ হইতে ট্রামগাড়ীর শব্দ আসিতেছে। গৃহস্বামী নবগোপালের একটি বন্ধু। পঞ্জাব যাত্রা করিবার প্রাকালে এ কয়েক দিবস নবগোপাল এই খানে অবস্থিতি করিতেছে। নবগোপাল আসিয়া অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত। তাহার কয়েকখানি কোম্পানির কাগজ

ছিল,—তাহা বিক্রয় করিয়াছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়াছে। বিবাহের পর পশ্চিমে কোথাও একটি ক্ষুদ্র বাড়ী লইয়া এখন থাকিবে। টাকা যাহা আছে তাহাতে দুইটি বৎসর চলিতে পারিবে। ইতিমধ্যে কোনও কর্ম্মের সন্ধান করিবে,—শিক্ষকতা হউক,—যাহা হউক।

নবগোপালের আসিবার আর বিলম্ব নাই। শ্যামচাঁদ জানালার কাছে একখানি আরাম কেদারা বিছাইয়া, তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টীপয়ে চা এবং কয়েকখানি লুচী সাজাইয়া রাখিল। পত্রখানিও চায়ের কাছে রাখিয়া দিল।

নবগোপাল আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিল। পত্রখানি হাতে করিয়া তাহার বহির্দ্দেশ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

শিরোনামা বাঙ্গালায় লেখা, হস্তাক্ষরও অপরিচিত। ছাপ দেখিল—স্থানটার নাম পরিচিত হইলেও—সেখানে তাহার কোনও পরিচিত ব্যক্তির অস্তিত্ব সে অবগত নহে।

কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত সে তখন পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল।

ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ

পরম কল্যানীয় শ্রীমান নবগোপাল বাবাজীবন পত্র দ্বারায় আমার বহু বহু আশীর্ব্বাদ জানিবেক। পূর্ব্ব পরামর্শ মত আমি অদ্য সপরিবারে পশ্চিম যাত্রা করিলাম। তোমাকে কহিয়াছিলাম যে রাওলপিণ্ডিতে শুভ বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবেক কিন্তু কোনও বিশেষ কারণবশতঃ উক্ত কল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। পঞ্জাবে রাওলপিণ্ডি অপেক্ষা আরও একটি নিকটবর্ত্তী স্থান স্থির করিয়াছি। উহার নাম অমৃতসর,—একটি প্রসিদ্ধ নগর। সেইখানে শুভ বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভিলাষ করিয়াছি। অতএব বাবাজীবন তুমি রাওলপিণ্ডিতে আগমন না করিয়া অমৃতসরে আগমন করিবে—আমরাও তথায় চলিলাম। উক্ত নগরে রবজিবাগ নামক পল্লীতে, আমার পুত্র শ্রীমান বিনয়কৃষ্ণের একজন পরম বন্ধু বাস করেন। তাঁহার নাম শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। তিনি সেখানকার একটি বিখ্যাত লোক,—স্থানীয় ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার। তুমি অমৃতসরে পৌঁছিয়া প্রথমে তাঁহার নিকট অন্বেষণ করিবেক, তাহা হইলে আমাদের বাসার সঠিক সংবাদ পাইবেক। অতি সত্বর আগমন করিবেক বিলম্ব না হয়, কারণ শুভবিবাহের দিন অতি সন্নিকট। অত্যন্ত সাবধানে আসিবেক এবং তোমার গন্তব্যস্থল কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেক

না, ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে, সাক্ষাতে সবিস্তার কহিব। ভগবৎকৃপায় অত্রস্থ মঙ্গল হয় বিশেষ। অধিক আর কি লিখিব সর্ব্বদা তোমার কুশল প্রার্থনা করিতেছি। ইতি।—

নিয়ত আশীর্ব্বাদক
শ্রীগদাধর দেবশর্ম্মণঃ

পুঃ—পত্র রেজিষ্টারি করিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিলাম ইতি।

পত্রপাঠ শেষ হইলে নবগোপাল চা পান আরম্ভ করিল। পত্রখানি আর একবার পাঠ করিল। হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? পত্রের মধ্যে যেন একটা গূঢ়ত্বের ভাব। সে যাহা হউক,—অমৃতসর এবং রাওলপিণ্ডি দুই তাহার পক্ষে সমান।

সমস্ত দিন জিনিষপত্র কেনায় এবং অন্য আয়োজনে কাটিল। রাত্রি দশটার সময় পঞ্জাবমেলে আরোহণ করিয়া নবগোপাল অমৃতসর যাত্রা করিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিবস অবিশ্রাম ভ্রমণের পর নবগোপাল অমৃতসরে পৌছিল। তখন বেলা আটটা হইবে। গাড়ী হইতে প্ল্যাটফর্ম্মে অবতরণ করিবামাত্র কয়েকজন পাণ্ডা তাহাকে ঘেরাও করিয়া, তাহার নাম ধাম গন্তব্যাদি সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্নবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নবগোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিনিষপত্র-বাহী কুলীর সঙ্গে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ষ্টেশনের বাহিরে বিস্তর একা ও গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। নবগোপাল ভাবিতে-ছিল কোথায় একটা বাসস্থানের সন্ধান পায়, এমন সময় একটি অদ্ভুতবেশী মনুষ্যমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দর্শন দিল। সে হিন্দুস্থানী অথবা বাঙ্গালী, বস্ত্রাদি দেখিয়া নবগোপাল অনুমান করিতে পারিল না। তাহার অঙ্গে একটি পশ্চিমী "মিরজাই," মাথায় একটি মলিন মখমলের টুপী, পায়ে নাগরা জুতা। কিন্তু তাহার ধুতিটি বাঙ্গালীর মত কোঁচা করিয়া পরা। যাহা হইক নবগোপাল অনুমান করিবার অধিক অবসর পাইল না কারণ লোকটি তাহাকে বলিল—"বাবু,—আমি একটি বাঙ্গালী হচ্চি।"

তাহাকে দেখিয়া নবগোপালের একটু কৌতুহলের উদয় হইল। জিজ্ঞাসা করিল —"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীমুকুন্দলাল বিশোয়াস। আমার পিতা তিনি বাংলা মুলুক থেকে এসে এইখানে মারা যান। পয়সা কড়ি কিছু রেখে যান না। ভারি দুঃখে পড়ি। কেউ বাঙ্গালী যাত্রী এলে আমি বাসা করে দিই, দর্শন করাই এই রকমে আমার পরবস্তি হোয়। আপনার কোথায় যাওয়া হোবে বাবু?"

একজন স্বদেশীয় ভদ্র সন্তান ঘটনাচক্রে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে জানিয়া নবগোপাল তখনই তাহাকে গ্রহণ করিল। বলিল—"আমি কোথায় যাব তা এখনও ঠিক করিনি। আমায় একটা ভাল দেখে বাসা ঠিক করে দিতে পার কি?"

মুকুন্দলাল উৎসাহের সহিত বলিল—"হাঁ বাবু, আলবৎ পারি। আসুন আমার সঙ্গে। গাড়ী ডাকি?"

নবগোপাল ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইল। মুকুন্দলাল তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া, কুলীর সঙ্গে নবগোপালের জিনিষ পত্র গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। পরে সে গাড়োয়ানকে একটা ঠিকানা বলিয়া, নবগোপালের পর গাড়ীতে আরোহণ করিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম বাড়ীতে নিয়ে যাচ্চ? যাত্রী বাড়ী নয় ত? যেখানে অনেক যাত্রী আছে সে বাড়ীতে আমি যেতে চাইনে। আমি নিজে একটা ছোট বাড়ী চাই।"

মুকুন্দলাল বলিল—"বহুৎখুব বাবু, যে রকম আপনার হিচ্ছা। তেমন বাড়ীভি আছে।" বলিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া গাড়োয়ানকে একটা নূতন ঠিকানা বলিয়া দিল।

সহর হইতে ষ্টেশন অর্দ্ধ মাইল পথ। নবগোপালের গাড়ী দুই ধারে মাঠ রাখিয়া সবেগে ছুটিতে লাগিল। মুকুন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, আপনার নাম?"

নবগোপাল নিজের নাম বলিল।

"নিবাস?"

নবগোপাল তাহাও বলিল।

"কত দিন থাকা হোবে?"

"বড় জোর এক সপ্তাহ।"

"ওঃ—বহুৎ সময়। আমি আপনাকে অমৃতসরে যা কিছু দেখবার শোনবার আছে সব দেখিয়ে দেব। অমৃতসর অতি মসহুর সহর। আপনি অমৃতসরের ইতিহাস জানেন কি?"

নবগোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল সে জানে না। গাড়ী তখন সহরে প্রবেশ করিতেছে। পথের জনতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। মুকুন্দলাল বলিল—"আচ্ছা, তবে ইতিহাস বলি শুনুন।" বলিয়া সে স্কুলবালকের পাঠ আবৃত্তি করার মত করিয়া আরম্ভ করিল :—

"এই সহর যখন ছিল না তখন সহরের মাঝখানে একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী ছিল তাহার নাম অমৃত সরস্। বাদশাহ আকব্বরসাহ পন্দ্রসৌ চুহত্তর সালে গুরু রামদাস জীউকো ঐ পুষ্করিণীর চারি পাশে বহুৎ ভূমি দান করেন।* গুরুজী পুষ্করিণীর মাঝে এক মন্দিল বানিয়ে সেখানে গ্রন্থসাহেবের পূজা করেন। অনেক সাধু মহাৎমা সেখানে দর্শন করতে আসেন, সেখানে বাস করেন। এই রকম করে পুষ্করিণী চারিরদিকে ভারি সহর বনে যায়। সত্রসৌ একষট্ সালে আমদ সা দুরানী এসে সব শিখদের তাড়িয়ে দেন, বারুদ ভরিয়া মন্দির উড়াইয়া দেয়, পূজার স্থানে গৌ কাটে।" (এইখানে মুকুন্দলাল "রাম রাম" বলিয়া জানালা পথে মুখ বাহির করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল) "শিখলোগ আবার মন্দিল বানায় আবার সহর বসায়। আঠারসৌ দুই সালে রঞ্জিৎ সিং মন্দিল সোনা দিয়া মুড়িয়া দেয়। সহরের উত্তরে রঞ্জিৎ সিং গোবিন্দগড় কিল্লাতি বানিয়ে দেয়, সহরের চারিদিকে দেওয়াল বানিয়ে দেয় এখন ইংরাজলোগ সে দেওয়াল তুড়িয়ে দিয়েছে।"

এই "ইতিহাসের" বলিবার প্রণালীতে নবগোপাল মনে আমোদ অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এ ইতিহাস তুমি কোথায় শিখলে?"

"পাণ্ডালোগের মুখে আমি যেমন শুনেছি তেমনি শিখিছি বাবু। যাত্রী এলে পাণ্ডালোগ সবাই এই রকম বলে।"—নবগোপাল পরে আবিষ্কার করিয়াছিল যে কল পাণ্ডাই যে ওরূপ বলে শুধু তাহাই নহে,—সকলেই গোবধের বিষয় বলিবার মাত্র রাম রাম নাম উচ্চারণ এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

গাড়ী ক্রমে জনতাপূর্ণ স্থান অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইতে লাগিল। রৌদ্র তখন অত্যন্ত প্রখর, শুভ্র রাজপথ ও গৃহাদির উপর হইতে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে।

* এ বিষয়ে মতভেদ আছে। Hunter তাঁহার Imperial Gazetteer of India পুস্তকে (Vol. I. pp. 256) বলেন যে আকবর ভূমিদান করিবার পরে গুরু রামদাস ঐ পুষ্করিণী খনন করান।—আমরা স্থানীয় প্রবাদের অনুসরণ করিলাম।—লেখক।

গাড়ী দাঁড়াইলে নবগোপাল দেখিল নিকটে একটি দুইতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। তাহার বহির্দ্দেশ চূণকাম করা,—স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মুকুন্দলাল নামিয়া দুয়ারের শিকল ঝম ঝম এবং "পাঁড়েজি পাঁড়েজি" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ভীমকায় ব্রাহ্মণ আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার সহিত একটু কথা কহিয়া মুকুন্দলাল নবগোপালের নিকট আসিয়া বলিল—"বাবু, বাড়ী খালি আছে। আইন দেখবেন।"

নবগোপাল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল একটি পরিষ্কার উঠান,—মধ্যস্থলে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ। নিম্নে তিনটি ঘর, স্নানের ঘর,—পাকশালা এবং কাষ্ঠাদি রাখিবার ঘর। উপরে উঠিয়া দেখিল দুইটি শয়ন কক্ষ,—টানাপাখার বন্দোবস্ত আছে,—একটি করিয়া খালি তক্তপোষ পড়িয়া রহিয়াছে,—এবং একটি বসিবার ঘর,—একটি টেবিল এবং কয়েকখানি চেয়ার আছে। দেখিয়া নবগোপালের অত্যন্ত পছন্দ হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"ভাড়া কত?"

মুকুন্দলাল মুখখানি গুটাইয়া কহিল "বহুৎ ভাড়া লেবে বাবু—কলকাত্তা থেকে আমির লোগ এলে এই বাড়ীতে নামে। রোজ দেড় টাকা করে,ভাড়া লেবে।"

নবগোপাল সম্মতি জানাইয়া—তাহার জিনিষ পত্র গাড়ী হইতে নামাইতে কহিল। সে সমস্ত আসিলে মুকুন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল কোন পাচক এবং ভৃত্য আনিয়া দিতে পারে কি না।

"কেন পারব না বাবু? আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্চি। একজন খুব ভাল রসুইদার আমার তল্লাসে আছে। কিন্তু আপনি বাংগালী মুলুক থেকে এসেছেন, একটা বাত বলে দিই। এখানকার বামুন মচ্ছি পাকাবে না। সালন পাকাতে বলেন সালন পাকাবে, পাখী পাকাতে বলেন পাখী পাকাবে,—যা পাকাতে বলেন তা পাকাবে—কিন্তু মচ্ছি ছোঁবে না। কি খাবার হিচ্ছা আমায় বলুন আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি।"

"আর চাকরের কি হবে?"

"চাকরভি এনে দিচ্চি।"

মুকুন্দলাল তখন নবগে

সংগ্রহ করিতে গেল। ন

রাখিতে লাগিল।

নবগোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল সে জানে না। গাড়ী তখন সহরে প্রবেশ করিতেছে। পথের জনতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। মুকুন্দলাল বলিল—"আচ্ছা, তবে ইতিহাস বলি শুনুন।" বলিয়া সে স্কুলবালকের পাঠ আবৃত্তি করার মত করিয়া আরম্ভ করিল:—

"এই সহর যখন ছিল না তখন সহরের মাঝখানে একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী ছিল তাহার নাম অমৃত সরস্। বাদশাহ আকব্বরশাহ পন্দ্রসৌ চুহত্তর সালে গুরু রামদাস জীউকো ঐ পুষ্করিণীর চারি পাশে বহুৎ ভূমি দান করেন।* গুরুজী পুষ্করিণীর মাঝে এক মন্দিল বানিয়ে সেখানে গ্রন্থসাহেবের পূজা করেন। অনেক সাধু মহাৎমা সেখানে দর্শন করতে আসেন, সেখানে বাস করেন। এই রকম করে পুষ্করিণী চারিরদিকে ভারি সহর বনে যায়। সত্রসৌ একষট্ সালে আমদ সা দুরানী এসে সব শিখদের তাড়িয়ে দেয়, বারুদ ভরিয়া মন্দির উড়াইয়া দেয়, পূজার স্থানে গো কাটে।" (এইখানে মুকুন্দলাল "রাম রাম" বলিয়া জানালা পথে মুখ বাহির করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল) "শিখলোগ আবার মন্দিল বানায় তাবার সহর বসায়। আঠারসৌ দুই সালে রঞ্জিৎ সিং মন্দিল সোনা দিয়া মুড়িয়া দেয়। সহরের উত্তরে রঞ্জিৎ সিং গোবিন্দগড় কিল্লাতি বানিয়ে দেয়, সহরের চারিদিকে দেওয়াল বানিয়ে দেয় এখন ইংরাজলোগ্ সে দেওয়াল তুড়িয়ে দিয়েছে।"

এই "ইতিহাসের" বলিবার প্রণালীতে নবগোপাল মনে আমোদ অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এ ইতিহাস তুমি কোথায় শিখলে?"

"পাণ্ডালোগের মুখে আমি যেমন শুনেছি তেমনি শিখিছি বাবু। যাত্রী এলে পাণ্ডালোগ সবাই এই রকম বলে।"—নবগোপাল পরে আবিষ্কার করিয়াছিল যে সকল পাণ্ডাই যে ওরূপ বলে শুধু তাহাই নহে,—সকলেই গোবধের বিষয় বলিবা মাত্র এরূপ রাম নাম উচ্চারণ এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

গাড়ী ক্রমে জনতাপূর্ণ স্থান অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইতে লাগিল। রৌদ্র তখন অত্যন্ত প্রখর, শুভ্র রাজপথ ও গৃহাদির উপর হইতে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে।

---

* এ বিষয়ে মতভেদ আছে। Hunter তাঁহার Imperial Gazetteer of India পুস্তকে (Vol. I. pp. 256) বলেন যে আকবর ভূমিদান করিবার পরে গুরু রাম দাস ঐ পুষ্করিণী খনন করান।—আমরা স্থানীয় প্রবাদের অনুসরণ করিলাম।—লেখক।

গাড়ী দাঁড়াইলে নবগোপাল দেখিল নিকটে একটি দুইতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। তাহার বহির্দ্দেশ চূণকাম করা,—স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মুকুন্দলাল নামিয়া দুয়ারের শিকল ঝম ঝম এবং "পাঁড়েজি পাঁড়েজি" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ভীমকায় ব্রাহ্মণ আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার সহিত একটু কথা কহিয়া মুকুন্দলাল নবগোপালের নিকট আসিয়া বলিল—"বাবু, বাড়ী খালি আছে। আসুন দেখবেন।"

নবগোপাল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল একটি পরিষ্কার উঠান,—মধ্যস্থলে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ। নিম্নে তিনটি ঘর, স্নানের ঘর,—পাকশালা এবং কাষ্ঠাদি রাখিবার ঘর। উপরে উঠিয়া দেখিল দুইটি শয়ন কক্ষ,—টানাপাখার বন্দোবস্ত আছে,—একটি করিয়া খালি তক্তপোষ পড়িয়া রহিয়াছে,—এবং একটি বসিবার ঘর,—একটি টেবিল এবং কয়েকখানি চেয়ার আছে। দেখিয়া নবগোপালের অত্যন্ত পছন্দ হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"ভাড়া কত?"

মুকুন্দলাল মুখখানি গুটাইয়া কহিল "বহুৎ ভাড়া লেবে বাবু—কলকাত্তা থেকে আমির লোগ এলে এই বাড়ীতে নামে। রোজ দেড় টাকা করে ভাড়া লেবে।"

নবগোপাল সম্মতি জানাইয়া—তাহার জিনিষ পত্র গাড়ী হইতে নামাইতে কহিল। সে সমস্ত আসিলে মুকুন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল কোন পাচক এবং ভৃত্য আনিয়া দিতে পারে কি না।

"কেন পারব না বাবু? আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্চি। একজন খুব ভাল রসুইদার আমার তল্লাসে আছে। কিন্তু আপনি বাংগালী মুলুক থেকে এসেছেন, একটা বাত বলে দিই। এখানকার বামুন মচ্ছি পাকাবে না। সালন পাকাতে বলেন সালন পাকাবে, পাখী পাকাতে বলেন পাখী পাকাবে,—যা পাকাতে বলেন তা পাকাবে—কিন্তু মচ্ছি ছোঁবে না। কি খাবার ইচ্ছা আমায় বলুন আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি।"

"আর চাকরের কি হবে?"

"চাকরভি এনে দিচ্চি।"

মুকুন্দলাল তখন নবগোপালের নিকট টাকা লইয়া বাজার করিতে এবং ভৃত্যাদি সংগ্রহ করিতে গেল। নবগোপাল ইতিমধ্যে জিনিষ পত্র খুলিয়া যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

প্রথমে এক প্রকাণ্ডকায় ভৃত্য আসিয়া দর্শন দিল। বলিল মুকুন্দলাল তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহার সাহায্যে নবগোপাল কূপের নিকট উপবেশন করিয়া স্নান করিয়া বাঁচিল।

ক্রমে জিনিষপত্র ও পাচককে লইয়া মুকুন্দলাল ফিরিল। অবিলম্বে পাকের উদ্যোগ হইতে লাগিল। নবগোপাল মুকুন্দকে বলিল—"ঠাকুরকে বল তোমারও জন্যে রসুই করতে এখানে।"

মুকুন্দলাল বলিল—"বাবু আমার আসনান করতে হোবে, পুজা করতে হোবে,—আমার কাচ্ছাবাচ্ছা রয়েছে—হুকুম হয় ত আমি ঘরে গিয়ে হাহার করি।"

নবগোপাল বলিল—"তোমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর?"

"দরবার সাহেবের খুব কাছেই।"

"বেশ। ও বেলা তবে এস।"

"হাঁ বাবু—ও বেলা এসে আপনাকে সহর দেখলাতে নিয়ে যাব।"

"ওবেলা সহর দেখবার আমার সময় হবে না। এখানে সবজিবাগে আমার চেনা লোক আছেন,—সেইখানে যাব।"

মুকুন্দলাল মাথা নাড়িয়া বলিল—"যো হুকুম বাবু। আপনি হাহার করে একটু নিদ্রা করুন। চাকর বিস্তারা লাগিয়ে দেবে—পাংখা টানবে। আমি উবেলা এসে আপনাকে সবজিবাগে লিয়ে যাব।"

মুকুন্দলাল তখন বিদায় গ্রহণ করিল।

আহারান্তে, দুই দিনের পথক্লান্ত নবগোপাল শয্যাগ্রহণ করিয়া বিগত কয়েক দিবসের ঘটনা চিন্তা করিতে লাগিল। পিতার সহিত বিচ্ছেদ,—মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ; সহসা বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাবে এ কোথায় আসিল,—কাহার লালসায়?—তাহার জন্য সে যাহা ত্যাগ করিল,—তাহাকে পাইলে সে ক্ষতির কি পূরণ হইবে?

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পাষাণের আবেদন।

তোমারি গঠিত এ দীন পাষাণ
অশেষ বেদনা সহ!
তবু সম্বর; কৌতুকে বাজ
হানিও না অহরহ!

বড় কোমল পরাণী হয় যে ভুবনে
নিমেষে পায় সে নাশ!
এতই ফাটল বহিয়া বক্ষে
বাঁচে না বরষ মাস!

যদি এখনো নিদেশ হইবে সাধিতে
বাঁধিতে হইবে সেতু,
আরো বিদীর্ণ কোরোনাক তবে,
ওহ দেব শুভকেতু!

জাপানের সনাতন আদর্শ।

[এই প্রবন্ধলেখক জাপানের সম্ভ্রান্ত ফুজিওয়ারা বংশজ শ্রীযুক্ত শিতোকু হোরী কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন। স্বদেশে ইনি শিঙ্গো নামক ধর্ম্মসভার নেতা। হিন্দুশাস্ত্র অনুশীলন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার এদেশে আগমন। এইরূপ উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে জাপানের আভ্যন্তরীণ কথা শুনিতে পাওয়া আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যজ্ঞান করিতেছি। ভারতীর জন্য তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ আমরা অনুবাদ করিয়া লইয়াছি। ভাঃ সং]

"পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপান কি প্রকারে এত উন্নতি লাভ করিল ?" এদেশে যে কোন মহিলা বা পুরুষের সহিত আমার দেখা হয় তিনিই আমাকে এই প্রশ্ন করেন। আমি ঈষৎ হাসিয়া নিরুত্তর থাকি ; কারণ জাপানের যে উন্নতি দেখিয়া আজ জগৎ চমৎকৃত হইতেছে তাহা পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষার ফল নহে। কিন্তু অধিককাল নিরুত্তর থাকা ভদ্রোচিত হয় না, অগত্যা আমার সামান্য বুদ্ধি অনুসারে দুই চারি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। এই ব্যাপারের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথমাবধি জাপানী প্রকৃতির ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক। এক্ষণে আমি দুই চারি কথায় তাহার আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করিব।

আরম্ভেই পুনরায় বলি যে, জাপানের বর্ত্তমান শ্রীবৃদ্ধি পঞ্চাশ বৎসর পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল কখনই নহে। আদিকাল হইতে ইহার বীজ বপন হয়—যে সময়ে আমাদের প্রথম সম্রাট স্বর্গলোক হইতে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তখন আমাদের রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (যাঁহার সমুজ্জ্বল মহিমায় ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত) আমাদের সম্রাটের প্রথম পূর্ব্বপুরুষকে য়াতা নামক দর্পণ, কুসানাগি নামক অসি এবং মাগাকাণি

নামক মণি, এই পবিত্র রত্নত্রয় প্রদান পূর্ব্বক সম্মুখপ্রসারিত জাপানের উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, "বৎস! এই উর্ব্বর শ্যামল প্রান্তর তোমারই বংশের শাসনে থাকিবে। ইহাতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তুমি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কর। দ্যুলোক ভূলোকের ন্যায় তোমার বংশ চিরস্থায়ী হইবে।"

দর্পণের অর্থ জ্ঞানের স্বচ্ছতা, অসির অর্থ বীর্য্যের তেজ, এবং মণির অর্থ দয়ার প্রভা। এই তিন রত্ন অদ্যাবধি ঈসে এবং আদ্‌সুতার মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে। জ্ঞান, বীর্য্য, ও দয়া এই গুণত্রয়, জাপানী ধর্ম্মে অবিচ্ছেদ্য। আমরা বলিয়া থাকি যে দয়া ব্যতীত বীর্য্য নিষ্ঠুরতায় পরিণত হয়, বীর্য্য ব্যতীত দয়া হৃদয়দৌর্ব্বল্যের হেতু এবং জ্ঞান ব্যতীত উভয়ই নিষ্ফল।

এই ধারণা এবং এই আদর্শ অনুসারে সাধনা করায় জাপান "সভ্য" জাতিসমূহ সমক্ষে অদ্য নির্ভয়ে দণ্ডায়মান। যে সকল মহাত্মাগণ এই সংস্কারে বলীয়ান হইয়া সুমহৎ কর্ম্ম সকল সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্য নামে আমাদের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

জাপানের এই প্রকৃতি কিরূপে কার্য্যপরিণত হইত তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

৬০ বৎসর পূর্ব্বে, যে সময়ে চীনে আফীম প্রবেশ করাইবার জন্য য়ুরোপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তখন হলাণ্ড ব্যতীত অন্য কোন য়ুরোপীয় জাতির সহিত জাপানের সংস্রব ছিল না। সে সময়ে শোগুণ নামক জাপানের শাসনকর্ত্তা জাপানী বন্দরে ওলন্দাজ ব্যতীত আর সকল য়ুরোপীয় জাহাজের প্রবেশ নিষেধ করেন। তাহাতে ওলন্দাজ বণিকগণ নিবেদন করেন যে চীনের মত প্রবল পরাক্রান্ত জাতি যখন য়ুরোপের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে এবং সেই সঙ্গে বন্দর খুলিয়া দিতে ও ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন জাপানীদের পক্ষে

বিনা যুদ্ধে তাহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করাই শ্রেয়ঃ। তদুত্তরে শোগুণ বলিলেন যে হিতাকাঙ্ক্ষী হলাণ্ডের উপদেশের জন্য বাধিত হইলেও তিনি তদনুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম, কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ টোকুগাবা বংশের প্রথম শোগুণ চীন, কোরীয়া এবং হলাণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বিদেশীর সহিত সম্বন্ধ রাখিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সে বাক্য লঙ্ঘন করা সম্ভব নহে।

এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বা অসদ্ভাবের পন্থা অবলম্বনের যে আমি পক্ষপাতী তাহা নহে—জাপানী মনোভাবের পরিচয় দিবার জন্যই এই বৃত্তান্তের উল্লেখ করিলাম। সুবৃহৎ ও প্রবল চীন জাতির পরাজয়, বন্দুক কামান প্রভৃতি য়ুরোপীয় অস্ত্র শস্ত্রের অভাব, এ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া যাহা অহিতকর, যাহা অসম্মানজনক বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহা সহ্য করা অপেক্ষা তাঁহারা অকাতরে তরবারি হস্তে প্রাণদানে প্রস্তুত হইলেন।

৭২০ বৎসর পূর্ব্বে শোগুণ নামক রাজমন্ত্রীগণ জাপানী রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া দিলেন। ইহাঁদের পঞ্চবংশ একাদিক্রমে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎকালে সম্রাট, নামে সর্ব্বোচ্চে থাকিলেও তাঁহার রাজকার্য্যের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। টোকুগাবা নামক শেষ শোগুণবংশের আধিপত্যকালে জনসাধারণের মনে ম্লেচ্ছ-বিতৃষ্ণা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন দেশের সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ এই ভাবের পোষকতা করিয়া সমগ্র য়ুরোপের সহিত জাপানের যুদ্ধ সংঘটন করা সুবুদ্ধি বিবেচনা করিলেন না। ফলতঃ তাঁহারা প্রজারঞ্জনে আর কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না এবং অন্তর্বিপ্লবের বীজ রোপিত হইল।

এ স্থলে এই টুকু বলিয়া রাখা আবশ্যক যে জাপানে যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা রাজায় প্রজায় যুদ্ধ নহে, তাহাতে যে

দুই দল রাজপুরুষ লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই সম্রাট ও স্বদেশের একান্ত ভক্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, হিতসাধনের প্রণালী সম্বন্ধেই মতভেদ ঘটিয়াছিল মাত্র।

শেষ শোগুন টোকুগাবা কৈকি লোকরঞ্জনে নিজের অক্ষমতা দেখিয়া এবং জাপানের সমূহ বিপদ অনুভব করিয়া স্বীয় অর্থ ও বল-সমূহ সম্রাটের চরণে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাসাদের অন্তরাল হইতে বাহির করিয়া কাজে সাম্রাজ্যের শীর্ষ স্থানে স্থাপন করিলেন। এই সুমহৎ স্বার্থত্যাগের দ্বারা তিনি সমগ্র রাজপুরুষগণকে এক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট করিয়া জাপানকে অতি ঘোর সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিলেন, কারণ সে সময় লুব্ধ য়ুরোপ শৃগালের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের নিকট হইতে মৃগ কাড়িয়া লইবার জন্য উন্মুখ ছিল।

৩৬ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট এইরূপে প্রকৃত আধিপত্য লাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি তখন ঘোষণা করিলেন যে, সমগ্র রাজকার্য্য প্রজা-বর্গের সম্মতিক্রমে এবং জাতিকুল নির্ব্বিচারে সাধারণের হিতার্থে পরিচালিত হইবে। দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞানার্জ্জন করা হইবে কিন্তু জাতায় ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রক্ষিত হইবে। ফলতঃ রাজভক্তি, পিতৃ মাতৃভক্তি, দাম্পত্যের সুশৃঙ্খলা এবং সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জনসাধারণের মনে অটলভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের প্রপিতামহ এই শ্লোকটি রচনা করিয়া-ছিলেন

শিকি-শিমানো য়ামাতো নিশিকিনি ওরিতে কোসো।
কারাকুরে নাই নো ইরোমো হায়েয়ারে॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, চীনের রেশম জাপানী কিংখাবে পরিণত হইলে উজ্জ্বলতর আকার ধারণ করে। আমি আর এক শ্লোকের দ্বারা এই ভাব সম্পূর্ণ করিতে চাহি—

শিকিশিমা নো হামাচো ওনোকোনো কোমেতেকোসো।
ৎসু ৎসু ও জু ৎসু মো ইসাও মাসু নারে॥

ইহার অর্থ এই যে, বিদেশী অস্ত্র জাপানী হস্তের দ্বারা প্রযুক্ত হইলে অধিকার ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

এ দেশে অনেকে মনে করেন যে, পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবেই আমরা উন্নতিলাভে সক্ষম হইয়াছি। সত্য বটে যে য়ুরোপীয়গণের নিকট আমরা যন্ত্রতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, কিন্তু সে শিক্ষা বাহ্যিক। অন্তরের শিক্ষা সাধনা, যাহা কিছু তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। য়ুরোপীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে আমাদের এই মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে আমরা বক্তৃতায় আত্মপ্রকাশ করিতে এবং অর্থ ভালবাসিতে শিখিয়াছি। কিন্তু হায়—কথা ত নহে কার্য্যই কঠিন, এবং অর্থলোভ ও ধর্ম্মলোপ একই কথা। এই তত্ত্বের যাথার্থ্য ভারতবাসীকে বুঝাইতে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক হইবে না। ইহা হইতে এই মাত্র সার সংগ্রহ করিবার আছে যে বিদেশীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলে কি গ্রহণ করিব কি ত্যাগ করিব সে বিষয়ে অপরিসীম সাবধানতা প্রয়োজন।

সনাতন আদর্শের সাধনা এবং স্বদেশের হিতার্থে স্বার্থত্যাগ ইহাতেই জাপানের মহত্ব লাভ হইয়াছে। বাহির হইতে আমরা যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা জাপানী অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া নব প্রভায় জগতের সমক্ষে ত প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্য আমার ধৃষ্টতা যদি মার্জ্জনীয় হয় তবে আমি ভারতবর্ষকে এই কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, শ্রী চাও ত, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না। যদি পাশ্চাত্যদের কোন সামগ্রী বা কোন প্রণালী আবশ্যক বোধ কর, তাহা স্বকার্য্যে খাটাইয়া লও, কিন্তু নিজেদের নিজত্ব হারাইও না, তাহাতে শুধু যে তোমাদের বিনাশ তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীর সমূহ ক্ষতি।

শ্রীশিতোকু হোরী।

যুগ বিদায়।

এক যায় আর আসে বিধাতার বিধি
কহে কেহ ;—তবু যুগযুগান্তের নিধি
অবাধে ছাড়িয়া দিতে নাহি সরে মন ;
—এ ভারতভূমি হতে চির পুরাতন !

বিদায়ের এই দুঃসহ বেদনা বুঝি
নূতনের তরে কাল নবভাষা খুঁজি
আনন্দাশ্রু হবে ; তবু যদি কাল শুন
নূতন জগত হ'তে এ ভারতে পুনঃ
এসেছে নবীন রাজা তব সিংহাসনে,
আমাদের হের যদি যোগাতে চরণে
নতশিরে অর্ঘ্যভার, জানিও তখন
তুমিই হৃদয়-রাজা ওগো পুরাতন !

নববর্ষের প্রতি।

(১)

অশোকের বীরবৌলী দোলে তব কাণে,
বালার্কের ফোঁটা তব ভালে !
কে গো তুমি দাঁড়াইয়া বিজন উদ্যানে ?
হাসিরাশি নয়ন বিশালে !
পীত ধড়া, পীত তনু, অধরে বাঁশরী,
কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণ, মন হরি ?

(২)

অপূর্ব্ব এ বৃন্দাবন সৃজিলে নিমেষে,
কে গো তুমি দেব বংশীধারী ?
মুরলীর গান-রসে, আনন্দ-আবেশে,
মুগ্ধ স্তব্ধ যত নর নারী !
আম্রমুকুলের মালা দোলে তব গলে !
সুরভী-বকুল-বাস নিশ্বাসে উথলে !

(৩)

বংশীর সুধার ধারা গলি গলি পড়ে,
কি হরষ, হে নব বরষ !
ধরিত্রীর মুখে আজি আনন্দ না ধরে,
পেয়ে তব মঙ্গল-পরশ !
শ্যামাঙ্গী প্রবীণা ধনী প্রাচীনা অবনি,
স্পর্শে তব, গৌরবর্ণা, তরুণা রমণী !

(৪)

অসাড় বাঙ্গালী প্রাণ, শ্লথ এ রুধির !
হে কুহকি, শুনি তব গান,
জাগিয়াছে সাধ প্রাণে, হয়ে কর্ম্মবীর,
সাধিবারে মায়ের কল্যাণ !
"বীরাষ্টমী"—নব পর্ব্বে, সুপুত্র সাজিয়া,
পূজিব রাতুল-পদ, পুলকে মাতিয়া !

(৫)

হে বরষ, শত হস্তে উদ্যমের লাঠি,
শত হস্তে উৎসাহের ঢাল,
সাজাইব পূজা-মঞ্চ অতি পরিপাটী,
অসীকরা দেবীর ছাবাল !
হে বরষ, তোমার ও বৈশাখী পরশে
নিদ্রিত বঙ্গের প্রাণ জেগেছে হরষে !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কবি কালিদাস ও রঘুবংশ।*

নমোনমঃ মহেশ্বর পর্ব্বত-নন্দিনী,
দোঁহে যাঁরা জগতের জনক জননী;
বাক্যসাথে অর্থ হেন দোঁহার মিলন,
বাক্যার্থ সিদ্ধির তরে, বন্দি ও চরণ।
কোথা সূর্য্যবংশ সেই, কোথা অল্পমতি এই,
মোহে বাহি ক্ষুদ্রতরী, দুস্তর সাগর,
তরিতে সাহস ধরে, কতই অন্তর।

* বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে,
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ।
ক্বসূর্য্য প্রভবোবংশঃ ক্বচাল্প বিষয়া-সতি
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহা দুডুপেনাঽস্মিসাগরম্।
মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ
অথবা কৃত বাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ
সোঽহমাজন্মশুদ্ধানাং অফলোদয় কর্ম্মণাং
আসমুদ্রক্ষিতীশানাং আশকরথবর্ত্তিণাং
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাং
যথা পরবিদণ্ডাশং যথাকাল প্রবোধিনাং
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাং
যশসে বিজীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং
শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্দ্ধক্যে মুণিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং
রঘুনামম্বয়ং বক্ষে তনু বাখিভবোঽপিসন্
তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ
তংসঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসধ্যক্তি হেতবঃ
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতেহ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকা পিবা

প্রাংশুলভ্য ফললাভে করি আস্ফালন,
হাত বাড়াইয়ে লোভে যেমতি বামন।
কবিযশ অভিলাষী আমি মন্দমতি,
লোক মাঝে উপহাস পাইব তেমতি।
কিম্বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবি রচি গেলা যেথা কাব্যদ্বার
অস্ত্রবিদ্ধ মণি মধ্যে সূত্র সম প্রবেশ আমার।
রঘুকুলপতি যাঁরা আজনম তাঁরা শুদ্ধমতি,
ফলোদয় নাহি হয় সে অবধি কর্ম্মে অবিরতি ;
সসাগরা পৃথ্বী পরে যাঁহাদের শাসন বিস্তার,
মর্ত্ত্য হতে স্বর্গপথে অবারিত রথের সঞ্চার ;
যথাবিধি হোমযাগ, যথাকাম অতিথি অর্চ্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত।
দান হেতু ধনার্জন, মিতভাষী সত্যের কারণ.
যশ আশে দিগ্বিজয়ী, পুত্র অর্থে কলত্র গ্রহণ ;
শৈশবে বিদ্যার চর্চ্চা, যৌবনে বিষয় অভিলাষ,
বার্দ্ধক্যে মুণির ব্রত, যোগবলে অন্তে দেহনাশ ;
এ হেন বংশের কীর্ত্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চঞ্চল ;
পণ্ডিতে শুনিবে কথা সদসদ্বিচারে নিপুণ
আগুনে পরিক্ষা হয় সোণার যে আছে গুণাগুণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাম-অনুগ্রহ-নারায়ণের বিদ্যারম্ভ।

"আর বিলম্ব করিলে চলে না, বাবুয়া সাত বৎসরে পড়িল। তোমার চাচাজীকে ডাকিয়া আন।"

"কেন?—কি হইয়াছে?"

"দেখিতেছ না—বাবুয়া টোলামহলার যত দুষ্ট ছেলের সঙ্গে মিশিয়া, খালি গুলি ডাণ্টা খেলিয়া, গুড্ডী উড়াইয়া বেড়াইতেছে। শীঘ্র পাঠশালায় না দিলে শাসন হইবে না। ছোট লোকের ছেলেদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, একেবারে বিগড়াইয়া যাইবে।"

"আমি কাকাবাবুজীকে ডাকিতে পারিব না। তিনি যে রাগী—খালি খালি বিনা দোষে বকেন।"

এক দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি রাম-অনুগ্রহ-নারায়ণ বাড়ী ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, তাহার মাতা ও ভগিনী—সরস্বতী ও কলাবতীতে, পূর্ব্বোক্তরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

কলাবতী আজিও পিত্রালয়ে আছে। কারণ, তাঁহার এখনও 'গাওনা' হয় নাই। গতপূর্ব্ব বৎসর "কলাবতীর বিবাহ" নামক প্রবন্ধে, বেহারের বিবাহ পদ্ধতি বর্ণনা করিতে গিয়া, আমি এখানকার বাল্য বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। কিন্তু এদেশের কন্যার 'গাওনা' নামক প্রথার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও বালিকাগণের সাধারণতঃ অতি শৈশবাবস্থায় বিবাহ দেওয়া হয়, কিন্তু তাহারা বয়স্থা না হইলে, তাহাদের 'গাওনা' হয় না—অর্থাৎ তাহারা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী ঘরবসত করিতে যাইতে পায় না। তাই কলাবতীর আজিও 'গাওনা' হয় নাই। সুতরাং কলাবতী কিশোরী, উজ্জ্বল নয়নে সুরমা লাগাইয়া, কপালে সোণার টিকুলী সাঁটিয়া, সুন্দর

দেহলতায় সাটীনের আঙ্গিয়া আঁটিয়া, সুচারু চিকুরে ফণি-বিনিন্দিত বেণী দোলাইয়া, জরীর কিনারাদার রঙ্গীন ওড়না উড়াইয়া, নাচিয়া খেলিয়া, আদরে আহ্লাদে, পিত্রালয়ে কালযাপন করিতেছে। আপাততঃ কন্যার শীঘ্র শ্বশুরঘর যাওয়ার সম্ভাবনা বুঝিয়া, সরস্বতীর কন্যা-স্নেহের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। আহা! বাছা কোন্ দিন্ শ্বশুরঘর করিতে যাইবে—যত দিন এখানে থাকে, খাইয়া পরিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াক্! তাই স্বভাব-সুশীলা কলাবতী, অন্য কাহারও কথা হইলে, আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত কি না সন্দেহ। মাতার অনুমতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া কহিল, "চাচা যেরূপ গোসা করেন—আমি তাঁহাকে ডাকিতে পারিব না।"

যাহা হউক, দেবর শিউনন্দনের দর্শন প্রাপ্তি, সরস্বতীর পক্ষে কিছু অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। শিউনন্দন হাবেলীর মধ্যে আহার করিতে আসিলে, রাম-অনুগ্রহের বিদ্যারম্ভের আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, সরস্বতী একথা তাঁহার দেবরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং ভাতীজা রাম-অনুগ্রহকে শীঘ্র মদরসায় ভর্ত্তি করিয়া দিতে, চাচা শ্রীশিউনন্দন স্বীকৃত হইয়া গেল। সরস্বতীর স্বামী, শিউনন্দনের জ্যেষ্ঠ-সহোদর, প্রকৃত পক্ষে বাটীর কর্ত্তা হইলেও, তিনি মাখনের ব্যবসা ও চাষবাস লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, বাড়ীর আভ্যন্তরিক গৃহস্থালী বন্দোবস্তের ভার, কনিষ্ঠ শিউনন্দনের উপরই ন্যস্ত ছিল।

তখন বাড়ীর সর্ব্ব-প্রধানা গৃহিণী, সরস্বতীর শাশুড়ী, 'পাঁড়েজী' আখ্যাধারী পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, পৌত্রের 'খল্লী ধরাই' (বা হাতে খড়ীর) জন্য ভাল দিন দেখাইয়া লইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে 'গুরুজী' (গুরু মহাশয়) ছাত্রের বাড়ীতে আসিয়া দর্শন দিলেন—তিনি 'গণেশ-পূজা' করিয়া, রাম-অনুগ্রহের হাতে-খড়ী দিবেন।

বেহারী বালকগণের হাতে-খড়ী ও তৎসাময়িক গণেশ-পূজা

অবস্থা ভেদে, স্বগৃহে বা পাঠশালায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের কার্য্য পৈতৃক ছাদের নিম্নেই হইয়া থাকে; কিন্তু গরীব দুঃখী ও সামান্য গৃহস্থ-ঘরের ছেলেরা, গণেশ পূজার উপকরণাদি লইয়া, পাঠশালায় উপস্থিত হয়। রাম-অনুগ্রহের পিতা ও পিতামহের হাতে-খড়ী, পাঠশালা গৃহেই হইয়াছিল; কিন্তু ইদানীং খগোলে দানাপুরের চেঞ্জীং ষ্টেসন হওয়াতে, উহা শ্বেতাঙ্গ-বহুল স্থান হইয়াছে; সুতরাং রাম-অনুগ্রহের প্রতি, মাখনের ব্যবসাজনিত কমলার অনুগ্রহদৃষ্টি পড়িয়াছে—তাই গুরুজী স্বয়ং সশরীরে আসিয়া, তাহাদের গৃহে দর্শন দিলেন।

রাম-অনুগ্রহ স্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত হইয়া, বহির্বাটীতে গুরুজীর নিকট উপস্থিত হইল। একজন দাই (পরিচারিকা), চাউল ও মিঠাই লইয়া আসিলে, তদ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া, গুরুজী পুষ্প-চন্দন দ্বারা গণেশ-পূজা করিলেন। ঘোর রোলে বাজনা বাদ্য বাজিতে লাগিল। পূজা শেষ হইলে, ছাত্রের হাত ধরিয়া, গুরুজী একখণ্ড খড়ির সাহায্যে, 'পঞ্চ দেবতার' নাম লিখাইলেন। যথা—

(১) গণেশজী সহায় নমঃ,
(২) রামজী সহায় নমঃ,
(৩) দুর্গাজী সহায় নমঃ,
(৪) সরস্বতীজী সহায় নমঃ,
(৫) কালীজী সহায় নমঃ।

তৎপরে "ও না মা সি ধং—ওঁ নমঃ সিদ্ধং" লিখান হইলে, 'খল্লী-ধরাই' বা হাতে-খড়ী ক্রিয়া শেষ হইয়া গেল।

তখন এক যোড়া নূতন ধূতি-চাদর ও একটী টাকা দিয়া, উত্তমরূপ পূরী-কচুরী খাওয়াইয়া, গুরুজীকে বিদায় করা হইল। ইত্যবসরে অনেক আহুত, অনাহুত, রবাহুত ব্যক্তিকে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় করিয়া ভোজন

করান হইল। বাদ্যকরেরা চুড়া-দহি খাইয়া, কিছু পারিশ্রমিক ও পুরাতন বস্ত্রাদি 'ইনাম্‌' লইয়া বিদায় হইয়া গেল। তৎপর দিন হইতে রাম-অনুগ্রহকে নিয়মিত পাঠশালায় যাইতে হইবে। প্রথম প্রথম, তাহার খুল্লতাত শিউনন্দন, বা বৃদ্ধ পিতামহ, অথবা একজন ভৃত্য, সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবে; কিন্তু কিছুদিন পরে, তাহাকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যাইতে আসিতে হইবে।

দানাপুর-খগোলের 'বাভন-টোলী' নামক পল্লীতে গ্রাম্য মদরসা বা পাঠশালা অবস্থিত। পাঠশালার নিজস্ব গৃহাদি নাই—জমীদার পালকধারী সিংহের আটচালায় পাঠশালা বসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় তৎসংলগ্ন অনাবৃত প্রাঙ্গনে ছেলেরা বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। সে বিদ্যালয়ে বেঞ্চী নাই, চেয়ার নাই, টেবিল নাই, গ্যালারী নাই—বিদ্যার্থীরা এক এক খণ্ড তালপত্র-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র চেটাকার উপর বসিয়া ভারতী দেবীর আরাধনা করিত। প্রত্যহ দুইবার করিয়া পাঠশালা হয়, প্রাতঃকাল হইতে স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত, পুনরায় দুই প্রহরের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। আধুনিক ইংরাজী কালেজ ও স্কুলে, বেলা ৮।৯ ঘটিকার সময় অক্ষুধায় আহার করিয়া গিয়া, যথেষ্ট আলোকশূন্য, বায়ুর অবাধচলাচল-বিরহিত, বালকবহুল, উষ্ণ কক্ষে, বহু বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, চক্ষুঃপীড়া, ডেস্পেপ্‌সিয়া, প্রভৃতির 'বলি' হওয়া অপেক্ষা, এইরূপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, দুই প্রহরে স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া, প্রাতে ও বৈকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এমন কি দেশীয় জমীদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারীদিগের ন্যায়, ইংরাজী আপিসের কেরাণীকুলের প্রতি এরূপ ব্যবস্থা নিয়োজিত হইলে, বোধ হয় বেচারীরা বহুবিধ পীড়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়।

এই পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ৫০।৬০ জনের উর্দ্ধ নহে—দৈনিক

উপস্থিতি সংখ্যা ৫০ হইতে ৫৫র মধ্যে। ব্রাহ্মণ, ছত্রী, রাজপুত, "বাভন," আগড়-ওয়ালা, বেণিয়া, হালুয়াই, গোয়ালা, কাহার, কুর্ম্মী, ধানুক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বালকই তথায় অধ্যয়ন করিয়া থাকে। দোসাদ, পার্সী, মুসহর প্রভৃতি খুব নিকৃষ্ট জাতীয় ছাত্র তথায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান, ব্যবসা বাণিজ্য ও তেজারতী মহাজনী করিতে আগত সর্ব্বব্যাপী মাড়বারী আগড়ওয়ালা বেণিয়া-দিগের কয়েকটি বালক তথায় দৃষ্ট হয়। যদিও মাড়বারীরা পুত্রগণকে কখন ইংরাজী পড়িতে দেন না, কিন্তু নিজের ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার জন্য বাল্যকালে দিন কতক কুঠীয়ালী ও মহাজনীর অক্ষর পরিচয় শিখাইয়া থাকে।

উল্লিখিত "বাভন" বা "ভূমিহার" জাতি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখানে ইহাদের সম্বন্ধে যৎসামান্য বর্ণনা করা আবশ্যক। ইহাদের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মণের এইমাত্র প্রভেদ, যে ব্রাহ্মণেরা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্-লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু ভূমিহার বাভনেরা 'দান ও প্রতিগ্রহ' ক্রিয়া বিবর্জ্জিত। অন্য পঞ্চধা ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ইহাঁদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছে। ১৩০৮ সালের বৈশাখ সংখ্যার "ভারতী"তে, "ছট্-পরব ও চকচন্দা" শীর্ষক প্রস্তাবে, আমি অবগত করি, যে 'ছট্-পরব,' শুদ্ধ বেহার প্রদেশ ভিন্ন, ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে, পরিলক্ষিত হয় না; তদ্রূপ এই বাভন বা ভূমিহার জাতিও ভারতের আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা অধিকাংশ কৃষিজীবী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার। রাজপুতানার ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ইহাদের পদবী সিং বা সিংহ। পশ্চিম বঙ্গের উগ্র ক্ষত্রিয় জাতির সহিত কেবল স্বভাব ও অবলম্বন-গত সুদূর সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে এই জাতি প্রভূত বিক্রমশালী ও রণদুর্ম্মদ ছিল। বীর-শ্রেষ্ঠ আলেকজান্দার সমগ্র এসিয়াভূমে স্বীয় বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়া যে গাঙ্গারিদিগের

করান হইল। বাদ্যকরেরা চুড়া-দহি খাইয়া, কিছু পারিশ্রমিক ও পুরাতন বস্ত্রাদি 'ইনাম্' লইয়া বিদায় হইয়া গেল। তৎপর দিন হইতে রাম-অনুগ্রহকে নিয়মিত পাঠশালায় যাইতে হইবে। প্রথম প্রথম, তাহার খুল্লতাত শিউনন্দন, বা বৃদ্ধ পিতামহ, অথবা একজন ভৃত্য, সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবে; কিন্তু কিছুদিন পরে, তাহাকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যাইতে আসিতে হইবে।

দানাপুর-খগোলের 'বাভন-টোলী' নামক পল্লীতে গ্রাম্য মদরসা বা পাঠশালা অবস্থিত। পাঠশালার নিজস্ব গৃহাদি নাই—জমীদার পালক্‌ধারী সিংহের আটচালায় পাঠশালা বসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় তৎসংলগ্ন অনাবৃত প্রাঙ্গনে ছেলেরা বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। সে বিদ্যালয়ে বেঞ্চী নাই, চেয়ার নাই, টেবিল নাই, গ্যালারী নাই—বিদ্যার্থীরা এক এক খণ্ড তালপত্র-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র চেটাকার উপর বসিয়া, ভারতী দেবীর আরাধনা করিত। প্রত্যহ দুইবার করিয়া পাঠশালা হয়, প্রাতঃকাল হইতে স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত, পুনরায় দুই প্রহরের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। আধুনিক ইংরাজী কালেজ ও স্কুলে, বেলা ৮।৯ ঘটিকার সময় অক্ষুধায় আহার করিয়া গিয়া, যথেষ্ট আলোকশূন্য, বায়ুর অবাধচলাচল-বিরহিত, বালকবহুল, উষ্ণ কক্ষে, বহু বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, চক্ষুঃপীড়া, চেষ্টডিজীজ, প্রভৃতির 'বলি' হওয়া অপেক্ষা, এইরূপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, দুই প্রহরে স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া, প্রাতে ও বৈকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এমন কি দেশীয় জমীদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারীদিগের ন্যায়, ইংরাজী আপিসের কেরাণীকুলের প্রতি এরূপ ব্যবস্থা নিয়োজিত হইলে, বোধ হয় বেচারীরা বহুবিধ পীড়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়।

এই পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ৫০।৬০ জনের উর্দ্ধ নহে—দৈনিক

উপস্থিতি সংখ্যা ৫০ হইতে ৫৫র মধ্যে। ব্রাহ্মণ, ছত্রী, রাজপুত, "বাভন," আগড়-ওয়ালা, বেণিয়া, হালুয়াই, গোয়ালা, কাহার, কুর্ম্মী, ধানুক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বালকই তথায় অধ্যয়ন করিয়া থাকে। দোসাদ, পাসী, মুসহর প্রভৃতি খুব নিকৃষ্ট জাতীয় ছাত্র তথায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান, ব্যবসা বাণিজ্য ও তেজারতী মহাজনী করিতে আগত সর্ব্বব্যাপী মাড়বারী আগড়ওয়ালা বেণিয়া-দিগের কয়েকটি বালক তথায় দৃষ্ট হয়। যদিও মাড়বারীরা পুত্রগণকে কখন ইংরাজী পড়িতে দেয় না, কিন্তু নিজের ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার জন্য বাল্যকালে দিন কতক কুঠীয়ালী ও মহাজনীর অক্ষর পরিচয় শিখাইয়া থাকে।

উল্লিখিত "বাভন" বা "ভূমিহার" জাতি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখানে ইহাদের সম্বন্ধে যৎসামান্য বর্ণনা করা আবশ্যক। ইহাদের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মণের এইমাত্র প্রভেদ, যে ব্রাহ্মণেরা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্-লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু ভূমিহার বাভনেরা 'দান ও প্রতিগ্রহ' ক্রিয়া বিবর্জ্জিত। অন্য পঞ্চধা ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ইহাঁদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছে। ১৩০৮ সালের বৈশাখ সংখ্যার "ভারতী"তে, "ছট্-পরব ও চকচন্দা" শীর্ষক প্রস্তাবে, আমি অবগত করি, যে 'ছট্-পরব,' শুদ্ধ বেহার প্রদেশ ভিন্ন, ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে, পরিলক্ষিত হয় না; তদ্রূপ এই বাভন বা ভূমিহার জাতিও ভারতের আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা অধিকাংশ কৃষিজীবী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার। রাজপুতানার ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ইহাদের পদবী সিং বা সিংহ। পশ্চিম বঙ্গের উগ্র ক্ষত্রিয় জাতির সহিত কেবল স্বভাব ও অবলম্বন-গত সুদূর সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে এই জাতি প্রভূত বিক্রমশালী ও রণদুর্ম্মদ ছিল। বীর-শ্রেষ্ঠ আলেকজান্দার সমগ্র এসিয়াভূমে স্বীয় বিজয়কেতন উড়াইয়া, যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী

ব্রাহ্মণগণের পরাক্রমে পরাভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহারা সেই ভুবনবিজয়ী, পরাভবকারী, বীরাগ্রগণ্যদিগের বংশধর। আজিও উহাদের সেই প্রাচীন বীরত্বের কণা-বহ্নি জমীদারী সংক্রান্ত দলাদলি ও লাঠিবাজীতে, কখন কখন য়ৎসামান্য ধুঁয়াইয়া উঠে, কিন্তু ইংরাজ রাজের একচ্ছত্রী শাসনতলে তখনই প্রশমিত হইয়া যায়। বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তথায় ইহাদের মধ্যে সম্পত্তিশালী ক্ষমতাপন্ন জমীদার আজিও অনেক আছেন। কয়েক বৎসর হইল, ইঁহারা চাঁদা করিয়া, মজফ্‌ফরপুরে, "ভূমিহার-কলেজ" নামক একটী বিদ্যামন্দির সংস্থাপিত করিয়া, স্ব স্ব সন্তানগণের ও স্বদেশীয় ভিন্ন জাতীয় বালকবৃন্দের, উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

যদিও খগোলের পাঠশালায় শ্রেণীবিভাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে বালকগণকে বসাইবার রীতি নাই, তথাপি 'ইলিমের' (বিদ্যার) তারতম্যানুসারে তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। (১ম) যাহারা খড়ীর দ্বারা মাটীতে লিখিয়া 'হরফ-পহচান' (বর্ণ-পরিচয়) করে। (২য়) যাহারা সট্টী বা তক্তির উপর খড়ির কালী দিয়া 'ঘরহী' নামক এক প্রকার শক্ত শরকাণ্ডের সাহায্যে লিখিয়া থাকে। (৩য়) যাহারা তালপত্রে লিখে। (৪র্থ) যাহারা দেশী কাগজে, কাল কালী দিয়া লিখিতে সক্ষম। (৫ম) যাহারা 'কাতারণী' নামক কাষ্ঠাসনের উপর তুলসীদাসের রামায়ণ, লেওল কিশোরের প্রেমসাগর, ইত্যাকার ভারী ভারী পুস্তক পাঠ (আবৃত্তি) করিতে পারে।

বঙ্গদেশের পাঠশালায় শ্লেটের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, যেরূপ কলাপাতে লিখিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এদেশে তাহা দৃষ্ট হয় না; কলাগাছের অস্তিত্বের অভাবই তাহার কারণ সন্দেহ নাই। সুতরাং কলাপাতের স্থান পট্টিনামক কাষ্ঠফলকে অধিকার করিয়াছে।

আবার পট্টিও কাতারণী মুসলমানদের আমদানী। পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, বিশাল শ্মশ্রুসমন্বিত মুসলমান মৌলবীরা কাতারণীর উপর কোরাণ শরিফ রাখিয়া গা-দোলাইয়া সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এদেশে পট্টির আগমনের পূর্ব্বে তালবৃন্তের চারি দিকে ফ্রেম্ লাগাইয়া এক প্রকার শ্লেটের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত। উহার নামটি আধুনিক লোকদিগের স্মরণপথের অতীত হইয়া গিয়াছে। শ্লেট ব্যবহার ও স্কুল পরিদর্শন ব্যাপার, বেহারী পাঠশালীয় ইতিহাসে, চিরকাল অজানিত ছিল; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পট্টি নামক কাষ্ঠ ফলকের স্থান কতক কতক শ্লেটে অধিকার করিতেছে—অবস্থাপন্ন লোকদিগের ছেলেরা কেহ কেহ শ্লেট কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং একজন ইন্সপেক্‌টিং সার্কেল পণ্ডিত, মধ্যে মধ্যে আসিয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়া গিয়া থাকেন।

এই পাঠশালার অধিষ্ঠাতা দেবতা—গুরুজী বা গুরু মহাশয়—মুন্সী গঙ্গাধর পর্‌শাদ্ সহাই। পাঠক মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে, রাম-অনুগ্রহদের বাড়ীতে, গণেশ পূজা ও খল্লীধরাই ক্রিয়াতে ইহাঁর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কিন্তু এই আদর্শ-বেহারী গুরুজীর কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বর্ণনা শুনিতে বোধ হয় আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। 'গঙ্গাধর' নাম শুনিয়া কোন কূটবুদ্ধি বৈয়াকরণিক পাঠক, 'থানাধরাদি' শব্দের ন্যায় ইহার এরূপ বাক্যার্থ করিতে পারেন, যে 'গজা' নামক মিষ্টান্ন যিনি 'ধারণ' করিয়া থাকেন। যদি তিনি ইহার এরূপ কূটার্থ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সংস্কৃত বা পালী-ব্যাকরণে যত দূরই অধিকার থাকুক, বেহারী ব্যাকরণের এক বর্ণও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। অর্থাৎ সরল কথায়, বেহার প্রদেশে, 'গদাধর প্রসাদ'কে 'গজ্জধের পরশাদ,' 'কানাইলালকে' 'কাঁধাইয়ালাল,' 'মাধব সিংহ'কে 'মাঁধো সিং' এবং, 'হনুমানচন্দ্রকে' 'হনুমান চন্দ্' ইত্যাকার লিখিবার ও উচ্চারণ করিবার রীতি আবহমান

পরিচ্ছন্ন করিয়া লয়। কিন্তু সেরূপ ঘটনা কালেভদ্রে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং পরিষ্কৃত বা মূল্যবান মস্তকাবরণ সাধারণ ভদ্রাভদ্র চিনিবার একটী প্রধান নিদর্শন। আর কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনবান্, কি ভিক্ষুক, সকলেরই স্কন্ধদেশে এক এক খণ্ড উত্তরীয় বিরাজ করিবে—তাহা মসীমলিন, শতগ্রন্থিযুক্ত, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট চেলখণ্ড হইলেও ক্ষতি নাই! আমরা এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বিহারী নব্য যুবকদিগের কথা বলিতেছি না। তাঁহারা অবশ্য বিহারপ্রবাসী সাহেব ও বাঙ্গালী-দিগের অনুকরণে, কোট-বুট-প্যাণ্ট-ধারী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা যাহা বর্ণনা করিতেছি তাহা দেহাদের (পল্লীগ্রামের) বেহারী কৃষি-জীবন অবলম্বন করিয়া।

গঙ্গাধর গুরুজীর বিদ্যার গভীরত আজি পর্য্যন্ত কেহ পরিমান করে নাই। তবে 'খোড়হা' (নামতা), 'পাহাড়া' (ধারাপাতের কড়ানে ষট্‌কে), ''ফুটহারা' (Mental Arithmetic—মানসাঙ্ক) ইত্যাদি পাঠশালার অধ্যাপনা-উপযোগী, 'দেশী-হিসাব' (Native Arithmetic) বিষয়ক বিদ্যা তাহার তুণ্ডাগ্রে সতত বসতি করিত। আর তুলসা দাসের সাতকাণ্ড রামায়ণ, শ্রীমৎভাগবতের হিন্দি অনুবাদ—প্রেম-সাগর, দান-লীলা, নাগ-লীলা, তুলসী-সাতশই প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দী পুস্তকের অধ্যাপনা কার্য্য (অর্থাৎ কেবলমাত্র আবৃত্তি করাণ) তাঁহার উর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ হইতে, খগোলের এই নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়ে, পুরুষানুক্রমে করাইয়া আসিতেছেন। তদ্ভিন্ন দেব-নাগরী, হিন্দী, উর্দ্দু, কায়থী ও কুঠীয়ালী ভাষার অক্ষর তাঁহার নখাগ্রে সতত বসতি করিত। মুসলমান বালকগণকে উর্দ্দু ও মাড়বারী ছাত্রগণকে কুঠীয়ালী ভাষার অক্ষর পরিচয় করান, তাঁহার পাঠশালার একটী কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল।

কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। হনুমান, নাম রাখার পদ্ধতি, বঙ্গ দেশে প্রচলিত থাকা দূরে থাকুক, যদি কোন ব্যক্তিকে তামাসা করিয়া ইঙ্গিতে উক্ত নাম সম্বন্ধীয় কোনও বিশেষণে বিশেষিত করা যায়, তিনি বক্তার অন্যায় সাহস ও ধৃষ্টতার জন্য, তাহার সহিত হাতা-হাতি পর্য্যন্ত করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশের হরিদাস, কালিপদাদি সাধারণ নামের ন্যায়, হনুমান প্রসাদ (অবশ্য হলুমান পরশাদ্) নাম এদেশে সচরাচর শ্রুত হওয়া যায়। হনুমান, ভগবান রামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত মহাবীর রুদ্রাবতার বলিয়া উক্তনাম, রামভক্ত অতীত বীরত্বাভিমানী পশ্চিমদেশবাসীরা, সগৌরবে ধারণ করিয়া থাকে।

গঙ্গাধর গুরুজী একহারা ছিপ্‌ছিপে মানুষ—অথচ বেশ বলিষ্ঠ। বয়ঃক্রম ৩০।৩৫ বৎসরের অধিক হইবে না। মাথায় থরকাটা চুল কাঁধের উপর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত—তাহার অগ্রভাগটা কেয়ারি করিয়া ছাঁটা। ললাটের ঊর্দ্ধভাগ হইতে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত কেশভাগ জ্যামি-তিক সমদ্বিভুজাকারে মণ্ডিত। গুম্ফদ্বয় দুর্গাপূজার অসুরের ন্যায় দুই কপোলের উপর ঊর্দ্ধদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উন্নত। পরিধানে মলিন বস্ত্র, স্কন্ধে তদধিক মলিন মসীচিত্রিত পুরাতন জীর্ণ উত্তরীয়। শিরোদেশে দ্বিরদরদশুভ্র, যাত্রাদলের ভিস্তীওয়ালার ন্যায় টুপী—তন্মধ্যে লুক্কায়িত সুদীর্ঘ স্থূলকায় অর্কফলা। বঙ্গীয় পাঠক এ বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারেন, যে পরিধেয় ধূতি ও উত্তরীয় বসন, পূর্ব্বোক্তরূপ মলিন হইয়া, মস্তকের টুপি কিরূপে পরিষ্কৃত হইল? এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বিহারবাসীরা পরিধেয় বসনের পরিষ্কৃতির দিকে তত লক্ষ্য না রাখিয়া, মস্তকাবরণ টুপি, তাজ, পাগড়ী প্রভৃতির পারিপাট্যের দিকে বিলক্ষণ নজর রাখিয়া থাকে! স্থানান্তরে কুটুম-কুটুম্বিতায় যাইতে হইলে, গাত্রাচ্ছাদন চাপ্‌কান্‌টাও পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন করিয়া লয়। কিন্তু সেরূপ ঘটনা কালেভদ্রে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং পরিষ্কৃত বা মূল্যবান মস্তকাবরণ সাধারণ ভদ্রাভদ্র চিনিবার একটী প্রধান নিদর্শন। আর কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনবান্, কি ভিক্ষুক, সকলেরই স্কন্ধদেশে এক এক খণ্ড উত্তরীয় বিরাজ করিবে—তাহা মসীমলিন, শতগ্রন্থিযুক্ত, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট চেলখণ্ড হইলেও ক্ষতি নাই! আমরা এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বিহারী নব্য যুবকদিগের কথা বলিতেছি না। তাঁহারা অবশ্য বিহারপ্রবাসী সাহেব ও বাঙ্গালী-দিগের অনুকরণে, কোট-বুট-প্যান্ট-ধারী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা যাহা বর্ণনা করিতেছি তাহা দেহাদের (পল্লীগ্রামের) বেহারী কৃষি-জীবন অবলম্বন করিয়া।

গজাধর গুরুজীর বিদ্যার গভীরত আজি পর্য্যন্ত কেহ পরিমান করে নাই। তবে 'খোড়হা' (নামতা), 'পাহাড়া' (ধারাপাতের কড়ানে ষট্‌কে), 'ফুটহারা' (Mental Arithmetic—মানসাঙ্ক) ইত্যাদি পাঠশালার অধ্যাপনা-উপযোগী, 'দেশী-হিসাব' (Native Arithmetic) বিষয়ক বিদ্যা তাহার তুণ্ডাগ্রে সতত বসতি করিত। আর তুলসা দাসের সাতকাণ্ড রামায়ণ, শ্রীমৎভাগবতের হিন্দি অনুবাদ—প্রেম সাগর, দান-লীলা, নাগ-লীলা, তুলসী-সাতশই প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দী পুস্তকের অধ্যাপনা কার্য্য (অর্থাৎ কেবলমাত্র আবৃত্তি করাণ) তাঁহার উর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ হইতে, খগোলের এই নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়ে, পুরুষানুক্রমে করাইয়া আসিতেছেন। তদ্ভিন্ন দেব-নাগরী, হিন্দী, উর্দ্দু, কায়থী ও কুঠীয়ালী ভাষার অক্ষর তাঁহার নখাগ্রে সতত বসতি করিত। মুসলমান বালকগণকে উর্দ্দু ও মাড়বারী ছাত্রগণকে কুঠীয়ালী ভাষার অক্ষর পরিচয় করান, তাঁহার পাঠশালার একটী কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল।

বস্তুতঃ দেহাতের হিন্দি পাঠশালায় পুস্তকাদি অধ্যয়ন করান

তত প্রয়োজনীয় নহে। বঙ্গদেশের পাঠশালায়ও এই পদ্ধতি ছিল। ধারাপাত, নামতা, ডাক জিজ্ঞাসা (মানসাঙ্ক) প্রভৃতি দেশীয় অঙ্কই অধিক শিখান হয়। আর খরিদ-বিক্রী, দেশী-হিসাব প্রভৃতি শিখিলে, ও চিট্‌ঠি, তমস্সুক্‌, পাট্টা, কবুলীয়ৎ প্রভৃতি জমীদারী ও কুঠীয়ালী বিষয়ক মোটামুটী ২।৪টা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইলে, এবং সর্ব্বোপরি রামায়ণাদি ২।৪ খানা হিন্দী কিতাব, কাতারজীর উপর রাখিয়া দোলাইয়া আবৃত্তি করিতে পারিলে, সে বালকের বিদ্যার গৌরব চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং ছাত্রের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা বলেন, "গুরুজী খুব পড়াইন্‌!" বাঙ্গালা দেশেও প্রাচীন পাঠশালায় অধিকাংশ হস্তলিপি, শুভঙ্করী, জমীদারী, মহাজনী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিষয় শিখাইয়া, কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়াইয়া গুরুমহাশয়েরা বিদ্যার শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দিতেন।

আমাদের দেশের পাঠশালের সেকেলে গুরুমহাশয়ের ন্যায়, গজাধর গুরুজী ছাত্রদিগকে কঠোর শাসন করিতে সিদ্ধহস্ত। অধিকন্তু নানাবিধ অশ্রাব্য কটূক্তি বর্ষণ করিতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গালা দেশের ছাত্রেরা কোন পুরুষেও, বিহারের ছাত্রদের ন্যায়, গুরুমহাশয়ের নিকট সেরূপ গালাগালি ও মার খায় নাই। খগোলের পাঠশালের ক্ষুদ্রপ্রাণ ছাত্রেরা গুরুজীকে ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও কঠোর শাসনের অবতার বলিয়া বিবেচনা করিত। কোন দুঃসাহসিক ছাত্রের সাধ্য নাই যে, সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি-গুম্ফদ্বয়-শোভিত, শ্যেনপক্ষী-সন্নিভ-আরক্ত-লোচন-সমন্বিত মুখ-ভিমরুল-চক্রের দিকে সহসা সাহস পূর্ব্বক চাহিয়া দেখে! পাঠশালার মধ্যস্থলে এক খানি দড়ি আচ্ছাদিত ক্ষুদ্র টুলের উপর বসিয়া, দক্ষিণহস্তে সুদীর্ঘ খর্জ্জুর যষ্টী ঘুরাইয়া যখন তিনি ছাত্রগণকে "পাজী! হারামজাদ! উল্লু! শুয়ার! শালা!" প্রভৃতি নানাবিধ মধুর সম্ভাষণে অপ্যায়িত করিয়া, বৃষভ-নিন্দিত কণ্ঠে মদরসা পরি-

পূরিত করিতে থাকেন, তখন সেই তানলয়-শুদ্ধ স্বরলহরী, উদারা মুদারা তারা প্রভৃতি গ্রামের, পরদায় পরদায় আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া, সেই সুকুমারমতি বালকগণের মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদনখরাগ্র ভাগ পর্য্যন্ত লু-সন্তাড়িত তালপত্র সমূহের ন্যায়, থর থর কম্পিত করিয়া তুলে। আবার যখন তাঁহার হস্তস্থিত সুদীর্ঘ বেত্র খণ্ডের সহিত নবনীত কোমল বালকগণের গাত্রচর্ম্মের ঘন ঘন পরিচয় হয়, তখন সেই অভিশপ্ত হতভাগ্যদিগের সর্ব্বশরীরে বিদ্যুতের জ্বালা ছুটিতে থাকে। তখন সেই অনবরত-বালক-কোলাহল-কাকলি-কলিত খগোলের ক্ষুদ্র পাঠশালা একবারে নির্ব্বাক নিস্পন্দ—যেন কাহারও নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত পড়িতেছে না।

তাই বলিয়া গঙ্গাধর পরশাদ্ নির্দ্দয় প্রকৃতির লোক ছিলেন না। স্কুলের বাহিরে, জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সমক্ষে, তিনি মেষ-শাবকের ন্যায় শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। এমন কি, তাহাদের মধ্যে, 'গো-বেচারী' বলিয়া, তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু মদরসায়, তাঁহার স্বীয় এজলাস মধ্যে বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী, বন্ধুদ্রোহী, দৌরাত্ম্যকারী, নষ্ট প্রকৃতি, সুশীল, দুঃশীল, অনাবিষ্ট, অভিবিষ্ট, হিন্দু, মুসলমান, মাড়বারী প্রভৃতি বালকবৃন্দের মধ্যে বসিলে, তিনি সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী হইতেন।

দানাপুর ষ্টেসনের ওভারব্রীজ পার হইয়া, খগোলের বাজারে প্রবেশ করিলে দক্ষিণে রেল-কর্ম্মচারী বাঙ্গালী বাবুদিগের বাসা। বামে শোন কেনাল—ডিহিরীর নিকট হইতে উত্থিত হইয়া, দানাপুর-ক্যাণ্টোন্-মেণ্টের নিকট শোন-গঙ্গার সঙ্গমস্থলে মিশিয়াছে। রেল-লাইনের একপার্শ্বে ইংরেজ-টোলা, অপর পার্শ্বে "বাভন্-টোলী"—সেই বাভন-টোলীর মধ্যস্থলে জমীদার পালকধারী সিংহের বিচিত্র রাজ-প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা। পালকধারীর পিতা রায় বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ সিং

বাহাদুর, সি-আই-ই, কোইলোয়ারের শোন ব্রীজে কনট্রাক্টারী করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বহুদূর বিস্তৃত জমীদারী—এই রাজ-প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সদর-কাছারী-বাড়ীর আটচালায় প্রবেশ করি—গঙ্গাধর গুরুজীর মদরসা দেখিতে পাইব।

পাঠশালার বালকগণ, পৃথক পৃথক দল বাঁধিয়া, ভিন্ন ভিন্ন চক্রে বিভক্ত হইয়া, সুর করিয়া, শরীর দোলাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে। কোন নবাগত বালক ভূমিতে খড়ী দিয়া 'হরফ-পহচান' (অক্ষর পরিচয়) করিতেছে। একজন 'বাল্‌চট্ট' (সদ্দার পড়ো) তাহাকে হাত ধরিয়া শিখাইয়া দিতেছে। যথা—ক—কা কো কোরোয়া; খ—খা বীজ খাট্টা; গ—গাবে নেড়িয়া; ঘ—ঘা সো রোট্টা; ঙ—আঁপোক বান্দা; চ—চ তিন-কোনা ইত্যাদি। কেহ 'মন্ত্রা' (মাত্রা) শিখিতেছে—যথা—ক+া=কা, ক+ ী=কী ইত্যাদি। একটী চক্রে একজন বাল-চট্ট (সদ্দার পড়ো) 'পাহাড়া' (কড়ানে শট্টকে) পড়াইতেছে—অন্য বালকেরা ঐক্যতানে সুর করিয়া তাহা পাঠ করিতেছে। আরও এক স্থানে কতকগুলি বালক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, 'খোড়হা' (নামতা) ঘোষিতেছে—এক জন অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ছাত্র তাহা ঘোষাইতেছে। কেহ কেহ বিনা সাহায্যে উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া পড়িয়া লিখিতেছে—যথা—ডেড়া (১॥), আড়াইয়া (২॥), হুট্টা (১ হুট্টা=৩॥, ২ হুট্টা=৭), পসেরী (পশুরি=৫ সেরা), বিঘোটী (বিঘা-কালী), নক্‌দী (Unitary Method—ঐকিক নিয়ম), দানাবন্দী (ভূমিতে উৎপন্ন শস্য তদবস্থায় পরিমাণ্য, খরিদ, বিক্রী, মহিয়ানা (শুভঙ্করী নিয়মে ত্রৈরাশিক), মহীন্নারী (মাসমাহিনা)। কোন কোন সুবুদ্ধি বালক, খড়ীর কালীতে লেখাপট্টী (কাষ্ঠফলক), হস্তদ্বারা মুছিয়া, সেই খড়ী অম্লানবদনে, মুখে ও পেটে মাখিতেছে এবং ভাঙ্গা বোতলের পশ্চাৎভাগ দ্বারা তাহা

চিক্‌না (চিক্কণ) করিয়া লইতেছে। বিহারী পাঠশালার বালকগণের মধ্যে এইরূপ সংস্কার আছে যে, পট্টী মুছিয়া যে যত খড়ী মুখে ও শরীরে মাখিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা তত অধিক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যাইবে। বাঙ্গলা দেশের পাঠশালায়, তাল-পত্রে লিখিতে লিখিতে শিশুগণের "ক লেখো—মুছে ফ্যালো" ইত্যাদি বলিয়া, হস্তদ্বারা মুছিয়া, মুখে, পেটে ও মস্তকের কেশে কালী মাখিবার অভ্যাস, বহুদিন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত। ইদানীং স্লেট ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায়, তাহা আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব্ব-প্রথার নিদর্শন স্বরূপ, একটী মেয়েলী ছড়া, বঙ্গকুল-কামিনীদিগের মুখে, আজও শ্রুত হওয়া যায়। পাঠশালা হইতে বিদ্যাভাস করিয়া গৃহ প্রত্যাগত শিশুপুত্রকে জননী সস্নেহে বলিতেছেন—

হাতে কালী মুখে কালী—
লিখে এলি, আমার বনমালী।

যাহা হউক গজাধর গুরুজীর পাঠশালার কথা বলিতেছিলাম—কখন তিনি সমস্ত বালককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স্বীয় তত্ত্বাবধারণে, সর্ব্ব প্রধান বালচট্ট দ্বারা, ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত গণাইয়া, নামতা, সইয়া, ডেড়িয়া, আড়াইয়া, হুট্টা প্রভৃতি সমস্ত ঘোষাইয়া লইতেছেন। কখন স্বয়ং বালকগণকে 'ফুট-হারা-বরজবানী হিসাব' (মানসাঙ্কের) 'ডাক জিজ্ঞাসা' করিতেছেন। কোন মুসলমান বালক 'খরহি' নামক শক্ত শর-কলম মুঠা করিয়া ধরিয়া, কলমদানের পার্শ্বস্থিত 'দাবাতের' বস্ত্রখণ্ড নিষিক্ত অর্দ্ধ-শুষ্ক কালী বারংবার খোঁচা মারিয়া তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হইতে বামভাগে, আলিফ, বে, পে, তে, টে হইতে আরম্ভ করিয়া,

ইয়ে, বাদগস্ত ইয়ে—
খোদা ইলিম দিজীয়ে।

নামক বয়েৎ (পদ্য) আবৃত্তি করিয়া ফার্সী বর্ণ-মালা শেষ করিতে করিতে, খোদার নিকট 'ইলিম' (বিদ্যা) কামনা করিতেছে। বঙ্গ-

দেশের পাঠশালার বালকগণ দেবী ভারতীর নিকট বিদ্যাকামনা করিয়া, যে কবিতাটী পাঠ করিয়া থাকে, তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কজ্জল পূরিত লোচন ভারে।
স্তনযুগ শোভিত মুক্তার হারে॥
গলায় গজমতি মুক্তার হার।
দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার॥
বিদ্যা দিয়ে মা কর মা হিত।
আমারে কর মা সভার পণ্ডিত॥
বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে।
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে॥

ইত্যাকার ভারতীর বন্দনা করিয়া, আধুনিক এম,এ, ডিগ্রী বা রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির পরিবর্ত্তে, তখনকার বালকেরা, সভা-পণ্ডিতের পদই, বিদ্যা গৌরবের চরমসীমা বলিয়া বিবেচনা করিত। তদ্রূপ বিহারী পাঠশালার বালকেরা বলে—

শিব শিব শঙ্করী।
শিব গৌরী মহেশ্বরী।
বিদ্যা দে পরমেশ্বরী॥

তাহার পর যে পাঠশালার কথা বলিতেছিলাম—কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্র অঙ্ক কসিতেছে। কোন ব্যুৎপন্ন বালক কাষ্ঠফলকের (উল্টাপিঠে) চিঠী, তমসুক্, পাট্টা, কবুলীয়ৎ, রসিদ, ফারখতী প্রভৃতি লিখিয়া গুরুজীকে দেখাইতেছে—তিনি তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছেন। কেহ বাহিরে যাইবার জন্য করযোড়ে কাতর স্বরে গুরুজীকে অনুনয় বিনয় করিতেছে—গুরুজী তাহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা যাহারা পুস্তক পড়িতে শিখিয়াছে, তাহারা

এক একটী দল বাঁধিয়া রামায়ণ, দানলীলা, নাগলীলা প্রভৃতি পুস্তক এক সঙ্গে ঐক্যতানে পাঠ করিতেছে। আর সকলের মধ্যস্থলে উচ্চাসনের উপর বসিয়া মুন্সী গজাধর গুরুজী—বালকদিগকে "খচ্চর, চণ্ডাল, বরগাঁই, সাঁহ" প্রভৃতি নানাপ্রকার অশ্রাব্য কটূক্তি ও গালিবর্ষণ করিতেছেন, এবং ছাত্রগণের মাতাপিতা ও পত্নী প্রভৃতিকেও তাহার কিছু কিছু অংশ দিতেছেন। এমন সময় শিউনন্দন, রাম-অনুগ্রহকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বলিল, "গুরুজীকে সেলাম বন্দেগী কর্—প্রথম দিন আমি সঙ্গে করিয়া রাখিয়া গেলাম—কাল হইতে একলা যেতে আসতে হবে।"

গজাধর গুরুজীর প্রলয়-কালীন-কাল-পয়োধরাচ্ছাদিত গম্ভীর মুখশ্রী, শিউনন্দনকে দেখিয়া (বোধ হয় পূর্ব্বদিনের প্রাপ্ত নববস্ত্র ও রজত-খণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া) সহসা মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। দুইটী ছাত্র বহুক্ষণ হইতে বাহিরে যাইবার অবসর খুঁজিতে-ছিল। এতক্ষণ তাহারা গুরুজীর আরক্তনয়ন ও যষ্টিআস্ফালনের দিকে ঘেঁসিতে পারিতেছিল না। এক্ষণে সুসময় বুঝিয়া, রাধে সিং নামক বালকটী, গুরুজীর সম্মুখে আসিয়া বিচারাধীন বন্দী যেমন ধর্ম্মাধি-করণে বিচারপতির সম্মুখে সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া যুক্তকরে প্রার্থনা করে, তদ্রূপ কাতরস্বরে বলিল, "গুরুজী! একৃথী!" (অর্থাৎ বাহিরে যাইতে আজ্ঞা হউক)। তখনই ছত্রধারী নামক আর একটী বালক, তদ্রূপ ভঙ্গীতে, কিন্তু অধিকতর ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়া বলিল, গুরুজী! দুঃখী!" (অর্থাৎ বহির্দ্দেশে যাইব—বড় জোর তলব—শীঘ্র যাইতে অনুমতি দিন)। গুরুজী অন্য সময় হইলে বলিতেন, "তোরা দুইজনে 'সল্লা' (পরামর্শ) করিয়া বাহিরে যাইতেছিস্—তোদের ভিতর কোন দুরভিসন্ধি আছে—হয় মাঠে গিয়া ক্ষেত্রের ভুট্টা (জনার) চুরি করিবি, না হয় ভৈঁস-চরবাহা (মহিষ-পালক) দিগের সঙ্গে মিলিয়া

তামাকু সেবন করিবি। তোদের লেখাপড়া কিছুই হইবে না—তোদের পিতামাতা অনর্থক পাঠশালে দিয়াছেন—ধরিত্রী বৃথাই তোদের ভার বহন করিতেছেন। আমি কখনই তোদের বাহিরে যাইতে দিব না—ইত্যাদি, ইত্যাদি।" নানা প্রকার বক্তৃতা ও ওজর আপত্তি করিতেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে, গুরুজী, সিউনন্দনের বাড়ীতে, গতকল্য যেরূপ আপ্যায়িত হইয়া আসিয়াছেন, সেই সিউনন্দন, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তাহাঁকে আদর অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে রাধে ও ছত্রধারীর প্রতি একবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে দিবার অনুমতির ইঙ্গিত করিলেন। অভ্যাগতকে আদর করিয়া বসাইয়া, একটী ছাত্রকে তামাকু সাজিয়া আনিতে অনুমতি দিলেন। এবং একজন 'বালচট্'কে ডাকিয়া, রাম-অনুগ্রহ-নারায়ণকে, তাঁহার শিক্ষার অধীনে সোপরদ্দ করিয়া দিলেন।

এই 'বালচট্' বা সদ্দার-পড়োদ্বারা শিক্ষাদান প্রণালী বঙ্গ ও বিহারের পাঠশালা সমূহে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। যে সকল বালক অন্য ছাত্র অপেক্ষা অধিক পড়াশুনা করিয়া পাঠশালীয় বিদ্যার প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই দুই কার্য্যই তাহাদিগকে করিতে হয়। বড় বড় পাঠশালায় দুই বা ততোধিক বালচট্ দৃষ্ট হয়. ইহারা গুরুজীর অধ্যাপনা কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। অনাবিষ্ট বালকদিগকে শাসন করিতে, পাঠশাল-পলায়িত ছাত্রগণকে

"গুরুমহাশয়! গুরুমহাশয়! তোমার পড়ো হাজির।
এক দণ্ড ছেড়ে দাও ত' জল খেয়ে বাঁচি॥"

ইত্যাকার কবিতা আওড়াইয়া, হস্তদ্বয় ও পদযুগল ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া আসিতে, তাহারা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। সময়ে সময়ে গুরুজীর অনুপস্থিতিতে, তাহারা পাঠশালের যাবতীয় কার্য্য পরিচালিত করিয়া

থাকে। বিহারীবালকেরা 'বালচট্টজী'কে 'গুরুজীর' তুল্য মান্য ও ভয় করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের সর্দ্দারপড়োর মান্যও তদপেক্ষা হীন নহে।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, যে আধুনিক ইউ-রোপীয় কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রণালী, আমাদের দেশের সর্দ্দারপড়ো কর্ত্তৃক শিক্ষাপদ্ধতির নবীন সংস্করণ মাত্র। ইউরোপীয় কিণ্ডার গার্টেণে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও অধিক বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রারা, মণিটার বা সর্দ্দারপড়ো হইয়া, ছোট্ট ছোট বালকবালিকা সহাধ্যায়ীদিগকে, ক্রীড়াস্থলে শিক্ষা দিয়া থাকে। এই নবীন শিক্ষা প্রণালী সম্প্রতি ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়া, সমস্ত সভ্য জগতকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। গ্রেট-ব্রীটেন, ফ্রান্স, এমন কি সমগ্র ইউরোপ ও মার্কিণবাসীরা যাঁহারা আধুনিক সভ্যতার উত্তুঙ্গ নগেন্দ্র-চূড়ে আরোহণ করিয়া, চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যা করতলগত করিয়াছেন, তাঁহারাও আজি সভ্যতাভিমানী জার্ম্মানীর নির্জ্জন উদ্যান-বিদ্যালয়ে উদ্ভূত এই নবীন শিক্ষাপ্রণালী অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বহু সহস্র মাইল দূরে, সুদূর বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেরও অন্ধ-তমসাবৃত পল্লীগ্রামে, অশিক্ষিত গুরুমহাশয় ও গুরুজীদিগের নগণ্য পাঠশালায়, এই কিণ্ডার গার্টেণের মণিটার প্রণালী, সর্দ্দার-পড়ো ও বালচটাকারে বহুশতবর্ষ পূর্ব্ব হইতে, প্রচলিত আছে। অধিকন্তু ইউ-রোপীয় বালচট্ট ও বালচটীরা "ফেল কড়ি, মাখো তেল" মন্ত্রে দীক্ষিত দেশের লোক; সুতরাং তাহারা বেতন লইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশের সর্দ্দারপড়োগণ "দানেন ন ক্ষয়ংজাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং" অপিতু "যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে" এই নীতির অনুসরণ করিয়া, কোন প্রকার পারিশ্রমিক না লইয়া, বিনা বেতনে

সগৌরবে, সন্তুষ্টচিত্তে, সহাধ্যায়ীদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, তাই কার্পাস, আমাদের দেশে জন্মিয়া, ইউরোপে গিয়া, বস্ত্র হইয়া আইসে; লবণ এ দেশ হইতে জাহাজে করিয়া গিয়া, রিফাইন হইয়া প্রত্যাগত হয়; আবার সর্দ্দার-পড়ো কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রণালী নবীন পরিচ্ছদ পরিয়া কিণ্ডারগার্টেনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নূতন হইয়া আসিল।

বিহারী পাঠশালায় দীর্ঘ অবকাশ দিবার আদৌ রীতি নাই। কেবল হিন্দু ও মুসলমানদিগের পর্ব্বদিন গুলিতে, ০৷১ দিন ছুটী দেওয়া হয়। (এমন কি রবিবারেও বন্ধ নাই)। শনিবার দিন সাপ্তাহিক অধীত বিদ্যার 'সহি' (revision—পুনরাবৃত্তি) লইয়া পাঠশালগৃহ মার্জ্জনা ও গোময় দ্বারা লেপন করাইয়া, দুই প্রহরের পর, অর্দ্ধেক দিন ছুটী (half-holiday) দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে পাঠশালের বৈতনিক বেহারা বা মালী নাই। ছাত্রগণ স্বহস্তে গৃহ মার্জ্জনা ও লেপন করিয়া থাকে। মার্জ্জনা কালীন নিম্ন লিখিত কবিতাটী পাঠ করে—

রাম নাম লাড্ডু, গোপাল নাম ঘী,
হরিকে নাম মিছ্রী, ঘোর ঘোর পী।

অর্থাৎ (আইস আমরা) রামনামরূপ লাড্ডু, গোপালনামরূপ ঘী ও হরিনামরূপ মিছরী, এই তিন দ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া পান করি।

ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের দিনে, দিবা দ্বি-প্রহরের পর, যখন প্রচণ্ড লূ-বায়ু প্রবাহিত হইয়া, দিকদিগন্তকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলে, তখন গুরুজী ছাত্রগণকে পাঠশালগৃহেই শয়ন করিয়া, বিশ্রাম করিতে আদেশ দেন; এবং নিজেও সেই স্থানে নিদ্রা গিয়া থাকেন। বেলা আন্দাজ দুইটার সময়, সকলকে জাগাইয়া, পাঠশালের বৈকালিক কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহাতে এই উপকার হয়, যে ইংরাজী স্কুলের ছাত্রেরা যেমন মর্ণিংস্কুল বা দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের সময়, বাগান হইতে কাঁচা আম চুরি করিয়া

খাইবার জন্য, রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসুস্থ হয়, এবং পশ্চিম দেশে লু-লাগিয়া, কোন কোন বালক প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়, বিহারী পাঠশালার ছাত্রেরা ঐ সময় গুরুজীর তত্ত্বাবধারণে পাঠশালে আবদ্ধ থাকিয়া, উহা হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইয়া থাকে।

বেহারী পাঠশালায় ছাত্রদিগকে শাস্তি দিবার প্রণালী, বঙ্গদেশীয় পাঠশাল অপেক্ষা অধিক বিভিন্ন দেখা যায় না। গুরুজী বেত্রের অভাবে সাধারণতঃ খেজুর ছড়ীর দ্বারা ছাত্রদিগকে শাস্তি দিয়া থাকন। বাঙ্গলা দেশের পাঠশালের ন্যায় ছাত্রদিগের হাজিরী (attendance) নিম্নলিখিত প্রকারে লওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে বালক সর্ব্ব-প্রথমে আইসে, সে ক্রমানুযায়ী সকলের নাম লিখিয়া রাখে। নিজের নামে শূন্য, দ্বিতীয় নামে ১, তৃতীয়ের নামে ২, চতুর্থের নামে ৩, এইরূপে যে যখন আইসে, সংখ্যানুসারে তাহার নাম লিখিয়া রাখে। যে সর্ব্ব-প্রথমে আসে, সেই সকলের নাম লিখিয়া রাখিবার স্বত্বে স্বত্ববান হয়। সমস্ত বালক সমবেত হইলে, সংখ্যানুযায়ী সকলের হস্তে বেত্রাঘাত করা হয়। পাঠক মহাশয় ইহা মনে করিবেন না যে, যে বালক সর্ব্ব প্রথমে আইসে সে ফাষ্ট বলিয়া, শূন্য পাইয়া বেত্রাঘাত হইতে একবারে বঞ্চিত হয়। পক্ষপাতশূন্য গুরুজী, সেই শূন্যপ্রাপ্ত ছাত্রটীর হস্তে, বেত্রের অগ্রভাগ দ্বারা, একটী শূন্যাকার, মধ্যমরাশী গুঁতা মারিয়া থাকেন। আর যাহারা পূর্ব্ব-কথিত "একৃথী" ও "দুঃখী" র জন্য বহির্দ্দেশে যাইতে বাধ্য হয়, তাহারা প্রত্যাগত হইলে, পুরস্কার স্বরূপ "চট্টী" নামক বেত্রাঘাত পাইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুজী তাহাদিকে চট্টী-পেটা করিবার অবসর না পান, ততক্ষণ তাহারা বিচারাধীন বন্দীর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে— আপনার খড়ী, পট্টী, পুস্তকাদি কিছুই স্পর্শ করিতে ক্ষমতাযুক্ত হয় না। এমন কি তাহার সতার্থেরা তাহাকে নিকটে বসিতে দিলে দণ্ডার্হ হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন "মোগ্‌লী" নামক এক প্রকার শাস্তি প্রচলিত আছে। তাহাতে দণ্ডিত ছাত্রকে (মো=দড়ি+গলি=গলা) জানুদ্বয়ের সহিত গলা একত্র করিয়া, আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বঙ্গদেশে "নাড়ু-গোপাল" নামক যে শাস্তির পদ্ধতি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল এবং আজিও কোন কোন সুদূর পল্লীগ্রামে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এখানে তাহাকে 'ঠিকৃড়ী-চড়াই' কহে। ইহাতে অভিযুক্ত অনাবিষ্ট বালককে, কুঁজের ন্যায় দণ্ডায়মান করাইয়া, তাহার জানু ও হস্তদ্বয়ের উপর চারিটি ঠিকরী (ঢিল) স্থাপিত করিয়া রাখা হয়। কোন প্রকারে ঠিকরী পড়িয়া গেলেই বেত্রাঘাত আরম্ভ হয়। আর তথাকার ঘোরতর অপরাধে অপরারী অত্যধিক অনাবিষ্ট বালকগণের শাসন জন্য "জল-বিছুটী" নামক যে ভয়ঙ্কর শাস্তির বিধান ছিল, এখানে তৎপরিবর্ত্তে "কাঠ্‌রেঙ্গনী-কা-কাঁটা" (শ্যা-কুল-কাঁটা) বিছাইয়া, শয্যারচনা করিয়া, হতভাগ্য শিশুকে, তাহার উপর শয়ন করাইয়া, ভীষ্মের শরষ্যার অভিনয় করা হইয়া থাকে। উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেই, তাহার উপর ধড়াধড় মার পড়ে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে অবগত নহেন যে "কৈঁথো" নামক এক প্রকার দণ্ড-বিধান, পমিশ্চবঙ্গের কোন কোন পাঠশালে প্রচলিত আছে—উহাতে অপরাধীকে পাঠশালের গৃহভিত্তির গাত্রে, পদদ্বয় উর্দ্ধে করিয়া, মস্তক নিম্নে রাখিয়া, আধুনিক জিমন্যাস্‌টিকের 'পিকক্‌' করার মত করিয়া রাখা হয়। এইরূপ শাস্তি বিধান এদেশে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তবে, গয়া হইতে যে রাজবর্ত্ম হাজারিবাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহার পথিপার্শ্বে "গৌ-বাছুয়া" নামক একটী ক্ষুদ্র শৈলমালা আছে। ঐ পাহাড়ের পাদদেশে "চিড়িয়া-টাঁড়" নামক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। এই পাহাড়ে (গৌ=গাভী+বাছুয়া=বাছুর, বৎস) একটী গরু ও একটী বাছুরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের গোপরমনীগণ দধিদুগ্ধাদির দ্বারা উহার পূজা করিয়া

থাকে। 'গৌ-বাছুয়া' 'ব্রহ্মজৈনীর' একটী শাখা মাত্র। যাহা হউক, উক্ত 'চিড়িয়া-টাঁড়' গ্রামের ক্ষুদ্র পাঠশালায়, লেখক ২৫ বৎসর পূর্ব্বে, বালকদিগকে ঐরূপ সাজা পাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু তদবধি পাটনা, শাহাবাদ, মুঙ্গের প্রভৃতি বিহার প্রদেশের অন্য কোন জেলার পল্লীগ্রাম সমূহে, ইহার অনুরূপ শাস্তি-বিধান প্রণালী দৃষ্ট হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিলে, পুষ্করিণীতে লইয়া, অপরাধী ছাত্রকে বারংবার জলে ডুবান; থ'লের মধ্যে পূরিয়া, উহার মুখ বন্ধ করিয়া, রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা (যাহাতে কোন কোন হতভাগ্য বালক, অকালে কালগ্রাসে পর্য্যন্ত পতিত হইতে শুনা গিয়াছে) প্রভৃতি হৃদয়-বিদারক লোম-হর্ষণ দণ্ড-দান প্রণালী, বহু প্রাচীন কালে, বঙ্গদেশের, কোন কোন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় গুরুমহাশয়ের দ্বারা অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সেরূপ শাস্তিদান প্রথা, সৌভাগ্যক্রমে বিহারীয় পাঠশালার ইতিহাসে কখনই ছিল না; এবং ভরসা করি বঙ্গদেশ হইতেও তাহার সম্পূর্ণ লোপ হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ স্কুল কলেজ ও পাঠশালার ছাত্রদিগের প্রতি শাস্তিদান বিষয়ে বিশেষ উদারতা দেখান হয়। সরকারী সাহায্যকৃত শিক্ষাবিভাগে শারীরিক শাস্তি (corporal punishment) একবারে উঠিয়া গিয়া, তৎপরিবর্ত্তে ফাইন, নাম-কর্ত্তন, রাস্টিকেশন্ প্রভৃতি সভ্যতর শাস্তির প্রচলন হইয়াছে।

গুরুজীর প্রাপ্য।—বেলা আন্দাজ দুইটার সময়, গুরুজী ছাত্রদিগকে 'জলপান' করিতে ছুটী দেন—বলিয়াছেন, "যে এক ঘণ্টার মধ্যে তোমরা ফিরিয়া আসিবে।" বালকেরা আসিবার সময় 'ভুন্না' (ভুজা) ইত্যাদি জলখাবার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে—নিজেরাও খায়, এবং গুরুজীকে এক মুঠা করিয়া দেয়! ইহাকে গুরুজীর 'মুঠিয়া' নামক প্রাপ্য কহে। এমন কাঙ্গাল গুরুমহাশয়—যিনি ছাত্রদিগের নিকট হইতে জলপান

মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করেন—পৃথিবীর অপর কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ!

আর ছাত্রেরা বাড়ী হইতে তামাকু, টিকিয়া, পান, কসেলী (সুপারি) প্রভৃতি আনিতে অনুজ্ঞাত হয়। তদ্ভিন্ন মাসিক ৵০ আনা, ⁄০ আনা করিয়া বেতন লওয়া হয়। আর প্রত্যেক শনিবারে গুরুজী পয়সা কিম্বা সিধা আদায় করেন। এই পাওনাকে "শনিচরা' কহে। যদি কোন ছাত্র 'শনিচরা' আনিতে দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করে, গুরুজী তাহাকে "শনিচরা লে আও" বলিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া আদায় করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশের পল্লীগ্রামের ছাত্রদের যে চারিখানি করিয়া ঘুঁটে, মধ্যস্থলে ফুটা করিয়া, দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া আনিয়া, গুরু-মহাশয়কে উপঢৌকন দিবার রীতি ছিল; বেহারে সে সম্বন্ধে বালক-দিগের আর কষ্ট পাইতে হয় না—গুরুজী স্বয়ং ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়া, ঘুঁটে ও কাঠ লইয়া আসেন।

কিন্তু গুরুজীর সর্ব্বপ্রধান প্রাপ্য চকচন্দা ও ফাগুয়ার (নষ্টচন্দ্র ও দোলপূর্ণিমার) সময়। তখন গুরুজী 'বালচটীয়া' ও অপরাপর ছাত্র-বৃন্দের সহিত বালকদের বাড়ী বাড়ী গিয়া, প্রাপ্য আদায় করিতে থাকেন। একখানি ছিপিয়াতে (থালাতে) আবীর ও অভ্র থাকে। ছাত্রগণ আবীর খেলিতে খেলিতে, আর দুটী লাল রঙ্গের 'ডাণ্ডা' (লাঠী) ঠকাঠক্ করিয়া বাজাইতে বাজাইতে, নানাবিধ ছড়া, দোহা, কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে, মহাকোলাহলের সহিত প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়েন। কোন কোন পসারওয়ালা গুরুজী, বাদ্যভাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বহুসংখ্যক ছাত্র সমভিব্যাহারে, ঢোলসহরতের সহিত, মহা-আড়ম্বরে গমন করিয়া থাকে। একজন 'বালচট' একটা গণেশের মৃন্ময়মূর্ত্তি ক্ষুদ্র চৌকিতে করিয়া মস্তকে লইয়া গমন করে। আমাদের দেশের দোল পূর্ণিমার সময়, পুলিসের

কনেষ্টেবলেরা, যেরূপ গীতবাদ্য করিয়া, আবীর খেলিতে খেলিতে ভদ্রলোকদের বাড়ী বাড়ী, "হোলী-কা-বখ্‌শীস্‌" আদায় করিয়া বেড়ায়—ইহা অনেকটা সেইরূপ দেখিতে।

যে ছাত্রের বাড়ীতে যাওয়া হয়, একজন 'বালচট্‌' পান দিয়া, তাহার চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া থাকে; এবং যতক্ষণ তাহার পিতামাতা টাকাটা, সিকিটা না দেন, ততক্ষণ তাহার চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেওয়া হয় না। ইত্যবসরে শিক্ষক ও ছাত্রেরা আবীর খেলিতে, লাল লাঠী বাজাইতে, এবং নিম্নলিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করিতে থাকে—

বাবুয়া রে বাবুয়া, লাল লাল ঢেবুয়া।
মাইকে অর্জ্জন, বাপকে কুশল, নিকাল্‌রে বাবুয়া।
আঁখিয়া লাল লাল ভেলো রে বাবুয়া।
ত ই ও না মেইয়াকে মায়া লাগ লো রে বাবুয়া।
সেঁইয়া তোর, কত্তে ক ঠোরী রে বাবুয়া॥

অর্থাৎ বাবুয়া, লাল লাল ঢেবুয়া (চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র পয়সা) লইয়া আয়। তোর মাতার অর্জ্জন (উপার্জ্জন), পিতার কুশল নিকাল্‌ (বাহির কর)। আঁখি (পান দিয়া সজোরে আবরণ করাতে) লাল হইল, তবুও তোর মায়ের মায়া লাগিল না—তোর পিতা কত কঠোর রে বাবুয়া?

পুত্র-বৎসলা জননী পুত্রের চক্ষুঃপীড়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া, যথাসাধ্য গৃহ হইতে বাহির করিয়া গুরুজীকে দেন। কেহ কিছু পয়সা, কেহ সিকি, কেহ দুয়ানি, কেহ থারিয়া, কেহ লোটা, কেহ বাঁট্‌-লোহী, কেহ 'ধোতা,' কেহ গামছা, যাহার যথাসাধ্য ঐ সময়ে গুরুজীকে দিতে হয়, এইরূপে তাঁহার যথেষ্ট প্রাপ্য হইয়া থাকে।

একজন সতীর্থের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিদ্যার্থীরা গুরুজীর

সঙ্গে, অন্য একজনের বাড়ীর দিকে, লাল লাঠী বাজাইতে বাজাইতে আবীর খেলিতে খেলিতে, নানা প্রকার দোহা, কবিতা, ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে গমন করে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কবিতাটী সাধারণতঃ আবৃত্তি করিতে শ্রুত হওয়া যায়—

শ্রীগণেশজী চড়হেঁ তুলঙ্গ্।
নশো মোতী ঝল্‌কে অঙ্গ্॥ ১
এক মোতী ঘর তালে তালে।
গুরু পঢ়াইল্ পণ্ডিত ওয়ালে॥ ২
পণ্ডিত ওয়ালে দিও আশীশ্।
জীও চটীয়েঁ লাখ বরীশ॥ ৩
লাখ বরীশকে খণ্ডে মণ্ডী।
ধরম দুয়ারে বর্ষে চণ্ডী॥
সেহো চণ্ডী আখর মণ্ডী॥ ৪
আখর মানাইতে ভেল বিহান।
আঁকু পাত পাত চল্ দেওয়ান॥ ৫
শিব শিব শঙ্করী।
শিব গৌরী মহেশ্বরী॥
বিদ্যা দে পরমেশ্বরী॥॥ ৬
আড়ষট্ সাড়ষট্ তোরথ বিনি।
তোরা হাথ সোনে কো বিনি॥ ৭
তোরা চটীয়াঁ লাখ দোচার।
বিদ্যা মাঙ্গো হাম পসার॥ ৮
হাথে হাথে ধরম মাঙ্গায়া।
ডিল্লী সে গজমোট মাঙ্গায়া॥ ৯
ওড়ো পহরো করো শৃঙ্গার।
দুশমন ছাতী পড়ে অঙ্গার॥ ১০
যো কোই লাবে চোথী সোথী।
তেকর পূজা (গণপৎ) নোহ লেতী॥ ১১
যো কোই লাবে লাড্ডু জলপান।
গওয়ে নাচে ঘর ছোড় অঙ্গান॥ ১২
নাচে গণপৎ পাওয়ে লাড্ডু—
এক লটাপট্ গণপৎ কিন্‌হা।
সব চটীয়ান্‌কো বিদ্যাদিন্‌হা॥ ১৩
গণেশজীকো নাক সেলাম।
গুরুজীকো শও সেলাম॥ ১৪
মাতাপিতাকে দশ সেলাম।
বালচট্টজীকো পাঁচ সেলাম॥ ১৫

অর্থাৎ—১। গণেশজী তুলঙ্গ্ (সর্ব্বোচ্চাসনে—ছাত্রের মস্তকের উপর) বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গে নশো (নয়-শত = অসংখ্য) মোতি (মুক্ত) ঝলকিতেছে। ২। তাহার এক এক মতির দ্বারা গুরুজী ছাত্রদিগকে তালিম করিয়া দেন। ৩। পাণ্ডিত্যপূর্ণ গুরুজী ছাত্রদিগকে

পড়াইয়া পণ্ডিত করিয়া দেন; এবং হে চটীয়াঁ (বাল্চটীয়াঁ—সদ্দার পড়োগণ) তোমরা লাখবরীশ জীও (বাঁচিয়া থাক), বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ৪। লাখবরীশ হইতেও যদি খণ্ডে মণ্ডী (কাটকুট যায়), চণ্ডী (দেবী) তোমাদের ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবেন। সেই চণ্ডীই আখর (অক্ষর) দ্বারা মণ্ডী (মণ্ডিত)। ৫। আখর মানাইতে (অক্ষর সাজাইতে) বিহান (প্রাতঃকাল) ভেল (হইল)। হে দেওয়ান, অঙ্ক পাতিয়া চল। ৭। আড়ষট্ (৬৮), সাড়ষট্ (৬৭) তোর (গণেশজীর) বিনি (পাখা)। তোমার (গণেশজীর) হাতে সোনেকা (স্বর্ণনির্ম্মিত) বিনি (পাখা) রহিয়াছে। তোর (গুরুজার) চটীয়াঁ (ছাত্র) লাখদুচার (দুইচারি লক্ষ) হাথ পসারিয়া (প্রসারণ করিয়া) বিদ্যা মাঙ্গিতেছে (চাহিতেছে)। ৯। হাতে হাতে ধরম আনন ও দিল্লী হইতে গজমোট্ (গজমতি) আনান হইয়াছে। ১০। ওড়ো পহরো (গায়ে দাও, আর পরিধান কর) এবং শৃঙ্গার কর (ব্যবহার কর)। [সাধারণত বিহারী রমনীগণ সাজসজ্জা, বিশেষতঃ কবরী বন্ধন; বেণীবন্ধন প্রভৃতি কেশরচনাকে "শৃঙ্গার" কহিয়া থাকে; কিন্তু এস্থলে শৃঙ্গার অর্থে 'ব্যবহার,' 'সজ্জা'] (দেখিয়া) দুশমনু (শত্রুর) ছাতী (হৃদয়ে) অঙ্গারপড়ুক (জ্বলিয়া যাউক)। ১২। যদি কেহ (কোন বালক) চোথা পুঁথী (কতকগুলা) লইয়া আইসে, তেকর (তাহার) পূজা গণপৎ (গণেশ) নেহি লেতি (লয়েন না)। ১৩। যদি কেহ লাড্ডু ও জলপান আনয়ন করে, তাহার জন্য গণেশজী ঘর ছাড়িয়া, অঙ্গনে নৃত্য করিতে থাকেন। লাড্ডু পাইয়া, নাচিতে নাচিতে গণপৎ এক লটাপট্ (খেলা) কিন্হা (করিলেন)—(অর্থাৎ) সব চটীয়ান্কো (বিদ্যার্থীদিগকে) বিদ্যা দিন্হা (বিদ্যা দান করিলেন)!

গণেশজীকে লক্ষ নমস্কার। পিতামাতাকে দশ নমস্কার।
গুরুজীকে শত নমস্কার ॥ ১৬ সর্দ্দারপড়োকে পাঁচ নমস্কার ॥ ১৭

শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃথিবীর দ্বিতীয় চন্দ্র।

সৌরজগতে কত অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় এবং জ্যোতিহীন পদার্থ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। আটটী প্রধান গ্রহ ভিন্ন ৩৬০টী ক্ষুদ্রতর গ্রহ মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যে (orbits) বিচরণ করিতেছে। যে সকল ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা করা দুরূহ। জ্যোতির্ব্বিৎ মনীষিগণ আরও আবিষ্কার করিয়াছেন যে পৃথিবীর একটী, বুধের দুইটী, বৃহস্পতির পাঁচটী, শনির আটটী, যুরেনাসের চারটী এবং নেপচুনের একটী চন্দ্র বা উপগ্রহ আছে। অনেক দিন হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-মহলে মধ্যে মধ্যে দুই একবার পৃথিবীর অপর একটী উপগ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করা যাইত; কিন্তু সাধারণ লোকে পৃথিবীর যে আর একটী চন্দ্র বা উপগ্রহ থাকিতে পারে তাহা বিশ্বাস করেন না। জ্যোতির্ব্বিৎ-জগতে রিচার্ড প্রকটরের (Richard Proctor) নাম বিশেষরূপে বিখ্যাত; তিনিই প্রথমে বৈজ্ঞানিক জগতে এইরূপ আভাষ প্রদান করেন যে, কতকগুলি প্রভাহীন উপগ্রহ আমাদের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলেও করিতে পারে। তিনি বলেন যে ঐ সকল উপগ্রহ জ্যোতিহীনতা বশতঃ আমাদের নয়নপথে পতিত না হইলেও উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সে যাহা হউক, হ্যামবার্গ নগরস্থ ডাক্তার ওয়ালটেমাথ্ (Dr Waltemath) সম্প্রতি নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে চন্দ্রের ন্যায় আর একটী উপগ্রহ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু এই উপগ্রহটী প্রভাহীন, চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল নহে। এই উপগ্রহের কক্ষাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার দেশান্তর (Longitude) মোটামুটি কিরূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত

হইল। এই উপগ্রহটীর নামকরণ হইয়াছে "লিলিথ্" (Lilith)। ইহা প্রভাহীন বলিয়া সকলে ইহাকে দেখিতে পায় না।

ডাক্তার ওয়ালটেমাথ্ বলেন যে নিম্নলিখিত তালিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এইরূপ উপগ্রহের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে :—

১৬১৮ খৃঃ অব্দ, ২রা সেপ্টেম্বর, ষড়ভান্তর (opposition) হইবার ১১ দিবস পূর্ব্বে ঐ উপগ্রহ অগ্নিময় গোলকরূপে দৃষ্ট হয়।

১৭০০ খৃঃ অব্দ, ৭ই নভেম্বর দৃষ্ট হয়।

১৭১৯ খৃঃ অব্দ, ২০শে ডিসেম্বর, ষড়ভান্তর হইবার ৫ দিন পূর্ব্বে, মধ্যদেশে শ্বেত রেখাযুক্ত অগ্নিময় সূর্য্যরূপে দৃষ্ট হয়।

১৭২০ খৃঃ অব্দ, ২৭শে মার্চ্চ, গ্রহযুতি (transit)।

১৭২১ খৃঃ অব্দ, ১৫ই মার্চ্চ, গ্রহযুতি (transit)।

১৭৩৫ খৃঃ অব্দ, ২৯শে জুন, রাত্রে উজ্জ্বল সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৭৬১ খৃঃ অব্দ, ৬ই জুন, গ্রহযুতি।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দ, ২৫শে মার্চ্চ দৃষ্ট হইয়াছিল।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দ, ১১ই জুন, সূর্য্যমণ্ডলের উপর দিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ চলিয়া যাইতেছে দৃষ্ট হয়; গ্রহযুতি।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, গ্রহযুতি।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দ, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, সূর্য্যমণ্ডলের উপর একটী কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়।

১৮৯৮ খৃঃ অব্দ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, একটী কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়; গ্রহযুতি।

এ পর্য্যন্ত সূর্য্যমণ্ডলের সমুদয় অংশ অথবা অংশ বিশেষ কেবলমাত্র চন্দ্র, শুক্র এবং বুধের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় বলিয়া সকলে অবগত আছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তারিখের পঞ্জিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়

যে ঐ সকল গ্রহ ও উপগ্রহের ভিতর কোনটীরও পূর্ব্বোক্ত গ্রহযুতি (transit) হয় নাই।

আমরা আলোচনা করিয়া আরও অবগত হই যে, পূর্ব্বোক্ত কোন দুইটী গ্রহযুতির ভিতর যে সকল দিন গত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাকে যদি ১৭৭ দ্বারা ভাগ করা যায় তাহা হইলে কোন ভাগশেষ থাকে না। যেমন, ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ৬ই জুন হইতে ১৭৬২ খৃঃ অব্দের ১৯শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৫৩১ (=১৭৭×৩) দিন গত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এমন একটি উপগ্রহ আছে, যাহার দুই ষড়ভান্তরের মধ্যস্থিত কাল (synodical period) ১৭৭ দিন। এই সংখ্যা যে আমরা হঠাৎ ঐ দুই গ্রহযুতির ভিতর পাইয়াছি তাহা নহে, পরীক্ষা করিলে উহার সত্য উপলব্ধি হইবে। যেমন, ১৮৩৪ খৃঃ অব্দের ৩রা মে হইতে, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দের ১১ই জুন পর্য্যন্ত দিন সংখ্যা হইতেছে ৩৩,২৭৬=১৭৮×১৮৮। ইহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই উপগ্রহ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ১৮৮ বার ভ্রমণ করিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা এক দিবসেরও অধিককাল ক্ষেপণ করে নাই। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে ঐ অজ্ঞাত পদার্থের দুই ষড়ভান্তরের মধ্যস্থিত কাল মোটামুটি হিসাবে (mean synodical period) ১৭৭ দিন মাত্র, কিম্বা সাধারণ কক্ষাগতির (orbital period) সময় ১১৯ দিন মাত্র। সুতরাং ১২৬ বৎসর পরে ঐ অজ্ঞাত উপগ্রহ বৎসরের প্রায় একই দিনে, একই দেশান্তরে (longitude) আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই হেতু আমরা বলিতে পারি যে নিম্নোক্ত দিনের ১২৬ বৎসর পরে পুনরায় গ্রহযুতি (transit) হইবে:—

৬ই জুন, ১৭৬১— ৫ই জুন, ১৮৮৭, গ্রহযুতি হইবে।
১৯শে নভেম্বর, ১৭৬২—১৭ই নভেম্বর, ১৮৮৮,
৩রা মে, ১৭৬৪— ২রা মে, ১৮৯০,

পুনঃপুনঃ লক্ষ্য করিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে যে চন্দ্রের কক্ষার চাপ (eccentricity) অপেক্ষা 'লিলিথের কক্ষার চাপ অধিক। সুতরাং ইহার মন্দফল (equation to centre),—যাহা কক্ষার স্থান বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া থাকে,—চন্দ্রের মন্দফল হইতে অধিক হইবে। ইহার মোটামুটি (mean) এবং যথার্থ দেশান্তরের ভিতর ৬° ডিগ্রি প্রভেদ এবং সেই হেতু সূর্য্যের সহিত নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্রহযুতি না হইয়া সময় সময় দুই দিন পরে হইতে পারে। কিন্তু সূর্য্যের সহিত শীঘ্র শীঘ্র 'লিলিথের' গ্রহযুতি হয় না বলিয়া, আমরা বলিতে পারি যে, লিলিথের কক্ষার বক্রতা (inclination) অত্যন্ত অধিক। যে সকল তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পূর্ব্বোক্ত উপগ্রহের দুই ষড়ভান্তরের মধ্যস্থিত কাল (synodical period) হইতেছে ১৭৭ দিন। রাশিচক্রে ইহার মোটামুটি কালগতি বা ভুক্তি হইতেছে ৩° ডিগ্রি এবং সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। যদি আমরা ইহার কোন অ্যুগণ (epoch) জানিতে পারি, যেমন ইহার গ্রহযুতির (transit) দিন,—যখন ইহার ভূকেন্দ্রীয় (geocentric) দেশান্তর ও সূর্য্যের দেশান্তর একই থাকে,—তাহা হইলে আমরা ৩° ডিগ্রি দিয়া কিম্বা যোগ করিয়া পূর্ব্বের কিম্বা পরের তারিখের 'লিলিথের' দেশান্তর অবগত হইতে পারি। যেমন, ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে, ২৯শে জুন তারিখে যখন 'লিলিথকে' লক্ষ্য করা হইয়াছিল, সেই দিনের 'লিলিথের' দেশান্তর যদি আমরা অবগত হইতে চাই, তাহা হইলে ইহার সন্নিকটবর্ত্তী দিনে যে গ্রহযুতি হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৭২১ খৃঃ অব্দ, ১৫ই মার্চ্চ তারিখ ধরিতে হইবে। সুতরাং ১৭২১, ১৫ই মার্চ্চ হইতে ১৭৩৫, ২৯শে জুন পর্য্যন্ত :—

১৭২১ – ১৭৩৫ = ১৪ বৎসর × ৩৬৫	=	৫১১০ দিন
১৫ই মার্চ্চ হইতে ২৯শে জুন	=	১০৬ „
৩ লিপ ইয়ার	=	৩ „
	মোট—	৫২১৯ দিন

তাহা হইলে ৫২১৯ দিনকে ৩° ডিগ্রি দ্বারা গুণ করিয়া, ৩৬০° ডিগ্রির দ্বারা ভাগ করিলে = ৪৩ ভগণ (revolution) এবং ৫৯° ডিগ্রি পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং ১৭২১ খৃঃ অব্দে ১৫ই মার্চ্চ তারিখের সূর্য্যের দেশান্তরে ৫৯° ডিগ্রি যোগ করিলে, আমরা ১৭৩৫ খৃঃ অব্দ ২৯শে জুন তারিখে 'লিলিথের' দেশান্তর পাইব। কিন্তু ৫৯° ডিগ্রির সহিত, ১৭২১ খৃঃ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখের সূর্য্যের দেশান্তর (শেষের ৫°৪৫' মিনিট) যোগ করিলে = বৃষের ৪°৪৫' পাইয়া থাকি। সুতরাং ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে ২৯শে জুন তারিখে ইহাই 'লিলিথের' দেশান্তর। এই প্রকারে 'লিলিথের' দেশান্তরের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ডাক্তার ওয়ালটেমাথ্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 'লিলিথের' কক্ষা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে চন্দ্রের ন্যায় 'লিলিথের' কক্ষার গতির (orbital motion) হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। 'লিলিথের' গতি দৈনিক ৩° ডিগ্রি মোটামুটি হিসাবে ধরিলে কোন ক্ষতি হয় না।

'লিলিথের' কক্ষা চন্দ্রের কক্ষা হইতে অধিক বৃহৎ, পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ৯৬০,০০০ হইতে ১,২৩০,০০০ মাইলের মধ্যে, অর্থাৎ প্রায় ১,০৪০,০০০ মাইল। গ্রহযুতির সময় সূর্য্যমণ্ডলের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে যাইতে ইহা প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে।

মনুষ্যের উপর অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ক্ষমতার ন্যায় 'লিলিথের' কি ক্ষমতা আছে, সে সম্বন্ধে জ্যোতিষীদিগের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। তবে যাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল। জন্ম সময়ে 'লিলিথ' লগ্ন হইতে ষষ্ঠ গৃহে থাকিলে, জাতকের হঠাৎ শোচনীয় মৃত্যু হয়। এইরূপ একটী জাতক রেলে পোরটারের কাজ করিত, এবং অপর

আর একটী মজুরের কাজ করিত, উহারা উভয়ে রেল চাপা পড়িয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আর একটী জাতক কোন খনিতে কাজ করিত, সেও খনি চাপা পড়িয়া মরে। এই প্রকার 'লিলিথ' দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম গৃহে কি কি ফল প্রদান করে তাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ঐ পর্য্যন্ত যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে পৃথিবীর দ্বিতীয় চন্দ্র বা উপগ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবার আর কোন কারণ নাই।

শ্রীআশুতোষ দেব।

ভারতীয় শিল্প।

বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের অবস্থার সহিত মোগল শাসনাধীন ভারতের তুলনা করা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের একটা নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে, আর তাঁহারা এই উপলক্ষ্যে বলিয়া থাকেন যে, বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতিশীল আর শেষোক্ত অবস্থায় ভারতের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। একটী মৃত সিংহের মস্তকে পদাঘাত করা অতি সহজ, কিন্তু যদি প্রকৃত ঘটনা প্রকৃতরূপে উপস্থিত করান যায়, তবে অন্ততঃ দারিদ্র্য-সমস্যা সম্বন্ধে মুসলমান শাসনই অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।•

স্বীকার করিলাম মোগল শাসনকালে নানাপ্রকার কর অতি কঠোরতার সহিত সংগৃহীত হইত—স্বীকার করিলাম সে সময় নানাবিধ বিরক্তিকর শুল্ক আদায় করা হইত—স্বীকার করিলাম তৎকালে রাজস্ব মাপ দেওয়া হইত না অথবা লোকের কষ্টের সময় তৎপ্রতি-

কারার্থ কোন্ উপায় অবলম্বিত হইত না। তর্কের অনুরোধে এ সমস্ত স্বীকার করিয়াও এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের শাসন সম্বন্ধীয় গৌরবান্বিত জনশ্রুতির সহিত মুসলমান শাসনকাল তুলনা করিলে যে, মুসলমান শাসনের পরাজয় হইবে সে সম্ভাবনা কম। তাহার একটী সহজ ও সরল কারণ এই যে, মুসলমান নরপতিগণ দেশীয় শিল্প সকল অতি আগ্রহাতিশয্যে উৎসাহিত করিতেন। বৃটিশ সিংহেরা যে সকল মনুষ্যোচিত এবং স্বদেশব্রতীকর নীতির কথা অবতারণা করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে চান, তাহার সহিত মুসলমানদের এই একটীমাত্র কার্য্য তুলাদণ্ডে মানিত হইলে, শেষোক্ত কার্য্যটী অধিক প্রশংসনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

আবুল ফজল লিখিত আইন-আকবরি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মোগল সম্রাট্‌গণ দিল্লীর রাজপ্রাসাদে ভারতের নানাস্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগকে রক্ষা করিতেন। শুনা যায় চিত্রবিদ্যার প্রতি আকবরের অতিশয় অনুরাগ ছিল এবং তজ্জন্য তিনি বহুসংখ্যক চিত্রকর রাখিয়াছিলেন। তাহারা সর্ব্বদাই অপর হইতে প্রাধান্য লাভের জন্য এবং স্ব স্ব অঙ্কিত চিত্রের দ্বারা যশোলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। তিনি সপ্তাহে একবার করিয়া প্রত্যেক শিল্পীর কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন এবং গুণানুসারে পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত এবং মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া প্রোৎসাহিত করিতেন। যুদ্ধাস্ত্র বিভাগও সম্রাট্ স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন এবং নানাবিধ অস্ত্র নির্ম্মাণের প্রত্যেক প্রণালী অবলোকন করিতেন। রাজকীয় পরিচ্ছদাগারে প্রত্যেক দেশের তন্তুবায় এবং সূক্ষ্ম কার্য্যক্ষম ব্যক্তি পাওয়া যাইত। তাহাদের সুনিপুণ হস্ত-প্রসূত প্রত্যেক দ্রব্যই অতি যত্নে রক্ষিত হইত। সম্রাটের অনুগ্রহে দিল্লীতে নানাপ্রকার কারুকার্য্য খচিত বস্ত্রের শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান

শাসনকালে রাজকীয় বস্ত্রাদির শিল্প-নৈপুণ্য এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা প্রুশিয়া, য়ুরোপ, চীন প্রভৃতি প্রদেশের বস্ত্র সকল ভারতের বিপনিতে হতাদর হইত। সম্রাট পশমী দ্রব্য, বিশেষতঃ শাল অতিশয় পছন্দ করিতেন। যে সমুদয় দ্রব্য রাজপ্রাসাদে নির্ম্মিত হইত, তাহার একটী তালিকা আইন-আকবারতে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং উহা প্রস্তুতের তারিখ, মূল্য, বর্ণ এবং ওজন অনুসারে শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। জহরতের, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল প্রভৃতির উপর কারুকার্য্যের, রেশমী দ্রব্য প্রস্তুতকারের, অস্ত্রশস্ত্র রঞ্জনকারের, মানাহকারের, স্বর্ণ রৌপ্যের সাদা কারিগরের, খোদাইকার্য্যকারকের, জড়াউকর্ম্মিদের, স্বর্ণাদি প্রতিবপনের, তরবারি, বন্দুক প্রভৃতির স্বর্ণ রৌপ্যের ঝালরকারের এবং অন্যান্য শিল্পীদিগের সুবিস্তৃত কার্য্যালয় ছিল।*

এই উৎসাহ পাইয়াছিল বলিয়া, দিল্লীর দরবারের মহাসমারোহ কাল-চক্রে বিলীন হইবার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্প জীবিত এবং উন্নত অবস্থায় ছিল।

বৃটিশ শাসনের এক শতাব্দী পরে আজ এই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এইরূপ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে যে, দেশীয় শিল্প বিলুপ্ত হইল, দেশীয় কলকারখানা মৃতকল্প হইয়া উঠিল। এই হাহাকার প্রাদেশিক কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে উত্থিত হয় নাই,—অথবা কোন স্বার্থান্ধ বা রুষ্ট ভারতবাসীর মুখ হইতে বাহির হয় নাই, এই চীৎকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহু গণ্যমান্য ইংরাজ কর্ত্তৃকই নিনাদিত হইয়াছে।

যাঁহার অপেক্ষা অন্য কাহাকেও অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, সেই সার জর্জ্জ বার্ড উড্—তাঁহার The

---

* The Indian Arts of India p.p., 141-142.

Industrial Arts of India নামক গ্রন্থে এই দুঃখের সুর তুলিয়াছেন এবং অতি প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ উহার শিল্প সমূহের অবনতিতে কত অধিক পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। ভারতীয় গৃহ-নির্ম্মাণ, খোদকারী ও অন্যান্য সংসৃষ্ট শিল্পে বিশেষ পারদর্শী সার আলেকজেণ্ডর কানিংহাম্, মিঃ ফারগুসন এবং হ্যারিংটনও এই সুরে স্বর মিলাইয়াছেন। সার্ জেমস্ কার্ড এবং ডাক্তার জর্জ্জ ওয়াটের নামও ভারতবর্ষে অপরিচিত নয়,—তাঁহারাও স্বীকার করিতে বিলম্ব করেন নাই যে, দেশীয় কর্ম্মী এবং শিল্পীরা দিন দিন কার্য্যশূন্য হইতেছে। কয়েক বৎসর গত হইল মিঃ সেমুয়েল স্মিথ হাউস্ অব্ কমন্স্ গৃহে বলিয়াছেন যে, যে সকল দেশীয় শিল্পকার্য্য দ্বারা দশ পোনের লক্ষ মনুষ্য জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহা বিদেশীয় শিল্পের প্রচলনে বিনষ্ট হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তান্তব দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কার্পাস-বোনান হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমাদের আমদানির ৩৫ ভাগ কেবল কার্পাস দ্রব্য। এতদ্দারা প্রতীয়মান হইতে পারে, যেন কার্পাস-আবাদ ভারতের জমির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অথবা যদিও উপযুক্ত হয়, তত্রাচ দেশীয় তন্তুবায়েরা কার্পাস-দ্রব্য বুনানী দ্বারা দেশের অভাব দূর করিতে অক্ষম। অতি মনোযোগের সহিত এই বিষয় প্রণিধান করা যাক্।

ভারতীয় সমুদয় চাষোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস একটি অতি পুরাতন এবং সর্ব্বজন-সমাদৃত দ্রব্য। ডাঃ মুর—এ বিষয়ে যাঁহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জে এইচ ব্যালফোর মহোদয় অনুমান করেন কার্পাস ভারতের একটী আদিম উৎপন্ন বস্তু। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনী কার্পাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলেই কার্পাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং রাজকর (Home demands) বহন করিয়াও ল্যাঙ্কাসায়ারে প্রতি বৎসর বহুলক্ষ টন কার্পাস প্রেরণ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে গুর্জ্জর এবং কাথিওয়ারের সমতল ক্ষেত্র, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের উপত্যকা-সমূহ কার্পাস আবাদের প্রধান স্থল। Economic Products of India গ্রন্থে ডাঃ ওয়াট ভারতীয় অসংখ্য প্রকারের কার্পাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নব-অরলিন্সের নীচেই ভারতবর্ষের বোম্বাই একটী প্রধান কার্পাস-বন্দর।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে কার্পাস-বোনানীর কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। এই বিভাগ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পীদিগের প্রতিভা অধিক দীপ্তিশালী হয় নাই। Behar Peasant Life গ্রন্থে মিঃ গ্রিয়ারসন্ কর্ত্তৃক অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূত্রকাটার চাকা এবং দেশী চর্কা হোমর ইলিয়ড্ গাহিবার বহু পূর্ব্বে ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কার্পাস দ্রব্যকে গ্রীকেরা 'সিণ্ডন' বলে। ইহা কতকটা ইণ্ডাস নদী প্রবাহিত 'সিণ্ড' নগরের শব্দবোধক। হিব্রু 'কাপাস' সংস্কৃত 'করিপাসা' হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং সকলেই জানেন যে, ইংরাজী 'কালিকো' (বস্ত্র বিশেষ) শব্দ, মালাবার তীরবর্ত্তী কালিকট হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই কালিকট নগর এক সময়ে তদীয় ঐতিহাসিক কার্পাস দ্রব্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। জর্জ বার্ডউড্ বলেন, "সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই সর্ব্ব প্রথম বস্ত্রবয়ন শিক্ষার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করে এবং ভারতে সোণার জরীর কারুকার্য্য ও সুচিক্কণ মসলন্দ মনুসংহিতারও পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত।" বেদের মধ্যেও বোনানীর কথা পরিলক্ষিত হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষ কেবল যে তাহার নিজ সন্তানকে নিজোৎপন্ন কার্পাস দ্বারা বিভূষিত করিত তাহা নহে, 'ক্ষুদ্র বুটন অন্তর্ভূত করিয়া সমগ্র ইউরোপ

খণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে 'কার্পাসজাত দ্রব্য অথবা কালিকো নামক বস্ত্রের উপকরণ এক ভারত হইতে রপ্তানি হইত।' অধিকাংশ লোক সংখ্যা,—প্রায় ষষ্ঠাংশ,—আর্য্যবিজয়ের পর হইতে এ পর্য্যন্ত তান্তব ব্যবসায়ে জীবনাতিবাহিত করিতেছে।

সময়ের কি বিচিত্র গতি! সার উইলিয়াম হণ্টার বলেন, "ঘটনা স্রোতে ভারতীয় তন্তুবায়দিগকে চর্কার পরিবর্ত্তে লাঙ্গলের মুঠা ধরিতে বাধ্য করিয়াছে।" সার জেম্‌স্ কার্ড বলেন, "আমাদের আইনে দেশীয় তন্তুবায় এবং শিল্পীদিগের প্রতি যতটা কঠোর চাপ দেওয়া হইয়াছে, ততটা আর কোন শ্রেণীর উপরই পড়ে নাই।" সার জর্জ বার্ডউডের মত এই যে, ম্যানচেষ্টার এবং প্রেসিডেন্সি কলের অসম প্রতিযোগিতায় হাত তাঁত এক রকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। জে, এস, কটন মহোদয় বলেন, ল্যাঙ্কাসায়ার প্রথমতঃ ইংলণ্ডে নিষেধাত্মক-হারে করস্থাপন করিয়া এবং তৎপরে কলের প্রতিযোগীতা দ্বারা দেশীয় শিল্প বিলুপ্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তন্তুব্যবসায়কে এইরূপ গলা টিপিয়া নষ্ট করা হেতু ভারতের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই জাহাজে জাহাজে বোঝাই হইয়া এত কার্পাস-নির্ম্মিত দ্রব্য ভারতে আসিতেছে।

১৮৬২ খৃঃ অঃ আমেরিকার যুদ্ধের অবসানে যখন কার্পাস ভয়ানক মহার্ঘ্য হইয়া উঠে, সেই সময় হইতে আমাদের শিল্পের অধোগতি সূচিত হইয়াছে। তৎকালে দেশোৎপন্ন মূল দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য দেওয়া হেতু দেশের নানা স্থানে দেশীয় তান্তব ব্যবসা একরূপ উঠিয়া যায়। কলের উন্নতি দ্বারা ল্যাঙ্কাসায়রের দ্রব্যের সুলভতায় এবং অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাধীনতায়, ভারতীয় কার্পাসের অদৃষ্ট চির-দিনের মত ভগ্ন হইয়া গেল। আমাদের গবর্ণমেণ্ট ল্যাঙ্কাসায়রের তান্তব দ্রব্য রূপ বেদীর সম্মুখে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর জীবনোপায়

অক্ষুব্ধচিত্তে বলি দিতেছেন। ল্যাঙ্কাসায়ারের কলের লোকের উপর আজ আমাদের নগ্ন শরীর আবৃত করিবার ভারার্পণ হইয়াছে এবং তদ্ধেতু ভারতের রক্তে তথাকার তন্তুবায়গণ পুষ্ট হইতেছে। ইহা ত হইবারই কথা, কারণ ম্যানচেষ্টার স্কুলের শিষ্যদিগের নিকট,—যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বৃটিশ-শাসন বিভাগের একরূপ কর্ণধার,—তাঁহাদের নিকট 'রক্ষা শুল্ক' (protection) অতি ঘৃণিত এবং অযশস্কর প্রথা বলিয়া বিবেচিত।

পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর প্রদেশে, রাজপুতানার জয়পুর এবং যোধপুরে, বোম্বাই প্রদেশের আহমাবাদ, সুরাট, ব্রোচ, পুণা, নাসিক, গুর্জ্জর নগরে; মধ্য-প্রদেশের নাগপুর, চান্দা এবং হোসেঙ্গাবাদে, মাদ্রাজ প্রদেশের আরনি, মসলিপত্তম, ভিজাগাপত্তম এবং নেগোর নগরে; বাঙ্গালা দেশের ঢাকা, সরইল (ত্রিপুরা), শান্তিপুর (নদীয়া) এবং চন্দননগর ও অন্যান্য প্রধান নগরের কার্পাস দ্রব্য অদ্যাপিও ম্যানচেষ্টারের সুলভ দ্রব্যের সহিত অসম প্রতিযোগীতা করিয়া সমসূত্রে চলিতেছে। যদিও ভারতবর্ষে কার্পাস বুনানি এখনও লুপ্তশিল্প না হউক, তত্রাচ বিলাতী কার্পাস দ্রব্যের নিষ্ঠুর প্রতিযোগীতা অল্প সময়ের মধ্যে উহা ধৌত করিয়া লইয়া যাইবার ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে! গত আদম সুমারিতে ভারতবর্ষে কার্পাস ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৫,৫০০,০০০ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তন্মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক।

তান্তব দ্রব্যের মধ্যে রেশমী দ্রব্য প্রথম উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ চিরকাল তাহার স্বর্ণরৌপ্য-খচিত রেশমী বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। রামায়ণ ও মহাভারতেও অত্যুৎকৃষ্ট রেশমী পরিচ্ছদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বার্ডউড্ সাহেব বলেন, "ইউলিসিস, ট্রয়নগরের হেলেন কুমারী, সোলমন, রাণী এসথার এবং হেরড—ইহাঁরা কিন্‌কব বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন।" যৎকালে হেরড, টাইরি এবং সিডনের বণিক-

কুলের মধ্যে তাঁহার শেষ বক্তৃতা করেন, জোসেকাস বলেন, তিনি রৌপ্যখচিত 'রুপারি' নামক ভারতীয় পরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ইয়ুরোপীয় সম্রাট, সম্রাজ্ঞী এবং যুবরাজগণ (অবশ্য এসিয়ার সম্রাটের কথা বলিতেছি না), 'চাঁদ তারা' (চন্দ্র এবং তারকা), 'মাজচর' (রৌপ্য-তরঙ্গ), 'ডাপ-চন' (সূর্য্য কিরণ এবং ছায়া), 'বুলবুল-কাটল' (বুলবুলের চোক্), 'মার-গলা' (শিখী স্কন্ধ) এবং 'শীকার ঘর' প্রভৃতি খাঁটি স্বর্ণ অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত ভারতীয় রেশমী বস্ত্র সকল অতি আহ্লাদের সহিত ব্যবহার করিতেন। মেকলে বলিয়াছেন, 'বেনারসের চর্কা নিঃসৃত অতি কোমল রেশমের দ্বারা সেণ্ট জেম্‌স্ এবং পেটিটট্রিয়ানওনের চূড়া সুশোভিত হইয়াছিল।' কিন্তু ইয়ুরোপ চিরকালই তাহার নিজের জন্ত রেশমের কার্য্য করিয়া আসিতেছে এবং বহুল পরিমাণে রেশমী দ্রব্য ভারতে প্রেরণ করিতেছে। তাহার ফলে দেশীয় জীবনসাধন শিল্পসমূহ ইরম্মদ বেগে বিনষ্ট হইতেছে। এখন প্রায় দেখা যাইতেছে যে, রেশমী ব্যবসায়ী তন্তুবায়েরা জীবন ধারণের অন্য কোন উপায় প্রাপ্ত হইবা মাত্রই, পুরাতন ব্যবসায় ত্যাগ করিতেছে। যদিও রেশম প্রভৃতির উন্নতি আশাপ্রদ, তত্রাচ স্থানান্তরে রেশম বুনানীর চাতুর্য্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। বঙ্গের সর্ব্বত্রই রেশম মিশ্রিত দ্রব্যের কার্য্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ভিতর বেনারস, মুর্শিদাবাদ, আহামাবাদ, ত্রিচিন্‌-পল্লী প্রভৃতি দ্বাদশটি স্থান ব্যতীত কুত্রাপি উক্ত কার্য্য বিদ্যমান নাই। কেবল ঐ কয়টী স্থানে খাঁটি রেশমের সূক্ষ্মকার্য্য এখনও হইতেছে।

বস্ত্র বুনানীর উল্লেখ করিতে হইলে কাশ্মীরের শালের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। এই কার্য্যের প্রারম্ভ এবং ইতিহাস দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত। তত্রাচ ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ের কারণই হইতে পারে না। হিরেণের মতে বাল্মীকী কর্ত্তৃক উল্লিখিত হিন্দু-রমণী-কুল-

শিরোমণি সীতাদেবীর উত্তরীয় বসনের অঙ্গীভূত 'রেশমীগুচ্ছ' শাল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সে যাহা হউক এমন সময় ছিল যখন বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরগণ ৩০,০০০ হাজার শালের চর্কায় অনবরত কার্য্য করিয়াও লোকের অভাব সম্পূর্ণ পূরণ করিতে সক্ষম হইত না। এই সকল দ্রব্যের অত্যধিক উৎকর্ষতা হেতু, কতকগুলি কোমলত্ব এবং বিনা সেলাইয়ের জন্য দেশীয় এবং বিদেশীয়দিগের রুচি অনুযায়ী 'জলপড়া' এবং 'তরল কিরণ' আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফরাসী-দিগের কল্পনা এবং আলুকাতুরা জাত রং কতকদিন এই সকল শালের উৎকর্ষতার অন্তরায় হইয়াছিল, কিন্তু অদ্যকার দিনে এই সুখশান্তি-বিরাজিত উপত্যকাভূমিতে কদাচিৎ দ্বাদশটি শিল্পী পাওয়া যাইবে, যাহারা তাহাদের শিল্প দ্রব্যের উপর জেলাম নদীর বক্রগতি অঙ্কিত করিতে পারে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রঙ্ক-প্রশিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে, ফরাসীরা কাশ্মীরী শাল অধিক পরিমাণে ক্রয় করিত। লণ্ডন, প্যারিস এবং ভিয়ানার এতদ্দেশীয় এজেণ্টরা এখনও কাশ্মীরী দ্রব্যের আমদানি স্থান অমৃতসরে এই সকল দ্রব্যের উৎকৃষ্ট নমুনা ক্রয় করিবার জন্য পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী হন। কিন্তু প্রায় বিংশতি বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইতে এই জীবনসাধন শিল্প অবনতির অধস্তন দেশাভিমুখে ত্বরিত পাদবিক্ষেপে প্রধাবিত হইতেছে এবং গত বৎসরের ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্ পত্রিকার নিম্ন-লিখিত বিবরণটী পাঠ করিলে বোধ হয় পাঠকগণ অত্যন্ত বিস্ময়া-ভিভূত হইবেন—"সহস্র সহস্র তন্তুবায় এখন কার্য্যশূন্য, দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত এবং অনশনের দুঃসহ তাড়না তাহাদিগকে পাপ পথে আকৃষ্ট করিতেছে। সেই পুরাকালের কাশ্মীরী কারিগর এবং তন্তুবায় সকল কার্য্যাভাবে শীঘ্র শীঘ্র চৌর্য্য ব্যবসায়ী হইতেছে।"

পক্ষপাতশূন্য এবং দুরদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পাইবেন, প্রতি

বৎসর কত শত ভারত সন্তান কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে, এবং বিদেশীয় দ্রব্যের অপরিসীম আমদানিহেতু দেশী তন্তুবায়েরা বিনষ্ট হইতেছে। যাহারা পূর্ব্বে এক রকম সুখেস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত এখন তাহাদের ঘোর দুঃখ। দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদিগকেই প্রথম সাহার্য্য-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতে কি আমরা দেখিতে পাই না? দেশের আয়পন্থা সংকীর্ণ হওয়ায় আমাদের সমাজ কিরূপ বিপদাপন্ন, আমরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধ করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান সময়ে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে না পারে, কিন্তু শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক এমন সময় আসিবে, যখন আমরা কিম্বা আমাদের বংশধরগণ আমাদের বর্ত্তমান অধীন-জনোচিত সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় উপস্থিত হইব।

তন্তুবায়ের সম্বন্ধে যাহা সত্য, সূত্রধর, কুম্ভকার, রাজমিস্ত্রি, কারিগর, রংওয়ালা, জহুরী, মণিহারী, মজুর, গৃহ-নির্ম্মাণকারী, খোদাইকারী এবং শত শত বিভিন্ন শিল্পিদিগের পক্ষেও তাহাই প্রযুজ্য। সংক্ষেপে, সমুদয় দেশী শিল্প, বিদেশীয় প্রতিযোগীতায় ধৌত হইয়া গিয়াছে।

অর্থনীতিবিৎগণ কর্ত্তৃক আমরা আশ্বাসিত হইয়াছি যে, বিদেশীয় সুলভ দ্রব্যের বিরুদ্ধে আমাদিগের অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নহে, কারণ আরব্য রজনী গ্রন্থে (Arabian Nights) আমরা যে স্বর্গীয় দূতের কথা অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহার ন্যায়, উহা যাহার দ্বারে উপনীত হয়, তাহারই উপর সৌভাগ্য বর্ষণ করিতে থাকে। আরো প্রয়োজন ব্যতীত বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি হইতে পারে না। ইহা কেবল অপ্রিয় সত্য মাত্র, কারণ ভারতের ন্যায় একটী প্রদেশে যেখানে দুই এক পয়সার প্রভেদই প্রচুর বলিয়া বোধ হয়, সেখানে দ্রব্য-সুলভতা সুবিধাও বটে প্রলোভনও বটে। কিন্তু যে সুলভতা দেশীয় জীবনসাধন শিল্পকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, খঞ্জ এবং অবশেষে মৃতকল্প

করে এবং সহস্র সহস্র লোককে কর্ম্মশূন্য অথবা ভূপাতিত করে, যাহা শিথিল ডিনামাইটের ন্যায় সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার ভয় প্রদর্শন করে, তাহা আমাদিগের মধ্যে অনেকে অনুমান করিতে না পারিলেও প্রকৃতই দুর্মূল্যে ক্রয় করা হয়। আমরা বর্ত্তমান সময়ে কি গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যেই না বাস করিতেছি!

বর্ত্তমান সময়ে এত বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীরা হলাকর্ষণ করিতেছে যে, তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎগণণা করিয়া বলা যাইতে পারে যে দুই এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতবাসীকে কেবল মাত্র খাদ্য শস্য ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। ভারতীয় প্রত্যেক জীবন-সাধন শিল্পের উপরই মৃত্যুছায়া পতিত হইয়াছে এবং অচিরেই বিলুপ্ত হইবে।

বর্ত্তমান কালে ভারত হিতৈষীদিগের একমাত্র চিন্তা এই যে কিরূপে এই গতির অবরোধ করা যায়। শিল্প বাণিজ্যই যে ঐশ্বর্য্যশালী হইবার প্রধান উপাদান, ইহা অভ্রান্ত সত্য। সমাজ বিজ্ঞানের একটা প্রতিষ্ঠিত আনুমানিক বিষয় এই যে, শিল্পোন্নত জাতির সহিত কৃষিজাতির সঙ্গতরূপে তুলনা হইতে পারে না। বর্ত্তমান ইয়ুরোপ ও ভারতের আর্থিক অবস্থা অবলোকন কালে, বর্ত্তমান সময়ের সহিত টুইডুদিগের সময়ের ইংলণ্ড তুলনা করিলে প্রত্যেক সন্দিহান ব্যক্তির চিত্ত হইতে সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে। সমস্ত লোককে একমাত্র জমির উপর নির্ভর করিতে হইলে সমাজের নিশ্চিত অমঙ্গল বলিতে হইবে। বহুসংখ্যক কৃষককুলকে কদাচার এবং দুঃখে গ্রাস করিয়াছে। ভারতবর্ষে শত করা প্রায় ৮০ জন লোক চাষি কিন্তু শত করা ৯ জন মাত্র কুঠিতে ও অন্যান্য শিল্পালয়ে নিযুক্ত।

সমুদয় মৃতকল্প জীবন-সাধন শিল্পসকল পুনর্জ্জীবিত করা, পশ্চিম দেশীয় কোন উন্নতিশীল শিল্প দেশে প্রচলন করা, এবং কৃষিবিভাগে

শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস করা, বর্ত্তমান সময়ে ইহাই কেবল প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার বিষয়। সম্ভবতঃ ইহাই দেশের উপস্থিত দুর্দ্দশা-নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কি প্রকারে এই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে তাহাই পরবর্ত্তী চিন্তার বিষয় এবং উহারই উপর এই দরিদ্র ভূমিখণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

বর্ত্তমান সময়েও ভারতবর্ষে নানা শ্রেণীর শিল্পী এবং শ্রমজীবী বিদ্যমান আছে। যথোচিত উৎসাহের অভাবে হয়ত অল্প দিনেই তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। ভিজ্ঞানাপত্তম, ত্রিচিন্নপল্লী, মহিশুর, লক্ষ্ণৌ এবং কাশ্মীরের জহরতের কার্য্য; পূর্ব্ব স্থান সমূহ এবং কাছ, গুর্জ্জর, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালা দেশের অনেকানেক প্রান্তের স্বর্ণ রৌপ্যের কার্য্য; কটক, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদের জড়াউকাজ; জয়পুর এবং হায়দ্রাবাদের স্বর্ণ-রৌপ্যের পাতের সহিত মস্লিম বস্ত্রের ছাপ, লক্ষ্ণৌ এবং পুণার রৌপ্য তারের কাজ, জয়পুর এবং পরতাবগরের মীনার কাজ; পাঞ্জাব, মুঙ্গের, ভজানাগ্রাম এবং আহম্মদাবাদের লৌহের কাজ, নাগপুরের ইস্পাতের অস্ত্র; পেশওয়ার, বর্দ্ধমান, ওয়াজিরপুর, (বরিশাল) এবং শ্যামকুচের (মান্দ্রাজ) ছুরি, কাঁচি; কাশ্মীর ও শিয়ালকোটের কফতগিরি; আগ্রার মজ্জিদের কাজ; দিল্লীর মণি খোদাই; বেনারস, মাদুরা, নেলোর, তানজোর, ব্রহ্মপুরী (চান্দা মধ্য প্রদেশ), পুণা, নাসিকের পিত্তল এবং তাম্র সূত্রের কাজ; মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম এবং কাসমারীর (ময়মনসিং) থাগড়াই (কাংস্য ধাতু) দ্রব্য; মনিপুরীর (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) তারকৃসি কামের নানাবিধ প্রস্তরের অলঙ্কার; জয়পুরের মুক্তাফল সংযুক্ত অলঙ্কার; জয়পুরের স্বচ্ছ প্রস্তরের দ্রব্য; মুলতান, লাহোর, পেশওয়ার প্রভৃতির অত্যুৎকৃষ্ট মৃন্ময় পদার্থ; দিল্লীর মাটীর দ্রব্য; অমৃতসর, বেনারস এবং ট্রাভানকোরের গজদন্তের দ্রব্য; বোম্বাই, সুরাট, আহম্মদাবাদ, সাগর এবং নাগপুরের কাঠের বেকান দ্রব্য; কাশ্মীর, সিন্ধু,

গুর্জ্জর, লুধিয়ানা, দিল্লী, পাটনা এবং আরঙ্গাবাদের সূক্ষ্ম কাজ; লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, বেনারস, মুজাপুর, জব্বলপুর, ওয়ারাঙ্গল, মালবর, সলৈম, মছলিপটাম এবং তানজোরের গালিচা এবং কম্বল; পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের কোষ্টার দ্রব্য; চট্টগ্রামের বেতের কাজ; এতদ্ব্যতীত শত সহস্র প্রকারের ঝিনুক ও স্বর্ণাদি প্রতিবপন, গজদন্ত বক্র করণ, মৃন্ময় পুত্তলিকা, লাক্ষকলেপন, পালকের দ্রব্য এবং অঙ্গুরীয়ক, খেল্না প্রভৃতি বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প দ্রব্য ভারতীয় প্রকৃত শিল্পজাত—কিন্তু যথোচিত উৎসাহের অভাবে এ সকল ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

English Citizen Seriesএ "ভারতবর্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধে মিঃ জে, এস, কটন লিখিয়াছেন,—"গালিচা তৈয়ারি সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ, জহরত, ধাতব দ্রব্য, অস্ত্রের বিদ্রি, জিন লাগাম, কাপড় প্রস্তুত এমন কি গৃহনির্ম্মাণ ও খোদাই কার্য্যও একরকম বিলুপ্ত প্রায়। কোন কোন অবস্থায় এই পরিবর্ত্তন পরিতাপের বিষয়। ইহাতে কেবল যে সমাজের অর্থ নষ্ট হইতেছে তাহা নহে, জগতের শিল্প ভাণ্ডারেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে। লোকে কার্য্যপ্রণালী বিস্মৃত হইতেছে এবং বংশানুক্রমিক যোগ্যতার আদর করিতেছে না। কিন্তু ইহার পুনরুদ্ধারও সম্ভবে না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কাঁচা (raw) দ্রব্য যোগাইতেছে এবং সে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। ভারতবাসিরা যে ইহাতে সন্তুষ্ট তাহা আমরা আশা করিতে পারি না।"

শিল্প এবং সৌন্দর্য্যজগৎ যে, ভারতীয় শিল্পের অধোগতিতে কি প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সম্যক্ অনুমান করা দুরূহ। কারণ ভারতীয় শিল্পীদিগের হস্ত-চাতুর্য্য পৃথিবীর কুত্রাপি পরাভব কিম্বা সমসংস্থানলাভ করে নাই। ডাক্তার করবিস্ ওয়াটসন্ বলিয়াছেন

"আমাদের সকল প্রকার যন্ত্র এবং উহার আশ্চর্য্য প্রয়োগ বিধি দ্বারাও আমরা সৌন্দর্য্যে ও উৎকর্ষতায় কোন দ্রব্য ঢাকার সূচিক্কন বস্ত্রের (woven air) সমকক্ষ করিতে পারি নাই।" ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মিঃ ড্রুরি কোটহাম মৃৎপাত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে দেশের দূরবর্ত্তী জেলা সমূহের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে, এবং যে দেশ শিল্পকার্য্য শিক্ষা করা অপেক্ষা শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, সে দেশে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করা ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।* এই সকল শিল্পের অবনতির কথা বলিতে হইলে করুণ রসের অবতারণা করিতে হয়। বার্ডউড্ বলিয়াছেন যে, আমাদিগের শিল্পীদের কার্য্যের প্রতিদানে, পুরাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ ভারতে অনবরত থান থান স্বর্ণ রৌপ্য বর্ষণ করিতেছে। ভারতের অপর উচ্চপদস্থ সুপ্রসিদ্ধ সার আলফ্রেড্ লায়াল বলেন যে, "রোমকদিগের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবসায় ইয়ুরোপের স্বর্ণ রৌপ্য নালা কাটিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।" এখন এই সকল শিল্প বিনষ্টপ্রায়। কল কারখানা এবং প্রতিযোগীতায় দেশীয় শিল্প সকল পরাভব মানিয়াছে এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে এত দরিদ্র দেশ হইয়াছে যে, তাহাকে সম্মান করিবার আর কেহ নাই।'

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণকালে, টেরি অবলোকন করিয়াছিলেন :—"পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীরা অনুকরণ-প্রিয় প্রকৃষ্ট মর্কুট! তাহারা এত প্রতিভাশালী যে যতই কেন দুরূহ হউক না কেন, তাহারা একটী আদর্শ দেখিয়া নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে

* Quoted by Sir George Birdwood.

পারে। সুতরাং ইহা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, তাহারা তদীয় পছন্দ এবং অভ্যাসের অনুরূপ ইংরাজি আদর্শে অতি পরিষ্কার ভাবে জুতা, বুট, কাপড়, বন্ধনা, আস্তিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবে।" এখন এই সকল শিল্প কৌশল দেশে অনাদৃত অবস্থায় আছে ও এই সকল কৌশল দেখাইবার সুযোগ অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। এই রকম শিল্পনৈপুণ্য থাকা সত্বেও আমাদিগকে অবস্থা-বিপর্য্যয়ে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত নগর হইতে নগরান্তরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘুরিতে হইতেছে। সার জর্জ বার্ডউড্ বলেন, "ললিতকলার নৈপুণ্য ভারতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, উহা এখন চেঁছে ছুলে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।"

মৃতকল্প শিল্প সকল পুনর্জীবিত করাই যে কেবল আমাদের কর্ত্তব্য কিম্বা কেবল এই উদ্দেশ্যের প্রতিই লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা নহে। ইয়ুরোপীয় ভাব এবং সভ্যতা আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বহুতর অভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে, নূতন নূতন আবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়াছে এবং যে সকল দ্রব্য আমাদের পূর্ব্ব পিতা-পিতামহগণ অস্পৃশ্য বলিয়া ধর্ম্মতঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই সকল দ্রব্যই এখন আমাদের এই উন্নত অবস্থার নিত্য অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আমাদের পিতৃপুরুষদের সরল ও বিলাসহীন আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করা আমরা যতই কেন নিন্দনীয় মনে না করি, এক্ষণে বর্ত্তমান সভ্য সমাজের আচার ব্যবহারের অনুরূপ না করিয়া আমাদের গত্যন্তর নাই। পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের এই সকল অভাব ভারতের বহির্ভূত যুক্তরাজ্য অথবা মহাদেশের প্রস্তুত দ্রব্য দ্বারা পূরণ হইতেছে। এস্থলে ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এইরূপ ঘটনা স্রোতের প্রতিনিবৃত্তির জন্য আমাদিগকে সাহসের সহিত দৃঢ় এবং অবিচলিত

ভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং যতদিন না তদ্রূপ দাঁড়াইতে পারিব ততদিন এ হতভাগ্য দেশের মঙ্গল হইবে না। ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত প্রতিযোগীতায় সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত ভারতের সর্ব্বত্র জীবনসাধন শিল্পের সৃষ্টি এবং কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশের ধনীদের প্রচুর পরিমাণে মূলধন আছে, তাহা দ্বারা এই উদ্দেশ্যে সংসাধিত হইতে পারে। কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং কার্য্যের শৃঙ্খলার নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিলে তাহাতে যে কেবল দাতারাই লাভবান হইবেন তাহা নহে, তাহা সম্পূর্ণ জাতীয় লাভরূপে দাঁড়াইবে। দেশের সর্ব্বত্র যে সকল কোষ্টা, রেশম, পশম, চর্ম্ম প্রভৃতির কার্য্য হইতেছে তাহাই কেবল আমাদের লোক ও অর্থ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, আমাদের এরূপ মনে করা উচিত নহে; ছুরি, কাঁচি, সুগন্ধি দ্রব্য, চটি, বুট জুতা, ছাতা, কাগজ, পেন্সিল প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনীয় সহস্র সহস্র দ্রব্য দেশীয় শিল্পী হইতে সংগৃহীত হইতেছে। পুরাকালের একটী স্পর্দ্ধার বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত সন্তানকে নিজের কার্পাস দ্বারা বিভূষিত করে, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান ও সুদূর ভবিষ্যতেরও গৌরবের কথা। নিজ সন্তানের প্রয়োজনীয় ও যাবতীয় বিলাসিতার উপকরণ যোগাইবার জন্য ভারতবর্ষকে একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতে দাও। ভারতবর্ষ তাহার নিজোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা দেশের অভাব মোচন করিতে পারিলেই পুনরায় তাহার পূর্ব্ব-গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

ভারতবর্ষ নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিলেও তথায় এরূপ পদার্থ বর্ত্তমান আছে যে, যাহা উপযুক্ত হস্তে পড়িলে অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায়স্বরূপ হইতে পারে। ধাতু, খাদ্যদ্রব্য, জীবজন্তু, রঞ্জন দ্রব্য, তৈলাক্ত এবং রেশমী দ্রব্য, ঔষধীয় গাছগাছড়া,—যাহাই কেন আমরা

তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি না, তাহাই সে অবাধচিত্তে প্রচুর পরিমাণে আমাদিগকে প্রদান করিবে। তাহা যে এখন প্রদত্ত হইতেছে না, বা বৃথা নষ্ট হইতেছে অথবা শুধু শুধু ফেলিয়া রাখা হইয়াছে কিম্বা ইংরেজ চক্ষুর অগোচরে রহিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ভারত-বাসীরা তদ্দ্বারা জাতীয় ধনবল বৃদ্ধি করিতে নিজ দোষে সক্ষম হইতেছে না।

এই সকল শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে বহুল পরিমাণে যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভালর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক কলকারখানার প্রচলনে আমাদের ব্যয় বাহুল্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। যদ্দ্বারা সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয় তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা নিবুর্দ্ধিতার পরিচায়ক। সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের প্রতি মিঃ রাস্কিনের একান্ত অনাস্থা এই শিল্পোন্নতযুগে তাঁহার অবিবেচকতার পরিচায়ক। যন্ত্রদ্বারা কত অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং কত পরিশ্রমের লাঘব হয় তাহা মিঃ ব্যাবেজ অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Economy of Machinery and Manufactories" প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। অবাধ বাণিজ্য প্রথার কল্যাণে আমাদের যে সকল দ্রব্য ধৌত হইয়া যাইতেছে, তাহা রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে যন্ত্রের ব্যবহার করিতে হইবে। বর্ত্তমান-অবারিত প্রতিযোগিতায় এবং অস্তিত্ব রক্ষা করিবার প্রাণপণ সংগ্রামসময়ে কল-কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের পরিমাণের উপর জাতীয় প্রাধান্য নির্ভর করিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্র সুন্দর সান্ন্যাল।

নিঃস্বের বিত্ত।

একে একে ভক্তদল ল'য়ে এল পূজা-অর্ঘ্য-ভার,—
কনক মাণিক মুক্তা কুবেরের রতন-ভাণ্ডার ;
নিবেদিল কত মন্ত্রে, কত ছন্দে, সবে মহোল্লাসে,
জয়মাল্য গলে দিয়া চলে গেল নিজ নিজ দেশে।
দিবসের অবসানে, আমি শুধু যত্নে ল'য়ে এনু,
জননী চরণ হ'তে শিরে তুলি ক্ষুদ্র-ধূলি-রেণু।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

রমাসুন্দরী।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবগোপালের যে সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্য অস্তমিত, দিবালোক ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দুই দিনের পথকষ্টে, অনাহারে, অনিদ্রায় সে এত ক্লান্ত হইয়াছিল, এমনই স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা উপভোগ করিয়াছে, যে হঠাৎ জাগরিত হইয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব কথা কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না। গৃহ, শয্যাদি অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল ;—এমন কি এই প্রদোষকে তাহার ঊষাকাল বলিয়া ভ্রম জন্মিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাবে কাটিলে পর, খোলা জানালা পথে নিম্ন হইতে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি এবং গঞ্জিকার উৎকট গন্ধ তাহার শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইল। তখন নবগোপালের সহসা সমস্তই মনে পড়িয়া

গেল। হাস্যকারীর কণ্ঠস্বরও চিনিতে পারিল, সে আর কেহই নহে, স্বয়ং মুকুন্দলাল ;—নিম্নে পাঁড়েজীর সঙ্গে বিলক্ষণ গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে।

নবগোপাল তখন সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ক্রমে মুকুন্দলালকে ডাকাইয়া পাঠাইল। মুকুন্দ আসিলে নবগোপাল দেখিল, ষ্টেশনের মত এখন আর তাহার সে দীনবেশ নাই ; দিব্য ফিটফাট হইয়া সাজিয়া আসিয়াছে। মস্তকে সে পুরাতন মখমলের টুপীটির পরিবর্ত্তে একটি কুসুম্ভবর্ণের পাগড়ী ; সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম মেরজাই ; ধুতি খানির পাড়টিও একটু বাহারের। আসিয়া নিশ্বাসের সহিত গঞ্জিকা-গন্ধ বিস্তার করিয়া বলিল—"বাবুজী, এইবারে বাহর হোবেন কি ?"

নবগোপাল তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, একবার সবজীবাগে আমায় যেতে হবে। এখান থেকে কতদূর ?"

"সবজীবাগ ভারি মহল্লা। ভোপিন্ বাবুর বাঁসায় যান যদি সে দুই মৈল হোবে।"

ভূপেন্দ্রের নামোল্লেখ শুনিয়া নবগোপাল বিস্মিত হইল, কারণ সে এ পর্য্যন্ত তাহাকে বলে নাই সবজীবাগে কাহার সন্ধানে যাইবে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল "তোমায় কে ব'ল্লে আমি ভূপেন বাবুর বাসায় যাব ?"

মুকুন্দলাল মুচকিয়া হাসিয়া বলিল—"বাবুজীর সেখানে সাদী হোবে, আমি খবর পেয়েছি। বিহা বাড়ীমে যাইছি কি না তাই একটু ভেশ বানিয়ে এসেছি।" বলিয়া সলজ্জ বিনয়-সহকারে সে নিজের পাগড়ীটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

নবগোপাল লোকটার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"তোমার নেমন্তন্ন হয়েছে না কি বিয়ের দিন ?"

"লিমন্‌ত্ররণো আমার এখনও হোয় নাই বটে, কিন্তু ভোপিন বাবুর বাড়ীতে কিরিয়া করম হোলে আমারও লিমন্‌ত্ররনো হোয়।"

নবগোপাল বলিল—"তা হলে বোধ হয় এবারও হবে।—আচ্ছা এবার তবে যাওয়া যাক্ চল। একটা গাড়ী ডাকতে পার ?"

মুকুন্দলাল গাড়ী ডাকিতে গেল। এই আধা-বাঙ্গালী-আধা হিন্দুস্থানীটিকে দেখিয়া নবগোপাল কৌতুক অনুভব করিতেছিল। গাড়িতে বসিয়া সে তাহাকে তাহার সাংসারিক সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিল। মুকুন্দলাল পাণ্ডাগণের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিল। বলিল অনেক বৎসর হইতে সে এইরূপ ব্যবসায় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। বাঙ্গালী আসিলে সকলে প্রায় তাহাকেই লয়, এইজন্য পাণ্ডারা তাহার উপর অত্যন্ত নারাজ। তাহারা নাকি "আদৌতি" করিয়া বৎসরে তাহার "গ্যারহ্ রুপিয়া লাইসিন" লাগাইয়া দিয়াছে ;—পূর্ব্বে এক পয়সাও লাগিত না। সে বারম্বার বলিতে লাগিল—"পাণ্ডা-লোগ্ বড়া দিক করে বাবু, বড়া দিক্ করে।"

গাড়ী দেখিতে দেখিতে গন্তব্য স্থানে পৌছিল। পরদিন প্রভাতে আসিতে বলিয়া মুকুন্দকে নবগোপাল বিদায় করিয়া দিল। ভূপেন্দ্র তখনও কর্ম্মস্থান হইতে ফিরে নাই। বাহির বাটীতে গদাধর বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন,—রাজলক্ষ্মী দাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বারান্দায় বসিয়া খেলা করিতেছিল। নবগোপালকে দেখিবামাত্র সে, "ওরে মন্ত্রী মশাই এসেছে রে" বলিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ছুট দিল।

গদাধর অভ্যর্থনা করিয়া নবগোপালকে বসাইলেন। সে কখন পৌছিয়াছে,—কোথায় উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে সংবাদ লইলেন। গাড়ীতে বেশী কষ্ট হয় নাই ত ? বলিলেন—আঃ—পথটা ভয়ানকই দীর্ঘ ! দুই দিন ট্রেণে আহারাদির বড়ই কষ্ট। গদাধরের আবার একটু একটু অহিফেণ সেবন করা অভ্যাস আছে কি না, একটু দুগ্ধ পান না

করিলে বাঁচেন না,—তা গাড়ীতে কোথাও যদি একটুকু ভাল দুগ্ধ পাওয়া গেল! দুগ্ধ বলিলেও হয় জল বলিলেও হয়,—ধোঁয়ার গন্ধ;—কোনও কোনও ষ্টেশনের দুগ্ধ অত্যন্ত টক্ হইয়া গিয়াছিল—দুই তিন দিনের বাসী হইবে। ইত্যাদি নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

হঠাৎ রাওলপিণ্ডি হইতে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অমৃতসরে আসার কারণ নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিলে, গদাধর উত্তর করিলেন—"পাছে বাঁড়ুয্যে মশায় কোন রকমে সন্ধান পেয়ে রাওলপিণ্ডিতে এসে ব্যাঘাত জন্মান, তাই এ বন্দোবস্ত করেছি। সাবধানের বিনাশ নেই।"

তাহার পর অমৃতসরের কথা উঠিল। গদাধর বলিলেন স্থানটি দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। এ দুই দিনে তিনি সহরের অনেক অংশই দেখিয়া লইয়াছেন। অদ্য প্রভাতে দরবার সাহেব দেখিতে গিয়াছিলেন। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে দরবার সাহেবের মন্দির। জলের উপর মর্ম্মর প্রস্তরের সেতু আছে, তাহা দিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ সোনার পাতে মোড়া। ভিতরে সুর করিয়া গুরু "গ্রন্থ" পাঠ করেন। নবগোপাল অমৃতসর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই যেন তাহা দেখিয়া যায়।

ক্রমে ভূপেন্দ্র বাটী আসিল। লোকটি খর্ব্বাকার, বয়স অল্প কিন্তু দেহখানি কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া পড়িয়াছে। নবগোপালকে দেখিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল। পরে বলিল—"আমাকে একটু মাফ্ করবেন্,—আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে এই ধড়াচূড়োগুলো ছেড়ে আসি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে, আফিসের বেশ পরিত্যাগ করিয়া, একটি জ্বলন্ত কলিকায় ফুৎকার দিতে দিতে ভূপেন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। কলিকাটি গদাধরের পার্শ্বরক্ষিত আলবোলায় বসাইয়া বলিল—"তামাক্ ইচ্ছে করুন চাটুর্য্যে মশায়।"

চট্টোপাধ্যায় ধূমপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূপেন্দ্র নবগোপালের

সহিত গল্প আরম্ভ করিল। বলিল—"তার পর নবগোপাল বাবু—বাড়ী চিনে এলেন কি করে বলুন দেখি।"

নবগোপাল তাহার পথ-প্রদর্শকের উল্লেখ করিল।

ভূপেন্দ্র বলিল—"তা হলে মুকনা আপনাকে ঠিক পাকড়েছে দেখ্‌ছি। আমি বলেছিলাম কিনা চাটুর্য্যে মশায়! চাটুর্য্যে মশায় বলছিলেন আপনি কবে কোন গাড়ীতে আসবেন কিছুই খবর পাওয়া গেল না, এসে কোথায় নামবেন—কি করে আমাদের সন্ধান পাবেন, তাই উনি ভাবছিলেন। আমি বল্লাম কিছু ভাববেন না—চাটুর্য্যে মশায়, মুকনা আছে ইষ্টিশানে বসে, ঠিক আন্‌বে। কেউ বাঙ্গালী নামলে ও তাকে একবারে ছোঁ মেরে তুলে নেয়। আপনাকে প্রথমে গিয়ে কি ব'ল্লে? বাবু, আমি একটি বাঙ্গালী হচ্চি বলেনি বোধ হয়?"

নবগোপাল হাসিয়া বলিল—"ঠিক ঐ কথাই বলেছে। ওটা বোধ হয় ওর বাঁধিগৎ?"

"তা হলে আবার ধরেছে। দিন কতক গৎ বদলে দিয়েছিল। হয়েছিল কি জানেন না বুঝি? একবার কলকাতা থেকে একজন ভারি তিরিক্ষে মেজাজের বাঙ্গালী এসে নামে। বাবুটির লগেজ হারিয়ে গিয়েছিল। তার উপর ওপারের প্লাটফর্ম্মে পাণ্ডাগুলো ভার তাকে বিরক্ত করেছিল। এ পারে যাই সে দাঁড়িয়েছে আর অমনি মুকনা গিয়ে তাকে বলেছে—'বাবু আমি একটি বাংগালি হচ্চি'। এই যাই বলা আর লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মারমূর্ত্তি ধারণ করে ওকে বলেছিল—'তুমি একটি আস্ত গোভূত হচ্চ' আরও অনেক কটু কাটব্য করেছিল। পাণ্ডারা তাই নিয়ে ওকে ভারি ঠাট্টা করত,—বেচারি দিক্ সিক্ হয়ে গিয়েছিল।"

নবগোপাল বলিল—"আহা বেচারি বড় ভাল মানুষ। ব'ল্লে ও একটি কায়স্থ।"

ভূপেন্দ্র বলিল—"ওর বাপ কায়স্থ ছিল বটে। ওর মা এই দেশের গয়লার মেয়ে।"

"বটে! ও কি রকম করে খবর পেয়েছে যে আমি বিবাহ করতে এসেছি?"

"ও লোকটার কাছে সব খবর আছে। ও একটি গেজেট বল্লেই হয়।"

"বলছিল বোধ হয় আপনি এ বিয়েতে ওকে নেমন্তন্ন করবেন?"

"হ্যাঁ, ওকে না নেমন্তন্ন করলে রক্ষে আছে? ভারি অভিমান ওর। বলে 'আমি বাঙ্গালী কিন্তু গরীব বলে আমার জাত ভাই আমায় পোঁছে না' ওকে নেমন্তন্ন করতেই হবে।"

চট্টোপাধ্যায় ধূমপান করিয়া আলবোলাটি ভূপেন্দ্রের দিকে সরাইয়া দিলেন। ভূপেন্দ্র সেটি লইয়া, বন্ধুপিতার প্রতি সমীহবশতঃ, বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ ধূমপান করিয়া আসিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ভূপিন দা,—ঠান্দি তোমায় ডাক্‌ছে।"

বাহির হইতে রাজলক্ষ্মার কণ্ঠস্বর। ভূপেন্দ্র বলিল—"রাজু ভিতরে আয় না,—কে এসেছে দেখ্‌।" সহসা রাজলক্ষ্মীর এমনই লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে যে, সে আর কিছুতেই আসিবে না। নবগোপাল মৃদুপদে বাহিরে গিয়া খপ্‌ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ভিতরে আনিল।

অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভূপেন্দ্র বলিল—"নবগোপাল বাবু, আমার ঠানদি আপনাকে দেখ্‌তে চান—একবার বাড়ীর ভিতর আস্‌তে হচ্চে।"

নবগোপাল উঠিয়া ভূপেন্দ্রের অনুসরণ করিল। পথে যাইতে যাইতে ভূপেন্দ্র নবগোপালের কর্ণে বলিয়া দিল—"ঠানদিকে একটা

প্রণাম করতে ভুলবেন না, নৈলে বুড়ী মহা চটে যায়।” উঠান পার হইয়া বারান্দায় উঠিয়া নবগোপাল একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল একটি গৌরবর্ণা বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। নবগোপালকে দেখিবামাত্র বলিলেন—“ওমা এই যে বেশ বর, খাসা বর, রাঙা টুকটুকে বর!”

নবগোপাল ঠানদিকে প্রণাম করিল। ঠানদি বলিলেন—“কি বলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব ভাই? রাজরাজেশ্বর হও বলব না—আরও তার চেয়ে একটা ভাল আশীর্ব্বাদ আছে তাই করব?”

ভূপেন্দ্র বলিল—“ভাল থাকতে মন্দটা নবগোপাল বাবু নেবেন কেন ঠান্‌দি? ভালটাই কর।”

ঠান্‌দি বলিলেন—“আচ্ছা তবে ভালটাই করি। রমার বর হও।”

ভূপেন্দ্র উচ্চস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। বলিল—“সবাই যদি এই রকম বুঝে সুঝে বরদান করে তা হলে এমন কি কলিকালেও কোনও বর নিষ্ফল হয় না।”

ঠান্‌দি ভূপেন্দ্রের প্রতি কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার কর্ণ মর্দ্দন করিবার উপক্রম করিলেন। বলিলেন—“আমাকে রাগাবি যদি তবে তোর বউকে একটা নতুন ‘বর’ দান কর্‌ব।”

ভূপেন্দ্র হাসিতে হাসিতে নবগোপালকে বলিল—“আপনি বসুন,—আপনাকে ঠানদির জিম্মায় রেখে চল্লাম। আমি বাইরে গিয়ে চাটুর্য্যে মশায়ের জলযোগের খবর নিই।” বলিয়া ভূপেন্দ্র সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

নবগোপাল ঠান্‌দির অনুরোধে জলযোগে বসিয়াছিল। ঠান্‌দি তাহার নিকটে উপবেশন করিয়া বলিলেন—“ভালই হ'ল। দুজনে নিরিবিলিতে একটু মনের কথা কয়ে নিই।—তার পর ভাই, বল দিকিনি,—আর কখনও বিয়ে করেছ—না এই হাতে খড়ি?”

"এই হাতে খড়ি ঠান্‌দি।"

"তা তোমার বেয়াকুব চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি! বিয়ে করতে হলে কি কি করতে কর্ম্মাতে হয় কিছু জান টান?"

নবগোপাল একখানি জিলাপী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল—"একেবারেই না।—আপনি শিখিয়ে দিন।"

"আচ্ছা, প্রথমতঃ একটা টোপর চাই—টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে আস্‌তে হয়। চেলী পরে, টোপর মাথায় দিয়ে, জরির জুতো পায়ে দিয়ে—বিয়ে করতে আসতে হয়। কলকাতা থেকে আসছ শুনলাম,—এ সব সংগ্রহ করে এনেছ?"

"না।"

শুনিয়া ঠান্‌দি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। বলিলেন—"ভাই হে! তবে তোমার দ্বারা হবে না—তুমি যাও। আমরা রমার জন্যে অন্য বর ঠিক কর্‌ব।"

নবগোপাল বলিল—"সে কি ঠান্‌দি—গঙ্গার মাঝে এনে নৌকা ডুবাবেন না!—আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম;—আমায় রক্ষা করুন।"

ঠান্‌দি বলিলেন—"তোমার যদি ভক্তি থাকে তা হলে রক্ষা কর্‌তে পারি।"

"খুব ভক্তি আছে, কি করে প্রমাণ দিই বলুন?"

"আচ্ছা তবে ঐ বালুসাইটে ফেলে না রেখে খেয়ে ফেল দিকিন লক্ষ্মীটির মত।"

নবগোপাল মুহূর্ত্তের মধ্যে ভক্তির প্রমাণ দিয়া দিল।

ঠান্‌দি খুসী হইয়া বলিলেন—"চেলী, জরীর জুতো এখানে পাওয়া যাবে—তার জন্যে ভাবিনে। টোপরটার জন্যই ভাবনা। সেরেস্তাদার বাবুর ছেলের বিয় হল আর বছর, এইখান থেকেই টোপর তৈরি

করিয়েছিল শুনলাম। কোথা তৈরি করালে তাদের বাড়ী দাই পাঠিয়ে খবর আনাচ্ছি দাঁড়াও।"

নবগোপাল বলিল—"আর কি দরকার হয় ঠান্‌দি ?"

"কনেকে গায়ে হলুদ পাঠাবার শাড়ী টাড়ী সব এনেছ ?"

"না। এখানে পাওয়া যাবে বোধ হয় ?"

"তা পাওয়া যাবে। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর রেশমের শাড়ী পাওয়া যায়, পছন্দ করে কিনতে পার যদি।"

"আপনি যদি ঠান্‌দি কেনবার সময় আমার সহায় হন। আপনি গাড়ীর ভিতর বসে থাকবেন আমি শাড়ী এনে আপনাকে দেখাব। আমার হয়ে আপনাকে পছন্দ করে দিতে হবে।"

ঠান্‌দি সম্মত হইলেন। বলিলেন—"আর একটা কথা। আমি সবই শুনেছি। বিয়ের পর কোথায় গিয়ে থাকবে ?"

"এখনও ত ঠিক করিনি। পাঞ্জাবেই আপাততঃ থাকব কোথাও।"

"আমার কথা শুনবে ?"

"কি বলুন ?"

"অমৃতসরেই থাক এখন। বেশ জায়গা অমৃতসর। আমি বারো বচ্ছর আছি—আমি জানি।"

নবগোপাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"বেশ। এইখানেই এখন থাকব।"

"তুমি যে বাড়ীতে উঠেছ সে কেমন বাড়ী ?"

"মন্দ নয়।"

"আসবাব পত্র কিছু আছে ?"

"সামান্য।"

"তা হলে ত সে সব চাই। আমার রমা ত একটা খালি যাত্রী

বাড়ীতে গিয়ে দুধে আলতায় পা দিতে পারবে না। সে বাড়ী সাজাতে হবে। পারবে ?"

নবগোপাল ঠান্‌দির নিতান্ত আত্মীয়বৎ পরম-অমায়িক ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সে সাহস করিয়া একটা প্রস্তাব করিল। বলিল—"ঠান্‌দি, আপনি যদি দয়া করে এ দুদিন আমার বাড়ীতে এসে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেন, বলে কয়ে দেন,—তা হলে বড় ভাল হয়। যদি আপনার হুকুম পাই তা হলে কাল সকালে এসে গাড়ী করে আপনাকে নিয়ে যাই, আবার সন্ধেবেলা এনে রেখে যাই, পরশুও ঐ রকম করি—নইলে ত আর কোনও উপায় নেই ঠান্‌দি।"

ঠান্‌দি গম্ভীর হইয়া একটু চিন্তা করিলেন, পরে সস্মিত বদনে বলিলেন—"আমার কি প্রাণের ভয় নেই মনে করেছ ভাই ?"

"কেন ?"

"আমায় নিয়ে যাবে—আর তোমার কনেটি কি আমায় আস্ত রাখবে ? বলবে 'তুমি কেন সমস্তদিন আমার বরকে বেদখল করে রাখ্‌লে ?'—কে বাড়ী এসে ঝগড়া করে মর্‌বে বাবু !"

নবগোপাল বলিল—"দখল হবার আগে ত বেদখল হতে পারে না। এ দুদিন ত আমি নাওয়ারিশ,—সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমায় দখল করুণ ঠান্‌দি।"

এইরূপ হাস্য পরিহাসের পর স্থির হইল পরদিন প্রভাতে আসিয়া নবগোপাল ঠান্‌দিকে লইয়া যাইবে।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রেম পরীক্ষা।

শিখা কয়, পতঙ্গ রে মোরে
    ভালবাসি ম'রেছ দহিয়া,
ক্ষণিকের দাহন জ্বালায়,
    মুহূর্ত্তের যাতনা সহিয়া।

রে প্রেমিক, ঐ জ্বালা সহি
    আমি শিখা সদা প্রাণ ধরি ;
প্রাণে মোর জ্বলন্ত অনল,
    দহে মোরে দিবস সর্ব্বরী।

বারিদ কহিল চাতকীরে
    শোন শোন ওরে ক্ষুদ্র পাখী,
বজ্রালোকে মরিলি পুড়িয়া !
    শত বজ্র আমি বুকে রাখি।

শ্রীনিশিকান্ত সেন।

কবি দণ্ডী।

দশকুমার চরিত এবং কাব্যাদর্শ প্রণেতা কবি দণ্ডী, মহাকবি কালিদাসের পরবর্ত্তী, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল, ঐ সময়ের কত পরে, তাহাই এই প্রবন্ধে নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব। বলিয়া রাখি, যে কালিদাসের সময়, প্রায় ৫০০ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

হর্ষচরিতে যেমন সুস্পষ্টভাবে সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তার উল্লেখ দেখিয়া, অনায়াসেই বাণভট্টকে সুবন্ধুর পরবর্ত্তী বলা যায়, দশকুমার চরিতের বাসবদত্তাকথার উপন্যাস হইতে, দণ্ডীর বিষয়ে সহসা তেমন কিছু বলা যায় না। খুব পরিস্ফুট না হইলেও, কবিদণ্ডী যে সুবন্ধুর গ্রন্থের নায়িকাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা ঐ কথা-প্রসঙ্গ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। বৃহৎকথা হইতে রত্নাবলীর গল্পভাগ সংগৃহীত; রত্নাবলীর বাসবদত্তা, উদয়ণকথার বাসবদত্তা। কিন্তু সুবন্ধুর বাসবদত্তার আখ্যায়িকা, কবির স্বকপোলকল্পিত। কবি নিজেও সে কথা বলিয়াছেন, এবং ঐ গল্প পড়িয়াও তাহা জানা যায়। বৃহৎ কথা বা কথাসরিৎসাগরের বাসবদত্তা, প্রণয়ীর সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, নিজে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহিতা হয়েন নাই। কাজেই দশকুমার চরিতে যখন রমণীর পক্ষে স্বয়ং গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিবার বিধিস্বরূপে, বাসবদত্তার নজীর দেওয়া হইয়াছে, তখন কবিদণ্ডী যে সুবন্ধুর বাসবদত্তাকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে যেন সন্দেহ থাকে না।

দশকুমার চরিতে বলভী রাজাদিগের কথা উল্লিখিত আছে। সেনাপতি ভট্টারক যখন গুর্জ্জর জয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি গুপ্ত রাজাদিগের সেনাপতি মাত্র। যত দিন পর্য্যন্ত গুপ্তরাজাদিগের রাজ্য বিধ্বস্ত হয় নাই, তত দিন ইঁহার বংশধর বলভীরাজগণ, মহাসামন্ত বা মহাদণ্ড নায়ক নাম গ্রহণ করিয়া গুপ্তদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইঁহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মহারাজাধিরাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালিদাসের সময়ে বলভীগণ নূতন রাজা বলিয়া, প্রাচীন ইন্দুমতী-স্বয়ম্বরের প্রসঙ্গে উহাদের নাম নাই।

উল্লিখিত দুইটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কবিদণ্ডীকে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, সুবন্ধুর পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। সুবন্ধুর বাসবদত্তা যে ৫৭০ হইতে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত, এ-বিষয়ে অন্য প্রবন্ধ

লিখিয়াছি। বাণভট্ট যে হর্ষবর্দ্ধনের সময়ের কবি, তাহা সকলেই জানেন; এই হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ৬০৫ হইতে প্রায় ৬৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কবিদণ্ডী, বাণভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী কি না তাহার বিচার করা যাউক।

কবিদণ্ডী, বাণভট্টের মত শবর কিরাতদিগের কথা, শ্মশানের চণ্ডীকামন্দিরের কথা, রুধির বলির কুপ্রথা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতির মালতীমাধবে যেমন বৌদ্ধভিক্ষুনীকে বিবাহসংঘটনে নিযুক্তা দেখিতে পাই, দশকুমারচরিতেও সেই প্রকার শাক্যভিক্ষুকী ধর্ম্মরক্ষিতাকে কামঞ্জরীর প্রধানা দূতীরূপে প্রাপ্ত হই। এই সকল কবিদিগের সময়ে সামাজিক অবস্থা যেন একই রকমের ছিল। কিন্তু বাণভট্টের রচনায়, প্রাকৃতের বহুল প্রচলনের ফলে, অনুস্মৃতিমূলক শব্দের যত আধিক্য দেখা যায়, দণ্ডীতে তাহা নাই। এ বিষয়ে দণ্ডীর রচনা সুবন্ধুর অধিক নিকটবর্ত্তী। 'ভেরী ঝংকারেণ, 'কল্লোল' 'কোলাহল' প্রভৃতি শব্দ আছে বটে, কিন্তু বড়ই ক্বচিৎপ্রযুক্ত। কেহ বলিতে পারেন, যে, যে শ্রেণীর শব্দব্যবহার, সুবন্ধু এবং দণ্ডীর সময়ে অল্প, তাহা কি সহসা বাণভট্টের সময়ে একেবারে এত অধিক হইতে পারিয়াছিল? দণ্ডী যদি সুবন্ধুর ১০ বৎসরের পরবর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলেও তিনি বাণভট্টের ২০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। ২০ বৎসরের মধ্যে যে ভাষায় যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা এ কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেও স্বীকার করিতে হইবে।

দশকুমারচরিতের উপাখ্যান হইতে, রচনাকাল সম্বন্ধে একটি আভ্যন্তরিক প্রমাণ প্রদান করিতেছি। এতৎ সম্বন্ধে গুপ্তরাজাদিগের রাজত্বের শেষ সময়ের ইতিহাস হইতে কএকটি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

স্কন্দগুপ্ত বড় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর

হূনেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়া মালব দেশ অধিকার করিয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের প্রভাবে রাজ্য সুরক্ষিত হইয়াছিল মনে করিয়া, তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা চিন্তাশূন্য হইয়া সময়ক্ষেপ করিতেছিলেন, এই সময়ের শাসনবিষয়ের শিথিলতার সুবিধায়, হূনেরা গুপ্ত সম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া যশস্বী হইয়া উঠিল ; এবং হূনপতি তোরমান, সদর্পে দেশ জয় করিতে লাগিলেন। স্বরাজ্য ভ্রষ্ট হইবার পর, বুধগুপ্ত এবং ভানুগুপ্ত প্রভৃতি যে মালবের কোন্ ভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু যে পরিব্রাজক মহারাজগণ গুপ্তদিগের গৌরব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা যে "অষ্টাদশ মহারণ্য"-বেষ্টিত দেশে রাজত্ব করিতেন, তাহা সংক্ষোভের ৫২৮ খৃষ্টাব্দের দানপত্র হইতে জানিতে পারা যায়। এই গোলযোগের সময়ে, বর্দ্ধনরাজারা কানোজে, এবং মৌথরীবর্ম্মনেরা পূর্ব্বপ্রদেশে প্রবলতা লাভ করেন। গুপ্তদিগের বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া, কৃষ্ণগুপ্ত প্রভৃতি মগধগুপ্তগণ, দেশে রাজাধিরাজ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই নূতন গুপ্তগণ এবং মালবসেনাপতি যশোবর্ম্মা, ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তোরমানের পুত্র মিহিরকুলকে পরাজয় করিয়া হূনগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। বর্ম্মনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং কানোজের বর্ম্মনদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া, প্রায় ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মগধগুপ্তদিগের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশকুমারচরিতের গল্প, যে উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি। "মগধরাজগণ অনেকবার মালব জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যখন রাজ্য সুরক্ষিত ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট এবং অসতর্কভাবে কাল যাপন করিতেছিলেন, তখন মালবেশ্বর মানসার (তোরমানের প্রতি লক্ষ্য নহে ত ?), মগধপতিকে পরাজয় করিয়া পাটলিপুত্র অধিকার করিলেন। সোমকুলতিলক মগধপতি বনে বাস করিতে লাগিলেন ; এবং ঐ বনেই কুমার রাজবাহনের জন্ম হইল।

যে সকল রাজা মগধের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সংহার-বর্ম্মা, চণ্ডবর্ম্মা প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। মালবরাজ মানসারের পুত্রের নাম, দর্পসার ; এই নামগুলি নিন্দাবাচক সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অনেক দিনের পর, কুমার রাজবাহন, অন্য ৯ জন রাজকুমারের সাহায্যে মগধরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন।" এই গেল দশকুমারচরিতের মূল কথা। ইতিহাসের সহিত যে আখ্যায়িকাটির সম্পূর্ণ মিল আছে, তাঁহা দেখা গেল। এই গল্প যখন নিশ্চয়ই মগধ-রাজের গৌরবের জন্য লিখিত হইয়াছিল, এবং দণ্ডী যখন সুবন্ধুর পরবর্ত্তী বলিয়াই সম্পূর্ণ মনে হইতেছে, তখন ৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে মহাসেন গুপ্তের সভায় দশকুমারচরিত রচিত, তাহা মনে করা যাইতে পারে। বর্ণিত বিষয়টি লইয়া আরো পরেও গ্রন্থরচনা হইতে পারিত, কিন্তু দণ্ডীর রচনা বাণভট্ট অপেক্ষা সুবন্ধুর অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া, ৫৯০ খৃষ্টাব্দেই দশকুমারচরিতের রচনাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল।

দশকুমার চরিতে একটি কৌতুকজনক কথা পাওয়া যায়। একটা খাঁটি আর্য্যপল্লীতে কুক্কুটের লড়াইএর বর্ণনা আছে। ও গুলি কি কেবল বুল্‌বুলের মত লড়ায়ের জন্যই পোষা হইত? যাহা হউক, পক্ষীগুলির প্রতি যে কোন বিদ্বেষ ছিলনা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পক্ষীদিগের বড় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। কুক্কুটদিগের মধ্যে একদল নারিকেল জাতীয় ; সেগুলির মেটেরং, এবং বেশ বড় বড়। অন্যদল, বলাকাজাতীয় ; সেগুলি শাদা, এবং একটু ছোট। ইহা দেখিয়া দণ্ডীকে কেহ কেহ অতি প্রাচীন বলিতে চাহেন। কিন্তু সেটা যুক্তি-সঙ্গত কথা নহে। দণ্ডী নিশ্চয়ই মনুর পরবর্ত্তী ; অথচ মনুতেও গ্রাম্য কুক্কুট নিষিদ্ধ। দণ্ডীকে প্রাচীন না বলিয়া, বরং এই কথা বলা সঙ্গত, যে শাস্ত্রের বিধানটি হয়ত পূর্ব্বকালে বড় কঠোর ছিলনা ; সাধারণ নিষেধবাচক বিধি মাত্র ছিল। মনুর বিধানের প্রতি দৃষ্টি করিলেও

দেখিতে পাই, যে ছত্রিকা (বেঙের ছাতি), রসুন, পলাণ্ডু প্রভৃতির সহিত, এক শ্লোকেই গ্রাম্য কুক্কুট নিষিদ্ধ হইয়াছে। অন্যগুলি যখন বঙ্গদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্রই প্রকাশ্যভাবে সকল হিন্দুর ব্যবহার্য্য, তখন বিধানটিকে খুব কঠোর বলিয়া মনে হয় না।

উপসংহারকালে বলিয়া রাখি, যে মল্লিকামারুত প্রণেতা দণ্ডী, স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি দশম শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমদেব চোলের আজ্ঞায় ঐ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইনি নিজেই সে সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম উদ্দণ্ড, এবং অপর বা দ্বিতীয় নাম ইরুগুপনাথ। এই নামটা তৈলঙ্গী, এবং কবির নিবাসও ঐ প্রদেশে বলিয়া মল্লিকামারুতেই লিখিত আছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শক্তিতত্ত্ব।

ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল ও বৈচিত্র্য প্রবন্ধে পুরাণ সম্বন্ধে ও মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে সামান্যতঃ যাহা বলা হইয়াছে মার্কণ্ডেয় পুরণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে উদাহরণ দ্বারা তাহারই সমর্থন ও শক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিবার যত্ন করা যাইবে। শক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করা মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধির পক্ষে অতিশয় দুষ্কর। আমার বিশ্বাস যে আনন্দময়ী কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াই বামন হইয়াও প্রাংশুলভ্য ফললাভে উদ্বাহু হইয়াছি। মায়ের সকল কথা অনেক সময় সন্তানের কাণে উঠে না, উঠিলেও অনেক সময় সে তাহার সবগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণে সক্ষম হয় না। সুতরাং এই শক্তিতত্ত্ব প্রবন্ধে যাহা কিছু দোষ লক্ষিত হইবে, তাহা লেখকের, আর যদি কিছু গুণ লক্ষিত হয় তাহা গুরু ও দেবতার।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী আমাদের এক অমূল্য রত্ন। ইহার মহিমা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর, সকলেই ইহার নিকট নতমস্তক। সকলেরই বিশ্বাস যে ইহা এক মহাসিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র। পুরাণের আর কোন অংশই এরূপ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে পূজনীয় হয় নাই। কিন্তু ঐহিক সিদ্ধির জন্যই ইহার অধিক আদর দেখা যায়। অপুত্রক পুত্র কামনায়, নির্ধন ধনকামনায়, শত্রুপীড়িত শত্রুনাশমানসে, রোগী রোগোপশমার্থে ইহার আরাধনা করিয়া থাকে। মায়ের কাছে ছেলে যাহা করে, লোকেও চণ্ডীর নিকট তাহাই করে। আমাদের বিশ্বাস যে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শক্তিতত্ত্বের প্রকৃতভাব বিস্পষ্ট করা আছে বলিয়াই ইহার এত আদর, ইহার এত মহিমা। ইহাকে সাক্ষাৎ শক্তির স্বরূপ মনে করা হয়। দর্শনকারগণ ঘটত্ব পটত্ব তদাকারকারিত্ব প্রভৃতি করিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অতি সরলভাবে তাহা সকলের বোধগম্য করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিষয় যতই ভাবা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় ইহার স্তরে স্তরে রাশি রাশি রত্ন নিহিত রহিয়াছে। আলোক আঁধারে পড়িয়া লোকে তাহা দেখিতে পায় না, কেহ বা দেখিয়াও চিনিতে পারে না। অনন্তরত্নের আকর মহাশক্তির অভিব্যক্তিস্বরূপ এই মহাসিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্রের আশ্রয়ে যদি শক্তিতত্ত্বের কিছুমাত্রও প্রকাশিত করিতে পারি সে বিষয়ে যত্নবান হইলাম, সিদ্ধি মায়ের হাতে।

প্রস্তাবনা।

মহাপরাক্রান্ত সুরথ নামে নরপতি পররাষ্ট্রে শত্রু কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া স্বদেশে আসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দুষ্টবুদ্ধি অমাত্যগণ ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্য শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল। রাজা মৃগয়া ব্যাজে অশ্বারোহণে গহনরবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একাকী

বসিয়া রাজা কত কি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সঞ্চিত ধনরাশির কি হইবে—নাজানি কতই অপব্যয় হইবে। তাঁহার প্রধান হস্তী আদরের বস্তু—আহা তাহার দশা কি হইবে। তাঁহার চাকর বাকর মোসাহেব দল অপরের সেবা করিবে। দুঃখে রাজার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পুত্রদের কি হইল, তাঁহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের কি হইল—এভাবনা রাজার নাই। তাহাদের বিষয় একটী কথাও ত রাজার মুখে বাহির হইল না। মৃগয়া ব্যাজ কাহার নিকট? ভার এড়াইবার জন্য স্ত্রী পুত্রের নিকট। ধন্য কবিত্ব—কি চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। ধনীরধন অপেক্ষা আদরের দ্রব্য, যত্নের বস্তু, ভালবাসার জিনিস আর সংসারে কিছুই নাই। ধন তাঁহার স্ত্রী অপেক্ষা, পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর। তিনি জানেন ধন থাকিলে শত শত স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন মিলিবে। সুতরাং ধননাশের জন্যই তাঁহার পরিতাপ। তিনি যে হস্তীতে স্বয়ং আরোহণ করিতেন, অপরে তাহাতে আরোহণ করিবে, যে মোসাহেবেরা তাঁহার তোষামদ করিত, তাঁহারা অপরের মোসাহেবী করিবে তাই তাঁর বুক ফাটিয়া যাইতেছে—স্বার্থপূজায় স্বার্থ সেবার এমন সুন্দর চিত্র আর দেখা যায় না। Kingship knows no Kinship—রাজপদ আত্মীয়তা জানে না। সেই বনেই সমাধি নামে এক বৈশ্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সে বেচারা ধনী অথচ গৃহস্থের ছেলে, আপনাকে ভাগ করিয়া দশ জনকে দিয়া বসিয়াছে। অথচ যাহাদের দিয়াছে সেই স্ত্রী পুত্রেরাই নির্ম্মম হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। "যার জন্য কর চুরী সেই বলে চোর"। এই মনুষ্যসমাজের মধ্যস্তরের ব্যাপার। রাজার ব্যাপার উপরের[illegible]নের। বেচারা বৈশ্য আপনাকে ভাগ করিয়া দিয়া বসিয়া আছে, তাই সে কৃতঘ্ন নির্ম্মম স্ত্রীপুত্রপরিবারকে ভুলিতে পারিতেছেনা। সে কৃতঘ্ন নির্ম্মম স্ত্রীপুত্রের কি হইল তাহা ভাবিয়াই আকুল, বেচারার মুখে

ধন ঐশ্বর্য্যের একটী কথাও নাই। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বৈশ্য রাজাকে আত্মবৃত্তান্ত সমস্তই খুলিয়া বলিল। তখন রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "যৈর্নিরস্তো ভবান লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্।" ধনের নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া যে দারাপুত্র তোমায় দূর করিয়া দিয়াছে তাহাদের উপর তোমার এত স্নেহ কেন? বিস্ময়ের কথা বটে। মহারাজ! মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, আপনার প্রাণ; তৎসাধনোপযোগী বস্তুজাত আপনার আদরণীয়; স্ত্রীপুত্র পরিবার ত সকলেরই থাকে, সেত একটা সাধারণ বস্তু, তাহা গজ, রত্ন, ছত্র চামর, সৈন্যসামন্তের ন্যায় মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে, সুতরাং আপনার তাহাতে মমতা না হইতে পারে। বৈশ্যও ধনীর ছেলে, কিন্তু সে গৃহস্থের ছেলে, তাহার ভাবও গৃহস্থের, সংসারের সুখ তাহার লক্ষ্য, বেচারা আদানপ্রদানে সেই সুখলাভ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু ব্যবসায় ঠকিয়াছে (এরূপ অনেকেই ঠকেন) তাই বেচারা দুঃখী, তাই বেচারা কাতর। তাই বৈশ্য সরলভাবে উত্তর দিতেছে।

"যৈ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ,
পতি স্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেম প্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসা দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্ব প্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥

যে পুত্রগণ ধনলোভে পিতৃস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া, যে স্ত্রী স্বামী-স্নেহ পরিহারপূর্ব্বক, যে আত্মীয়েরা স্বজন স্নেহ তাগ করিয়া আমায় দূরীভূত করিয়াছে, তাহাদেরই উপর আমার মন স্নেহপ্রবণ। জেনে শুনেও নির্ম্মম আত্মীয়গণের প্রতি চিত্ত কেন যে প্রেমপ্রবণ হয়, তাহা বুঝিতে পারি না॥ তাহাদের জন্য আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে,

চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইতেছে, নির্ম্মমদিগের প্রতি চিত্ত নিষ্ঠুর হয় না কি করি বলুন।

সমস্যা অতি বিষম বটে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সমাজের প্রথম ও মধ্যস্তরের কথা বলা হইল। নিম্নস্তরের কথার কোন উল্লেখ হইল না কেন? উত্তর অতি সহজ। নিম্নস্তরস্থ লোক সাধারণতঃ মধ্যস্তরেরই অনুকরণে চলিয়া থাকে, তাই নিম্নস্তরের কোন উল্লেখ নাই। আর এক কথা, প্রথম ও মধ্যস্তরের লোকেরই মেধসমুণির নিকট যাইবার অধিকার, নিম্নস্তরের তাহা নাই। পাঠক বিরক্ত হইবেন না ও তত্ত্বান্বেষী তত্ত্বদর্শী ও বিচারাত্মক মেধা প্রথম ও মধ্যস্তরেই দৃষ্ট হয়। মানবহৃদয়ারণ্যে এই মেধস্ মুনির আশ্রম, ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হয়।

রাজা ও বৈশ্য আপন আপন সমস্যার মীমাংসায় অক্ষম হইয়া মেধস্ মুনির নিকট গমন করিলেন। উভয়ে মুনিকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া উপবিষ্ট হইলে, রাজা কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"দেব, জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞানের ন্যায় আমাদের দোষ পূর্ণ বিষয়ে সকলে চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে কেন?

দেবীমহাত্ম্যের সূত্রপাতে এই প্রশ্ন হইল। মনুষ্যমাত্রেই কোন না কোন বিষয়ে আসক্ত। তাহা দোষযুক্ত হইলেও সে তাহার দোষ দেখে না, তাহা অশাশ্বত হইলেও শাশ্বত মনে করিয়া লয়, কুৎসিত হইলেও সুন্দর মনে করে। লাথি খাইয়াও ভালবাসে। এ পাগলামী না কি? বৈদান্তিক উত্তর করিবেন—অজ্ঞানের কায মায়ার কার্য, এবং আপন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে তাঁহাকে ঝুড়ি ঝুড়ি ঘটত্ব পটত্ব আনিয়া ফেলিতে হইবে। সাধারণ লোকে তাহা বুঝে না, হাঁ করিয়া থাকে, তাই মহর্ষি মেধা ঘুরাইয়া নাক না দেখাইয়া সরলভাবে সরল কথায়

বুঝাইতেছেন। ইনিও বলিতেছেন এ মহামায়ার কার্য্য "তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।" তিনিই জগৎকে সংমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

দেবী ভগবতী মহামায়া বলপূর্ব্বক জ্ঞানীগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মোহে মুগ্ধ করেন। এখন প্রশ্ন হইবে এই মহামায়া কি বা কে? বৈদান্তিক সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বাক্যসাগর প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন। আর মেধা বলিতেছেন—মায়া নয় মহামায়া অর্থাৎ হেয়া নয়, মহাপূজ্যা। কা মায়া? মায়া কি? উত্তর হইল মা যা—যিনি মা, যিনি জননী, বৈষ্ণবী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি, যিনি মূলা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি:—

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সাবিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

তিনিই এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করেন, তিনিই প্রসন্না হইয়া বরদা হইলে নরগণের মুক্তির হেতু হয়েন। তিনি পরমা বিদ্যা মুক্তির হেতু ও সনাতনী। তিনিই সংসারবন্ধহেতু, তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

মৎস্যজীবী যখন জাল ফেলিয়া মৎস্যধারণ করে তখন যে মৎস্যগুলি তাহার পায়ের নিকট থাকে তাহারা জাল বদ্ধ হয় না, আকৃষ্ট জালস্থিত মৎস্য সকলকে ধীবর মনে করিলেই ছাড়িয়া দিতে পারে। যে মহাশক্তি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার পদাশ্রিত জনগণ সে মোহজালে পতিত হয় না। জালে জড়াইতেও তিনি আর জাল মুক্ত করিতেও তিনি। বৈদান্তিক তোমার মায়া অবিদ্যা আর ঋষির মায়া পরমাবিদ্যা। তোমার আপন সিদ্ধান্ত

বজায় রাখিবার জন্য এই অবিদ্যার, এই মায়ার অবতারণা করিতে হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি মেধার মায়া মহামায়া, পরমাবিদ্যা; তাঁহার লীলাবিশেষকে, তাঁহারই কার্য্য বিশেষকে তুমি মায়াপদবাচ্য করিয়াছ। মাতা যখন স্তোকবাক্যে রোরুদ্যমান সন্তানকে ভুলাইয়া নিদ্রায় অভিভূত করেন তখনও তিনি যেমন মাতা, আবার ক্রুদ্ধ হইয়া যখন শাসন করেন, তাড়না করেন, তখনও তিনি সেই মাতা; আবার যখন স্নেহভরে গদগদ হইয়া সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া দুইটী প্রাণে মিশামিশি করিয়া দেন, তখনও তিনি সেই মাতা। এই ত্রিবিধ অবস্থায় ত তাঁহার ত্রিবিধ নাম দেওয়া হয় না। তবে এই মায়াবাদ নিরর্থক না কেবল কচাকচি? বৈদান্তিক বলেন মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের নাম মুক্তি। ঠিক কথা, এখন নিস্তার পাইব কার বলে? সে শক্তি কোথায় পাইব? মেধা বলিতেছেন যে শক্তি তোমায় মায়ায় মুগ্ধ করিয়াছেন সেই শক্তিই তোমায় মোহ মুক্ত করিবেন—যিনি মোহে মুগ্ধকারিনী তিনিই মুক্তির হেতু, এক ভিন্ন দুই নাই, তিনি ছাড়া সনাতনী বা সনাতন আর কেহ নাই তাঁহার উপর ঈশ্বর বা ঈশ্বরী কেহ নাই। তিনিই একং সৎ শুদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপিণী। ইহা অপেক্ষা সরল অদ্বৈতবাদ আর কি হইতে পারে? এখানে নীরসকে সরস করা হইয়াছে, কঠোরকে কোমল করা হইয়াছে। আদ্যাশক্তিকে জগজ্জননী করিয়া, জগতের যাবতীয় কার্য্য তাঁহার লীলারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু রাজা কিছুই পরিষ্কার করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :—

> ভগবন্, কাহি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্‌।
> ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥
> যৎ স্বভাবা য সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
> তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাংবর॥

ভগবন্, আপনি যাহাকে মহামায়া বলিলেন তিনি কে? তাঁহার উৎপত্তিই বা কিরূপ, তাঁহার কার্য্যকলাপই বা কি প্রকার? তাঁহার যেরূপ স্বভাব, যাদৃশ স্বরূপ, যেরূপে তিনি উৎপন্না, আপনি ব্রহ্মবিৎ আপনার নিকট সেই সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

রাজা মহর্ষি মেধাকে ব্রহ্মবিৎ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ব্রহ্ম-বিৎ শব্দের অর্থ না জানিলে আর রাজা সে শব্দ ব্যবহার করেন নাই। ইহার অভিপ্রায় এই বুঝা যায় যে ব্রহ্মবিৎ ভিন্ন শক্তিতত্ত্ব বুঝাইবার ক্ষমতা আর কাহার নাই। কারণ শক্তিই ব্রহ্ম। কিন্তু রাজার প্রশ্ন আলোচনা করিলে কি দেখা যায়? নেতি নেতি দিয়া যে ব্রহ্মের লক্ষণ দেওয়া হয়, তাহা কাগজে কলমে দেখিতে বেশ, শুনিতেও মন্দ নহে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ পক্ষেও তাহা অতিশয় সুন্দর। যা কষ্ট বুঝিবার ও অনুভব করিবার। অশব্দম্ অস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। আওয়াজ বেশ, কর্ণপটহে সজোরে আঘাত পড়ে, মস্তিষ্কও বিচলিত হয়, কিন্তু সেই খানেই পর্য্যবসান, দাগ পড়ে না, অনুভূতিও হয় না, ফাঁকা আওয়াজ ফাঁকায় থাকিয়া যায়। কয়জন লোক নেতি নেতি লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্মের অনুভূতি করিতে সক্ষম হয়? যিনি বৃত্তি সকলকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের বহির্ভূত হইতে পারেন, তিনিই "অশব্দম-স্পর্শমরূপমব্যয়ম্" কি তাহার অনুভূতি করিতে পারেন। কোটী কোটী লোকের মধ্যে একজন এরূপ দেখা যায় কিনা সন্দেহ। সাধারণ লোকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান লাভ করে, সুতরাং তাহাদের জ্ঞান সসীম। জগতে উৎপন্ন হয় নাই এমন বস্তু দেখা যায় না, মূর্ত্তিমান জগতে অরূপ বস্তু দেখি না, বস্তুজাত কোন না কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা আপনার গুণ অনুভূত করাইয়া আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। বস্তুমাত্রেরই কোন না কোন স্বভাব বা প্রকৃতি (characteristic) আছে। উৎপত্তি, স্বরূপ ও স্বভাব না

জানিতে পারিলে সাধারণতঃ জ্ঞান সুনিষ্পন্ন হয় না, চিত্ত তৃপ্ত হয় না, তাই রাজা জ্ঞানী হইয়াও পণ্ডিত হইয়াও ব্রহ্মবিৎকে ব্রহ্মের উদ্ভব, স্বরূপ ও স্বভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা অতি সরল ও স্বাভাবিক। সংসার দাবদাহে দগ্ধ বৈশ্য নীরবে পার্শ্বে উপবিষ্ট, তিনি কোন প্রশ্নই করিতেছেন না। রাজা তাঁহার নিকট গুরুস্থানীয়, তাঁহার কথার উপর কথা কওয়া তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতা, প্রশ্ন ও উত্তর তাঁহার মনোমত হইতেছে, কোন সন্দেহ বা খটকা থাকিয়া যাইতেছে না, তাই তিনি নীরব। মহর্ষি মেধা উত্তর দিতেছেন ঃ—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্ব মিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥
দেবানাং কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

তিনি নিত্যা, তিনি জগন্মূর্ত্তি, তিনি সর্ব্ব ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার বহু প্রকার উৎপত্তির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি যখন দেবকার্য্য সিদ্ধ্যর্থ আবির্ভূতা হয়েন, তখন নিত্যা হইলেও লোকে বলে যে তিনি উৎপন্না হইয়াছেন। মহর্ষি প্রথম দুই চরণে ব্রহ্মবিদের ন্যায় উত্তর দিয়াছেন। রাজা মহাশক্তির উদ্ভব জানিতে চাহিয়াছিলেন মহর্ষি বলিলেন "তিনি নিত্যা অর্থাৎ তাঁহার উদ্ভব নাই।" রাজা মহাশক্তির স্বরূপ জানিতে চাহিয়া ছিলেন, মহর্ষি উত্তর করিলেন "তিনি জগৎ মূর্ত্তি"। কি সুন্দর বিশেষণ, এই জগতের যাবতীয় বস্তু মহা শক্তির অবয়ব, আমি তুমি সকলেই তাঁহার অঙ্গীভূত। তবে আর কি রহিল, এক ভিন্ন আর কি রহিল? বস্তুজাতের পৃথক অস্তিত্ব গেল, সবই অনন্ত অস্তিত্বে নিমজ্জিত হইল। ভগবান গীতায় আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া মহাশক্তির এই জগন্মূর্ত্তি ভাবই বিস্পষ্ট করিয়াছেন। জগৎ বলিতে কেবল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নহে।

উৎপত্তি ও লয়বিশিষ্ট প্রবাহরূপে নিত্য সৃষ্টিকাণ্ড বুঝাইতেছে। রাজা মহাশক্তির স্বভাব জানিতে চাহিয়াছিলেন। মহর্ষি উত্তর দিলেন "তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন"। তাহার অর্থ কি? সূত্র যেমন মালার প্রত্যেক দানাটীর ভিতর দিয়া গিয়াছে সেইরূপ কি? না তাহা নহে। সূত্রত প্রত্যেক দানাটিতে আংশিকরূপে বর্ত্তমান। আদ্যাশক্তি পূর্ণা, সুতরাং পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রভবতি, পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। এই কয়টি কথা বলিয়াই মহর্ষি বলিলেন "তথাপি"। মহর্ষির মনে হইল অধিকারী ভেদে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, রাজা যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন তাঁহাকে সেইরূপ উত্তর দেওয়াই প্রয়োজন। অন্যথা উপদেশ নিষ্ফল হইবে। শক্তিমানকে অবলম্বন না করিলে শক্তিকে বুঝান যায় না, ধর্ম্মীকে (concrete) অবলম্বন না করিলে ধর্ম্মকে (Abstract) বুঝান যায় না। তাই মহর্ষি বলিলেন "তথাপি তাঁহার বহু প্রকার উৎপত্তির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।" প্রকৃত উপদেষ্টা যখন উপদেশ দেন, তখন যাহাকে উপদেশ দেন সেই কেবল তাঁহার লক্ষ্যভুক্ত থাকে না, সমগ্র জগৎকে বিশেষতঃ জ্ঞানী ও বিচারশীল। গণকে পরোক্ষে রাখিয়া তাঁহাকে উপদেশ দান করিতে হয়। "সমুৎপত্তি" বলিয়াই উপদেষ্টার পরোক্ষস্থ শ্রোতৃবর্গের উপর দৃষ্টি পড়িল। তাই তিনি ইহার ব্যাখ্যা দিতেছেন। "দেবগণের কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ যখন সেই মহাশক্তি আবির্ভূতা হয়েন, তখন নিত্যা হইলেও লোকে তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়া থাকে।" আবির্ভূতা হওয়ায় বুঝাইতেছে যে তিনি ছিলেন কিন্তু লোকের দৃষ্টির বা জ্ঞানের বহির্ভূতা হইয়াছিলেন। যখন দৃষ্টিগোচর বা জ্ঞানগোচর হইলেন তখনই তাঁহার আবির্ভাব হইল। লোকে সাধারণতঃ এই আবির্ভাবকে উৎপত্তি বলিয়া থাকে অর্থাৎ উৎপত্তি কথাটী দার্শনিক ভাষা নহে। মহর্ষি বলিতেছেন দেবীর আবির্ভাব হয় দেবগণের কার্য্য

সিদ্ধ্যর্থ, মনুষ্যের কার্য্য সিদ্ধির জন্য নহে। মনুষ্যের কার্য্যসিদ্ধির ভার দেবগণের উপর, মহাশক্তির আবরণ দেবতাগণের উপর। এইজন্য গুরুবাক্য শিষ্যকে আরাধ্যা আদ্যাশক্তির নিকট কামনাসিদ্ধির প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এখন এই দেবগণ কি, তাঁহাদের কার্য্যই বা কি; মহর্ষি মহাবিদ্যার তিন চরিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রথম চরিত।

মহর্ষি মেধা মহারাজ সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে বুঝাইতেছেন। তিনি সৃষ্টির অব্যবহিত প্রথমাবস্থা ধরিয়াছেন। যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণু র্জগত্যে-কার্ণবীকৃতে। আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান প্রভুঃ। কল্পান্তে যখন ভগবান প্রভু বিষ্ণু একার্ণবীকৃত জগতে শেষশয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া যোগ নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন—সেই সময়ের কথা বলিতেছেন। কল্পান্ত হইয়াছে, সৃষ্টির প্রলয় হইয়াছে। সৃষ্টির আর কোন চিহ্ন নাই। চতুর্দ্দিক কেবল জলময়: অর্থাৎ ব্যোমের পর বায়ু, বায়ুর পর তেজের পরিণাম অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া, জলপরিণাম হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। চারিদিক জলময়, অনন্তশক্তিমান অনন্ত শয্যায় শায়িত, সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া হইতে বিরত, সুতরাং নিদ্রিত বলিয়াই বর্ণিত। তাঁহার শক্তি স্তম্ভিত, অথবা তাঁহারই শক্তি তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকে লয়রূপী তমোগুণেরই প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে। সেই জন্য এ অবস্থায় যে শক্তি প্রবলা তাহাকে তামসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ক্রমে অনন্তশক্তিমানের নাভিকমল হইতে, অর্থাৎ কেন্দ্রস্থল হইতে ব্রহ্মারূপী সৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অনন্ত শক্তিমানের কর্ণমল মধুকৈটভ নামক সৃষ্টি সংহারিণী শক্তিদ্বয়ের আবির্ভাব হইল। তথাচ লয়ই প্রবল, সৃষ্টি কেবল বিকাশোন্মুখ, সুতরাং মধুকৈটভ লয়রূপিণী বিনাশিণী শক্তির আধার

স্বরূপ হইল। শাস্ত্রে নাশকারিণী শক্তির আধার প্রায়ই যুগ্ম দেখা যায়। যাহাকে ইংরাজিতে Active ও Passive principles বলে। সূর্য্যোত্তাপ মোমকে গলায় ও মোমের ভিতরও গলিয়া যাইবার গুণ আছে। সুতরাং উত্তাপ (active) এবং উক্ত গুণ (Passive) উভয়ে মিলিত হইয়া মোমের বিশ্লেষণ কার্য্য সাধন করিতেছে। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে যখন যে শক্তি প্রবলা থাকিবে তখন সেই শক্তি দুর্ব্বলা শক্তিকে অভিভূত করিবে। বিকাশ মুখে সৃষ্টিশক্তির লয়শক্তির হস্তে নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু এই উভয় শক্তিই সেই এক অনন্ত শক্তিমান হইতে উৎপন্ন। উভয়ই এক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ-মাত্র। কাহাকে প্রবলা রখিয়া কাহাকে সংযত করিতে হইবে তাহাই বিবেচ্য যাঁহারই শক্তি যাঁহারই এ কার্য্য, তিনি ভিন্ন আর কে তাহা স্থির করে? কিন্তু মহাশক্তি তাঁহাকে স্তম্ভিত, নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই তাঁহাকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। তাই সৃষ্টিশক্তির আধার ব্রহ্মা তাঁহাকে জাগ্রত করিবার জন্য মহাশক্তির শরনাপন্ন। এখন দেখা যাইতেছে শক্তি এক। শক্তিকে কার্য্য করিতে হইলে, শক্তিমানের প্রয়োজন, আধারের প্রয়োজন। সে শক্তিমান শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ কার্য্যার্থে তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন, ভগবান্ বিষ্ণু সেই শক্তিমান। কিন্তু এখানে যে অবস্থায় তাঁহাকে দেখা যাইতেছে তাহাতে মহাশক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই। পূর্ণাশক্তির আধার হইয়া তিনি আচ্ছন্ন। এই আচ্ছন্নভাব কাটাইতে হইলে আবিষ্টা শক্তির হ্রাস হওয়া চাই; যেমন আচ্ছন্ন ব্যক্তির রক্তমোচনাদি দ্বারা তাহার শক্তির হ্রাস করিয়া তাহার সংজ্ঞা করাইতে হয়, এখানেও সেইরূপ শক্তি হ্রাস করা প্রয়োজন হইয়াছে। যাহাতে ভগবান বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অপসৃত হয়, এবং তিনি জাগ্রত অর্থাৎ কার্য্যশীল হয়েন সেই জন্যই ব্রহ্মার মহাশক্তির আরাধনা। বিষ্ণু শব্দের অর্থই অনন্ত বা

মহানন্ত শক্তির অনন্ত আধার আর বৈষ্ণবী শক্তির অর্থও সর্ব্বব্যাপিন অনন্ত শক্তি। এই অনন্ত শক্তিমান হইতেই সৃষ্টি স্থিতি লয়কারিণী শক্তির বিকাশ এবং তৎপরে সর্ব্বতঃ সৃষ্টি ক্রিয়ার প্রারম্ভ ও গতি।

পুরাণাদিতে যেখানে দেবদেবীগণের স্তব আছে সকল গুলিতেই সামান্য ও বিশেষ ভাব লক্ষিত হয়। অদ্বৈত ও তৎপ্রসূত দ্বৈতভাব উভয়েরই মিশ্রন লক্ষিত হয়। ব্রহ্মা কি ভাবে আদ্যাশক্তির স্তব করেন তাহারই আলোচনা করা যাউক।

ব্রহ্মা বলিতেছেন "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ইত্যাদি যাসুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ যাবৎ। আদ্যাশক্তিকে শব্দ ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়া স্তব করিলেন। তিনি সৃষ্টির অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যে উপনীত হইয়াছেন। যখন আর কিছু নাই কেবল সেই চিৎশক্তি আছেন, অনন্ত ধু ধু করিতেছে, সৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি সেই আদ্য-শক্তিতে প্রত্যাহৃতা। ক্রমে সৃষ্টিবীজ তন্মাত্ররূপে প্রকটিত। আছে কেবল অনন্ত পরমাণু (atoms) আর আকাশ (space)। আকাশই এই সৃষ্টি তন্মাত্রের আধার হইয়াছে। তৎপরেই বায়ু তন্মাত্রের (ether) বিকাশ। বায়ুতন্মাত্র শক্তির আধার ও সেই আকাশ (space) এই চিৎশক্তিতে অনুস্যূত বায়ুতন্মাত্রের অনন্ত সাগরের এক দেশে সেই চিৎশক্তির আকস্মিক ক্রিয়া বলে প্রকম্পন হইল। সে প্রকম্পনে শব্দের সৃষ্টি হইল। ইহাই প্রথম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পেটা ঘড়িতে আঘাত করিলে যে শব্দ হয় তাহা কমিতে কমিতে মিলাইয়া যায়। ইহার তিনটি মাত্রা হয় ১ উদাত্ত ২ অনুদাত্ত ৩ স্বরিৎ। ইহার পর যে অবস্থা তাহাকে অর্দ্ধ মাত্রা বলা হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা বলিলেন শব্দব্রহ্মের যে শক্তি এবং তজ্জন্য মন্ত্রাদির যে শক্তি তাহা তুমিই। বায়ুর পর গতিজনিত তেজের বিকাশ, তাই ব্রহ্মা বলিতেছেন ত্বং "সাবিত্রী" তেজোশক্তি স্বরূপিণী। এই তেজোশক্তিই সৃষ্টির জননী-

স্বরূপা। তাই ব্রহ্মা বলিতেছেন "ত্বং দেবি জননী পর।" তুমিই সমস্ত সৃজন করিতেছ, পালন করিতেছ, আবার তুমিই তাহা গ্রাস করিতেছ। ত্রিবিধ ক্রিয়াহেতু তোমার ত্রিবিধ স্বরূপ দৃষ্ট হয়। একই তুমি সৃষ্টিকালে সৃষ্টিস্বরূপিণী, পালন কালে স্থিতিস্বরূপিণী এবং অন্তে সংহৃতিস্বরূপিণী। মা তুমি, জগন্ময়ী; সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয়গণের যে বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, মোহন ও মুগ্ধকারিণী শক্তি সেও তুমি। দেবগণের শক্তিও তুমি অসুরের শক্তিও তুমি। ত্রিগুণের ক্রিয়াবস্থাও যেমন তুমি, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, অক্রিয়াবস্থা, কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি স্বরূপাও তুমি। তুমি সকলের প্রকৃতি স্বরূপা। যে শক্তি সৌভাগ্য সম্পাদন করে যে শক্তি অপরের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম করে, যে শক্তি অপকর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত করে, যে শক্তি বিচার করিতে ও কৌশল প্রকাশে সক্ষম করে, যে শক্তি ভাবগ্রহে সক্ষম করে, যে শক্তি শিষ্টাচার করায়, যে শক্তি পুষ্টিসাধন করে, যে শক্তি সন্তোষ উৎপাদন করে, যে শক্তি নির্দ্বন্দ্ব করিয়া শান্তি উৎপাদন করে, যে শক্তিবলে অন্যকৃত অপরাধ সহন করা যায়, সে সকলই তুমি। সৃষ্টির সকল শক্তিরই উল্লেখ হইল, অনুক্ত অপরাপর শক্তি পূর্ব্বোক্ত কোন না কোনটীর অন্তর্গত। তাহার পরই ব্রহ্মা বলিতেছেন—

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুষণ্ডীপরিঘায়ুধা॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥

এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে এই দুই শ্লোকে দেবীর রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে কি না। আমাদের বোধ হয় যে এ দুই শ্লোকে রূপ বর্ণন হয় নাই, পূর্ব্ববৎ শক্তির উল্লেখ হইয়াছে, এবং তদ্ভিন্ন আর কিছু হইয়াছে। ১ম শ্লোকের অর্থ এই যে যুদ্ধে সংহারের উপায় বা

কারণভূত যে সকল অস্ত্র আছে তাহাদের যে শক্তি এবং তৎসহ যোদ্ধার শক্তিও তুমি। আদি কবি দশদিকরূপিণী আদ্যাশক্তির দশ হস্ত করিয়া সেই দশ হস্তে দশ খানি অস্ত্র দিয়া বর্ণন করিবামাত্র ইঙ্গিতের ন্যায় সমগ্র শক্তিমূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপটে পড়িয়া গেল, তিনি যেন মাতিয়া গেলেন, মুগ্ধ হইয়া গেলেন, আর বর্ণনা করা হইল না, মুগ্ধের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "সৌম্যা" শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, তৃপ্তি হইল না— বলিলেন "সৌম্যতরা", তাহাতেও তৃপ্তি হইল না—"বলিলেন অশেষ সৌম্যেভ্যঃ তু অতিসুন্দরী", নিখিল সৌম্য বস্তু অপেক্ষা অতি সুন্দরী। বাক্যের সমাপ্তি হইল, আশা মিটিল কি না, প্রাণে তৃপ্তি হইল কি না, কে বলিবে? না মিটিবার, না হইবারই কথা। ইহা রূপবর্ণনা নহে। তখন জগৎ এক প্রকার অমূর্ত্ত, তখন মূর্ত্তি কল্পনা সাজে না, সম্ভবও নহে, অথচ পরিচ্ছিন্ন হইলেও আদি কবির হৃদয়ে শক্তির অনুভূতি হইবে সে কিছু আশ্চর্য্য নহে। তাই তিনি অবশভাবে "সৌম্যা, সৌম্যতরা, সৌম্যতমা" বলিয়া হতগজ করিয়া একরূপ মনোভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা উপসংহার করিয়া বলিতেছেন, "আর কত বলিব তুমি অখিলের আত্মা, সৎ অসৎ যা কিছু বস্তু আছে, তাহাদের যে শক্তি সে তুমি, তবে আর তোমার স্তব করিব কি করিয়া।" মুগ্ধ আদিকবির বাক্য ফুরাইয়াছে "সৌম্যতমা" বলিয়া আর তাঁহার কথা যোগায় নাই, তাই এই উপসংহার। আবার বলিতেছেন

যয়া ত্বয়া জগৎ স্রষ্টা জগৎ পাত্যত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥

যিনি জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা, তাঁহাকেও যখন তুমি নিদ্রাভিভূত করিয়াছ, তবে কে আর তোমার মহিমা বর্ণনে সক্ষম হইবে। এখানেও সেই অদ্বৈতভাব, এখনও দ্বৈতভাবের অবতারণা হয় নাই। সাধারণ

আত্মাশক্তিই এই অনন্তরূপী ভগবান, জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা। তাহার পর আবার বলিতেছেন

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহনমহমীশাস এব চ
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কস্তোতুম্ শক্তিমান ভবেৎ।

বিষ্ণুকে, আমাকে ও ঈশানকে তুমিই শরীর গ্রহণ করাইয়াছ, অতএব তোমাকে স্তব করিতে কে সক্ষম হইবে। ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে যে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তার কথা বলা হইয়াছে তিনি মহাবিষ্ণু, সত্বরজতম-ত্রিগুণময় অনন্ত মহাশক্তির অনন্ত মহাধার মহাবিষ্ণু; এখানে যে বিষ্ণুর উল্লেখ করা হইল, তিনি সত্বরজস্তময় অনন্ত শক্তির পরিচ্ছিন্নাধার, সেইরূপ ব্রহ্মা রজোপ্রধান এবং ঈশান তমপ্রধান। অপরিচ্ছিন্ন মহাশক্তির আধার অবস্থায় বিষ্ণু মহাবিষ্ণু, আর পরিচ্ছিন্নাবস্থায় তিনি কেবল বিষ্ণু। এইজন্যই বিষ্ণুর বর্ণই নীল। অনন্ত আকাশের বর্ণ নীল, অনন্তপ্রায় সমুদ্রের বর্ণও নীল, তাই বিষ্ণুর বর্ণ নীল। ব্রহ্মার বর্ণ লাল, ইনি তেজোস্বরূপ, যে তেজ বস্তুজাতকে সর্ব্বদা চঞ্চল রাখিয়াছে। ঈশান তমরূপী তেজের নির্ব্বাণপ্রায় অবস্থা, তাই ইঁহার বর্ণ শ্বেত, সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত চন্দ্র যেমন শ্বেত। শরীর গ্রহণ করাইয়াছ অর্থে এই বুঝাই-তেছে যে পরিচ্ছিন্নভাবাপন্ন করিয়াছে। সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদনার্থ সত্বরজঃ ও তমোগুণের বিশ্লেষণ ও তৎ তৎগুণের পরিচ্ছিন্ন আধারের প্রয়োজন। সুতরাং অনন্তশক্তির অনন্ত আধার বিষ্ণু হইতেই পরিচ্ছিন্নাবস্থায় বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ঈশানের অবতারণা হইল। প্রথমে অনন্ত ভূমা চিৎশক্তি—তাহার পর তাহারই অনন্ত আধার স্বরূপ মহাবিষ্ণু—তাহারই ত্রিধা বিশ্লেষণ—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ঈশান—তাহার পর সৃষ্টি কার্য্যের প্রারম্ভ। ব্রহ্মা পুনশ্চ বলিতেছেন—

সাত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারের্দ্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌমহাসুরৌ॥

দেবি তোমার স্তব করিবার উদ্দেশ্য এই যে তুমি আপনার উদার প্রভাবে মধুকৈটভনামে দুর্দ্ধর্ষ অসুরদ্বয়কে মুগ্ধ কর। শীঘ্র জগৎস্বামী অচ্যুতকে জাগ্রত করিয়া তাঁহার ঘুমের ঘোর কাটাইয়া দাও, তিনি এই অসুরদ্বয়কে সংহার করুণ। ব্রহ্মা শক্তিকেই কেন অসুর সংহার করিতে বলিলেন না? দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিতে শক্তিইত অসুর সংহার করিয়াছেন! প্রথম চরিতে শুদ্ধ চিৎশক্তির বর্ণনা। আধারশূন্যা শক্তি কার্য্যকারিণী হন না। এ অবস্থায় শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিতে পারা যায় না। তাই আধারে রাখিয়া শক্তিমানের দ্বারা কার্য্য করাইবার যুক্তিসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু সে আধারও মহাশক্তিতে মগ্ন বা মিশিয়া আছেন। সুতরাং তাঁহাকে কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত করিতে হইলে, শক্তির হ্রাসতা অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নাবস্থার প্রয়োজন। তাই ব্রহ্মা বলিতেছেন, ইঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দাও, এবং নিদ্রাভঙ্গের পর ঘুমের ঘোর কাটাইয়া দাও। ব্রহ্মা আর এক কথা বলিলেন এই অসুর দ্বয়কে মুগ্ধ কর। সৃষ্টিবিরোধিনী এই অন্যোন্য সাহায্যকারিণী শক্তিদ্বয়ের আধার স্বরূপ এই মধু ও কৈটভ। এ শক্তিদ্বয়ও সেই অনন্ত চিৎশক্তির রূপান্তরমাত্র, সুতরাং পূর্ণাবস্থায় ইহারা অজেয়। ইহাদের মুগ্ধ করা অর্থাৎ শক্তি হ্রাস করা প্রয়োজন। হাতের ঢিল ছাড়িয়া দিলে তাহা ফিরান যায় না, কিন্তু উড্ডীয়মান ঘুড়িকে অল্পে অল্পে আবার আপনার হাতে ফিরাইয়া আনা যায়। ছাড়াতে যত না আয়াস প্রত্যাকর্ষণে তদপেক্ষা অধিক আয়াস। কৃষক কোন বলবান বৃষভকে দীর্ঘ রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া, মুখের দড়ি ধরিয়া মাঠে ছাড়িয়া দিবা মাত্র বৃষভ লাফাইতে লাফাইতে যত দূর পারে ছুটিয়া যায়, বৃক্ষকাণ্ডে রজ্জু নিবদ্ধ থাকায় যথেচ্ছ চলিয়া যাইতে পারে না। কৃষক যদি রজ্জু আকর্ষণ করিয়া

বৃষভকে ফিরাইতে চাহে সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। সে লাফাইবে ঝাঁপাইবে, সম্মুখ দিকে টানিবে, কৃষককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে, হয়ত দড়ি গাছটী ছিঁড়িয়া ফেলিতেও পারে। কিন্তু যদি কোন লোক লগুড় হস্তে দুর্দ্ধর্ষ বৃষভের সম্মুখে তাড়া দিয়া তাহার শক্তি প্রসারণে বাধা দেয় তাহা হইলে কৃষক অল্পে অল্পে দুর্দ্ধর্ষ বৃষভকে আপন আয়ত্তে আনিতে পারে। এখানেও তাহাই হইয়াছে। এইরূপ ব্যাপার করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ঋষি বলিতেছেন—ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে তামসী দেবী মহা বিষ্ণুর "নেত্রাস্য নাসিকা বাহু হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ। নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণো" ব্যক্ত জন্ম নঃ। চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বৃক্ষস্থল হইতে বহির্গত হইয়া অব্যক্ত জন্ম ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইলেন। অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর জড়ভাব কাটিয়া গেল, তমাংশ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তমাংশকে পৃথক করায় তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করা হইল। পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় তামসীশক্তি নামরূপের যোগ্য হইলেন, তাই ঋষি বলিলেন "ব্রহ্মণঃ দর্শনে তস্থৌ।" এখানে কিন্তু রূপের বর্ণনা নাই। দেবী ভাগবতে রূপ বর্ণনা আছে। এ অবস্থায়ও পরিচ্ছিন্না শক্তি যার তার দৃষ্টিগোচর হন না, তবে ব্রহ্মা অব্যক্ত জন্মা তাই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। দেবী ভাগবতে ইহার পর অনেক বিস্তারিত কথা আছে। এখানে কিন্তু তাহা কিছু নাই। তমগুণের অপসারণে স্বত্তগুণে অনুপ্রাণিত রজোগুণের ক্রিয়া দেখাইতেছেন। ভগবান উঠিয়া মধু-কৈটভকে দেখিলেন, দেখিলেন তাহারা আরক্তনয়নে ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। মিলিত সত্ব ও রজোগুণযুক্তাশক্তি সৃষ্টিবিরোধিনী শক্তির দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্নিকটে সঙ্ঘর্ষ হইল—যেন ট্রেনে ট্রেনে সঙ্ঘর্ষ। এই সঙ্ঘর্ষ পাঁচ হাজার বৎসর চলিল। তখন মহামায়া মুগ্ধ অসুরদ্বয় ভগবানকে বলিলেন "তুমি আমাদের নিকট

বর প্রার্থনা কর" "বরোস্মত্তো ব্রীয়তাম্," খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মে এই সৃষ্টিবিরোধিনী শক্তিশয়তান্‌-হাতের ছাড়া ঢিল, মহাশক্তিকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া, অপনি প্রবল হইয়াছে, পরিচ্ছিন্না মহাশক্তির তাহার উপর আর আধিপত্য চলে না, আমাদের ধর্ম্মে এ দুর্দ্ধর্ষ বৃষভ রজ্জুবদ্ধ, আর সে রজ্জু কীলবদ্ধ বা কৃষকের হস্তে। সম্মুখে তাড়িত ও পশ্চাতে আকৃষ্ট হইয়া বৃষভ যেমন গর্ব্বে মাথা নাড়িতে নাড়িতে সার্ব্বে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে "আচ্ছা চল যাচ্চি" যেন এই কথা বলিতে বলিতে কৃষকের হস্তের দিকে ধাবিত হয়। মধুকৈটভেরও তাহাই হইয়াছে "বর চাও" বলাও যা, আর "আচ্ছা চল যাচ্চি" বলাও তাই। ভগবান্ বলিলেন "তোমরা আমার বধ্য হও" "ভবেতামদ্য মেতুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবসি।" অসুরগণ না বলিল না। এইখানে এক মহা রহস্য রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের অসুরগণও সত্যসন্ধ; কারণ তাহারা হাতের ছাড়া ঢিল নয়। তাহারা যে রজ্জুতে বদ্ধ তাহার শেষাংশ সত্যে আবদ্ধ। হিন্দুর সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তবে কোনটী বা দূরে কোনটী বা সেই সত্যের অন্তিকে। অসুরদ্বয় বেগতিক দেখিয়া বলিল যেখানে জল নাই সেখানে আমাদের মার। এইখানে আসুরিক ভাব দেখান হইয়াছে। একেবারে তথাস্তু না বলিয়া সর্ত্ত করিয়া হাঁ বলিল। সর্ত্ত করুক, সত্য বজায় রাখিল। তখন ভগবান আপনার উরুদেশের উপর রাখিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভূতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসীতয়োঃ॥

যতক্ষণ ভগবান একার্ণবে শয়ান সত্ত্বরজঃ ও তম এই ত্রিগুণময় হইয়াছিলেন ততক্ষণ তাঁহার স্বরূপ বর্ণনার নাম গন্ধ ছিল না। তমোগুণের বিশ্লেষণের পর পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় শঙ্খচক্রগদাভূৎ বিষ্ণুর মুর্ত্তি বর্ণিত হইল। উরুদেশের উপর রাখিয়া অসুরদ্বয়কে বধ করার তাৎপর্য্য এই

যে দুর্দ্ধর্ষ বৃষভ কৃষক কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সংযমিত হইল। সৃষ্টি বিরোধিনী শক্তিদ্বয়কে সংযমিত করিয়া পাদাংশে রাখা হইল। এতক্ষণে সৃষ্টি ক্রিয়া চলিল। ইতঃপূর্ব্বে তাহা চলে নাই। পুরাণান্তরে প্রকাশ এই মধুকৈটভের মেদে প্লাবিত জলরাশি মেদিনীতে পরিণত হইয়াছে।

এখন যিনি যে ভাবে দেখিতে চাহেন তিনি তাহাই দেখিবেন। যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বাইবেলের সৃষ্টি প্রক্রিয়া পাঠ করিয়া নাক উল্টাইয়া উপহাস করেন, তিনি দেখুন দেখি তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রথা, তাঁহার সৃষ্টিকল্প (geological age) প্রভৃতি ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে কি না? মধুকৈটভের মেদে মেদিনীর সৃষ্টি জলের ক্রমশঃ স্থলপরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। জড়বাদীর blind primordial force অন্ধ আদ্যাশক্তি শাস্ত্রের আদ্যাশক্তি কি না? সৃষ্টির প্রারম্ভে আদ্যাশক্তি নিষ্ক্রিয় কেবল শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপা, যে অবস্থায় তাহাকে blind বলিতে চাও বল, কিন্তু সে অবস্থা অন্ধাবস্থা নহে। পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়াবস্থায়ও শক্তিকে blind বলা যাইতে পারা যায় না। এই শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

বীর বালক

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যে ভীষণ ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হয় অল্প দিনের মধ্যেই তাহা তাড়িত বার্ত্তাবহ ও লৌহরথের অভাবেও লোকমুখে—কেবল বায়ুর স্রোতে প্যালেসোঁতে পৌঁছিত; প্যালোসোঁ ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত নগর ভার্সেলিসের সন্নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র সহর।

এই সহরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জোসেফ্ বরার জন্ম হয়। জোসেফ পিতা মাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং পিতা মাতার স্নেহ তাহার উপরই

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পিতা মাতা অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই জোসেফ পরিশ্রমী। সংযম, সহিষ্ণুতা, সংকল্পের দৃঢ়তা ও সর্ব্বোপরি আত্মসম্মান জোসেফ বাল্যকালেই লাভ করিয়াছিল। বিনা আপত্তিতে কষ্ট সহ্য করিত, কিন্তু অন্যায় দেখিলে তাহা কখন সহ্য করিতে পারিত না, বাল্যকাল হইতেই ইহা তাহার স্বভাবের একটা বিশেষত্ব ছিল।

ফ্রান্সের বক্ষের উপর যখন বিপ্লব স্রোত তরঙ্গিত হইতেছিল তখন জোসেফ দশ বৎসরের বালক মাত্র। সেই সময়েই স্বদেশের দুর্দ্দশার কথা শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। প্যারিসের ভীষণ বিপ্লবকাহিনী সেই দশ বৎসরের বালক মহা আগ্রহভরে শ্রবণ করিত। অবশেষে যে দিন প্যারিসের সুপ্রসিদ্ধ বাস্তিল ধ্বংসের কথা প্যালেসোঁর অধিবাসীবর্গের কর্ণগোচর হইল সেদিন সেই ক্ষুদ্র নগরের মধ্যে মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে ইনের বাহিরে দলে দলে লোক দাঁড়াইয়া বিদ্রোহীদিগের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। প্রজাগণ অত্যাচারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যে কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, যে নিদারুণ অত্যাচার সমগ্র দেশ সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা হইতে মুক্তিলাভের ইহাই একমাত্র উপায়। সেই ইনের একটা দেওয়ালে ভরদিয়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া জোসেফ এই সকল আলোচনা শুনিতেছিল, কেহ তাহাকে লক্ষ্যও করে নাই।

একজন লোক মোটা গলায় বলিয়া উঠিল, "অন্যায় আবার কি হইয়াছে? কাজ ত ঠিকই হইয়াছে, যদি লুই আমাদের প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করিতেন, যদি আমাদের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থের শেষ পয়সাটি তিনি নিজের ভোগে লাগাইয়া আমাদিগের প্রতি উপবাসে মরিবার ব্যবস্থা না করিতেন, যদি আমরা

তাঁহার কাছে মানুষের মত ব্যবহার পাইতাম তাহা হইলে আমাদের মত অনুরক্ত অনুচর তিনি আর কোথাও পাইতেন না।”

এই কথায় বালকের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, ঘৃণা ক্ষোভ ও স্বদেশীয়ের প্রতি সমবেদনায় তাহার হৃদয়ে এক তুফান উঠিল। দেশে কি নিদারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত, রাজা নূতন নূতন আইন করিয়া দেশে দরিদ্রগণের সর্ব্বস্ব বৈধ উপায়ে কিরূপে লুণ্ঠন করিতেছেন, অসহায় লোকের উপর কিরূপ কঠোর উৎপীড়ন চলিতেছে—বক্তাগণ এই সকল কথা লইয়া যখন আলোচনা করিতে লাগিলেন, যোসেফের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে অন্যের অজ্ঞাতসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন; সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি লুইয়ের অত্যাচার হইতে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিবেন, সেই এক মাত্র উদ্দেশ্যে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবেন। লুইর স্বেচ্ছাচারের কঠোর শৃঙ্খল হইতে স্বদেশের মুক্তির জন্য তিনি—সেই নবীন বয়সেই সংসার সমুদ্রের আবর্ত্তিত প্রবাহে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার জীবন নাটকের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল।

বাল্যকাল হইতেই একজন গ্রাম্য বৃদ্ধ সার্জ্জনের সহিত যোসেফের বড় ভাব হইয়াছিল, অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যাইত, বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষটি একটি নধরদেহ সুন্দরকান্তি বালকের হাত ধরিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, সার্জ্জনটিকে যোসেফের পিতামহ বলিয়াই কাহারও কাহারও ভ্রম হইত। যোসেফ সেই সার্জ্জনের নিকট অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অতি সুকৌশলে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এক এক সময় যোসেফ মনে করিতেন তিনি একদল সুশিক্ষিত সাহসী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালন করিতেছেন! উৎসাহে তাঁহার হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, প্রকৃত সংগ্রাম ক্ষেত্রে ধাবিত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিত। যেন তিনি অদূরে রণভেরীর

সুগম্ভীর নিনাদ শ্রবণ করিতেন, তাহা তাঁহাকে ক্রমাগত রণরঙ্গে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান করিত।

ভীষণ বিপ্লবের বহ্নিতে ফরাসী দেশ দগ্ধ হইতে লাগিল, সে বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না, রাজার দুর্ব্বল হস্ত সে দেশব্যাপী অসন্তোষ-কোলাহল, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার গতিরোধ করিতে পারিল না; বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যে পৈশাচিক অত্যাচার যে কঠোর উৎপীড়ন সহিষ্ণু ফরাসী জাতির মস্তকে সঞ্চিত হইতেছিল, এত দিন ফরাসী জাতি তাহার মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর, ক্ষুদ্র রাজশক্তির সাধ্য কি যে সেই অপ্রতিহত প্রচণ্ড প্রজাশক্তি নির্ম্মূল করে? সুতরাং বিদ্রোহ প্রশমিত হইল না; অবশেষে, তাহা ক্রমে রুদ্রভাব ধারণ করিয়া রাজার মস্তক চূর্ণ করিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশের রাজশক্তি নবসঞ্জীবিত প্রজাশক্তির সংঘর্ষণে বিদীর্ণ হইয়া গেল। শত শত বৎসরের অপমান ও ঘৃণা, শত শত বৎসরের অবিচার ও নিষ্ঠুরতা দেশের লোকে নির্ব্বাক ভাবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে, আর তাহারা সহ্য করিতে পারে না, অতএব রাজার গর্ব্ব-শক্তি নির্ম্মূল করিতে হইবে, এই সংকল্প অনুসারেই তাহারা ফ্রান্সের অধীশ্বর লুইর মস্তকচ্ছেদন করিল!

দেশে কেবল রক্তস্রোত, কেবল গিলটিনে নরমুণ্ডচ্ছেদন, মহা ঝটিকায় যেন ফরাসীদেশ বিধ্বস্ত প্রায় হইয়াছিল। শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

ফরাসীদেশের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিলেন, এ ভাবে দীর্ঘকাল চলিতে পারে না, এ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে হইবে, এ অশান্তির কোলাহল নিবৃত্ত করিতে হইবে, নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া ফরাসীদেশের পূর্ব্বগৌরব ও প্রতিষ্ঠা ইউরোপের ইতিহাসে সভ্যতার ইতিহাসে চিরমুদ্রিত করিয়া রাখিতে

হইবে, দলবদ্ধ অসংখ্য উচ্ছৃঙ্খল, উৎপীড়ক পরস্বাপহারক দস্যুর তাণ্ডব-নৃত্যে ফরাসীদেশের কি উপকার হইবে? লুই গিয়াছে তাহার স্থানে সহস্র লুই মস্তক উত্তোলন করিয়াছে,—ইহাদিগকে দমন করিতে হইবে, দেশে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া একদল লোক একটি গবর্ণমেণ্ট সংগঠন করিলেন, তাঁহাদের মূল মন্ত্র হইল "Liberty, Fraternity, Equality." স্বাধীনতা; সৌভ্রাত্র, সাম্য।

স্বদেশের এই সুসন্তানদল অতঃপর ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার দলভুক্ত যে সকল লোক তখনও নূতন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত রাখিয়াছিল তাহাদিগকেও দমন করা আবশ্যক হইল। এই সময় যোসেফ একদল অশ্বারোহী সৈন্য, শ্রেণীভুক্ত হন, এ সৈন্যশ্রেণী সেই নব সংগঠিত সাধারণ তন্ত্রের।

এই ঘটনার অল্পকাল পরে, ভেন্দিয়ানেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ভেন্দিয়ানেরা রাজা লুইয়ের ভক্ত বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেছিল, দেশলুণ্ঠন ও দেশে অরাজকতা বৃদ্ধি করা তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এবং রাজপক্ষসমর্থন দ্বারা তাহারা প্রভাবস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল। নবগঠিত সাধারণতন্ত্র এই বিদ্রোহ দমন করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। যে সকল অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট এই সকল বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল, তাহাদের মধ্যে যোসেফের রেজি-মেণ্টও ছিল।

এই সকল ফরাসী সৈন্যকে শিবিরে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইত, তাহাদের সকল অভাব দূর করিবার মত শৃঙ্খলা সম্পাদনের সামর্থ্য নূতন গবর্ণমেণ্ট তখনও লাভ করিতে পারেন নাই; দীর্ঘ পথপর্য্যটনে সৈন্যগণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, সকলেই অবসন্ন হইয়া উঠিল, অনেকেই ভয়ানক অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু জোসেফ

ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত সকল কষ্টকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ হইতে একবারও একটি অসন্তোষের কথা উচ্চারিত হইল না; অটলহৃদয়ে মনুষ্যের মত তিনি সকল অসুবিধা সহ্য করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন নিজের সুখের জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি এই স্বদেশসেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই। আপনার সকল সুখ, সকল সুবিধা নিজের কোষস্থ তরবারিতে ছিন্ন করিয়া তবে সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; যে জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত—তাহার জন্য পিপাসার যন্ত্রণা, ক্ষুধার তাড়না, রৌদ্রের প্রদাহ, গ্রীষ্মের কঠোরতা সহ্য করা নিতান্তই তুচ্ছ কথা।

অনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় শরৎকাল কাটিয়া গেল। কিন্তু স্বদেশহিতের উদ্দীপনায় জোসেফ পারিবারিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না; তিনি প্রতিমাসে রীতিমত তাঁহার বিধবা জননীর নিকট সাংসারিক খরচের টাকা পাঠাইতেন, তাঁহাকে সাহস দিয়া পত্র লিখিতেন, নিজের কুশল-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেন।

ডিসেম্বর মাসে ভয়ানক শীত পড়িল, উপযুক্ত বস্ত্রাদির অভাবে সৈন্যগণ শীতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের উপর তখনও কোন নূতন হুকুম আসিল না, জোসেফ শীতের প্রবল আক্রমণ প্রসন্নমনে সহ্য করিতে লাগিলেন।

অবশেষে একদিন শীতের অতি প্রত্যূষে, ঊষার আলোকে চরাচর আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই সৈন্যগণ সেনাপতির আদেশে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কলেট অভিমুখে ধাবিত হইল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই তাহারা দেখিতে পাইল পল্লীবাসী কৃষকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। তখন সহসা প্রবলবেগে তূর্য্যধ্বনি হইল, তাহা বিপক্ষদলকে আক্রমণের সঙ্কেত চিহ্ন। তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ মাত্র অশ্বারোহী সৈন্যগণ উপল নির্ম্মুক্ত গিরি নদীর ন্যায় মহা বেগে

বিপক্ষ দলের উপর মুক্ত তরবারিহস্তে অশ্ব পরিচালিত করিল, কৃষকদল সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পাহাড়ের দিকে পলায়ন করিল। জোসেফ আনন্দে ও উৎসাহে উন্মত্ত প্রায় হইলেন, তাঁহার মুখ লোহিতাভ হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক পলায়নপর বিদ্রোহীগণের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

সহসা জোসেফের অশ্ব সম্মুখে বাধা পাইয়া দণ্ডায়মান হইল। জোসেফ চক্ষুর নিমিষে দেখিতে পাইলেন দুইজন কৃষক তীক্ষ্ণধার কৃপাণ উদ্যত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, অশ্ব হইতে ভূপাতিত করিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করাই তাহাদের অভিপ্রায়। জোসেফ অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই আর কিছু শুনিতে পাইল না, কেবল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা সকলের কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

অবশেষে যোসেফের তরবারি মহাবেগে একটি কৃষকের স্কন্ধে নিপতিত হইল, হতভাগা কৃষক আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিত হইল। দ্বিতীয় কৃষক বিশেষ সাবধানতার সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জোসেফের সঙ্গে যুদ্ধ করিল, কিন্তু অবশেষে তাহাকেও আহত ও পরাজিত হইয়া জোসেফের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল।

এই বিজয়ে জোসেফ এত পুলকিত হইলেন যে তিনি সেই পরাজিত কৃষকদ্বয়কে একজন কর্পোরালের হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্য পলাতক-গণের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গী সৈন্যদল বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিল।

সহস্র সহস্র পলাতক কৃষক দেখিল, অল্প বয়স্ক একটি মাত্র অশ্বা-রোহী সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তাহারা পলাইতে পলাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বালকের সুকুমার মুখ ও

অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তাহারা জোসেফের চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিল, অস্ত্র উদ্যত করিয়া বলিল, "বল 'জয় রাজার জয়'—তাহা হইলে প্রাণ বধ করিব না এখনই তোমাকে ছাড়িয়া দিব,"—জোসেফ এক হস্তে তাঁহার অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করিয়া ও অন্য হস্তে সুদীর্ঘ যুদ্ধ পতাকা উদ্যত করিয়া, নির্ভীক স্বরে বলিলেন, 'জয় সাধারণ তন্ত্রের জয়!'

সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে অসংখ্য শত্রু, সকলেই সশস্ত্র, একজন কৃষক তাহার তীক্ষ্ণধার কুঠার ঊর্দ্ধে তুলিল, আর একজন তাহার বল্লম উচ্চ করিল, তৃতীয় কৃষক জোসেফের বুকের উপর সঙীন স্পর্শ করিল, কয়েকজন উন্মত্তের ন্যায় তাহার অশ্বের উপর আসিয়া পড়িল, সজোরে অশ্বের বল্গা ও রেকাব চাপিয়া ধরিল, তাহার পর একজন কৃষক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "এখনও বল 'জয় রাজার জয়।' তুমি বালক, আমরা বালকের প্রাণবধ করিতে চাহি না, কেবল তোমার মুখে রাজার জয় ধ্বনি শুনিলেই আমরা তোমাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা—"

কৃষকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সাহসী যোসেফ পতাকা শূন্যে তুলিয়া অকুণ্ঠিত স্বরে তেজের সহিত বলিলেন, "প্রাণ গেলেও তাহা বলিব না, অত্যাচারী রাজার কখন জয় ঘোষণা করিব না, জয় সাধারণ তন্ত্রের জয়।" যুগপৎ তিন চারি খানি উদ্যত অস্ত্র বালকের কোমল দেহে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। যোসেফ সেই অস্ত্রাঘাতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে পুনর্ব্বার উচ্চারিত হইল 'জয় সাধারণ তন্ত্রের জয়।' স্বদেশ রক্ষার জন্য ত্রয়োদশ বৎসরের বালক এই ভাবে নিজের হৃদয় শোণিত নিঃসারিত করিলেন। এইরূপ কত ভক্ত সাধকের রক্তপাতে ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কে তাঁহাদের সংখ্যা করিবে?

জোসেফ রবার মৃত্যুর পর, তাঁহার জন্মভূমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া

ছিল, ফরাসী জননী এরূপ সন্তান লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ফরাসী দেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যোসেফের সাহস ও আত্মত্যাগের কাহিনী কীর্ত্তিত হইতে লাগিল, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম গ্রীস ও রোমের পৌরাণিক বীরগণের বিস্মৃতপ্রায় আত্মবিসর্জ্জনের সমতুল্য বলিয়া সকলের মনে হইল, তাঁহার আত্মত্যাগ দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ফরাসী জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল, কবিকণ্ঠে তাঁহার কীর্ত্তি মহিমা প্রচারিত হইতে লাগিল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র।

বাঙ্গালীর পিতৃধন।*

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। বঙ্গভূমির বন, উপবন, নদী, প্রান্তর, সৈকত ও চত্বর, এমন তিন শত বৈশাখী পূর্ণচন্দ্রের সম্পূর্ণ আলোকে নীরবে প্লাবিত হইয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এমনই তিথিতে একদিন যে মঙ্গলশঙ্খ যে তোপধ্বনি যে অভিষেক মন্ত্রের গম্ভীর রব বঙ্গাকাশকে পরিকম্পিত করিয়াছিল, বঙ্গমাতা তাহারই অনুরণন, তাহারই প্রতিধ্বনির শ্রবণলালসায় আজ তিন শত বৎসর ধরিয়া মিছায় প্রতীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কে জাগাইবে প্রতিধ্বনি? সে প্রথমাধ্বনির বার্ত্তা তাঁর কোন্ সন্তানের কর্ণকুহরে পৌঁছিয়াছে? কেহ ত শোনে নাই! কেহ ত জানে না!

* বিগত বৈশাখী পূর্ণিমায় ভবানীপুর, কালীঘাট, বালিগঞ্জ ও বাগবাজারের বালকসমাজ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রতাপাদিত্য-উৎসবে ইহা পঠিত হয়।

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমায় বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা বার প্রতাপাদিত্যের সস্ত্রীক রাজ্যাভিষেক-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহাতে হিন্দু মুসলমান পর্টুগীজ, উৎকলী বিহারী আসামী সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ধূমধাম রাজধানী পঞ্চক্রোশী মানবারণ্য হইয়াছিল।—সেদিনকার স্মৃতিসম্পদ বর্ত্তমানের ইতিহাসে কোথায়?

বাঙ্গালীর পিতৃধন হইতে আমরা বাঙ্গালী শিশুরা বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছি। ইংরাজের ইতিহাসে আমরা শিখি এবং সেই কুশিক্ষা দূষিত সংস্কাররূপে আমাদের রক্তে মাংসে মিশিয়া যায় যে মারাঠা পাঞ্জাবী রাজপুত ইহারা সব ভারতের বীরজাতি বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের বীরত্বের পিতৃসম্পদ কিছুই নাই। আমাদের মনের উপর এই তিক্ত শিক্ষার বীজ কোন্ ফল প্রসব করে?—শুধু আত্মগ্লানি ও আত্মবমাননার বিষফল। আমরা নিজেদের প্রতি এতই হতাদর ও হতশ্রদ্ধ হইয়া মানুষ হই, যে কোন উৎসবের দিন ধনী জ্ঞাতি ভ্রাতাদের সুন্দর উজ্জ্বল বেশ ভূষার পার্শ্বে মলিন দীনহীন সজ্জায় সজ্জিত বালক যেরূপ লজ্জিত বোধ করে, আমরাও অন্য ভারতবাসীদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে সেইরূপ সঙ্কোচ অনুভব করি।

এক যুগ—প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেকার আমার নিজের জীবনের কোন ঘটনার দ্বারা এই সত্যটি চিত্রিত করিব। সে জন্য স্মৃতির বা কল্পনার সাহায্য লইতে হইবে না, ঘটনাটি তদানীন্তন, ১২৯৯ সালের, ভারতী পত্রিকাতেই "বাঙ্গালী ও মারহাট্টা" ইতিশীর্ষক একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব মাত্র।

ইতিমধ্যে পুণা বেড়িয়ে আসা গেল। * * পুণায় গিয়ে বিকেলে গাড়ী করে সহর দেখতে বেরিয়ে প্রথমেই আমার নজরে কি পড়্‌ল জান? রাজপথের জনারণ্যের ভিতর একজন বালক আপনার খেয়ালে গান গেয়ে চলেছে। সে যেন আমাকে বল্‌ছে—হে নব্য বঙ্গসন্তান! তুমি তোমার সুদূর বঙ্গভূমি থেকে অনেক কষ্ট করে

মহারাষ্ট্র প্রদেশ দেখ্‌তে এসে আমাদের অনুগৃহীত করেছ। * * ঐ দেখ আমাদে পেশোয়ার দগ্ধাবশেষ কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও ঐ সম্মুখে বর্ত্তমান। তোমাদের কি অতীত গৌরব আছে দেখাতে পার কি? * *—বাস্তবিক এরা কি রকম জমা অতীত গৌরবের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে! শুধু তৈলস্নিগ্ধ ক্ষীণ দেহ বাঙ্গালী কেন—একদিন এই মারহাট্টা হস্তের ঝাঁকনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ থরহরি কেঁপেছিল। আমাদের মাতারা যখন শিশুকে বীর কাহিনী শোনান, তখন চতুর্দ্দশ পুরুষ খুঁজলেও একটা বঙ্গ বীরের নাম পাওয়া যায় না* অবশেষে বর্গীর বীরত্বের গানই গাইতে হয়।

সেদিন বিজয়া দশমীতে এখানকার ইউনিয়ান্‌ক্লাবে পানসুপারি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম। বিজয়া দশমীর উৎসব বলতে ভাসানের ঘটা মনে কোরো না। প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে নবমী পর্য্যন্ত সকলে ঘরে ঘরে দুর্গাপূজা করে। এ পূজা উপলক্ষে কেউ নূতন প্রতিমা নির্ম্মাণ করে না সুতরাং দশমীর দিন বিসর্জ্জনের পালাও আসে না। বিজয়া দশমী এখানে অস্ত্রপূজার জন্যে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে সেই দিন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল অতিক্রান্ত হয়। এতদিন তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র একটা শমীবৃক্ষে সোলান ছিল। এই দশমীর দিন তাঁরা সেই শমীবৃক্ষ পূজা করে, অস্ত্র ধারণ করে দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেকালের যোদ্ধা মহারাষ্ট্রীয়গণ পাণ্ডবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিজয়ার দিন দিগ্বিজয়ে বাহির হতেন। এখন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিরস্ত্র কিন্তু তবু তাদের অস্ত্রের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ। এখনো এদেশে এই দিন শমীবৃক্ষ ও অস্ত্রপূজা প্রচলিত। পুরোহিত সকলের হয়ে বৃক্ষ পূজা করেন এবং গৃহস্বামীরা স্ব স্ব গৃহে স্বয়ং অস্ত্রপূজা করেন। ইউনিয়নক্লাবে আমাদের কস্‌রৎ দেখবার নিমন্ত্রণ ছিল; কস্‌রৎ অর্থাৎ জিম্‌ন্যাষ্টিক্। যে কস্‌রৎ-ব্যবসায়ীটিকে সেদিনের জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে সভাস্থলে উপস্থিত হবার পূর্ব্বে হাইস্কুলের দুজন বালক তলোয়ার খেলায় নৈপুণ্য দেখিয়ে আমাদের মোহিত করেছিল। কস্‌রৎ দেখা হয়ে গেলে একজন অভ্যাগত মহারাষ্ট্রীয় উকীল উঠে একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি বল্লেন এই বিজয়া দশমী তাঁদের একটি বিশেষ আনন্দের দিন। মহারাষ্ট্রীয়দের দুই দেবতা, শস্ত্র এবং শাস্ত্র। শাস্ত্রচর্চ্চা এখনো আছে। কিন্তু শস্ত্রচর্চ্চা প্রায় উঠে গেছে। এখন

* এই পিতৃনিন্দা পাপের জন্য দোষী আমার তদানীন্তন অজ্ঞতা, দোষী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অভাব, দোষী সে অভাব নিরাকৃতসত্ত্বেও টেক্সট্‌বুক কমিটির বালপাঠ্য-নির্ব্বাচনে অর্ব্বাচীনতা।

তাঁর জাতের শস্ত্রপরাঙ্মুখতা দেখে তাঁর অনেক সময় নিজেকে মহারাষ্ট্রীয় বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। তাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রতিবৎসর এই দিনে অস্ত্রপূজা করে শস্ত্রধারী হয়ে দিগ্বিজয়ে যেতেন, আজ সেদিন দূরস্মৃতি। একদিন তাঁদের অস্ত্রবান্ বাহুর ভয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ভীত হয়েছিল—আজ সে বাহু অস্ত্রধারণের কৌশল পর্য্যন্ত ভুলে গেছে। আজকাল তবু স্থানে স্থানে অস্ত্রচর্চ্চা দেখা দিয়েছে। এখানকার হাইস্কুলের বালকেরা অস্ত্রশিক্ষা করে সেটা শুভলক্ষণ। কারণ কবে আমাদের রাজা ইংরেজরা তাঁদের সাহায্যার্থ আমাদের ডাকবেন, তখন আমরা শস্ত্রপরাঙ্মুখতা বশতঃ অগ্রসর হতে পারব না, সে বড় লজ্জার কথা হবে।”

বঙ্গদেশের বিজয়া দশমীর উৎসবের অর্থ নাচ, গীত, বাদ্য ও বিলাসিতার ষোড়শোপচারে পূজা। আর এদেশে এর অর্থ অস্ত্রপূজা আর নাচ থিয়েটরের পরিবর্ত্তে এই রকম বীররসাত্মক ক্রীড়া কৌতুক, আলাপসালাপ। আমার এক বিলেৎ ফেরত বন্ধু গল্প করেছিলেন যে অতি শিশুকাল থেকে বিলেতে পালিত হওয়ায় ইংরেজ যুবকদের সঙ্গে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ রকমে মিশে গিয়েছিলেন। একত্রে বাস, অধ্যয়ন, খেলা, আমোদ প্রমোদ সব করাতে তাঁদের জাতিগত বৈষম্যের কথা কখন মনে পড়ত না। তাঁর বিলিতী বন্ধুরাও তাঁকে আপনাদেরই একজনের মত দেখ্ত। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা যখন কোন জাতীয় উৎসবের দিন ব্রিটিশ পতাকা উড়িয়ে জলদ গম্ভীরস্বরে গেয়ে উঠ্ত—

Rule Britanina Britanina rules the waves !
And Britons never, never will be slaves !

তখন সেই জনারণ্য ও আনন্দের তরঙ্গের ভিতর তিনি অনুভব কর্ত্তেন যে তিনি অসীম একলা, তখন তাঁর হৃদয় একান্ত বিষণ্ণ ও লজ্জাভারাক্রান্ত হয়ে পড়্ত। এই মহারাষ্ট্রীয়দের জাতীয় উৎসবের দিন, তাদের বীর হৃদয়ের কথা শুনে আমারও কতকটা সেই রকম ভাব হয়েছিল। আমি নির্ব্বীর্য্য বাঙ্গালী এই বীর সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, আমরা ওদের বীরত্বের গর্ব্ব কি ঠিক বুঝতে পারব! এই মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা ছাপ রেখে দিয়েছে। এরা ভারতের এক বনেদী বংশ বটে। কিন্তু আমরা অতীতে কোন পাথের সঞ্চয় করিনি। * * তুমি বলবে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন সভ্যতা আমাদের অতীত। কিন্তু সে অতীত ত মান্ধাতার আমলের অতীত। তখন বাঙ্গালীও ছিল না, মারহাট্টাও

ছিল না, রাজপুতও ছিল না, ছিল কেবল আর্য্য এবং অনার্য্য।* কিন্তু যখন থেকে মারহাট্টা, রাজপুত ও বাঙ্গালীর ভেদ হল, সেই অতি-প্রাচীনের পর যে দর্শনস্পর্শন যোগ্য প্রাচীন আরম্ভ হল, তার গৌরবভাণ্ডারে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতানা স্ব স্ব করন্ধ দিয়েছেন, কিন্তু বাঙ্গালীরা তাতে এক কপর্দ্দকও দিতে পারে নি।"

উপরোদ্ধৃত অংশে আমি যেরূপ জাতীয় আত্মলঘিমা ও আত্মগ্লানিযুক্ত মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছি আমার বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত অধিকাংশ বাঙ্গালী বালক বালিকা এমন কি তাহাদের গুরুজনস্থানীয়দেরও মনে নিজেদের সম্বন্ধে ঐরূপ গ্লানি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কিন্তু সেদিন আমার যে জাতীয় আত্মসম্মান ক্ষুব্ধ হইয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ নিজের নিকট নিজের হৃতসম্মান ফিরিয়া পাইবার পথ হাতড়াইতেছিল। আমার মন তখনি বলিয়া উঠিয়াছিল — —

"অতীত আমাদের নয়, অতীত থেকে চোখ ফিরিয়ে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ। ভারতবর্ষকে নবীন সভ্যতা, নবীন সাহিত্য, নবীন বীর্য্য দেওয়া আমাদের ব্রত হোক। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে নব্য বাঙ্গালীর একটা বৃহৎ কার্য্য ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। * * শারীরিক বীরত্ব যে আমাদের হতে পারে না তা মানিনে। * * আর বাহুবল না থাকলেও মনে যার কাপুরুষতা নেই সেই বীর। আমার বিশ্বাস আজকাল নব্য বাঙ্গালীর হৃদয়েও এই বীরত্বের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। এমন দিন আসবে যখন আর কোন ভদ্রলোক অম্লানবদনে ইংরেজ গোরার চপেটাঘাত উদরস্থ করবেন না, আর যদি বা করেন তাহলেও 'কাপুরুষ' অভিধানের ভয়ে বন্ধু সমাজে সে কথাটা চেপে যাবেন। আর রেলওয়েতে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের প্রতি অভদ্র ইংরেজের একতরফা অপমানের কথা শোনা যাবে না। ইংরেজের মুষ্টির ওজন বিরাশী সিক্কা, বাঙ্গালীর বাহুবলের ওজন শূন্য, কিন্তু তবু নবীন বাঙ্গালীর মনের তলায় এমন একটু খানি আগুণ এসে লুকোবে যার জোরে সে আবশ্যকস্থলে ইংরেজের মুষ্টিতে গা পেতে দিতে পিছপাও হবে না। * * আমাদের দেশের

---

* এ ভ্রান্ত উক্তি আমি এখন প্রত্যাহার করিতেছি। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতিতে মহাভারত রামায়ণের কাল হইতেই প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গদেশের ইতিহাস সেই সুদূর অতীত হইতেই সংগ্রহনীয়।

জলবায়ু শারীরিক বলের প্রধান প্রতিবন্ধক এ কথাটা খানিকটা সত্যি হলেও, এর উপর পুরোপূরি বিশ্বাস করা কিছু নয়। কারণ ব্যায়াম চর্চ্চার অভাবই আমাদের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। ব্যায়াম চর্চ্চা করলে দেশের জলবায়ুকে যে কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে বাঙ্গলার লাঠীয়ালেরা তার প্রমাণস্থল। এই ম্রিয়মাণ বাঙ্গালী জীব কেবলমাত্র আশৈশব চর্চ্চার ফলে তাদের ক্ষীণমধ্য সুঠাম দেহে শারীরিক বীর্য্যকে স্ফূর্ত্তিমান করে তুলেছে। বাঙ্গালী যুবকেরা কোঁচার প্রান্তটি বাম হাতে ধরে' রূপমোড়া সখের ছড়িটি হাতে করে না বেরিয়ে লাঠি খেলা কেন যে অভ্যাস করবে না আমি ত ভেবে পাইনে। আমাদের স্কুল কলেজে জিওমেট্রি কনিক্সের সঙ্গে সঙ্গে যদি নানা রকম ব্যায়াম এবং অস্ত্রশিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হয়, অন্ততঃ ঘরে ঘরেও ছেলেরা যদি অস্ত্র শিক্ষা করে তাহলে আর আমরা একেবারে নির্ব্বীর্য্য জাত হয়ে থাকিনে। বাহুবলের গৌরব নিয়ে আমরাও বীর সভায় দাঁড়াতে পারি।"

সে দিন অতীতের দিকে চাহিবার অধিকার নাই জানিয়া শুধু ভবিষ্যত্যের দিকেই চাহিয়াছিলাম। তখন নিজেদের কাঙ্গাল দুঃখী নিঃস্ব বলিয়া জানিতাম, এবং রাজপুত ও মারহাট্টার গর্ব্ববিভাসিত মুখের দিকে তাকাইতে ব্যথা পাইতাম। তারপর হঠাৎ একদিন জানিলাম আমরা এতদিন শত্রু কর্ত্তৃক বঞ্চিত, প্রতারিত হইয়া আসিয়াছি। আমরা দরিদ্রের সন্তান নই—আমরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, আমাদের পিতৃসম্পদ তুলনায় কোন জাতির অপেক্ষা হীন নহে। সেই পিতৃধনের বার্ত্তা আমাদের নিকট আনিলেন—সৌভাগ্য হইতেও সৌভাগ্যতর এই যে কোন ইংরেজ বা স্কচ্ মহাপুরুষ নহে,—আমাদেরই এক জন!—মাতৃভূমির সুসন্তান শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী! বঙ্গের শেষ স্বাধীন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যথার্থ জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া তিনি আমাদের জাতীয় ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার লিখিত প্রতাপচরিতে যে শুধু প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের কাহিনীই পাওয়া যায় তাহা নহে। ইহাতে শুধু যে জানা যায় একজন বাঙ্গালী কায়স্থ সন্তান কতদূর প্রতাপান্বিত হইতে পারে, বাঙ্গলা দেশের সমস্ত মুসলমান দিগকে স্ববশে আনিতে পারে, উড়িষ্যার একত্রিত হিন্দুরাজাদের যুদ্ধে

পরাভব করিয়া গোবিন্দজী প্রতিমা কাড়িয়া আনিয়া পিতৃব্যের অনুরোধ পালন করিতে পারে, দিল্লীর স্বনামপ্রসিদ্ধ শাহনসা আকবরের সাম্রাজ্য-নীতি বিধ্বস্ত করিতে পারে, আরাকাণ পর্য্যন্ত নিজ প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে—এবং যে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে তখন সমগ্র জগৎ ভীত ছিল তাহাদের শাসন করিয়া তাহাদের উপদ্রব রোধ করিয়া তাহাদের দলপতিকে নিজ সৈন্যভুক্ত করিতে পারে—একজন মাত্র বাঙ্গালীর সম্বন্ধেই যে এত কথা শুধু জানা যায় তাহা নহে। ইহাতে দেখা যায়, তখন এক প্রতাপ ছিল না, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই আমাদের চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে ঘোষাল গাঙ্গুলী, ঘোষ বোস গুহ দত্তেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ—শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত উদয়াদিত্য, রামচন্দ্র, কীর্ত্তিনারায়ণ প্রভৃতি কত বঙ্গবীর ছিলেন। এই গ্রন্থে সেই সমসাময়িক কালাপাহাড়ের সহিতও সাক্ষাৎ হয়—যে স্বধর্ম্মদ্রোহী হইলেও বঙ্গবীর বটে; যে বাঙ্গালীবীরের নামে উড়িষ্যাবাসী আজ পর্য্যন্ত ভীত, যাহার বাহুবলে মোগল ত্রস্ত। তাহা ছাড়া সেই সময়কার বারভুঁইয়াদের বিবরণ, যে বারজন বাঙ্গালী রাজা—যশোহর, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভূষণা, ভুলুয়া, খিরিজপুর, ভাওয়াল, বিষ্ণুপুর, তাহিরপুর, দিনাজপুর, পুঠীয়া ও পাবনার—বাঙ্গলার পাঠান রাজ্য ও দিল্লীর মোগলরাজ্যকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আরও পূর্ব্বেকার বীরত্বের কত আভাষ কত ইঙ্গিত এই গ্রন্থে আছে—যে ইঙ্গিতগুলি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক সুদূর অতীতে বাঙ্গালীগৌরবের সন্ধান করিয়া লইবেন।

বাঙ্গালী চিত্তের প্রসাদজনক বাঙ্গালীর আত্মসম্মানের পুষ্টিজনক বহু উপাদান এই গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম এই পুস্তকখানি আমাদের জাতীয় ধনাগারবিশেষ। এই পুস্তকপ্রণেতা নিজ পিতৃপৈতামহ ঋণ সম্যক পরিশোধ করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশকে তাঁহার নিকট চিরঋণী করিয়া

রাখিয়াছেন। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকের, বাঙ্গালী বৃদ্ধের ও বাঙ্গালী বণিতার নিত্যপাঠ্য ও জীবনের নিত্যসহচর হওয়া উচিত।

শিবাজীকে লইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা কত গর্ব্ব করেন কত উৎসব করেন। কিন্তু সেই শিবাজীর অপেক্ষাও প্রতাপ বড় ছিলেন। বর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রীয়দের এত নাম ধাম এই জন্য যে উহাঁরা খুব শেষাশেষি জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, এখনও প্রায় লোকস্মৃতির মধ্যেই সে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মহারাষ্ট্রীয়েরা আবহমান কালই বীরত্ব দেখাইয়া আসিয়াছেন। মহারাষ্ট্রদেশও মুসলমানের করায়ত্ত হইয়াছিল। শিবাজীর আমলে তাঁহারা যেমন ছাড়াইয়া উঠিয়া বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, আমরাও তেমনি প্রতাপের আমলে সেই বীরত্ব দেখাইয়াছি। এইটি মনে রাখিয়া বাঙ্গালী বালক মহারাষ্ট্রীয় বালকের অপেক্ষা নিজেকে এক তিল হীন বা কৃপাপাত্র মনে করিতে না শিখুক। হে বঙ্গবালক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি মনে রাখ। শুন ঐ বেদমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে।

অহং সর্বা জিতীজয়েয়ম্, অহং সুর্বাল্লোকান্ বিন্দেয়ম্, অহং সর্বেষাং রাজ্ঞাং শ্রেষ্ঠমতিষ্ঠাং পরমতাং গচ্ছেয়ং, সাম্রাজ্যং ভৌজ্যং, স্বরাজ্যং বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যং রাজ্যং মাহারাজ্য মাধিপত্যং অহং সমন্তপর্য্যায়ীস্যাং সার্বভৌম, সার্বায়ুষ আন্তাদা পরার্দ্ধাৎ পৃথিব্যৌ সমুদ্র পর্যন্তায়া একরাজিতি।

"আমি সকল যুদ্ধভূমিতে বিজয়ী হই, আমি সকল দেশ প্রাপ্ত হই, আমি সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব চিরজীবিত্ব, উৎকৃষ্টত্ব লাভ করি, সাম্রাজ্য ভোগসমৃদ্ধি, অপারতন্ত্র্য, অন্য রাজা হইতে বৈশিষ্ট্য প্রজাপতি-পদ, রাজ্য মহারাজ্য লাভ করি; আমি দেশে কালে সর্ব্বব্যাপী হই, সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম, পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত আয়ুষ্মান হই, আমি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর একেশ্বর হই।"

শ্রীসরলা দেবী।

ভ্রম সংশোধন।

বৈশাখ মাসের ভারতীতে অনেকগুলি ছাপার ভুল রহিয়াছে—তন্মধ্যে দুইটি প্রধান ভুল নিম্নে সংশোধিত হইতেছে :—

"প্রাচীন ভারতে মদ্যপান" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখকের নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নহে। "পাষাণের আবেদন" এই কবিতার প্রথম চরণের দুইটী অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে। উহা এইরূপ হইবে—নাথ! তোমারি গঠিত এদীন পাষাণ!

ধরণীর প্রেম।

ছয় ঋতু ফিরে ফিরে যায় আর আসে ;—
প্রেমের বিচিত্র লীলা ধীরে পরকাশ
ধরার নায়িকা-হৃদে ; হর্ষ লজ্জা ভয়ে
উন্মত্তা ধরণী-বধূ রহস্য-বিস্ময়ে।

তৃষার্ত্ত বৈশাখ শুষ্ক—খড়ি উঠে গায়,
তপ্ততনু ছটফটি ধূলায় লুটায়,
রুক্ষ পাণ্ডু কেশপাশ, রিক্তদেহবাস
বিরহ ব্যাকুলা ধরা ফেলিল নিশ্বাস।

আষাঢ় এলায়ে দিল কৃষ্ণ কেশস্তর,
পুলকে উঠিল ফুটি কদম্ব কেশর।
রাত্রিদিন শ্রান্তিহীন বৃষ্টিধারা ঝরে—
প্রোষিতভর্ত্তৃকা ধরা কাঁদিলা কাতরে।

সুন্দর শরৎ অঙ্গে পীত রৌদ্রবাস,
সুশুভ্র রজতজ্যোতি ঝলি' উঠে কাশ,
সেফালি কমল মধুগন্ধ মাতোয়ারা—
মিলন সম্ভোগরসে হাসে বসুন্ধরা।

হেমন্ত হাসিছে, কাণে শিশিরের দুল,
দীপিয়া উঠিল দেহে দোপাটি দুকূল,
পরিপক্ব ধান্যশীর্ষে দুলায়ে অঞ্চল,
দলমলি উঠে ধরা রভস চঞ্চল।

উত্তর অনিলরথে আসিল হিমানী
কম-অঙ্গে কুয়াশার জবনিকা টানি'
আতপ্ত পরশ আশে, দীর্ঘনিশি ধরি'
মানিনী ধরণীরাণী কাঁপে থরথরি"।

বসন্ত আসিল সাজি' ফুলে ফুলে ফুলে,
চূতাস্বাদে কোয়েলার কণ্ঠ গেল খুলে
মলয় বহিয়া আনে প্রেমের নিঃশ্বাস
ধরার প্রণয়ে আজি প্রথম সম্ভাষ।

জানি না কাহার সাথে ধরণী এমন
যুগ যুগান্তর ধরি প্রেম নিমগন
যার সে বিরাট প্রেম খণ্ড হয়ে রাজে—
ধরার সন্তান—এই নরনারী মাঝে !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

গঙ্গাস্নান-যাত্রা।

গভীর রাত্রে ১০।১৫ জন স্ত্রীলোকের কণ্ঠে হরিধ্বনি শুনিয়া পার্ব্বতী জাগিয়া উঠিয়া সহোদরা ভগ্নী রক্ষাকে বলিল,—

"দিদি ওঠ্ ওঠ্ বোধ হয় আর রাত নাই, ওই দেখ কারা গঙ্গা নাইতে গেল ওঠ্ ওঠ্," বলিয়া বারম্বার ভগ্নীকে ঠেলিতে লাগিল। রক্ষা জাগিয়াছিল, কিন্তু আজ মাঘমাসের ১লা, দারুণ শীত, সেই ভয়ে উঠিয়াও উঠিতে ছিল না, জাগিয়াও লেপ চাপা দিয়া শুইয়া ছিল। পার্ব্বতীর তাগাদায় অগত্যা লেপ ছাড়িয়া উঠিল। মুখে হাতে জলদিয়া পার্ব্বতী এতক্ষণ পুঁটুলি খুঁজিতে ছিল; অবশেষে খুঁজিয়া না পাইয়া বিরক্ত হইয়া চীৎকারস্বরে কহিল,

"যাবি কি যাবিনা বল্; কোথা পুঁটুলি রেখেছিস সেই ইস্তক খুঁজে পেলামনা।"

এই যে আজুলি মুখে রয়েছে," বলিয়া রক্ষা পুঁটুলি বাহির করিল। পার্ব্বতী বলিল,—

"আমি সেই অবধি হাত্ড়াচ্ছি আমাকে বলতে হয়? আমাকে ফাঁকা খোঁজ করালি, নে আর দেরি করিসনে।" তখন দুই ভগিনীতে দুই খানা শীতবস্ত্র এবং সেই পুঁটুলি লইয়া ঘরে তালা লাগাইল ও তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া "গঙ্গা "গঙ্গা" বলিয়া পথে বাহির হইল।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ। সুশুভ্র চন্দ্রালোকে গ্রাম হাসিতেছিল। সেই জনশূন্য পথে বাহির হইয়া পার্ব্বতী সভয়ে কহিল,—

"ও দিদি! কেউ যে কোথাও নাই। তবে কে হরিবোল দিলে!" রক্ষা অভয় দিয়া কহিল "আমি আছি, তোর ভয় কি? কত গাঁ হতে আজ কত লোক গঙ্গা নাইতে যাচ্ছে তারাই হরিবোল দিয়েছে।"

"দিদি কে কে নাইতে যাবে শুনেচিস্ ?"

"যাবে ঢের লোক্। আমাদের পাড়ায় ফণের মা" বলিয়া অঙ্গুলি পর্ব্বে গণনা করিয়া বলিল "এক, হেমা দুই, রাইপুরের গিন্নি তিন, ইটের বউ চার, আর তার সই পাঁচ।

পার্ব্বতী বাধা দিয়া কহিল, "তার আবার সই কে ?"

"ওই যে কোথাকার বউ বলে, দূর ছাই ওই যে কি গাঁথানা নাম মনে থাকেনা, হ্যাদে গিয়ে বল—কোঁদা, কোঁদা, কোঁদার বউ তার সই না ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সে বছর সই পাতানের হিড়িকে পড়ে সই পাতিয়ে ছিল বটে—"

রক্ষা তখনও অঙ্গুলির পর্ব্ব ধরিয়া ছিল, সে আবার আরম্ভ করিল "কোঁদার বউ পাঁচ, হাবুর মা ছয়, আমি সাত, তুই আট—"

এইরূপ হিসাব করিতে করিতে খানিক দূর গিয়া ডাকিল "বউ ঠাক্‌রোণ—"

"যাইলো যাই," বলিয়া একজন গৌরবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি ষাট বৎসরের প্রাচীনা ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষয়া ক্ষয়া দাঁত বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি "রাইপুরের ঠাকুরোণ" নামে স্বগ্রামে পরিচিতা। ইঁহার এবং আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা ভগ্নীদ্বয়ের পরিচয় দিয়া রাখি। ভবিষ্যতে অন্যান্য যাত্রীদের পরিচয় দেওয়া যাইবে।

রক্ষা ও পার্ব্বতী দুই ভগ্নী, ব্রাহ্মণ কুলীনকন্যা, উভয়েই বিধবা। রক্ষার বয়স বোধ হয় ত্রিশ পার হইয়াছে, দেখিতে শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি ও কৃশা। ভগ্নী পার্ব্বতী একজন যথার্থ রূপবতী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অনিন্দ্য মুখশ্রী, সুন্দর অবয়ব, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় অভাগিনী অল্পদিন হইল স্বামীহারা হইয়াছে। রক্ষা যেমন প্রগল্‌ভা ও কলহ-

প্রিয়া পার্ব্বতী তেমনি শান্ত ও লজ্জাশীলা। রক্ষার বিশ্বাস সে এখন একজন "গিন্নি বান্নি" হইয়াছে, তাহার উপর আবার এই গ্রামের কন্যা, সেইজন্য কাহাকেও লজ্জা বোধ করা সে আবশ্যক মনে করিত না। রক্ষার কলহপ্রিয়তা এবং প্রগল্‌ভতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকে যতই কেন কথা বলুক না, তাহার ধর্ম্মে মতি সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ ছিল না। স্বভাব চরিত্র পরম পবিত্র; ঠাকুর দেবতায় আঠার আনা ভক্তি। প্রত্যহ এক প্রহর রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, রক্ষা, ইষ্ট দেবতার নাম লইত, শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নাম জপ করিত, নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ করিত, দশমহাবিদ্যার ধ্যান এবং দাতাকর্ণ, গণেশবন্দনা ইত্যাদির জ্বালায় প্রতিবাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইত। কিছু পৈত্রিক ব্রহ্মোত্র জমি আছে, তাহার ধান হইতে সম্বৎসর এক প্রকার বেশ চলিয়া যায়। "রাইপুরের ঠাকরোণ" একাকিনী থাকেন, সংসারে কেহ নাই, স্বামীপরিত্যক্ত কিছু সামান্য নিষ্কর ভূমি হইতে কোনও প্রকারে দিনপাত হয়। বৃদ্ধার মনটা খুব সাদা, খলতা বা কপটতা নাই। কথা বার্ত্তা বেশ সংযতভাবে কহিতে পারেন না। অনেক সময় এক কথার স্থানে আর একটা কথা বলিয়া শ্রোতাগণের হাস্যরসের কারণ হইয়া ওঠেন। বৃদ্ধা দ্রুতগমনে খুব পটু, কিন্তু দোষের মধ্যে পথ চলিতে চলিতে নিদ্রালু হইয়া ঢুলিতে থাকেন।

আমরা যে পল্লীগ্রামের কথা বলিতেছি, সে গ্রামটি বর্দ্ধমান জেলার এক অজ্ঞাত প্রান্তে অবস্থিত। চলিত কথায় যাহাকে "অজ পাড়া গাঁ" বলে, এ গ্রামটিও তাই। গ্রামে একখানিও ইষ্টকালয় নাই, ভাল দোকান নাই এবং মোটের উপর দুই শত আন্দাজ লোকের বাস।

পূর্ব্বকথিতা যাত্রী তিনজন পথে বাহির হইলে, আরও পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক পথে বাহির হইল। তখন সকলে "গঙ্গা" "গঙ্গা" বলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চড়কডাঙ্গার মাঠে আসিয়া পড়িল।

প্রায় আধপোয়া পথ অতিক্রম করিয়া ফণের মা (শেষোক্ত দলের একজন বিধবা প্রৌঢ়া শূদ্রকন্যা) বলিল "হাবুর মা এল না?" ইটের বউ হাসিয়া বলিল "এগিয়ে গিয়েছে।"

পার্ব্বতী বলিল "কোথা মাগী মত্তে গেল একলা?"

"একলা কেন যাবে? সে যে জয়রাম ও অনন্তর সঙ্গে গেছে।"

পার্ব্বতী একটু সভয়ে বলিল "পুরুষেরা এগিয়ে গেল, আর আমরা এই কজন মেয়েলোক একলা যাব?"

হেমা ওরফে হেমাঙ্গিনী নামে একজন যুবতী ব্রাহ্মণকন্যা কহিল "তাইত ভাই আমরা আট নয় জনে একলা কেমন করে যাব?" বলিয়া হাসিতে লাগিল। হেমার পিতা নাই, মাতা ও চার ভাই ও চার ভ্রাতৃজায়া আছে। হেমার বয়স ২৪ বৎসর হইবে; বড় ডানপিটে, নিজে হাসিতে এবং সকলকে হাসাইতে বড় পটু। কিছু চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়া বর্ষীয়সীরা হেমার উপর সদয় ছিলেন না, কিন্তু হেমা পাড়ার যত যুবতী ও কিশোরী বউঝির সঙ্গিনী ও উপদেষ্টা ছিল। এই যাত্রিদলের মধ্যে কেবল ফণের মা ও হাবুর মা জাতিতে শূদ্র—উগ্রক্ষত্রিয়, বাকি সকলেই ব্রাহ্মণ। হাবুর মা একজন অদ্ভুত প্রকৃতির স্ত্রীলোক। তাহাকে লইয়া পাড়ার ছেলে বুড়া সকলে যথেষ্ট রঙ্গ করিয়া আমোদ উপভোগ করিত, কিন্তু মাগী নিজে বড় আড়বুঝো। গায়ের রং কটা, চক্ষু কটা, বয়স ৫০ পার হইয়াছে, শিরঃপীড়া আছে, তাই মস্তক মুণ্ডিত। যাত্রীরা সকলে পূবের গাঁয়ের কাছে আসিয়াছে, এমন সময় কোঁদার বউ বলিল,—

"আমার ভাই আসতে ইচ্ছে ছিল না, পয়সা নেই, নাদায় একটা চাল নেই, যেখেনে যাব সেই খেনেই খরচ—"

বাধা দিয়া রক্ষা কহিল "তা বটে, ডাক পুরুষের বচন আছে—

'হাতে কড়ি পায়ে বল।　　তবে চল নীলেচল॥'

এমন সময় দূরে কাহার অস্ফুট কথা শুনিয়া সকলে সভয়ে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। সকলে জ্যোৎস্নালোকে দেখিল অদূরে মাঠের উপর ৩৪ জন লোক বসিয়া আছে। উপবিষ্ট লোকের মধ্যে একজন বলিল—"আর নয় এই বার ওঠ, তারা আসছে।" দ্বিতীয় এক ব্যক্তি বলিল—"না না আমাকে অনেকে লজ্জা করে, আমি থাকলে তাদের কথা কবার ব্যাঘাত হবে, এত পথ চুপ করে থাকতে কষ্ট হবে—"

"হ্যাঁ ওদের আবার লজ্জা আছে! যদি থাকেত বাড়ীতে, পথে বেরিয়ে নয়।" দ্বিতীয় ব্যক্তি শুনিল না, প্রথমের হাত ধরিয়া বলিল "বোস।"

প্রথম ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া বলিল "কি করিস্ জয়া? শীতে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? বরং চললে শীত থাকে না।" এমন সময় প্রথমোক্ত যাত্রীর দল আসিয়া জুটিল। হেমা বলিল "বেশ যাহো'ক পুরুষ বটে, আগ বাড়ান এসে বসে আছে।"

উপবিষ্ট প্রথম ব্যক্তি বলিল "বসেত আছি চলেত যাই নাই তার আর অন্যায় কি হয়েছে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"চলে যাব নাত কি, তোমাদের বাড়ী বাড়ী ডেকে বেড়াব বুঝি?"

ইটের বউ বলিল—"ডাকতে হবে কেন? আমরা পথ চিনি তোমার ভরসাতে আসি নাই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সক্রোধে বলিল—"দেখলে অনন্ত দাদা, আমি বলিচি কি মিছে কথা? সেদিন তোমাকে দেখে গোবর হাতে ঘোমটা টান্তে টান্তে হুড়মুড় করে কুকুরের গায়ে পড়ে মলেন, আর শুনচ আজ চোপরা?" অনন্ত হাসিয়া বলিল "আমার সঙ্গেত আর কথা কহে নাই তোর সঙ্গে চোপরা করেছে তাতে আর দোষ কি? চল্ চল্ আর দেরি করিসনে, রাত থাকতে থাকতে পঁহুছান চাই।"

হঠাৎ ব্যস্তভাবে রক্ষা বলিল—"হাঁগা সবাইত আছি হাবুর মা কই? তাকেত ডাকা হয় নাই?" জয়রাম বলিল "এই যে হাবুর মা,—ও মাগী ওঠ্, নইলে তোকে ফেলে যাব, মাগী এখানে ঢুলতে এয়েচে।" অনন্ত রক্ষার প্রতি চাহিয়া কহিল—"হাবুর মা যে আমাদের সঙ্গে এয়েছে! হাবুর মা ওঠো গো আর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঢুল্‌তে হবে না।" হাবুর মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পুঁটুলি হাতড়াইতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ পরে নৈরাশ্যব্যঞ্জকস্বরে কহিল "হেই দেখ আমার পুঁটুলি কোথা গেল! তাইত আমি কি সর্ব্বনাশ কল্লাম গা? হয়ত ভাইথাকির জ্বালায় বাড়ীতে ভুলে থুয়ে এলাম, কি হবে? খাব কি? কি অশুভক্ষণেই বউ এনেছেলাম।" জয়রাম কৃত্রিম দুঃখের সহিত বলিল "তাইত হাবুর মা তুমি যে পুঁটুলি ফেলিয়ে এয়েছ তাতে তোমার কি ছিল?"

"তাতে আমার সব্বিশ্বি আছে; নতুন চেলের মুড়ি আছে তিন সের, বরি (বড়ি) আছে ঠিকির এক পা, থারা থারা তেঁতুল আছে খান পাঁচ ছয়, ডাল আছে, নুন আছে, আলু আছে, আর গোণ্ডাচার পহাও (পয়সা) আচে।"

জয়রাম। তুমি না হয় বাড়ী যাও, পুঁটুলি আন নইলে খাবে কি?

হাবুর মা। আমি কিন্তু নেইছেলাম বোদ নাগচে, আমি কি করি গা, আমায় যে ডাকাডাকি করে কাস্তে ইচ্চে হচ্চে।

বলা বাহুল্য যে হাবুর মা যখন পুঁটুলির শোকে বিহ্বল হইতেছিল তখন সকলেই চলিতেছিল। কিন্তু হাবুর মার পুঁটুলির শোকে পা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। যাত্রীরা কেহই নীরবে ছিল না। হাবুর মার পুঁটুলিবিভ্রাটের সময় সকলেই নিজ নিজ ঘরসংসার, চাসবাস ইত্যাদির গল্প করিতেছিল। এই গল্পে ও হাস্যপরিহাসে যোগ দেয় নাই কেবল

একজন—সে অভাগিনী পার্ব্বতী। সকলের পশ্চাতে হেমা ও পার্ব্বতী চলিয়াছে। হেমা সঙ্গিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার জন্য অনেক কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল, কিন্তু পার্ব্বতী পূর্ব্ববৎ নীরব, আপনার ভাবে আপনি বিভোর।

যাত্রিগণ (অনন্ত ও জয়রাম ছাড়া) সকলেই বামকক্ষে পুঁটুলি ও শীতবস্ত্রে আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া চঞ্চলা কল্লোলিনীর ন্যায় কল কল নাদে মাঠ প্রতিধ্বনিত করিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিয়াছে। খানিক দূর আসিয়া অনন্ত হাসিল ও কৃত্রিম বিরক্তি সহকারে বলিল "আঃ, কি করিস, জয়া কেন বুড় মানুষকে কাঁদাচ্চিস? দে ওর পুঁটুলি ফিরে দে বুড়মানুষ কত কাঁদছে।"

"না দাদা তুমি জাননা, মাগী বড় পাজী, যে বয়ের সঙ্গে ঝকড়া করে, বউটাকে ভারি জ্বালায়।"

অনন্ত। তোর সে মাথাব্যথা কেন? ওর বউ, যা খুসি তাই করবে, তোর তাতে কি?

জয়া। কেন আমি কি কল্লাম?

অনন্ত। আবার চালাকি কচ্ছিস, লাগাব ঘুষি?

অনন্তর ঘুষিকে জয়রাম বড় ভয় খাইত। যখন কথায় জয়রামকে বশে রাখিতে পারিত না, তখন অনন্ত ঘুসিটা আসটা ব্যবহার করিতে ছাড়িত না। উভয়ের কথায় পাঠকগণ বোধ হয় কতকটা উহাদের প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছেন তথাপি একটু খুলিয়া বলা ভাল।

অনন্তর মাতামহের বাস আমাদের কথিত এই গ্রামে, তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় সমস্ত বিষয় একমাত্র দৌহিত্র অনন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর মাতাপিতা অথবা মাতামহ কেহই জীবিত নাই, সংসারে থাকিবার মধ্যে এক বিধবা খুড়ীমাও এক দূরসম্পর্কীয়া ঠাকুরমা আছেন। অনন্তর বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রী সুলক্ষণার বয়স প্রায় ১৫ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু

গত জ্যৈষ্ঠমাস হইতে অনন্ত শ্বশুরবাড়ীও যায় না অথবা তাহাকে আনিবার নামও করে না। মধ্যে নাকি অনন্তর চরিত্র সম্বন্ধে গ্রামে একটু দুর্ণাম রটে, এই কলঙ্ক কিন্তু সকলে বিশ্বাস করিত না, কেহ বলিত সত্য, কেহ বলিত মিথ্যা।

কথাটা নানা আকারে প্রচারিত হইয়া অবশেষে অনন্তর শ্বশুরবাটী সহজপুরে সুলক্ষণা ও তাহার মাতার কর্ণগোচর হয়। গত জ্যৈষ্ঠমাসে ষষ্ঠীবাটার সময়, যখন অনন্ত শ্বশুরবাটি গিয়াছিল, তখন মাতা ও ভ্রাতার নিষেধ সত্বেও সুলক্ষণা স্বামীর নিকট তাহার দুর্ণামের কথা উল্লেখ করে। অনন্ত একেবারে সাফ জবাব দেয় যে, সে এবিষয় কিছুই জানে না। কিন্তু অভিমানিনী সুলক্ষণা তাহাতে নিরস্ত না হইয়া বারবার সেই অপ্রিয় কথার উল্লেখ করাতে মধ্যরাত্রে অনন্ত অতিশয় বিরক্ত হইয়া শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করে। সুলক্ষণাও স্বামীর স্বভাব জানিত, সে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া স্বামীকে অন্ততঃ সে রাত্রির মত থাকিতে অনুরোধ করে, এমন কি স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু অনন্ত কিছুতেই নরম হইল না, সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। সুলক্ষণা প্রথমে মনে করিয়াছিল এই অন্ধকার রাত্রে মাঠে মাঠে যাইতে পারিবে না, অবশ্য ফিরিয়া আসিবে।

কিন্তু যখন দেখিল যে সে আশা বৃথা, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তারপর তিন চার বার অনন্তকে শ্বশুরবাটিতে লইয়া যাইবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছিল। অনন্ত সকল বিষয়েই খুল্লতাতপত্নীর আজ্ঞাকারী ছিল, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে বধূ আনয়ন করিতে বলিলে মাতৃতুল্যা খুল্লতাতপত্নীর কথা রক্ষা করা দূরে থাক, অনন্ত তাহাতে বিরক্ত হইত। অনন্ত নিতান্ত মূর্খ নহে। ছাত্রবৃত্তি পাশ

করিয়াছে, এক্ষণে মাতামহদত্ত বিষয় আশয় দেখে, আর গ্রামে একখানা দোকান করিয়াছে। তাহার সাংসারিক অবস্থা মন্দ নহে।।

জয়রামের বয়স ১৮।১৯ বৎসর হইবে, অনন্ত অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের ছোট। গ্রামসম্পর্কে জয়রাম অনন্তর ভাই হয়। তাহায় চেহারা মন্দ নহে, কিন্তু জয়রামের প্রতি সরস্বতীর অনুগ্রহ আদপে ছিল না, লেখা পড়া কিছুমাত্র শেখে নাই। পিতৃহীন, সংসারে মা আছে, এক ছোট ভগ্নী আছে। ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে, সে শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। সামান্য কিছু জমি ও মাতার কায়িক পরিশ্রমে তাহাদের কষ্টে দিন পাত হইত। পল্লীগ্রামে দিনপাতের ভাবনা নাই। জয়রাম অনন্তর ঘুষির ভয়ে নিজের র‍্যাপারের অভ্যন্তর হইতে একটা পুঁটুলি বাহির করিয়া, হাবুরমার মাথায় বসাইয়া দিয়া বলিল—"এইনাও ভূতে লইয়া গিয়াছিল দিয়া গিয়াছে।"

হাবুর মা বেশ চলিতেছিল এইবার দাঁড়াইয়া শিহরিয়া বলিল "দূর দাদ্না ঝুঁজকো বেলায় (গভীর রাত্রে) ও সব নাম কর্ত্তে নাই।"

জয়রাম বলিল "ভূত আর পেত্নী ত? তার আর অভাব কি? বাঁকার ধারে কত নেবে নিও এখন, কি বল?"

হাবুর মা বলিল "হ্যাদ্দেখো দাদা ঠাকুর তবে আমি যেতে পারব না।"

হেমা বলিল "হাবুর মা তবে ফিরে যাও।"

"ওমা তা আমি কি করে যাই?"

"তবে এগিঁয়ে যাও।"

"তাই বা কি করে যাই? আঁধার রেতে মাঠাল পথে এগিয়ে যাওয়া কি বাবার ঘরের কথা?"

কোঁদার বউ বলিল "হাবুর মা তুমি এইখানে বসে থাক তোমাকে এগুতেও হবেনা পেছুতেও হবে না।"

"হেঁগা তুমি সোয়ামি পুত্তুর নিয়ে ঘর কর—কেমন করে বল্লে ? তোমরা চলে যাবে আর আমি যুবো মেয়ে এই মাঝ মাঠে বসে থাকব ?"

এইবার সকলে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। হাবুর মা চলে না, আর সকলে চলিতে পায় না। তখন পার্ব্বতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "হাবুর মা তুই বামুনের পৈতা ধরে চল তাহলে তোর কোনও ভয় থাকবে না।" ইহাতেও হাবুর মা শিহঁরিয়া বলিল—

"সেকি বামুন দিদি ? কত যাগ যগ্যি কল্লে পইতে হয় সেকি আমরা ছুঁতে পারি ? তোমরা এমন মজার মানুষ জানলে আমি তোমাদের সঙ্গে আসতাম না।" ফণের মা পশ্চাৎ হইতে বলিল—

"হ্যা দেখো গিন্নি তুমি মোটটা মাথায় নাও আর দুই হাতে দুই বামুনের কঁ্যাচা (কাছা) এঁটে ধর কোনমতে ছেড় না।"

এইবার হাবুর মা সুযুক্তি পাইয়া পুঁটুলি মাথায় করিয়া দুই হাতে দুই জনের কাছা ধরিতে গেল। জয়রাম বলিল "আমার কাছে এলে চাট্ মারব।" অনন্ত তখন হাবুর মার হাত ধরিয়া বলিল—

"তোমাকে পৈতেও ধর্ত্তে হবে না, কঁ্যাচাও ধর্ত্তে হবেনা তুমি আমার সঙ্গে এস।"

হাবুর মা সলজ্জে হাত টানিতে টানিতে কহিল "ছেই দাদা ঠাকুর বাঁ হাত খানায় পরপুরুষের অধিকার নেই"

"আমি কি তোমার পর ?" বলিয়া অনন্ত হাবুর মার হস্ত পরিত্যাগ করিলে, হাবুর মা মনে করিল ব্রাহ্মণ আমাকে ছুঁইয়াছেন আমি কত অপরাধী হইয়াছি, এই মনে করিয়া পুটুলি নামাইয়া যেমন অনন্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে, অমনি পশ্চাতে রাইপুরের গিন্নি ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসিতেছিল, একেবারে হুড়মুড় করিয়া হাবুর মার ঘাড়ে পড়িয়া গেল। সকলে হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। রাইপুরের গৃহিণী ত একেবারে অগ্নিশর্ম্মা, কিন্তু হাবুর মা কিছু অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

যাইতে যাইতে জয়রাম বলিল "হাবুর মা তুমি ভূত দেখেছ ?" হাবুর মা বলিল "হ্যাদে দেখ আমি যদিও তানাকে দেখিনাই বটে তবে সে দেখার বারা। আমি পেথমে বাঁজা হয়েলাম। আমার কত্তামা সড্ডের ভূতের কাছ হতে পুষ্প এনে দিয়ে ছেল, আর বলে' ছেল—ছেলে হলে পর পোয়াতিকে ফলার কত্তে হবে।"

জয়রাম বাধা দিয়া বলিল "আঁতুড় ঘরেই ? ছেলেটাকে পেট থেকে ফেলেই ফলারে বসে গেলে ?"

অনন্ত বলিল "তাকি কেউ পারে ? তার উপর আবার হাবুর মা কম খোরাকী, কি বল হাবুর মা ?"

হাবুর মা সোহাগভরে বলিল "বলত দাদাঠাকুর আমার কি আর খাওয়া আছে ? না খেয়ে খেয়ে শড়ীল (শরীর) পাক পেয়ে গেল।"

এমন সময় সম্মুখস্থ গ্রামের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া জয়রাম বলিল "দাদা আমার সঙ্গে আর নাগবে সামনে দেখছ সহজপুর।"

সহজপুর শুনিয়া অনন্ত একটু চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "ওটা সহজপুর নয়রে মূর্খ ওটা গর্ভপুর।"

রাইপুরের গিন্নি বলিল "তুমিও ত তেমনি মুরুক্ষু ও গব্বপুর না গাবড়োপুর ?"

অনন্ত হাসিয়া বলিল "তা বটে আমার উচ্চারণে ভুল হয়েছে।" জয়রাম বলিয়া উঠিল "হাবুর মা তার পর কি হল ?"

হাবুর মা বলিল, "পুষ্প ধারণ কল্লাম বটে কিন্তু ফলার করা আর হল না।"

জয়রাম বলিল "আহা তবেত বড় দুঃখের কথা ; ফলারে ব্যাঘাত দিলে কে ?"

"বাত আর কে দিলে মা, বেম্মা। (ব্রহ্মা) সেই সে বছর সালে আগুন হয়ে ছেল, গুর ত আর পেলাম না তা সোম বচ্ছর ফলার হয়

কিরূপে? কাজেই হল না। তার দিন কত বই আমি গর্ব্বিনী হই। তা সাত মাস কেটে গেল। সাত মাসে আমার ভাজা হ'ল, কিন্তু বাবা ঠাকুরের পহা (পয়সা) তুলে রাখা হল না। তার ফিরে দিন ধান সিজুলাম এক বিশ, আর ভাপালাম এক বিশ (১ বিশ = পাকি ৬ মণ)। রাত থাকতে থাকতে সিজনা ভাপানা সব শেষ হয়ে গেল। সকাল বেলা যেমন ধানের ঝুড়ি কেঁক্ করে তুলেচি; অমনি কেঁকালটায় হেঁক্ করে খচি নড়ে গেল। তারপর আর কিছুতেই গর্ব্ব রক্ষা হল না। বাবার পহা তুলে না রেখে ভাজা খেয়েছি, সে সন্তান কি আর রক্ষা হয়? সাত মাসে পুত্তর সন্তান পেশব কল্লাম; তিন চার দিনের ছেলে হল, একদিন খুব বাদলা হ'ল, যেত হিম বাতাস তেত জল।" জয়রাম বলিল "গিন্নি তাপ সেঁক করে ছিলে নাকি?" হাবুর মা জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল—

"বাপরে ওনাম করবার যো নাই। বাবার আঁতুড়ে পিদিম উস্কে কি দুধ গরম করা? সে দিকে যাবার যো নাই।"

"তার পর কি হ'ল?"

"তার পর ছেলের চোয়াল চেপে গেল। গায়ের রং নানা রকম হতে লাগল, আর হুলো বেরালেরা যেমন ডাকে তেমনি ধারা চেঁচাতে লাগল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া বলিল "পেচুতে বৌগুন আস্‌চে, এ আবার পোয়াতিকে শুনতে নাই।" বলিয়া হাবুর মা একটু ক্রন্দনের সুরে আরম্ভ করিল। চক্ষু মুছিয়া নাক ঝাড়িয়া যেমন ফেলিবে, অমনি সেই শ্লেষ্মা আসিয়া জয়রামের কাপড়ে লাগিল! জয়রাম একেবারে রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া "নচ্ছার মাগি, বজ্জাৎ মাগি, বৌকাঁটকি মাগি!" এই বলিয়া যেমন চড় উঠাইয়াছে অমনি অনন্ত আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিকটস্থ জলাশয় হইতে জল আনাইয়া জয়রামের কাপড় ধোয়াইয়া দিল। অনন্ত বলিল "হাবুর মা তোমার ছেলের কি হল?"

হাবুর মা পুরাতন মুলতুবি গল্প আবার আরম্ভ করিল। "ছেলে ত হুলো বেরালের মত চেঁচাতে লাগল। আমাদের মুরুব্বি গিয়ে যুগী হোতে একজন ঝাড়ানে কবরেজ আনলেন। তিনি মশাই ছেলে না দেখে বল্লে 'করিচিস কি? একি তোর ছেলে? ছেলে যে সে তো গেছে, এ একজন উপর দেবতা।' আমি সুদালাম রুপায় কি হবে? ওজা বল্লে তিন ছাঁইচে এনে একে শোয়া' আমি তাই কল্লাম। তা বই ওজা মন্তর বলতে লাগ্‌ল। আমায় বলে 'ওটার মুয়ে তিনটা নাতি মার' আমি যেই দুম্ করে নাতি মেরেছি ছেলে অমনি ক্যাঁ—আঁ করে চোক কপালে তুল্লে। ওজা বল্লে আর ভয় নেই আমার দক্ষিণা দাও।"

হাবুর মার গল্প শুনিয়া সকলেই শিহরিল, এমন কি ইটের বউ ও কোঁদার বউ কাঁদিয়া ফেলিল। অনন্ত বলিল "কি দক্ষিণা দিলে ওঝাকে?"

"পাঁচ সিকে নগদ, আর একখানা পুরান কাপড়।" জয়রাম বিষম রাগিয়া বলিল—"মাগি ঝাঁটা দিয়ে বউয়ের ব্যবস্থা করতে পারিস আর ওজাকে দুঘা দিতে পাল্লি না?"

অনন্তও সক্রোধে বলিল "আমি থাকলে ওঝার ব্যবস্থা ওঝাকে কর্‌তাম। আর তোমার ব্যবস্থা তোমাকে করতাম। সে না হয়—পর—তুমি মা হয়ে কেমন করে লাথি মেরে ছেলেটাকে মেরে ফেল্লে?"

"দাদাঠাকুর কি বল তার ঠিক নেই, সে বেঁচে থাকলে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হত তার ঠিকানা আছে?

যাত্রিগণ গল্প করিতে করিতে গর্ভপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঁকা নদীর গর্ভে ঐ গ্রাম অবস্থিত বলিয়া বোধ হয় উহার নাম গর্ভপুর হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমাদের পল্লীবাসিনী যাত্রিগণ গর্ভপুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতামত প্রকাশ করিল।

বাঁকা নদীতে এক উরুত জল, কিন্তু অতিশয় স্রোত। জয়রাম ও অনন্ত একে একে পাদুকা খুলিয়া নদী পার হইল। স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। পরপারে হরিণডাঙ্গার মাঠে উঠিয়া আবার সকলে যাইতে লাগিল। গ্রামের নাম "হরিণ ডাঙ্গা" কেন হইল জিজ্ঞাসা করাতে, রাইপুরের গৃহিণী একবার সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত করিয়া নিজের কণ্ঠচুম্বন করিয়া ভক্তি গদ্‌গদস্বরে কহিল, "বাপরে সে সব কথা মাঠের মধ্যে রেতে বলতে ভয় লাগে। হ্যা দেখ নাদাইয়ের ঘাটে বাবা গোবাধারী আছেন। তিনি একদিন গরু চরাতে চরাতে এইদিক পানে এসেছিলেন। গরুগুনর জল পিপাসা লেগেছেন তা কি করেন? বাঁকার জল দেখতে এলেন। তা বই আপনার গরুগুন করেছেন কি, যেমন জলে নামা অমনি সব একালে হরিণ হয়ে গেল।"

হাবুর মা মাথা নাড়িয়া বলিল "আহা বাবার এমনি মহিমেই বটে।"

অনন্ত সহাস্যে কহিল "ঠানদিদি কোন পুরাণে এটা আছে?"

"উপহাস্যি করিস্ তার কি বলব বল্? অনন্ত তুই মোচ দাড়িগুন মুড়িয়ে ফেল।"

অনন্ত হাসিতে হাসিতে কহিল "কেন? আমার মোচ দাড়ি তোমার কথকতার তো কোনও হানি করে নাই? আমি নেই বা গোপ দাঁড়ি মুড়ালাম?"

রাইপুরের গিন্নি বলিলেন "বলে দাড়িগুন নাকি বড় বালাই, দাড়ি থাকলে ঠাকুর দেবতায় ভক্তি হয় না।"

জয়রাম, বাবা গোবাধারীর "মাহিত্র" শুনিয়া অবধি হাসিতেছিল, এখন খুব হাসিয়া উঠিল। গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "দেখনা কেন, সহরের যত ছোঁড়া দাড়ি রাখে, কে মন্তর নেয়? তখন সকলে মন্তর নিত, সন্ধ্যে আহ্নিক না করে জল খেত না, তখন কার দাড়ি ছিল?"

পার্ব্বতী চলিতে চলিতে বলিল "নাদাই কোন দিকে? বাকা কি নাদাই পর্য্যন্ত আছে?"

রক্ষা কহিল "বঙ্কেশ্বরীর কথা বলিস না, সমস্ত বাঙ্গলামুলুক যাকে পিথিমি বলে, সেই বর্দ্ধমান হেতে, কাটোয়া হেতে, কাল্না হেতে, আর আমাদের গাঁ ইস্তক এই সব, মা বঙ্কেশ্বরী মনে কল্লে সেই ছিরিক্ষেত্তোরের সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।" রক্ষার এই ভূগোল জ্ঞান দেখিয়া অনন্ত হাসিয়া বলিল "রক্ষে দিদি তুমি ত ভূগোল বিদ্যায় খুব পারদর্শিনী!" জয়রাম আপন মনে গান আরম্ভ করিয়াছিল, সে রক্ষার প্রশংসা শুনিয়া বলিল।

"অনন্ত দাদা তুমি যক্ষণ্ যাকে বাড়াও তাকে একেবারে স্বর্গে তুলে দাও—রক্ষে দিদি "ক"য়ের নাময় "ঠ" দিতে জানে না, সে হল পার্শদর্শিনী, আর আমি যে তিন বছর ধরে ছয়খানা পেথম ভাগ ছিঁড়ে "সাধু" "পূজা" "ধেনু" পর্য্যন্ত পড়লেম, তা আমাকে মুরুক্ষু বই কথা কওনা—"

সম্মুখে সহজপুর, অনন্তর শ্বশুর বাটি। অনন্ত যত সহজপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিল। তাহার এই অন্যমনস্কতা জয়রাম লক্ষ্য করিয়া বলিল "দাদা কোন পথে যাবে, সহজপুরের বার দিয়ে, না ভিতর দিয়ে?"

অনন্ত চমকিত হইয়া বলিল "সহজপুরের? বার দিয়ে।"

"না ভিতর দিয়ে"

"না না বার দিয়ে।"

"না ভিতর দিয়ে।"

জয়রামের কথায় অনন্ত উত্তর দিতে ছিল বটে, কিন্তু তাহার মনের সম্মুখে আট মাস পূর্ব্বের একখানি ছবি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মন অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। মনে করিল ঐ সেই ঘার দেখা

যাইতেছে, যে দ্বারে পদতলে পতিতা সুলক্ষণাকে পদদলিতা করিয়া নিষ্ঠুর অনন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। যদি আজও সে সেই দ্বারের নিকট পড়িয়া কাঁদিতে থাকে, তাহা হইলে? আহা, সেদিন কে সেই অভাগিনীকে সান্ত্বনা দিয়াছিল? হয়ত তাহার পিতামাতা ভ্রাতা তাহাকে কত তিরস্কার করিয়া থাকিবেন। অনন্ত যতই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই বৃশ্চিকদংশনের যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে এমন সময় পশ্চাৎ হইতে জয়রাম উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"ওগো চক্রবর্ত্তীরে গো তোমাদের জামাই পালায় গো। ওগো—"

অনন্ত দ্রুতপদে তাহার নিকট গিয়া সবলে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু চক্রবর্ত্তীদের বাটি হইতে কেহ কোনও সাড়া দিল না দেখিয়া, অনন্ত জয়রামকে ছাড়িয়া দিল।

অনন্তকে গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে দেখিয়া জয়রাম আবার হাবুর মাকে লইয়া রঙ্গ আরম্ভ করিল। জয়রামের স্বভাবই এইরূপ। জয়রাম জানিত, হাবুর মা তাহার পুত্রবধূকে দুইচক্ষে দেখিতে পারে না। জয়রাম বলিল "হাবুর মা, তোর বউকে তুই দেখতে পারিস্ না কেন?"

"কি জান ঠাকুর ভাইথাকীর নজরটা বড় খর।"

"বটে? তোকে কোনও দিন নজর দিয়ে খেয়ে ছিল নাকি?"

"আমি মিথ্যে কথা বলব না আমায় খায় নাই বটে, কিন্তু অন্য একজন আমায় নজর দিয়েছেল।"

"সে তাহলে ডান নয়, সে রাবণের মা, তোমাকে নজর দিতে যে সে পারে না। তা বউকে তুই ডান বল্লি কেন?"

"তবে বলি। আর বছর চোত মাসে হাবু আমার মাসতুতো বোনের বাড়ী হেতে লুচি খেয়ে এল। তা রাতে আর কিছু খেতে চাইলে না। তা আমি বল্লাম দুটি ছাঁকা ভাত খা, লুচি গুলো চাপা

পড়ুক। ভাইখাকী রাতের বেলা ভাত দিয়েছেল। তার পর দিন তাতরসা দিয়ে হাবু কাঠা দুই মুড়ি ভিজিয়ে খেয়ে ছেল, আর হাজরা দেয় নাই। তাল গাছটা হেতে এক কুড়ি তাল কেটে তার সাঁশ খেয়েছেল। তা বাছা আমার তামাম দিন পেট কামড়ে যায় আর কি! তা বই কি করি? ফরেশডাঙ্গায় বয়ের কাছে ছুটে গেলাম। তিনি কাঁচ ভাঙ্গার মতন কি দিলে, বল্লে চটি না খড়ম। তাই খেয়ে বাছা আমার ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ভয়ে আর বাঁচিনা, যত গিন্নিরে বল্লে ডাইনে চুষে খেয়েছে, নইলে এত ঘুমুচ্চে কেন?"

জয়রাম বলিল "ডাইনে খেলে বুঝি ঘুময়?"

"ঐ ওষুদ খেয়ে ঘুমল কিনা? আর ওষুদ যখন খায়, তখন ভাই-খাকী সাতবার বল্লে "ওষুদের কি শোবা! ঠিক যেন নবাত!"

"তাতেই বুঝি দোষ হল?"

"তা হবে না? নজর খর হলেই হয়। তাকি করি ভুলোর মাকে ডেকে এনে দেখালাম। সে ঝেড়ে দিলে, তবে বাছা ভাল হয়।"

"সে বুঝি ঝাড়ানর গুণে ভাল হল?"

যাত্রিগণ গুড়জোয়ানে নামক স্থানে আসিলে রাত্রি প্রভাত হইল। সকলে দুর্গা দুর্গা করিতে লাগিল। ফণের মা রাইপুরের গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিল "গিন্নি কাল কি রেঁধে ছিলে।"

রাইপুরের গিন্নি চকিত হইয়া কহিল "কে, আমি? আমাকে বলছ? রান্নার যে কষ্ট বুন্, হাট করবার লোক নেই তা কি করবো? দুটো নেয়ের ডাঁটি পালমের শিস দিয়ে চচ্চড়ি কল্লাম আর সেই বুড়ো গাইটে ছিল টেনে টেনে খেলাম।"

গৃহিণীর ভাতের তরকারী শুনিয়া সকলে হো হো রবে হাসিয়া মাঠ প্রতিধ্বনিত করিল। জয়রাম বলিল "তবে আর তোমার ভাবনা কি? লোকের গোয়ালে গোরু থাকতে তোমার খাবার ভাবনা কি?" অনন্ত

কহিল "ওই তেমোহানা দেখা যাচ্ছে।" রাইপুরের গিন্নি বলিল "কই?"

জয়রাম বলিল "ওই যে নাকের সোজা দেখা যাচ্ছে।"

অনন্ত কহিল "তুই দেখতে পাচ্ছিস বলে কি উনিও দেখতে পাবেন? এখন কি আর ওঁর চক্ষের তেমন তেজ আছে?"

"না নাইত সেদিন ওঁর গাছের ২টা পেয়ারা চুরি করছিলেম আর অমনি দেখতে পেলেন।" রাইপুরের গিন্নি বলিল "বটে, সেই গয়াবুগাছ আর তেমোয়ালে বুঝি সমান হল?" গৃহিণীর শ্বাশুড়ীর নাম "পিয়ারী" ছিল বলিয়া তিনি পেয়ারা বলিতেন না, গয়াবু বলিতেন।

সকলে তেমোহানায় প্রবেশ করিল। তেমোহানায় পূর্ব্বদিকে "নাদাই," এই নাদাইএর মাঠে আজ যাত্রিগণ সমবেত হইয়াছে। এই স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত। জনরব যে এই স্থানে বাবা গোবাধারী নামে এক মহাপুরুষের আড্ডা আছে। তিনি এক দিন স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় একখানা ষ্টীমারের চক্রবিলোড়িততরঙ্গে তাঁহার গাত্র-মার্জ্জনী ভাসিয়া যায়। সেই জন্য তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ষ্টীমারকে জল-নিমজ্জিত করেন। এই স্থান সেই পর্য্যন্ত একটা স্থানীয় তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। পাঠক কখন পল্লীগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে ভাগীরথী তীরে প্রভাত দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক ত আজ একবার আমাদের যাত্রীদের নিকট আসিয়া দাঁড়াও। উত্তরে দক্ষিণে ও পূর্ব্ব-দিকে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। পশ্চাতে প্রায় এক পোয়া দূরে একখানি গ্রাম। পূর্ব্বদিকে সম্মুখে, ভাগীরথীর পর পারে দিগন্তের কোলে রক্তবর্ণ ধূমরাশির মধ্যে অনুজ্জ্বল সূর্য্যদেব উঁকি মারিতেছেন। মাঠের ধান সব পাকিয়া মাঠের চিত্র নূতন হইয়াছে, এখন আর "হরিৎ ধান্যের ক্ষেত্র" নহে, এখন যেন বঙ্গদেশ স্বর্ণমণ্ডিত। কোনও কোনও মাঠের ধান কাটা হইয়াছে, কর্ত্তিত ধান্য মাঠেই পতিত রহিয়াছে। কৃষকেরা গোরুর গাড়ী আনিয়া সেই সকল ধান্য বহিয়া লইয়া যাইবার

আয়োজন করিতেছে। গ্রাম হইতে দলবদ্ধ লোক মাঠে কায করিবার জন্য ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। মাঝে মাঝে ইক্ষুক্ষেত্রগুলি সবুজ মাথা তুলিয়া মাটীর বৈচিত্র্যসাধন করিতেছে।

যাত্রীরা পথকষ্ট ভুলিয়া মহা উৎসাহে গঙ্গা অভিমুখে ধাবিত হইল। গঙ্গাদর্শনমাত্রে সকলে করযোড়ে "বন্দে মাতঃ সুরধুনী", "সৰ্ব্বপাতক সংহন্ত্রী", "শৈলসুতা সপত্নী" ইত্যাদি স্তব পাঠ করিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হইলে সকলে ভক্তিভাবে গঙ্গাজল স্পর্শ করিল।

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

বিলাতী ঘুসি বনাম দেশী কিল।

(সম্পাদকীয় নোটবুক হইতে †)

১। রামচন্দ্র চৌধুরী নামে আমাদের পরিচিত কোন ভদ্রলোক একদিন কার্য্যবশে গড়েরমাঠের সন্নিহিত ইংরাজপল্লীর নিকট দিয়া চলিতেছিলেন। তাঁহার অগ্রে একজন সাহেব ও একজন মাড়োয়ারী যাইতেছিল। সাহেবের সঙ্গে একটি আদুরে কুকুর ছিল। মাড়োয়ারীটি পথ চলিতে চলিতে দৈবাৎ কুকুরের লেজ মাড়াইয়া ফেলে। মাড়াইয়াই

* আমাদের অভিধানে ঘুসি শব্দে—দাঁতখিঁচানি, মুখভ্যাঙানি, গালিগালাজ; লাঠির গুঁতা, ছাতার খোঁচা, চাবুকের আঘাত; প্লীহা ফাটান ও বন্যপশুভ্রমে শীকার—সকলই বুঝায়।

কিল শব্দ—আক্রান্তের আত্মরক্ষার ত্রিবিধ উপায়বাচক,—যথা বল, ছল ও কৌশল।

† অধিকাংশ ঘটনা বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাময়িক সম্বাদপত্র হইতে সঙ্কলিত, কতকগুলি আত্মীয় বন্ধুমুখে শ্রুত।

সে অগ্রসর হইয়া যায়। সাহেব তাহাকে নজর করে নাই। কুকুরটা বেদনায় ক্যাঁক করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই সাহেব পিছন ফিরিয়া দেখে—এক নেটিভ মনুষ্যমূর্ত্তি—আমাদের রামচন্দ্র বাবু! যেমন দেখা—অমনি আহ্বরে পশুর কান্নার শোধস্বরূপ—রামচন্দ্রের চোখের উপর আচম্বিতে এক বিলাতী ঘুষি! এক মুহূর্ত্ত রামচন্দ্র বাবু সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন! তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি আত্মস্থ হইয়া সেই দুর্দ্দান্ত সাহেবকে আক্রমণ করিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিলেন—সৌভাগ্য বশতঃ রামচন্দ্র একজন রীতিমত কুস্তি-বাজ—এবং তার বুকের উপর বসিয়া বিলাতী ঘুষির বিনিময়ে গোটাকত দেশী কিল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় অদূরে সাহেবের কতিপয় জাতভাইদের অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখা গেল। রামচন্দ্র নিজে তাহাদের দেখিতে পান নাই। দেখিয়াছিলেন একখানা আগন্তুক বৈদ্যুতিক ট্রামের একজন বাঙ্গালী আরোহী ও তাহার কন্‌ডাক্টর। ট্রাম থামাইয়া উহারা রামচন্দ্র বাবুকে বলিলেন—"মশায় একা পেরে উঠবেন না, ঐ আরও আসছে, ট্রামে চড়ে পড়ুন।" বলিয়া সাধু কন্‌ডাক্টর হাত বাড়াইয়া চট্‌পট তাঁহাকে ট্রামে তুলিয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে একটিও পয়সা ছিলনা। পূর্ব্বোক্ত আরোহী ভদ্রলোকটি নিজের পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া তাঁহার টিকিট করিয়া দিলেন।

২। একটি বৃদ্ধ যুবতী-কন্যাকে লইয়া রেলপথে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, পথিমধ্যে এক ইম্‌পিরিয়াল্‌ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের করকবলে তাঁহারা নিপতিত হইলেন; উৎপীড়িতা রোরুদ্যমানা যুবতীকে রক্ষা করা বৃদ্ধের সাধ্য হইলনা, মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, অনেকে সে ঘটনা-স্থলে আসিয়া জমায়েৎ হইলেন কিন্তু বালিকাকে উদ্ধার করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত হইল না, অকর্ম্মণ্য পুলিশের লোকেরা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ

দণ্ডায়মান রহিল। বৃদ্ধের পৃষ্ঠে শিলাবৃষ্টির ন্যায় চপেটাঘাত ও ঘুসির বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। এমন সময় একটি দেশীয় যুবক সেই প্রহসনাভিনয়মঞ্চে উপস্থিত হইয়া প্রহসনটাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে একখানি সকরুণ বিয়োগান্ত নাটকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। যুবকটি সেই ফিরিঙ্গীর নিকট আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহার পদদ্বয় আকর্ষণ পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী পুষ্করিণীর পার্শ্বে নিক্ষেপ করিলেন। এতক্ষণ পরে সুযোগ বুঝিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ পুলীশ প্রভু সেই যুবককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য মহাবেগে ধাবিত হইল; এতক্ষণ পরে তাহাদের হৃদয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠিল! কিন্তু যুবক তখন রণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, দলবদ্ধ পুলীশ তাঁহাকে ধরিতে পারিল না, তিনি হস্তস্থিত লাঠি সাহায্যে ভীষণবেগে তাহাদিগকে তাড়না করিলেন; পুলিশ রণে ভঙ্গ দিল। ষ্টেসন মাষ্টার সাহেব তখন যুবকের নিকট ভ্রূকুটি করিয়া কৈফিয়ত চাহিলে,—যুবকটি বলিলেন "কৈফিয়ৎ আবার কি! গোটাকতক কাপুরুষ "রাস্কেল"কে—তাহাদের ধৃষ্টতার প্রতিফল দিয়াছি, যদি এ বিষয়ে কেহ প্রতিবাদ করিতে চাহে তাহা হইলে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক্।" কালা আদমির মুখে এই কথা শুনিয়া সেই ট্রেনের গার্ড সাহেব উত্তেজিত হইয়া যুবকের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে আসিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধের পরেই তাঁহার নাসিকা হইতে দরদরধারে রক্ত প্রস্রবণ ছুটিতে লাগিল, আর একটু হইলেই সাহেবের একটি চক্ষু গিয়াছিল আর কি! গার্ডকে পরাস্ত দেখিয়া ড্রাইভার সাহেব যুবককে আক্রমণ করিতে আসিল কিন্তু তাহারও গার্ডের সমাবস্থা লাভ হইল। অবশেষে সকল শ্বেতাঙ্গ মিলিয়া আলিঙ্গনদানে রণবিজয়ী যুবকটিকে সুস্থির করিয়া তাঁহাকে গাড়িতে বসাইল; বিবাদও মিটিয়া গেল।

৩। পুণা হইতে খড়কী ছাওনীতে যাইবার জন্য যে সমস্ত ট্রেনের

বন্দোবস্ত আছে তাহাতে কার্য্যাপদেশে প্রায়ই অনেক গোরা সৈনিকের ভিড় হয় এবং অনেক সময় নেটিভপীড়নের অভিনয়ও যে হইয়া থাকে সংবাদপত্রের সাহায্য তাহা জানিতে কাহারো বাকি নাই। এক দিন একজন পার্সী ও একটি দেশীয় স্ত্রীলোক এই বর্ব্বরদের হাতে পড়িয়াছিলেন। পার্সী মহাশয় ও তাঁহার সহযাত্রী স্ত্রীলোকটি যে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আরোহণ করিয়াছিলেন, পুণা ষ্টেশনে কয়েকজন গোরা আসিয়া তাহাতে প্রবেশ করে এবং দেশীয় যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি সরাইয়া দিয়া গাড়ীর সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে। নিরীহ পার্সিপ্রবর তাহাদিগের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া কমাণ্ডিং অফিসারকে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন করেন। সেনাধ্যক্ষ মহাশয় গোরাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া যান। কিন্তু গোরা প্রভুরা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর এমনই আজ্ঞানুগত যে তিনি ঘটনাস্থল ত্যাগ না করিতে করিতেই তাহারা আপনাদিগের গুণগ্রাম প্রকাশ করিতে লাগিল। যে গোরাটা অতিরিক্ত সুরাপান করিয়াছিল—তাহার মুখবিবর হইতে অনর্গল অশ্রাব্য বচনাবলী নির্গত হইতে লাগিল। তাহার সহচরেরা তদ্দর্শনে কৌতুক আরম্ভ করিল। তাহারা পার্সী যাত্রিটীকে কখনও মুখবিকৃতি কখনও বা যষ্টি দ্বারা প্রহারের ভীতিদর্শন, কেহ বা তাহার চশমা হরণ, কেহ বা অঙ্গে দগ্ধ চুরুট নিক্ষেপ প্রভৃতি নানা প্রকার শিষ্টজনসম্মত প্রক্রিয়ার দ্বারা আপ্যায়িত করিতে লাগিল। অবশেষে দেশীয় মহিলাটীকেও বিরক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। এতক্ষণে পার্সীপ্রবরের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিল। এইবার তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তাহাদের একজনকে ধরাশায়ী করিয়া ঘা কতক উত্তম মধ্যম প্রদান করিলেন। এই চিকিৎসার ফল হাতে হাতেই ফলিয়া গেল। চঞ্চল সমুদ্রবারির উপর তৈল প্রক্ষেপের ন্যায় সমস্ত গোলোযোগ মিটিয়া গেল।

৪। ডাক্তার শরৎচন্দ্র মল্লিক একবার আজমীর ষ্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় তত্রত্য প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে কিয়ৎকাল অবস্থান করিতেছিলেন। অল্পক্ষণ পরে এক শ্বেতাঙ্গ প্রভু তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাক্তার মল্লিক মহাশয়কে পর্য্যঙ্কে শয়ান দেখিয়াই দুর্ব্বৃত্তের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে অতি কর্কশ ভাষায় তাঁহাকে পর্য্যঙ্ক ত্যাগ করিতে আদেশ করিল। বলা বাহুল্য ডাক্তার মল্লিক সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতে শ্বেতাঙ্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে এবং সে তাঁহাকে নিগার সম্বোধনে সম্মানিত করিয়া তাঁহার টিকিট দেখিতে চায়। ডাক্তার মল্লিক বলিলেন তাহার ন্যায় নীচ প্রকৃতি শ্বেতাঙ্গ হওয়া অপেক্ষা নিগার হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। কেবল তাহাই নহে, তিনি তাহাকে টিকিটও দেখাইলেন না. শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব—তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলপ্রয়োগে কৃষ্ণাঙ্গের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিতে অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার মল্লিকও তাহাকে উত্তম মধ্যম প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। এমন সময় ষ্টেশনের অপর কয়েকজন লোক আসিয়া মধ্যস্থতা করাতে ব্যাপার অধিকদূর গড়াইল না।

৫। লর্ড এলগিনের সময় সিমলার লাটভবনে একবার একটা নৃত্যোৎসব বা "বল" উপলক্ষে জনৈক রাজবংশজাত সম্ভ্রান্ত শিখ সস্ত্রীক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সামরিক বিভাগের জনৈক কার্ণেল সাহেব নৃত্য কক্ষে উপস্থিত ছিল। সে শিখপত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নৃত্য করিবার প্রার্থনা করে। ভারতবর্ষীয় মহিলা নাচেননা, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করায় শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল যে তবে তাঁহার ন্যায় আমাদিগের এস্থলে আগমন করিবার কোন্ প্রয়োজন ছিল? শ্বেতাঙ্গের এইরূপ মধুর রসিকতা ঐ শিখসর্দ্দারের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি শ্বেতাঙ্গপ্রবরের উপর ব্যাঘ্রবৎ পতিত হন এবং তাঁহার কণ্ঠদেশধারণপূর্ব্বক সেই হর্ম্ম্যপ্রাঙ্গনে তাহাকে

শায়িত করেন। এই স্বপ্নাতীত ব্যাপার সন্দর্শনে উপস্থিত নিমন্ত্রিতবর্গ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। পরে প্রকৃত ঘটনা লইয়া সকলেই সৈনিক প্রবরের কার্য্যে নিন্দাবাদ করেন। তাহাতে শ্বেতাঙ্গ প্রভু এরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে কৃষ্ণাঙ্গ রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরের "মেলে" ভারত ছাড়িয়া বিলাত গমন করিতে হইয়াছিল।

৬। গৌহাটী হইতে ১১৫ মাইল দূরে অবস্থিত লামডিং ষ্টেশনে জনকয়েক শ্বেতাঙ্গ এবং অনেকগুলি বাঙ্গালী আছেন। তথায় চারিজন ফিরিঙ্গির সহিত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙ্গালী ভদ্র-সন্তানের প্রহারের আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। হরিবাবু লামডিং ষ্টেশনের একজন কেরাণী। লামডিংয়ে ইঁহার একটি বাসা আছে। সেই বাসায় অপর দুইজন ভদ্র সন্তান হরিবাবুর সহিত একত্র বাস করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একজন একটি মদের দোকানের ম্যানেজার। একদিন রাত্র এক ঘটিকার সময় পূর্ব্বোক্ত ফিরিঙ্গি ভায়াগণ হরিবাবুর গৃহসম্মুখে গিয়া মদ্যবিক্রেতাকে ডাকাডাকি করে। সকলেই তখন নিদ্রিত। সুতরাং কেহই তাহাদের ডাক শুনিতে পায় নাই। ইহাতে সেই বর্ব্বর সাহেবগুলার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। কাজেই বুটপদদ্বারা দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলের নিদ্রাভঙ্গ করা অনিবার্য্য হইল এবং তার পর সাহেব মুখপদ্মনিঃসৃত অসভ্য ভাষায় গালি চলিতে লাগিল। গৃহমধ্যস্থ হরিবাবু ক্রোধকম্পিতস্বরে তাহাদিগকে গৃহ হইতে দূর হইতে বলেন। হরিবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া দুই জন সাহেব তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। সে দিন হরিবাবু জ্বরাক্রান্ত ছিলেন, শরীর দুর্ব্বল ছিল, তথাপি তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। উক্ত বর্ব্বরদিগের সহিত লড়িয়া তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

৭। ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের বেঙ্গলী পত্রে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ যে কলিকাতার বিগত অভিষেক উৎসবের আলোক-সজ্জার দিবসে তিনি রাত্রি আট ঘটিকার সময় লালবাজারের মোড়ে অতিরিক্ত ভিড়ের দরুণ "ফুটপাথ" হইতে নামিয়া সদর রাস্তায় পড়েন। সেই সময় তাঁহার সম্মুখে এক সাহেব আসিয়া উপস্থিত হ'ন, তাঁহার সঙ্গে দুইটী বিবি ছিলেন। তিনি সেই স্থান দিয়া যাইতে না যাইতেই সাহেব তাঁহাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা খাইয়া তিনিও সাহেবকে এক ধাক্কা মারেন। ধাক্কার পর সাহেব ঘুসি চালাইলে তিনিও সাহেবের উপর রীতিমত ঘুসি চালাইয়াছিলেন। ক্রমশঃ ঘটনাস্থলে অনেক সাহেব আসিয়া জুটিল—মারা মারিও বেশ চলিল। অবশেষে তিনি পুলীশ হস্তে গেপ্তার হন। সৌভাগ্যের বিষয় অতি সহজেই তিনি পুলিশের করকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

৮। কলিকাতার অভিষেক উৎসবের কাঙ্গালী-ভোজন-ব্যাপার দিবসে ভোজন ক্ষেত্রের দ্বাররক্ষক ছিল কতকগুলি অশিক্ষিত হাইলাণ্ডার সৈন্য। তাহারা সে দিবস কাঙ্গালী—এমন কি অনেক ভদ্রসন্তানের উপর—এমন অত্যাচার করিয়াছে যে তাহা কহতব্য নহে। তাহারা যাকে পাইয়াছে তাহাকেই ঠেঙ্গাইয়াছে আর মহা আনন্দে হাসিয়াছে। তাহাদের এই আনন্দোৎসবস্রোতে পড়িয়া এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। গোরারা তাহাকে বেদম প্রহার করিতে করিতে তাহার উচ্চ আর্ত্তনাদ শ্রবণে এতদূর হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল যে বৃদ্ধার অঙ্গ হইতে দরদরধারে রক্তধারা নির্গত দেখিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। অবশেষে জনকতক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান আসিয়া লাঠির সাহায্যে উপস্থিত জনকতক গৌরাঙ্গদেবের চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া বৃদ্ধাকে তাহাদের কবল হইতে রক্ষা করেন। কোন সংবাদ পত্রে ঐ ভোজনবিবরণী পাঠে জানা গিয়াছে যে কলিকাতার সঙ্গীত সমাজ একটি

বৃদ্ধা ভিখারিণীকে বড় রক্ষা করিয়াছিলেন—"একটি গোরা ভিখারিণীকে এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে, প্রহারে অভাগিনীর একটি কাণ প্রায় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সে হয় ত মরিয়া যাইত। সঙ্গীত সমাজ—তাহাকে দেখিতে পাইয়া গোরার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সমাজের দুই একজন সভ্য, ভিখারিণীকে নগদ দুই একটি টাকাও দিয়াছিলেন।" আমরা যে ভিখারিণীর দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিলাম সে এই ভিখারিণীই কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না।

৯। ঐ ভোজন ক্ষেত্রেরই অপর ঘটনা ;—একস্থলে অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল, সেখানে অনেক লোক জমায়েৎ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাঙ্গালী, মুসলমান, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী সর্ব্ব প্রকারের লোক ছিলেন। সেই ভিড়ের মধ্যে একজন সাহেব হঠাৎ আসিয়া স্বহস্তস্থ লগুড় সাহায্যে চতুস্পার্শ্বস্থ লোকদিগকে যথেচ্ছা প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। হঠাৎ সে ব্যাপার দেখিয়া সমস্ত লোক স্তম্ভিত ও অবাক্ হইয়া পড়িলেন। প্রহারের বেগ বৃদ্ধি পাওয়াতে স্তম্ভিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া উত্তেজিত হইয়া অধিকাংশ লোক "মার মার" শব্দে সাহেবের উপর আসিয়া পড়িলেন। সাহেব বাচ্ছা তখন বিব্রত হইয়া "ত্রাহি মধুসূদন" ডাকিতে লাগিলেন। উপস্থিত কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্যে সাহেব-পুঙ্গবের সেদিন প্রাণ রক্ষা হয়। এই ঘটনার প্রসঙ্গে সাময়িক "বঙ্গবাসী" লিখিতেছেন :—"মিরর সম্পাদক স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, বেঙ্গলী কি লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম শুনুন, মর্ম্ম এই :—একটি গোরা ভিড়ের মাঝে লোকদিগকে বেদম প্রহার করিতেছিল। মিরর সম্পাদক এবং অপর দুইজন ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া গোরাদিগকে নিষেধ করেন। তাঁহাদের কথায় গোরা প্রহার-বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিল বটে ; কিন্তু একজন সাহেব কোথা হইতে আসিয়া যাহাকে তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। ইনি গোরা নহেন ; পুলীশও নহেন। নরেন্দ্রবাবু ও অপর

ভদ্রলোক দুইটি ইঁহাকেও অনেক নিষেধ করেন, কিন্তু ইনি কাহারও কথা শুনেন নাই। শেষে উপস্থিত জনবৃন্দ ক্ষেপিয়া উঠে। জনবৃন্দ হইতে মার মার শব্দ উঠিল। তখন সাহেব কাকুতি মিনতির ভাব ধরিলেন। নরেন্দ্রবাবু ও অপর ভদ্রলোক দুইটি লোকবৃন্দকে শান্ত করেন।"

১০। ঐ অভিষেক উৎসব সময়ে বাজি পোড়ানর দিন অনেক সাহেব তনয়ের সহিত বাঙ্গালীর ছেলের মারামারি হইয়াছিল তাহার অনেক সংবাদ আমরা পাইয়াছি। বাজি পোড়ানো দেখিবার জন্য স্কুলের বালকদের জন্য যে সমস্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল সেই থানে অনেক সাহেব বাচ্ছা স্বভাবদোষ অনুসারে বাঙ্গালীর ছেলের উপর নিজেদের জোর পরীক্ষা করিতে গিয়া যে, বাঙ্গালী সন্তানদের নিকট উত্তম মধ্যম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বিস্তর বিবরণ আমরা শুনিয়াছি। তাহার মধ্যে একটি ঘটনা বিবৃত হইতেছে। একটি বালক বাজি পোড়ান দেখিতে যাইবার সময় তাহার গায়ের ধাক্কা লাগিয়া একটি সাহেবের ছেলের হস্তস্থিত টুপি ভূপতিত হয়। ভিড়ের মধ্য হইতে টুপি বাহির করিতে সাহেবতনয়কে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বলিয়া সে ক্রুদ্ধভাবে ঐ বাঙ্গালীর ছেলেকে প্রহার আরম্ভ করে। বাঙ্গালী বালক সাহেবের অকস্মাৎ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত বা ভীত না হইয়া তাহার উপর ঘুসি পরিচালনা করে। ক্রমশঃ ঘটনাস্থলে অনেক বাঙ্গালী ও অনেক সাহেবের ছেলে জড় হইল। মারামারিটা বেশ পাকিয়া দাঁড়াইল, দুই পক্ষে খুব বাহুযুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইহাতে কাহারো কাহারো নাসিকা হইতে রক্তপাতও হইয়াছিল। ক্ষণকাল এই ভাবে চলিলে কতকগুলি বয়স্ক লোকে এ বিবাদ মিটাইয়া দেন।

১১। বিগত বিজয়া দশমীর দিবস, মণীন্দ্রনাথ নামে এক সপ্তদশ-বর্ষীয় বঙ্গবালকের সহিত তিন জন ইংরাজ খৃষ্টান মিশনারীর কালী-

ঘাটের মন্দিরত্রয় সমীপবর্ত্তী স্থানে বিবাদ ঘটিয়াছিল। কার্য্যোপলক্ষে মণীন্দ্র সেই দিবস কালীঘাটে গমন করিয়াছিলেন। তিন জন বিধর্ম্মীকে কালী- মন্দিরের পার্শ্বে, নাটমন্দিরের সম্মুখভাগে জুতা সমেত দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হ'ন, এবং তাহাদিগকে সেস্থানে জুতা সমেত আগমন নিষিদ্ধ, বিনীতভাবে একথা জ্ঞাপন করেন। মিশনরীরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সম্মুখে যে দুই একজন ভাট ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিল মিশনারীরা অপূর্ব্ব বাঙ্গালায় তাহাদিগকে নানাপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে কালীদেবীকে লইয়া তাহারা তামাসা জুড়িয়া দিল। কালীমাতার উলঙ্গমূর্ত্তি, লোলজিহ্বা ও বিরাট মুখ-মুণ্ডলের অশ্লীল সমালোচনায় তাহারা নিজেরা আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থিত ভাট ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহিতও সেই সব লইয়া পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। এমন সময় ঘটনা-ক্রমে মন্দির প্রদক্ষিণ কালে কতকগুলি হিন্দুস্ত্রীলোকের প্রদক্ষিণপথ মিশনারী দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে তাঁহারা সেই স্থলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহাতে সেই হিন্দু যুবক উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন, হিন্দুর দেবীপূজা হইতেছেনা আর বিধর্ম্মীরা সেই থানে দাঁড়াইয়া দেবী নিন্দাবাদ করিয়া পূজার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে! মণীন্দ্রনাথ দ্রুতপাদ-ক্ষেপে সেই মিশনারীদের নিকট গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উদ্ধত ভাষায় সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। মিশনারীরা তাচ্ছিল্যভাব দেখাইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির-সোপানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মিশনারীদের আচরণ দেখিয়া যুবকের রক্ত তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে, তিনি বারম্বার তাঁহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাহাদের তাহাতে দৃক্‌পাতও নাই, যথেচ্ছা এদিক্ ওদিক ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে মণীন্দ্র তাহাদিগকে বলিলেন "তোমরা এ স্থান হইতে দূর হও নচেৎ অন্য উপায়ে তোমাদিগকে এখনই দূর করিয়া

দিব।" এই কথা শুনিয়া একজন মিশনারী অঙ্গভঙ্গী করিয়া যুবককে মারিবার ভয় দেখাইল। যুবক তাহার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে বলিলেন "বাঁদরের মত অঙ্গভঙ্গিতে আমি ভয় পাইনা।" পরক্ষণেই মারামারি দাঁড়াইল। পরস্পরে ঘুসি চলিতে লাগিল। অনেক লোক আসিয়া জুটিল। তখন সাহেবরা আপনিই সরিয়া দাঁড়াইল, মারামারি থামিল। আবার কিছুক্ষণ পরে পরস্বত্বাবমাননাকারী সাহেবেরা পরামর্শ করিল, "চল ঐ কি আছে দেখে আসি"—বলিয়াই রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল। মণীন্দ্রও সেখানে ছিলেন, তিনিও তাহাদের পশ্চাৎধাবন করিলেন। সাহেবরা ইতস্ততঃ না করিয়াই মন্দির সোপান অতিক্রম করিতে উদ্যোগ করিল। যুবক তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ির উপর উঠিয়া তাহাদিগের গমনে বাধা দিলে—দুই জন সাহেব ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং একজন, বাঙ্গালীর মুখে এক ঘুসি বসাইয়া দিল। পরক্ষণেই বাঙ্গালী ঘুসি হজম না করিয়া তাহা সাহেবকেই প্রত্যর্পণ করিলে সাহেব সে ঘুসির ওজন সহ্য করিতে না পারিয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইল। অপর সাহেব তাহাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া নামিয়া গেল। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে অনেক স্থানীয় লোক আসিয়া জুটিলেন। কালীমন্দিরে বিজয়ার দিবস অনেক স্ত্রীলোকের সমাগম হয়, তথায় সাহেবেরা কোন ক্রমেই থাকিতে পারেন না—এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া সকলেই একবাক্যে তাহাদিগকে স্থান পরিত্যাগ করিতে জিদ করিলেন। অবশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া কালীমন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বর্ষায়

ধূসর তাম্র জলদ ধূম্র
গগণে বিজুলি ঝলিছে,
গুরুগর্জ্জনে ঘোর তর্জ্জনে
বজ্র শ্রবণ রোধিছে।
গিরির শৃঙ্গ সম তরঙ্গ
আলোড়ি সিন্ধু উঠিছে।
নাশিতে বিশ্বে ভীষণ দৃশ্যে
প্রলয় ঝটিকা বহিছে।
দুখ অর্জ্জিত তৃণ সজ্জিত
কুটীর গিয়াছে উড়িয়া;
ঝটিকা পূর্ণ অসীম শূন্য
প্রান্তরে আছি পড়িয়া।
অনাথ ক্ষুদ্র এ দীন, রুদ্র!
আশ্রয় করে প্রার্থনা;
প্রকাশি অরূপ দক্ষিণ মুখ
দেহ গো অভয় সান্ত্বনা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিতের ইতিহাস।

কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদিগকে একটা কিম্ভূত কিমাকার জীব বলিয়া মনে করিতেন। আমরা অসভ্য, আমাদের না ছিল সাহিত্য, শিল্প, গণিত, জ্যোতিষ, স্থাপত্য; আমাদের দেব নাগর অক্ষর আমাদের নিজস্ব নহে, ফিনিসীয় ও মিশরীদিগের নিকট ধার করা, উহা সেমিটিক বংশান্তর্গত; স্থাপত্য গ্রীসিয় আমদানি; জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি আরবীয় আমদানি। এ সকল যুক্তির প্রতিপক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ দুর্ল্লভ, কাজেই আমাদিগকে নীরব থাকিতে হইত। কিন্তু আরবীয়গণ ভারতবর্ষের নিকট জ্যোতিষ ও গণিতের ঋণ স্বীকার করিয়া একটু গোলযোগ বাধাইয়াছে। এক্ষণে সকলের মনে সন্দেহের একটু ছায়ার সূত্রপাত হইয়াছে। ইহার ফলে য়ুরোপে সংস্কৃত চর্চ্চার ধুম লাগিয়া গিয়াছে, এবং সেই সংস্কৃত চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

Cassini, Bailly, Playfair প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন খৃষ্ট জন্মের ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেরও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রমাণ বর্ত্তমান আছে, এবং অত প্রাচীন কালেও তাহার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু La Place (ফরাসী জ্যোতিষী ১৭৪৯—১৮২৭ খৃষ্টাব্দ) ও De Lambre বলেন যে, সে সকল গণনা ভ্রমাত্মক, হিন্দু-[illegible]বীর বিরুদ্ধবাদীদিগের অগ্রণী Bentley সাহেব কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের ১৪৪২ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুগণ বৎসরকে ২৭টি চান্দ্রমাসে ভাগ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Elphinstone সাহেব অনুমান করেন, গ্রীসে প্রথম জ্যোতিষের উল্লেখের এক বা দুই শতাব্দী পূর্ব্বে এবং খৃষ্টজন্মেরও পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দুগণ জ্যোতিষের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

আমরাও ঐ উক্তির যাথার্থ্য দেখিতে পাই। পৃথিবীর সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ। উহাতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সমন্বয়, সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিকাশ (কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যেও ইহার উল্লেখ আছে), সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়। অন্যান্য বেদেও ইহাদের উল্লেখ আছে (Asiatic Researches Vol. VIII, P. 489; Vol VII, P. 282 দ্রষ্টব্য)। ঋষিগণ যজ্ঞকাল ও যজ্ঞবেদী সকল নির্ম্মাণ ও নিরূপণের জন্য বাধ্য হইয়া জ্যোতিষ ও গণিতের বহুল চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহার ফলে জ্যোতিষ, ক্ষেত্রমিতি, পরিমিতি বীজগণিত প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত থিব সাহেব বেদবিহিত বেদীনির্ম্মাণ সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করিতেছেন শুনিয়াছি। নবগ্রহনির্ণয়, গ্রহদিগের অয়ন, চলন, স্থিতি, আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, উদয়াস্ত, গ্রহণ প্রভৃতি পঞ্জিকা সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল তাঁহারা খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, কেন না প্রথম জ্যোতিষী পরাশর ঐ সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (Mr. Davis বলেন—Asiatic Researches Vol. V, P. 288,—পরাশর ১৩৯১ খৃঃ পূর্ব্বের লোক; Bentley সাহেব কিন্তু পরাশরের জ্যোতিষ গ্রন্থকে আধুনিক বলিতে চাহেন —Asiatic Researches Vol. VI. P. 581—).

নবগ্রহের মধ্যে রাহু ও কেতু নামে দুইটি গ্রহ আছেন, ইহারা এত দিন য়ুরোপীয় জ্যোতিষমণ্ডলীর নিকট আমল পাইতেছিলেন না। কিন্তু সম্প্রতি ইঁহাদিগকে হর্শেল ও নেপচুনের সহিত অভেদাত্মা বলিয়া অনুমান চলিতেছে, কারণ ইহাঁদের স্থিতিস্থান, অয়ন-চলন, ও বর্ণনা একইরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে।

পৃথিবীকে যে কোনও প্রাণীবিশেষ (কূর্ম্ম ও শেষ নাগ) ধারণ

করিয়া নাই, সে যে মহাশূন্যে আপনাতে আপনি অবস্থিত, তাহাও হিন্দু মনীষীগণ বহু পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সে কালে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা কহা বড় কঠিন কার্য্য ছিল, এজন্য সাধারণ বিশ্বাস এতকাল পর্য্যন্ত অটুট রহিয়া গিয়াছে।

বৌধায়ণের সূত্রে রাশিচক্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ডাক্তার ভাণ্ডারকর, বরাহমিহিরের (৫৮৫) গ্রন্থ হইতে রাশি সকলের নাম, জ্যামিত্র (ব্যাস), কেন্দ্র, হোরা, লিপ্ত প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষোক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতি দেখাইয়াছেন।

কিন্তু কেহ কেহ রাশিনাম গ্রীসিয়, ও নক্ষত্র সকলের নাম চৈন আমদানি বলিয়া অনুমান করেন।

হিন্দুগণ Ptolemy (দ্বিতীয় শতাব্দী) ও আরবদিগের পূর্ব্বে সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন স্থির করিয়াছিলেন; এবং পঞ্চম শতাব্দীতে পৃথিবীর আহ্নিক গতিও স্থির করিয়াছিলেন। হেরাক্লিটস (৫০০ খৃঃ পূঃ) ইহার বহু পূর্ব্বে পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্থির করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা কোপারনিকসের (১৪৭৩—১৫৪৩) পূর্ব্বে য়ুরোপে প্রচারিত হয় নাই। এবং তাহাও যে অধিক প্রচারিত হয় নাই তাহা গালিলিওর (১৫৬৪—১৬৪২) মৃত্যু দণ্ড হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর জ্যোতিষীগণ 'যবনজ্যোতিষ' ও 'রোমকসিদ্ধান্তের' উল্লেখ করিয়া, অনেকের মনে বিপরীত সন্দেহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয় নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ 'রোমক' শব্দে সিরিয়া প্রদেশ বুঝিতে চাহেন। এবং তাহাই সম্ভব। কারণ তুর্কীর সুলতানকে পূর্ব্বে রুমের বাদশা বলা হইত।

জ্যোতিষ অপেক্ষা গণিতে ইঁহাদের চিন্তা অধিক প্রসারিত হইয়াছিল। অধ্যাপক Playfair বলিয়াছেন ত্রিকোণমিতি (Trigonome-

try) সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক আছে তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, রচয়িতা যতটা জানেন ততটা যেন প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে চাহেন। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের ইহাই বিশেষত্ব। Edinburgh Review Vol. XXIX, 147 পৃষ্ঠায় পাটিগণিত সম্বন্ধেও খুব সপ্রশংস কাহিনী লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় যে সকল পাঠ আছে, তাহার সকলগুলিই গ্রীক গণিতের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং তন্মধ্যে এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা য়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত বেণ্টলি সাহেবের মতে ১০৯১ খৃষ্টাব্দের অর্ব্বাচীন নহে। কিন্তু বেণ্টলি সাহেব সহজে হিন্দুপ্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। স্বয়ং Elphinstone সাহেবই তাঁহাকে "the most strenuous opponent of the claims of the Hindoos" বলিয়াছেন; এজন্য সকল সময়ে আমরা তাঁহার মত স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিব না। Colebrook ও Sir W. Jones মহোদয়দিগের মতে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ব্রহ্মগুপ্তের সমসাময়িক। অর্থাৎ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিরচিত। হিন্দুগণই প্রথম দশমিক ভগ্নাংশের (decimal notation) আবিষ্কর্ত্তা।

জ্যামিতিতেও ইহাঁরা অনেক অগ্রযায়ী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বেদীনির্ম্মাণকল্পে ইহাঁদিগকে জ্যামিতির আলোচনা করিতে হইত। হিন্দু-আবিষ্কৃত বহু নূতন নিয়ম ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপও উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। অধ্যাপক Wallace এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "However ancient, therefore, any book may be in which we meet with a system of Trigonometry, we may be assured it was not written in the infancy of science. We may therefore conclude that geometry must have been known

in India long before the writing of the Suryya Siddhanta". অর্থাৎ স্বর্য্যসিদ্ধান্তে ত্রিকোণমিতি লিখিবার বহু পূর্ব্বে জ্যামিতি ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল, কারণ জ্যামিতি ব্যতিরেকে ত্রিকোণমিতি রচনা অসম্ভব।

বীজগণিতে (Algebra) কিন্তু হিন্দুগণ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রযায়ী। ব্রহ্মগুপ্ত (ষষ্ঠ শতাব্দী), শ্রীধরাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য (দ্বাদশ শতাব্দী) ও আর্য্যভট্ট প্রভৃতি মনীষীগণ তাঁহাদের কীর্ত্তিলাতিতে ভারতের নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। আর্য্যভট্ট ৩৬০ খৃষ্টাব্দে (কোলব্রুকের মতে) প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই সময়েই Diophantus প্রথম গ্রীক বীজগণিতজ্ঞ প্রাদুর্ভূত হয়েন, কিন্তু আর্য্যভট্ট গ্রীক গণিতজ্ঞ অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন। এবং আর্য্যভট্টের সময়ে বীজগণিত যেরূপ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে অনুমান হয় চতুর্থ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই ভারতে বীজগণিত চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। সেই সময় আরবেরা আমাদের নিকট উক্তবিদ্যা শিখিয়া য়ুরোপে ছড়াইয়া দেয়।

ডাক্তার ভাওদাজী উক্ত পণ্ডিতগণের এইরূপ কালনির্ণয় করিয়াছেন—'আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দ, (ইহা আর্য্যভট্টরচিত গ্রন্থের আন্তর প্রমাণ হইতে স্থিরীকৃত); ব্রহ্মগুপ্ত ৫৯৮ ; ভাস্করাচার্য্য ১১১৪ ; বরাহমিহির ৫৮৭। বরাহমিহির কালিদাসের সমসাময়িক। ভাস্করাচার্য্যের জন্মকাল লইয়া মতদ্বৈধ আছে। ডাক্তার ভাওদাজী আকবরের রাজ্যকালের পূর্ব্বাগত লেখকদিগের গ্রন্থমধ্যে ভাস্করাচার্য্যের উল্লেখ পাইয়াছেন ; বেণ্টলি সাহেব কিন্তু ইহা মানিতে চাহেন না। তিনি ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থের ফৈজীকৃত পারস্য অনুবাদ দেখিয়া তাঁহাকে আকবরের (৫৫৬) সমকালিক বলিতে ইচ্ছুক।

Edinburgh Review Vol. XXI, ৩৭২ পৃষ্ঠায় ভাস্করের অগ্রযায়ী বিদ্যার বহু প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত বহু

নিয়ম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও য়ুরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল। ইহার বিশদ বিবরণ Elphinstone সাহেবের ইতিহাসে দেওয়া হইয়াছে, পুনরুদ্ধার অনাবশ্যক।

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে আরবীয়েরা হিন্দুগণিত স্বদেশে লইয়া যান। এ সময়ে খালিফ অল মনশুর (৭৫৪—৭৭৫) আরবের রাজা। ইঁহার সময়েই সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র আরবী ভাষায় অনূদিত হয় (Prof Max-Muller's Selected Essays). ১২০২ খৃষ্টাব্দে Leonardo of Pisa য়ুরোপে প্রথম বীজগণিত প্রচলিত করেন। ইহা হইতেই ভারতের অগ্রযায়ীত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে সন্দেহ নাই।

মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিয়া মহাত্মা নিউটন যে বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারও অগ্রভাগ ভারত গ্রহণ না করিয়া ছাড়ে নাই। প্রাচীন ভারতে কোনও আবিষ্কারের পর দুন্দুভিধ্বনি উঠিত না। দুন্দুভি বাজাইয়া খ্যাতি প্রচার করিবার সুবিধাও ছিল না। এজন্য কোন আবিষ্কার, আবিষ্কর্তার দপ্তর, না হয় বড় জোর ৫।৭ জন শিষ্যের মস্তিষ্কের গণ্ডীর মধ্যে আটক থাকিত, জনসাধারণে প্রচারিত হইত না। নিউটন ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর মাত্র বয়সে মাধ্যাকর্ষণশক্তি লোকসমাজে পরিচিত করেন ইহা তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতির বিষয় সন্দেহ নাই। এই জন্যই ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক Principia মুদ্রিত হইলে, মাধ্যাকর্ষণ যখন সর্ব্বজনবিদিত, হইয়া পড়িল তখন নিউটনের অপূর্ব্ব প্রতিভার একটা ধন্য ধন্য রব সমগ্র জগৎ ছাইয়া ফেলে।

কিন্তু তাঁহার বহুপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্য যে উক্ত শক্তির বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন তাহা আজও কেহ জানে না। ইহা প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ-পাপের ফল। নহিলে অধ্যাপক বসুকে আমরা আরও উচ্চ পদবীতে দেখিতে পাইতাম। যা'ক সে কথা। আমি

এক্ষণে ভাস্কর-রচিত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থ হইতে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

উক্ত গ্রন্থের গোলাধ্যায়ের অন্তর্গত ভুবনকোষাধ্যায়ে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"করতলকলিত-আমলকবৎ—অমলং বিদন্তি যে গোলম্"। কিন্তু পৃথিবী যে গোল তাহা ১৪৯০' খৃষ্টাব্দেও য়ুরোপে ধারণা ছিল না (এ সম্বন্ধে "ভূগোলের ইতিহাস" প্রবন্ধে বিশদ ভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল)। পৃথিবী গোল যদি হইল তাহা হইলে তাহার কেন্দ্রও আছে। তৎপরে লিখিত হইয়াছে—

"আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা
আকৃষ্যতে,. তৎ পততীব ভাতি ;
সমে সমন্তাৎ ক্ক পতত্বিয়ং খে" ॥

পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে : সেই শক্তি দ্বারা পৃথিবী শূন্যস্থ কোন গুরু দ্রব্যকে স্বাভিমুখে (কেন্দ্রাভিমুখে) আকর্ষণ করে, তাহাতে সেই দ্রব্যকে পতনের মত দেখায়, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ সমান হওয়ায় পৃথিবী কোথায় কেমন করিয়া পড়ে ?

এই একটি শ্লোক হইতে আমরা অনেকগুলি তথ্য পাইতেছি, ১। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে ; ২। সে প্রত্যেক পদার্থ স্বকেন্দ্রে আকর্ষণ করিতেছে ; ৩। পৃথিবীও সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা স্বস্বাভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু সে বৃহৎ বলিয়া আকৃষ্ট হইতে পারে না, এবং আকৃষ্ট হইলেও আমরা তাহার পতন অনুভব করিতে পারিব না ; কারণ ৪। পৃথিবী মহাশূন্যে বিলম্বিত।

নিউটনের gravity ও gravitation (সৌর জগতের আকর্ষণ) মূলতঃ উক্ত কয়েকটি তথ্য হইতে পৃথক নহে। তিনি উন্নতকালে, বিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীর আকর্ষণী

শক্তির একটা নিয়মও নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্রযায়ী ভাস্কর ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু ইহাতেও ভাস্করের প্রতিভাদ্যুতি ম্লান হইবে না নিশ্চিত।

বেণ্টলি সাহেবের মতে ব্রহ্মগুপ্ত ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম জ্যোতিষগণনার সূত্রপাত করেন। ডাক্তার ভাওদাজী ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্বে আর্য্যভট্টের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে বেণ্টলি সাহেব কয়েক খানি জ্যোতিষগ্রন্থের কাল নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন ৯১৮ অব্দে 'বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত'; ১০০০ অব্দে বরাহের 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত'; ১৩২২ অব্দে আর্য্যসিদ্ধান্ত'; ও ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ভাস্করের 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' বিরচিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি সূর্য্যসিদ্ধান্ত পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিরচিত বলিয়া Colebrook ও Sir W. Jones মহোদয়দিগের বিশ্বাস। এবং আমাদের দেশের কিংবদন্তি অনুসারে বরাহ কালিদাসের সমকালিক এবং কালিদাসের প্রাদুর্ভাবকাল ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া সকল পণ্ডিত ধরিয়া লইয়াছেন। অতএব বরাহের কালনির্ণয় সম্বন্ধে দ্বিধা থাকা অন্যায়। অতএব দেখা যাউক সিদ্ধান্ত শিরোমণি সম্বন্ধে আর কে কি বলিতেছেন।

ভাওদাজীর মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'পঞ্জিকার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে আন্তর প্রমাণ হইতে স্থির করিয়াছেন যে ১০৩৬ শকে ভাস্করাচার্য্যের জন্ম হয়, এবং ১০৭২ শকে ৩৬ বৎসর বয়সে ভাস্কর 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' রচনা করেন। খৃষ্টাব্দে ও শকাব্দে ৭৮ বৎসর তফাৎ। অতএব আমরা দেখিতেছি ১১১৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্করের জন্ম হয় ও ১১৫০ সালে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি রচিত হয়। ইহা হইতে দেখিতেছি নিউটনের জন্মের ৫২৮ বৎসর পূর্ব্বে, ভাস্কর জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং নিউটন কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের ৫১৬বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে তাহা বিধিবদ্ধ হয়।

বেণ্টলি সাহেবের নির্দ্দেশানুসারে গণনা করিলেও ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর ও ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে নিউটন মাধ্যাকর্ষণের বিষয় অবগত হয়েন, অর্থাৎ ভাস্কর তবুও ১১০ বৎসরের অগ্রগামী হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিলেও প্রাণ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে। অতীতের আদর্শে সন্তুষ্ট হইয়া না থাকিয়া আমরা বর্ত্তমানেও অগ্রসর হইতে পারি ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষা-আবাহন।

এস এস নব বরষা,
তাপিত-ভুবন-ভরসা।

এসগো সজলা স্নিগ্ধশ্যামলা
নবযৌবনা সরসা।

আন মেঘভার গগণে
গুরুগর্জ্জনে সঘনে

আকাশের দ্বার খুলিয়া আবার
এস নামি' শুভ লগনে।

এসগো রঙ্গে শোভনে,
উতলা আর্দ্র পবনে

আন হিল্লোল কলকল্লোল
অলস তটিনী জীবনে।

আন নব সাধ বাসনা
জাগাও নূতন বেদনা।

আন দূরস্মৃতি মল্লার গীতি
দিবস-বিবশ চেতনা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মানুষের জড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দেশের গৌরব অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্রবসু মহাশয় তাড়িত-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, 'জীবনী শক্তি' (১) বলিয়া যে একটা কথা দ্বারা এতকাল সভ্যজগতে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হইত, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতা লুক্কায়িত রাখিবার নিমিত্ত বৃথা শব্দাড়ম্বর মাত্র। বস্তুতঃ প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থের মধ্যে কোন তীব্র পার্থক্য নাই, সকলেরই মধ্যে প্রাণ আছে। তাড়িত-প্রবাহের উত্তেজনায় প্রাণিগণে যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থেও তাদৃশ উত্তেজনায় কিয়ৎ পরিমাণে সেই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এক কথায় অধ্যাপক বসু প্রাচীন ভারতের বেদবাক্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন 'একং সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

ডাক্তার লোয়েব (২) নামক একজন জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিক আমেরিকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিগত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিণ শারীর-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সভায় তিনি ও তাঁহার সহকারী অধ্যাপক ম্যাথুস্ (৩) দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা বৈজ্ঞানিক জগতকে আলোড়িত ও বিস্মিত করে। অধ্যাপক বসুর আবিষ্ক্রিয়ার সহিত তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। জীব ও জড়জগতে যে একই প্রাণশক্তি বর্ত্তমান ইহা অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, মানুষ যে জড়ে প্রাণদান করিতে পারে, ডাক্তার লোয়েবের প্রবন্ধে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অধ্যাপক ম্যাথুস্ ডাক্তার লোয়েবের

(১) Vital force.

(২) Dr. Jacques Loeb (৩) Prof. Albert P Matthews.

তাড়িতানুবিষয়ক সিদ্ধান্ত স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনপ্রণালীসম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া তৎসম্বন্ধে অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বিষয়টি সত্য হইলে ইহার ফলে শারীরবিজ্ঞান (physiology), প্রাণীবিজ্ঞান (biology) ও ধর্ম্মবিজ্ঞান (theology) সম্বন্ধে অনেক প্রচলিত মত খণ্ডিত হইবে, এবং উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে এপর্য্যন্ত উহার কোন প্রতিবাদ বাহির হয় নাই,—এই সকল কারণে জটিল হইলেও আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করিতেছি।

পতঙ্গ অগ্নিমুখে ধাবিত হয়, ফুলের পাঁপড়িগুলি আলোর সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তন করে। কিন্তু পতঙ্গে আমরা নৈসর্গিক সংস্কার অথবা বুদ্ধির আরোপ করি, ফুল আলোকদ্বারা আকৃষ্ট হয় বলি। বাস্তবিক পক্ষে উভয়ই এক কারণাধীন। আলোতে এমন কতকগুলি গুণ আছে যাহা পতঙ্গ ও ফুলকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণী শক্তি পতঙ্গ ও ফুল কেহই রোধ করিতে পারে না। ডাক্তার লোয়েব প্রমাণ করিয়াছেন যে আলোক, উত্তাপ, স্পর্শ, বস্তুবিশেষের রাসায়নিক গঠন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর বিভিন্ন প্রকারে ক্রিয়া করে এবং সেই ক্রিয়ার ফলে একই উত্তেজক কারণে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বিভিন্ন প্রকারে আচরণ করিতে দেখা যায়। অতএব আমরা নীচ প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে বুদ্ধিগত যে পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করি, তাহা ভুল,—তাহারা সমভাবে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের অধীন।

প্রাণিগণের সর্ব্বনিম্নস্তর হইতে জেলিমৎস্য (১) লইয়া তাহার উপরার্দ্ধ কাটিয়া ফেলিয়া ডাক্তার লোয়েব দেখিয়াছেন যে, জেলির সমতান স্পন্দন বা আকুঞ্চন (২) বন্ধ হইয়া গিয়াছে! পরে লবণের

(১) Jellyfish (২) Rythmical pulsation or contraction

আরকে (১) ঐ মস্তকবিহীন শরীরার্দ্ধকে স্থাপন করিলে পুনরায় স্পন্দন আরব্ধ হয়। একবিন্দু পোটেসিয়ম্ (২) বা কেল্‌সিয়ম্ (৩) ঐ আরকে মিশাইয়া দিলে পুনরায় স্পন্দন থামিয়া যায়।

প্রাণিবর্গের হৃৎপিণ্ডেও জেলির ন্যায় সমতান স্পন্দন হইয়া থাকে। আরকবিশেষে প্রাণিদেহ হইতে উৎপাটিত হৃৎপিণ্ড রক্ষা করিয়া সেই আরকের রাসায়নিক প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দ্বারা অনেক কাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ক্ষীণ অথবা দ্রুত করা যায়, একেবারে থামাইয়া দিয়া পুনরায় আরম্ভ করা যায়। এইরূপে মাংসপেশী সমূহও ক্ষীণ কিম্বা দ্রুতভাবে স্পন্দিত করা যায়।

ইহা হইতে ডাক্তার লোয়েব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার জৈবিক ক্রিয়ার মূলেই তাড়িতশক্তি নিহিত। পূর্ব্বে শারীরবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিতেন যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্নায়ুসমূহের কোন অজ্ঞাত প্রভাব হইতে সঞ্জাত। ডাক্তার লোয়েব দেখাইয়াছেন যে অতিসূক্ষ্ম পরিমাণে কতকগুলি রাসায়নিক লবণের অস্তিত্ব কি অভাবই ঐ স্পন্দনের প্রকৃত কারণ। ইহা সকলেই জানেন, জলে সাধারণ লবণ মিশাইয়া দিলে সেই জল তাড়িতপরিচালক হয়। একটি তামার তারের দুই মুখ তাহাতে ডুবাইয়া দিলে তাড়িতপ্রবাহ আরব্ধ হয়। কিন্তু জলে লবণের পরিবর্ত্তে চিনি মিশাইয়া দিলে তাহা হয় না।

ইহার কারণ রাসায়নিকগণ অনেক কাল স্থির করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে রাসায়নিক লবণ ও অম্ল (৪) একত্রে মিশাইয়া দিলে তাহাদের পরমাণু সমূহ অতি বেগের সহিত পৃথক হইয়া যায়, এবং সেই বেগ প্রভাবে প্রত্যেক পরমাণুতে প্রবল তাড়িত শক্তি সঞ্জাত হয়।

(১) Solution (২) Potassium (৩) Calcium
(৪) Chemical salt and acid

পরমাণুসমূহ পৃথক হওয়ার কালে একদল পরমাণু যোগাত্মক, (১) অন্যদল পরমাণু বিয়োগাত্মক (২) তাড়িত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সাধারণ লবণের সোডিয়ম (৩) পরমাণুগুলিতে প্রথমোক্ত প্রকারের, ক্লোরাইন (৪) পরমাণুগুলিতে শেষোক্ত প্রকারের তাড়িতশক্তি সঞ্চারিত হয়। এইরূপ তাড়িশক্তিযুক্ত পরমাণুগুলিকে ফ্যারাডে (৫) 'ইয়ন্' (৬) (তাড়িতাণু) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার লোয়েব দেখাইয়াছেন যে, তাড়িতাণু সমূহের হৃৎপিণ্ড ও মাংসপেশীর স্পন্দন হইয়া থাকে। বিয়োগাত্মক পরমাণুগুলি স্পন্দন জন্মায়, যোগাত্মক পরমাণুগুলি স্পন্দন নিবারণ করে। অতএব জীবনী শক্তির মূলে তাড়িতশক্তি নিহিত। ডাক্তার লোয়েব আরও বলেন যে, আহারের উদ্দেশ্য খাদ্যপরিপাকদ্বারা মাংসপেশী ও শারীরিক যন্ত্রসমূহের পরিপুষ্টি নহে, আহারের উদ্দেশ্য তাড়িতাণুসৃষ্টি।

রাসায়নিক দ্রবণ (৭) তত্ত্বনির্ণয় যেরূপ রসায়নবিদ্গণের পক্ষে এতকাল নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল, গর্ভাশয়ে জীবের প্রথম সৃষ্টিও এতকাল জীবতত্ত্ববিদ্গণের পক্ষে তাদৃশ কঠিন সমস্যা ছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ডিম্বাধার হইতে যে কোটি কোটি ডিম্ব নিঃসৃত হয়, তাহার একটিমাত্র ঐরূপ কোটি কোটি পুংবীজের একটির সহিত মিলিত হইয়া অতি সূক্ষ্ম কোষ নির্ম্মাণ করে। পুংবীজের সহিত স্ত্রীডিম্ব মিলিত না হইলে সেই কোষ গঠিত হয় না। সেই কোষই জীবনের ভিত্তি, তাহা হইতেই প্রাণের সূত্রপাত।

ডাক্তার লোয়েব দেখাইয়াছেন পুংবীজ ব্যতীত কেবল স্ত্রীডিম্ব হইতে 'জীবনী শক্তির' বিকাশ সাধন করা যায়। এস্থলে বলিয়া লওয়া

(১) Positive (২) Negative (৩) Sodium
(৪) Chlorine (৫) Faraday (৬) Ion
(৭) Solution.

যাইতে পারে যে, এই তত্ত্ব সত্য হইলে বংশানুক্রমিকতার অমূলকতা প্রমাণিত হয়। কারণ যদি স্ত্রীডিম্বের সহিত পুংবীজের মুহূর্ত্তকালের সম্মিলনস্বরূপ পিতৃসাহায্য ব্যতিরেকেও জীবসৃষ্টি হইতে পারে, তাহা হইলে পিতা তাহার দোষগুণ পুত্রে সংক্রামিত করেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ সমুদ্রের এক প্রকার কীটের (১) সাহায্যে নানাবিধ তত্ত্বালোচনা করিয়া থাকেন। তাদৃশ একটি সামুদ্রিক কীটের ডিম্বসমূহ পুংবীজের সহিত কোন প্রকার সংস্পর্শের সম্ভাবনা জন্মিবার পূর্ব্বেই ডিম্বাধার হইতে বাহির করিয়া লইয়া ডাক্তার লোয়েব সমুদ্রের জলে ছাড়িয়া দেন। জৈবিক স্পন্দন ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচনাকালেই ডাক্তার লোয়েব দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, আরকে নিমজ্জিত জীব-কোষের (২) চতুর্দ্দিকে যে সমুদায় তাড়িতাণু থাকে, তাহাদের প্রকারভেদে জীবকোষের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব ঐ সমুদায় যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক তাড়িতাণুর আপেক্ষিক অনুপাত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া, জীবকোষের সাধারণ প্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া তাহাকে কোন অসাধারণ গুণ প্রদান করা অসম্ভব নহে। এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া, যে জলে ডিম্বগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ডাক্তার লোয়েব তাহাতে একে একে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ মিশাইতে থাকেন, অবশেষে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ম্যাগ্নেসিয়ম ক্লোরাইড (৩) মিশাইয়া দিলে ডিম্বসমূহ ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া প্রাণীতে পরিণত হয়। এইরূপে অন্যান্য রাসায়নিক লবণ দ্বারা ডাক্তার লোয়েব অপরাপর জাতীয় প্রাণীর অনুর্ব্বর ডিম্ব-গুলিকে প্রাণান্বিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ এই আবিষ্কার উপহাসিত হয়, কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণও উক্ত প্রণালী

(১) Sea urchins. (২) Protoplasm.
(৩) Chloride of magnes um.

অনুসারে পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ায় এখন উহার সত্যতা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। (১)

পুংবীজ কর্তৃক অনভিসিঞ্চিত স্ত্রীডিম্বকে ঠিক জীবিত পদার্থ বলা যাইতে পারে না। কারণ জীবিত পদার্থের প্রধান চিহ্ন বিকাশক্ষমতা তাহাতে নাই। বার্থেলোট (২), ক্লড বার্ণার্ড (৩) প্রভৃতি বড় রসায়নবিদ্‌গণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে জীবসৃষ্টির যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা এতদিনে সফল হইয়াছে। শরীরবিজ্ঞানের ইতিহাসেও ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আবিষ্কার।

রাসায়নিকগণ দেখাইয়াছেন যে, এক শ্রেণীর পরমাণু অন্য শ্রেণীর পরমাণুর সহিত যখন মিলিত হয়, তখন ঐ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর পরমাণুর এক, দুই কিম্বা ততোধিক বাহু থাকে, এরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন জলজান যখন অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া জলে পরিণত হয়, তখন দুই বাহুবিশিষ্ট অম্লজানের এক পরমাণু এক বাহুবিশিষ্ট জলজানের দুইটি পরমাণুর সহিত আবদ্ধ বা মিলিত হয়, দেখা যায়। ইহাকে রাসায়নিকগণ পরমাণু-ধর্ম্ম (৪) বলেন। ফ্যারাডে দেখাইয়াছেন যে তাদৃশ পরমাণুসমূহের প্রত্যেক বাহুতে কিয়ৎ পরিমাণ তাড়িতশক্তি নিহিত থাকে। সুতরাং তাড়িতাণুসমূহ সকলে সমশক্তিশালী নহে, কোনটির শক্তি এক বাহুনিবদ্ধ, কোনটির শক্তি দুই বা ততোধিক বাহু-সম্প্রসারিত। ডাক্তার লোয়েব দেখাইয়াছেন জলে কেবল লবণ মিশাইয়া দিলে জেলিমৎস্যের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন লক্ষিত হইবে না, তৎসহ অল্পকিঞ্চিৎ কেল্‌সিয়ম্ (৫) মিশাইয়া

(১) ডাক্তার লোয়েব ইহাকে artificial parthenogenesis (অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে ডিম্বে প্রাণদান) সংজ্ঞা দিয়াছেন।

(২) Berthelot. (৩) Claude Bernard

(৪) atomicity (৫) calcium.

দিতে হইবে। আবার অধিক পরিমাণে কেল্‌সিয়ম্‌ মিশাইলে তাহা বিষের ন্যায় কার্য্য করিবে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যাইবে। (১) অতএব কতকগুলি তাড়িতাণু বিষের ন্যায় কার্য্য করে, কতকগুলি তদ্বিপরীত কার্য্য করে। এই প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার লোয়েব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক বাহুবিশিষ্ট বিয়োগাত্মক তাড়িতাণুর বিষাক্ত ক্রিয়া এক মিনিম্‌ পরিমিত দুই বাহু বিশিষ্ট অথবা তদপেক্ষা কম পরিমিত তিন বিশিষ্ট যোগাত্মক তাড়িতাণুর দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। সেইরূপ তিন বাহুবিশিষ্ট তাড়িতাণু দুইবাহু বিশিষ্ট তাড়িতাণুর অনিষ্টকর ফলের প্রতিষেধক।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আয়ুবৃদ্ধির সম্ভবপরতা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন, সুতরাং ডাক্তার লোয়েবও যে তদ্রূপ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। তিনি বলেন, "পুংবীজ অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অনুর্ব্বরীকৃত স্ত্রীডিম্ব যখন শীঘ্রই মরিয়া যায়, অথচ পূর্ব্বোক্তরূপে উর্ব্বরীকৃত হইলে বাঁচিয়া থাকে, তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে জীবন ও মৃত্যু দুইটি বিপরীত "ক্রমিক প্রক্রিয়া," তাহাদের একে অন্যতরের শক্তিরোধ করিতে সক্ষম।

অল্প পরিমাণ পোটেসিয়ম সিয়েনাইডের (২) আরকে অনুর্ব্বর স্ত্রীডিম্ব রাখিয়া দিলে তাহারা সপ্তাহকাল বাঁচিয়া থাকে। তৎপর সিয়েনাইড বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিলে ডিম্বসমূহ স্বাভাবিকরূপে বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যদি এইরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্যু শক্তিকে

(১) অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, প্রাণিশরীরে বিষ যেরূপ অবসাদ জন্মায়, উদ্ভিদ এবং ধাতুশরীরেও বিষ তাদৃশ ক্রিয়া করে, এবং উত্তেজক কোন ঔষধ প্রয়োগে যেরূপ প্রাণিশরীরে ঐরূপ বিষের শক্তি বিনষ্ট হয়, উদ্ভিদ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়া থাকে।

(২) potassium cyanide.

এক সপ্তাহ কাল রুদ্ধ রাখা যায়, তবে, ক্রমশঃ পরীক্ষা দ্বারা ঐ কালের পরিমাণ আরও অনেক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার ন্যায়-সঙ্গত পরিণাম অমরত্ব। কিন্তু ডাক্তার লোয়েব যে অমরত্বলাভের উপায় অবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ কখনও মনে করেন না। তবে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া দীর্ঘজীবন লাভের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত নহে।

পরিশেষে অধ্যাপক ম্যাথুস্ ডাক্তার লোয়েবের তাড়িতাণু সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে অভিনব তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যাউক। এপর্য্যন্ত শারীর-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্নায়ু-কোষের (১) গঠন অতি জটিল ও রহস্যময় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ম্যাথুস্ বলেন যে তাহাদের জীবকোষ (২) সুলভ দুইটি সাধারণ গুণ আছে ধরিয়া লইলেই বিজ্ঞানের কাজ চলিতে পারে, যথা—স্নায়ুসমূহ মস্তিষ্কে উত্তেজনা পরিচালনা করিতে, এবং তাদৃশ উত্তেজনাজনিত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিতে সক্ষম। স্নায়ুকোষ সমূহে শতকরা ৮০।৮৫ ভাগ জল, অবশিষ্ট জেলি (৩) (ক্বাথের ন্যায় আটাল পদার্থ)। এই জেলির প্রত্যেক অণুতে যোগাত্মক তাড়িত নিহিত আছে। সুতরাং বিয়োগাত্মক তাড়িতাণুদ্বারা তাহারা আকৃষ্ট হয়। ক্লোরোফরম (৪) প্রয়োগে মানুষ সংজ্ঞাহীন হয় ইহা সকলেই জানেন। ডাক্তার ম্যাথুস বলেন তাহার কারণ এই যে, ক্লোরোফরমের যোগাত্মক তাড়িতাণুসমূহ স্নায়ুকোষের যোগাত্মক তাড়িতাণুসমূহকে পরস্পর হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়, এবং এইজন্য তাহারা তাড়িত-প্রবাহ-পরিচালনে অক্ষম হইয়া পড়ে।

(১) Nerve-cells. (২) Protoplasm.
(৩) Jelly. (৪) Chloroform.

আবার বিয়োগাত্মক তাড়িতাণু বিশিষ্ট কোন পদার্থের সংযোগে আসিলে স্নায়ুকোষের তাড়িতাণুসমূহ ঘনীভূত হইয়া জেলির আকার ধারণ করে, এবং মস্তিষ্কে তাড়িতপ্রবাহ পরিচালনে সক্ষম হয়। এই সিদ্ধান্ত যে সমীচীন, তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, বৈদ্যুতিক ব্যাটারির বিয়োগাত্মক ধ্রুবের (১) তাড়িতপ্রবাহ দ্বারাই কেবল স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া থাকে।

মানুষ প্রাণদান করিতে পারে কি না? এবিষয়ে সম্প্রতি কস্‌মপলিটান্ নামক বিলাতী পত্রিকায় ষ্ট্রং সাহেব একটি গল্প লিখিয়াছেন। জনৈক বৈজ্ঞানিক এক প্রাণীসৃষ্টি করিয়া দেখিতে পান যে, তাহার মধ্যে কেবল নীচ প্রবৃত্তিগুলি বিকাশলাভ করিতেছে, এবং তাহার অসংখ্য সন্ততি পৃথিবী গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তখন নিতান্ত ভীত হইয়া বিজ্ঞানসাহায্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন, ধরণী রক্ষা পাইল। রিভিউ অব্ রিভিউস্ পত্রিকার সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব বলেন এই বিভীষিকাময় গল্পপাঠের পর কোন বৈজ্ঞানিক আর জীবসৃষ্টি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইবে না। কিন্তু সত্য আবিষ্কারের পথে বৈজ্ঞানিকগণ এতদপেক্ষা অনেক গুরুতর বাধা অতিক্রম করিয়াছেন। একটি অযৌক্তিক কাল্পনিক বিবরণপাঠে যে তাঁহারা এবিষয়ে তত্ত্বনির্ণয়ের প্রয়াস হইতে বিরত হইবেন, এরূপ অনুমান হাস্যাস্পদ।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১) Negative pole.

পূজা।

আমার যা শ্রেষ্ঠতম তাই দিতে আমি
নিত্য আসি তব দ্বারে, হে জগৎস্বামি,

আশাদীপ্ত সমুন্নত শ্লাঘ্যবীরচিতে
তব বরহস্তদত্ত কিরীট লভিতে ;—

আসিয়া দেখি গো প্রাতে প্রভার আধার
রাখিয়াছে তব পদে রক্তপুষ্পভার ;

তৃণ হেরি শিশিরাক্ত তব আগমনে
ধরণী মলয়াঞ্চিত দখিন পবনে ;—

এ সব মহান মাঝে ক্ষুদ্র মোর হিয়া
কেমনে করিব দান,—বারেক ভাবিয়া

হৃতগর্ব্ব অনুদ্ধত নতনম্রমুখে
ফিরিয়া যাইতেছিনু, তখনি সম্মুখে

সিয়া বুঝালে দিয়া নবীন জীবন,—
মারি ত এই সব পূজা-আয়োজন।

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যা

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।*

ভারতে নাট্যবিদ্যা যে এক সময়ে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা প্রচলিত সংস্কৃত নাটকগুলি পাঠ করিলেই সহজে উপলব্ধি হয়। কাল-প্রভাবে, অনেকগুলি নাটক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা অবশিষ্ট আছে য়ুরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের তুলনায় তাহার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হইলেও, গুণগরিমায় জগতের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত উচ্চ-আসন অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন অমূল্য রত্নভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী হইয়াও আমরা ইহার যথার্থ মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝি না; বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবেই হউক বা যে কারণেই হউক, আমাদের রুচি এমনি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, যে আমাদের প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের অকৃত্রিম সরল সৌন্দর্য্য আর আমরা উপভোগ করিতে পারি না। এখন বিদেশীয় য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও ইহার যতটা আদর আছে, আমাদিগের মধ্যে তাহাও নাই। এখনও মধ্যে মধ্যে ফ্রান্স ও জর্ম্মাণি দেশে, তত্তৎ ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত নাটকগুলি আগ্রহ-সহকারে অভিনীত হইয়া থাকে,—আর আমাদের মধ্যে কি দেখা যায়? আমাদের রঙ্গপীঠে বিলাতি ভূতপ্রেতেরাও বরং স্থান পায়, তবু আমাদের সেই প্রাচীন সূত্রধার বিদূষকাদি ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা তাহার ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পায় না। সেই সূত্রধর বিদূষকাদি পাত্র-সমন্বিত শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই জর্ম্মানির প্রসিদ্ধ কবি গত্তে বলিয়াছিলেন:—

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

চাহ কি দেখিতে তুমি অভিনব বরষের
ফুল, আর পরিণত বরষের ফল,
আর সেই সব যাহে, চিত্ত হয় বিমোহিত,
উল্লসিত, ভোগতৃপ্ত, সম্ভোগ-বিহ্বল ;
দেখিতে চাহগো যদি, একটি নামের মাঝে
স্বর্গমর্ত্ত সম্মিলিত দোঁহে একাধারে,
শকুন্তলে! তোর নাম করি আমি উচ্চারণ,
তাহলেই সব বলা হয় একেবারে।(১)

পণ্ডিতবর হরেস উইলসন্, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যের সমালোচনা করিয়া উপসংহারে এইরূপ বলিয়াছেন :—(২) "হিন্দুদিগের এমন অনেকগুলি নাটক আছে যাহা আধুনিক য়ুরোপের অধিকাংশ নাটকের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে।" বৈদেশিকের মুখে ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে।

কোন্ সময় হইতে ভারতে এই নাট্যবিদ্যার অনুশীলন ও প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে জানিবার জন্য স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল উপস্থিত হয় ; কিন্তু এই কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার কোন সহজ উপায় নাই। ভারত-সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্বেরই সময় নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। নানা প্রকার অনুমানের আশ্রয় ব্যতীত, কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর ভর দিয়া এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

(১) "Woulds't thou the young year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed,
Woulds't thou the earth and heaven itself in one sole name combine
I name thee, O Sakuntola ! and all at once is said."

(২) "......much of that of the Hindus may compete successfully with the greater number of dramatic productions of Modern Europe".—H. Wilson—"Theatre of the Hindus."

ভাগ্যে গ্রীকেরা ভারতে আসিয়াছিল, ভাগ্যে তৎকালীন বৃত্তান্ত তাহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাই আজ আমরা ভারত-ইতিহাসের কোন কোন যুগের—বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগের সময় নিরূপণ করিতে কিয়ৎ-পরিমাণে সমর্থ হইয়াছি। কোন্ সময়ে ভারতে নাট্যের আবির্ভাব হয়, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমেই প্রাচীন ভারতের সাহিত্যগ্রন্থাদি ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতে নাট্য-প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, সুত-মাগধেরা শ্লোক-নিবদ্ধ পৌরাণিক আখ্যান সকল পাঠ করিত, কুশীলবেরা বীণা বাদ্যাদি-সহকারে সেই সকল আখ্যান গান করিয়া আবৃত্তি করিত, এবং নটেরা নৃত্য করিত। প্রথমে উহারা কেবল অঙ্গবিক্ষেপ সহকারে নৃত্য করিত; পরে নৃত্যের সহিত যখন গীতের যোগ হইল, তখন উহারা ভাব-প্রকাশ করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নটের এই ভাব-প্রকাশের অভ্যাস হইতেই নাট্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। (১) তাই আমাদের শাস্ত্রে, নৃত্যের এইরূপ লক্ষণ ও ভেদ নিরূপিত হইয়াছে :—

যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে, তত্তাবতের সাধারণ নাম নর্ত্তন। ফল, চিত্ত-রঞ্জক অঙ্গবিক্ষেপের নামই নর্ত্তন। যথা নর্ত্তক-নির্ণয়ে,—

"অঙ্গবিক্ষেপ-বৈশিষ্ট্যং জন-চিত্তানুরঞ্জনং
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা।"

অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা জনচিত্তরঞ্জন যে বিশেষ ব্যাপার নটের দ্বারা প্রদর্শিত হয় তাহাকেই নর্ত্তন বলে। "নাট্যং নৃত্যং—নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতং" নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত নর্ত্তনের এই ত্রিবিধ ভেদ।

"নাটকাদি কথা দেশবৃত্তি ভাব রসাশ্রয়ং
চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ।"

(১) ঐতিহাসিক রহস্য, পৃঃ ৯৪।

অর্থাৎ দেশ, বৃত্তি ভাব-রসাশ্রিত চারি প্রকার অভিনয়ের দ্বারা নাটকাদি কথা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নাট্য বলা যায়।

নৃত্য।—"অপুস্ত সর্ব্বাভিনয় সম্পন্নং ভাবভূষিতং
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোক মনোহরং।"

নেপথ্য বিধানের অধীন নহে, অথচ রস-ভাবাদির দ্বারা বিভূষিত ও সর্ব্ব-প্রকার অভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শিত যে নর্ত্তন তাহাকেই নৃত্য বলে।

এবং "হস্ত পাদাদি বিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গশোভিতং
ত্যক্তাভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জনপ্রিয়ং।"

অভিনয় বর্জ্জিত, চমৎকারজনক অঙ্গবিক্ষেপ বিশেষের নাম নৃত্ত। অতএব দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে নর্ত্তন, নটেরই কাজ ছিল; কেন না, "নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা।" আবার নাট্যশাস্ত্রে আছে,—

"নট ইতি ধাত্বর্থভূতং নাটয়তি লোক বৃত্তান্তং
রসভাব সত্ত্বযুক্তং যস্মাৎ তস্মাৎ নটো ভবেৎ।"

অর্থাৎ, রসভাবযুক্ত লোক-বৃত্তান্ত যে অভিনয় করে সেই নট। অতএব দেখা যাইতেছে, যে নট পূর্ব্বে কেবল নর্ত্তক ছিল, পরে সেই নটই ক্রমে অভিনেতা হইয়া দাঁড়ায়। বোধ হয়, সংস্কৃত "নর্ত্ত" শব্দ প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া নট্ এই আকার ধারণ করিয়াছে। তাই মনে হয়, প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে নাট্যের উদ্ভব হয় নাই।

পণ্ডিতবর ওয়েবর বলেন, ঋগ্বেদে, অথর্ব্ব সংহিতায় ও যযুর্ব্বেদে নৃত্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্ত বেদের মধ্যে কুত্রাপি নট্ শব্দের প্রয়োগ নাই। এই নট্ শব্দ ও নট্ সূত্রের উল্লেখ সর্ব্ব-প্রথম পাণিনির গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। পাণিনি নাট্য-শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন:—"নটানাম্ ধর্ম্ম আম্নায়ো বা"; অর্থাৎ, নটদিগের ধর্ম্ম বা শিক্ষাপদ্ধতি; কিন্তু সে সময়ে নৃত্য ও নাট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য

ছিল কি না, এই ব্যাখ্যা হইতে তাহা কিছুই স্পষ্ট জানা যায় না। পাণিনিতে যে দুই নট্-সূত্র-গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে একটির প্রণেতা "শিলালিন্" এবং অপরটির প্রণেতা "কৃশাশ্ব।" এই দুই নটসূত্রে নৃত্যকলার উপদেশ ছাড়া নাট্য-প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন উপদেশ ছিল কি না তাহা জানিবার উপায় নাই। গোল্ডষ্টুকার ও ভাণ্ডারকারের মতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দিই পাণিনির আবির্ভাব কাল। তখনও শাক্যসিংহ আবির্ভূত হয়েন নাই। কিন্তু সে সময়ে ভরত-নাট্যসূত্র নামে কোন নাট্যসূত্র প্রচলিত ছিল কি না, এবং সে সময়ে নাট্য-প্রয়োগ হইত কি না, তাহারও কোন উল্লেখ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না।

তাহার পর সর্ব্বপ্রথমে, পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে নাট্য-প্রয়োগের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। গোল্ডষ্টুকার ও ভাণ্ডারকার বলেন, বাহ্লিক প্রদেশের যবনরাজ মিন্যাণ্ডার এবং মৌর্য্যরাজ্যের উচ্ছেদকারী ও বৌদ্ধগণের উৎপীড়নকারী পুষ্পমিত্র, পতঞ্জলীর সমসাময়িক। এই যবন-বাহ্লিক রাজ্য খৃঃ পূঃ প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ ন্যূনাধিক সাতান্ন-বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতএব পতঞ্জলী ঐ কালের কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে তাঁহার গ্রন্থে যখন নাট্য-প্রয়োগের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বেও উহা প্রচলিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলে যদিও রঙ্গভূমি, রঙ্গস্ত্রী, নাট্যাগার, নাট্যালয় প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সমস্ত নৃত্য সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত এরূপ অনুমান হয়; কেন না, রামায়ণ ও মহাভারতে সূত্রধার, বিদূষক প্রভৃতি নাটকীয় পারিভাষিক নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—কেবল পাওয়া যায় এক হরিবংশে। ইহাতে রীতিমত নাট্য-প্রয়োগের বর্ণনা আছে। যদিও হরিবংশ মহাভারতেরই অংশ, কিন্তু উহা উত্তরকালে বিরচিত; এই নিমিত্তই উহার নাম "খিল-"হরিবংশ; খিল শব্দের

অর্থ—উত্তরকালে সংযোজিত। হরিবংশে রোমক-মুদ্রা ডিনারিয়াসের অপভ্রংশ দিনার শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খৃষ্টাব্দের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দির কোন সময়ে উহা মূল-মহাভারতের সহিত সংযোজিত হয়। আমরা মহাভারতকে এখন যে আকারে দেখিতে পাই, তাহা প্রক্ষিপ্ত অংশে পরিপূর্ণ; অনেক প্রসঙ্গ উহাতে ক্রমশঃ সংযোজিত হইয়াছে; এমন কি, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, খৃষ্টাব্দের ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত, এই সংযোজন কার্য্য চলিয়াছিল। এখন কথা হইতেছে যদি পতঞ্জলীর সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দিতে নাট্য-প্রয়োগ প্রচলিত থাকে, আর যদি মহাভারতের সংযোজন-কার্য্য খৃষ্টাব্দের চারি শতাব্দি পয্যন্ত চলিয়া থাকে, তাহা হইলে হরিবংশর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতের আর কোন অংশে, নাট্য-প্রয়োগের কিম্বা নাটকীয় পারিভাষিক কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? ইহা একটি বিষম সমস্যার বিষয় সন্দেহ নাই। আমার এইরূপ অনুমান হয়, মূল-মহাভারতের সহিত অবান্তর প্রসঙ্গের সংযোজনা বরাবর সমান ভাবে চলে নাই। যে সময়ে মূল-মহাভারত রচিত হয়, সেই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ নাট্য-প্রয়োগ প্রচলিত ছিল না। এবং আমার বিশ্বাস, মহাভারত ও রামায়ণের সংযোজন-কার্য্য পতঞ্জলীর উত্তর-কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সেই জন্যই সর্ব্বপ্রথমে হরিবংশেই নাট্য-প্রয়োগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। নানা প্রকার অবান্তর প্রসঙ্গ মূল-মহাভারতের সহিত উত্তরকালে কেন সংযোজিত হইয়াছিল, তাহারও একটি সঙ্গত কারণ সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। যতদিন প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধ নরপতি অশোক কিম্বা তাঁহার বংশধরগণের আধিপত্য ছিল, ততদিন বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। তাহার পর যখন মৌর্য্য সেনাপতি পুষ্পমিত্র মৌর্য্যরাজত্ব ধ্বংস করিয়া কাশ্মীর

হইতে মগধ পর্য্যন্ত স্বীয় রাজত্ব বিস্তার করিলেন, তখন হইতে হিন্দুধর্ম্ম আবার প্রবল হইয়া উঠিল। খৃঃ পূঃ ২৫০ বৎসর হইতে কনিষ্কের রাজত্বের আরম্ভ-কাল খৃষ্টাব্দ ৭৮ বৎসর পর্য্যন্ত এই হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়েই ব্রাহ্মণেরা উৎসাহিত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য নানা প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যান মহাভারত রামায়ণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যাহাতে হ্রাস হয়, তৎপক্ষে বিধিমতে চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মতন্ত্রে সার্ব্ববর্ণিক লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, বরং ব্রাহ্মণেরা লোকশিক্ষায় বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া সেই অভাব কতকটা দূর করিয়াছিল; নানা প্রকার লোক-চিত্তহারী আখ্যানাদি বিবৃত করিয়া বৌদ্ধেরা বর্ণ-নিরপেক্ষভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে নীতিধর্ম্ম প্রচার করিতেন। পরে সময়ে সময়ে যখন হিন্দুরাজার আধিপত্য হয় সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধদিগের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধদিগেরই পন্থা অনুসরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মানুগত লোকশিক্ষার নানা প্রকার ব্যবস্থা করেন। সেই সময়েই বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান মূল-মহাভারত রামায়ণের মধ্যে সংযোজিত হয়। এবং দেবদেবী, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতির পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া সেই সময়েই নাট্য-প্রয়োগের আরম্ভ হয়।

সার্ব্ববর্ণিক লোকশিক্ষার উদ্দেশেই যে ভারতে নাট্যবিদ্যার প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা ভরত-নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। নাট্য শাস্ত্রে আছে :—কোন সময়ে অনধ্যায়কালে আত্রেয় প্রমুখ মুনিগণ নাট্য-কোবিদ ভরত মুনিকে নাট্যবেদ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, "সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগের আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ড যখন গ্রাম্যধর্ম্ম-প্রবৃত্ত কামলোভের বশীভূত হইল; ত্রিলোক যখন ঈর্ষা-ক্রোধ-বিমূঢ় ও সুখদুঃখে বিচলিত হইল; দেবাদানব-গন্ধর্ব্ব-

যক্ষ-রক্ষাদির দ্বারা যথন লোকপাল-প্রতিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপ সমাক্রান্ত হইল, তথন ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন, আমরা এমন একটি ক্রীড়নীয়ক পাইতে ইচ্ছা করি যাহা দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়ই হইবে। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া যোগস্থ হইলেন এবং যাহাতে শূদ্রজাতিরও শ্রাব্য হয় এই অভিপ্রায়ে এই নূতন পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন।” বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই, অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধদিগের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা বর্ণ-নিরপেক্ষ লোকশিক্ষার উপায়-স্বরূপ নাটক ও নাট্য-প্রয়োগের সৃষ্টি করেন। নাট্য-প্রয়োগ লোকশিক্ষার কিরূপ উপযোগী এবং তাহার দ্বারা কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতে পারে, তাহাও নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—

“এই নাট্যে কোথাও দ্বন্দ্ব, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও হাস্য, ও কোথাও বা যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তের ধর্ম্ম, কামীর কাম, দুর্বিনীতের নিগ্রহ, ধনাভিমানীর উৎসাহ, অবোধের বিবোধ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, রাজার বিলাস, ও দুঃখার্ত্তের স্থৈর্য্য, নানাবস্থার নানাভাব এই নাট্যে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা লোক চরিত্রের অনুকরণ। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোকেরই কর্ম্ম ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হিতোপদেশ-পূর্ণ। ইহা দুঃখার্ত্তের ধৈর্য্যসম্পাদক ও শোকার্ত্তের সুখজনক। বলিতে কি, ইহা সকলেরই চিত্ত-বিনোদন করিবে। এই নাট্যে যাহা না দৃষ্ট হইবে এমন বিদ্যা নাই, এমন কলা নাই, এমন যোগ নাই; এমন কর্ম্মই নাই।” .

“ মালবিকাগ্নিমিত্র ” নাটকে কালীদাসও গণদাসের মুখদিয়া নাট্য-বিদ্যায় গৌরব এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :—

“দেবের বাঞ্ছিত অতি   নেত্র-তৃপ্তিকর যজ্ঞ
বলে মুণিগণ ;

রুদ্র এরে নিজ-অঙ্গে হর-গৌরী দুই ভাগে
করেন স্থাপন ;
ত্রৈগুণ্য-সমুদ্ভব নানারস-সমন্বিত
লোকের চরিত ইথে হয় প্রদর্শিত ;
নানাবিধ প্রকৃতির ভিন্নরুচি লোক যত
—সবারি সমান প্রিয়, সর্ব্ব-আরাধিত।”

য়ুরোপের প্রধান নাট্য-সমালোচক শ্লেগেল একস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই সকল কথারই যেন প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন “নাট্যালয়ে অনেক কলাবিদ্যা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় ফলোৎপাদন করে ; উচ্চতম ও গভীরতম কবিত্ব, সম্পূর্ণ-সমাপ্ত কার্য্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। বাস্তুবিদ্যা, নানা প্রকার সমুজ্জ্বল ভূষণে উহাকে ভূষিত করে ; চিত্রবিদ্যা, দূর-নৈকট্যের বিভ্রম উৎপাদন করে : সঙ্গীত চিত্রতন্ত্রীতে সুর বাঁধিয়া চিত্তের আবেগ আন্দোলন বর্দ্ধিত করে ; সকল বিদ্যাই উহাতে কিছু না কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকে। কোন-জাতির মধ্যে শত শত বর্ষ হইতে যাহা কিছু সমাজিক উন্নতি, কলা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু বিদ্যা-সম্পদ বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্তই দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে নাট্যালয়ে প্রদার্শিত হয়। তাই, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি উচ্চ, কি নীচ, সকল ব্যক্তির পক্ষেই নাট্য-প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক এবং ইহাই সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতিমাত্রেরই চিত্ত-বিনোদনের প্রধান উপায়। নাট্যালয়েই কি রাজা, কি সেনাপতি, অতীত ঘটনা সকল, তাঁহাদের নিজ কার্য্যের ন্যায় প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন। এবং সেই সকল কার্য্যের অন্তরতম সূত্রস্থান ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। এমন কি, তত্ত্বজ্ঞানীরাও এই নাট্যপ্রয়োগে মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতম চিন্তার বিষয় প্রাপ্ত হন।” লোক শিক্ষাই যে নাট্যপ্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই

যে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিযোগিতার নাট্য-প্রয়োগ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাবিয়া পান না, কি করিয়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ-গঠিত নাট্য-সাহিত্য ভারতে উৎপন্ন হইল। ইহা যে স্বাভাবিক নিয়মে ভারত-ভূমিতেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা তাঁহারা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহেননা। ওয়েবর-প্রমুখ কতকগুলি য়ুরোপীয় পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, যে আমাদের নাট্যকলা দেশের মাটিতে অঙ্কুরিত হইয়া কালসহকারে স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, পরন্তু বিদেশীয় গ্রীকদিগের সংস্রব-প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ওয়েবার এইরূপ অনুমান করেন যখন ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক্ রাজাদের দরবারে গ্রীশীয় নাটকের অভিনয় হইত, সেই সকল অভিনয় দেখিয়া পঞ্জাব ও গুজরাটের হিন্দুদের অনুকরণবৃত্তি উত্তেজিত হয়,এবং এইরূপে হিন্দুনাট্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ওয়েবর সেইসঙ্গে এ কথাও বলিয়াছেন যে, গ্রীশীয় ও হিন্দুনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে কোন আভ্যন্তরিক যোগ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে তাঁহার অনুমানটি কতটা অসার ও ভিত্তিহীন। আসল কথা, সাহিত্য-কলা সম্বন্ধে গ্রীস্ই য়ুরোপের আদিম শিক্ষাগুরু; তাই প্রাচীন গ্রীসের প্রতি তাঁহাদের এতটা অন্ধভক্তি যে, কোন কলা-বিদ্যা গ্রীস ছাড়া আর কোথাও যে স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা তাঁহারা যেন সহসা বিশ্বাস করিতে পারেন না। আবার ডেনিশ্ পণ্ডিত ই-ব্র্যাণ্ডিস্, ওয়েবার অপেক্ষা আর একটু বেশী দূর গিয়াছেন। তিনি বলেন, New Attic Comedyর সহিত হিন্দুনাটক-গুলির আভ্যন্তরিক যোগও দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ উক্ত গ্রীক কমেডি অবলম্বন করিয়া রোমক নাটক-কার প্লৌটাস্ ও টেরেন্স যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদেরই সহিত হিন্দুনাট্যের বিশেষ মিল আছে। এই ডেনিশ্ পণ্ডিতের মত অনুসরণ করিয়া, জর্ম্মাণ

পণ্ডিত উইণ্ডিশ্ (Windish) এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন :—"প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূভাগের মধ্যে অনেক দিন হইতে গতিবিধি ছিল। দুইটি দ্বার দিয়া গ্রীসের বিজ্ঞান-কলা ভারতে প্রবেশ করে ; স্থলপথে বাক্‌ট্রিয়া ও প্যালমাইরা দিয়া, এবং জলপথে অ্যালেকজ্যাণ্ড্রিয়া ও ভারত উপকূলের প্রাচীন বন্দর "বারিগোজা" অর্থাৎ আধুনিক "ব্রোচ" দিয়া। সেই সময়ে, অর্থাৎ ৮০।৮৯ খৃষ্টাব্দে ব্রোচ ও উজ্জয়িনীর মধ্যে সতেজে বাণিজ্য চলিত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক মৃচ্ছকটিকের দৃশ্যস্থল উজ্জয়িনী। এই হেতু উইণ্ডিশ মনে করেন, ভারতীয় নাট্যকলা উজ্জয়িনীতেই প্রথম পরিপুষ্ট হয়, এবং অ্যালেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়া ও উজ্জয়িনীর মধ্যে গতিবিধি থাকা-প্রযুক্তই হিন্দুরা রোমকদিগের নিকট নাট্য-বিদ্যার আভাস পান। খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও ইজিপ্টের সহিত ভারতবর্ষের গতিবিধি ছিল ; কিন্তু খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই রোম ও রোমীয় প্রদেশাদির সহিত গতিবিধি আরম্ভ হয়। সুতরাং নূতন গ্রীক কমেডিগুলি—অন্ততঃ প্লৌটাস ও টেরেন্স সেই সকল কমেডির ছায়া অবলম্বন করিয়া যে নাটকগুলি রচনা করেন, তাহা খুব সম্ভব হিন্দুদিগের গোচরে আসিয়াছিল। সংস্কৃত নাটকের রচনা-পদ্ধতি অনেকটা প্লৌটাস-টেরেন্সের রচনা-পদ্ধতির ন্যায় ; উহাদিগেরই ন্যায় হিন্দু-নাটকগুলি অঙ্কে বিভক্ত, এবং প্রতি অঙ্কের আরম্ভে সংস্কৃত নাটকেও "প্রলোগ" অর্থাৎ প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়। ভারতীয় ও রোমীয় নাটকের আখ্যান-বস্তু, পরিপুষ্টি, উপসংহার, ধরণধারণ অনেকটা এক রকমের।"
মানিলাম, হিন্দু ও রোমকদিগের মধ্যে সে সময়ে গতিবিধি ছিল ; মানিলাম হিন্দু ও রোমক নাটকের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহা হইতে কি করিয়া প্রমাণ হইল যে হিন্দুরাই রোমকদিগের নাট্য-পদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছে, এবং রোমকেরা হিন্দুদিগের নাট্য-পদ্ধতির অনুকরণ করে নাই ? বরং ইহার বিপরীতটাই তো সম্ভব বলিয়া

মনে হয়। শ্লেগেল বলেন, প্লৌটাস টেরেন্সের নাটকগুলি, New Attic Comdyর অর্থাৎ মিন্যাণ্ডার আদিরচিত নূতন গ্রীকনাটকেরই স্বাধীন অনুবাদ—অর্থাৎ ছায়া। শুধু তাহা নহে গত ফেব্রুয়ারি মাসের Ninteenth Century নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি মাসিক-পত্রিকায়, "গ্রীকভাষার অনুশীলন" এই শীর্ষক প্রবন্ধে হর্বার্ট পোল বলেন :—"Terence, most graceful and elegant comedian is now supposed to have simply translated Menander, unless indeed, as some say, he was a mere amanuensis of the real translator, Scipio Africanus. Plautus, who wrote the purest and raciest vernacular, as became a slave, born in the house, is believed to have copied Dippisus and other Greeks as faithfully as Moliere in the Amphitryon, copied him."—অতএব এই লেখকের কথা যদি সত্য হয়, প্লোটাস ও টেরেন্সের নাট্য-রচনা, গ্রীক নিউ কমেডির শুধু ছায়া মাত্র নহে, উহা দাসবৎ অবিকল অনুবাদ। আমরা দেখিতে পাই, নূতন গ্রীক কমেডিতে অঙ্কচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তবে তাহার রোমক অনুবাদকারীরা এই পদ্ধতি কোথা হইতে পাইলেন? নিশ্চয় তাহা হইলে হিন্দুদিগের নিকট হইতেই পাইয়াছেন বলিতে হইবে। কেন না, যাহারা কেবল অনুবাদকারী, তাহাদের দ্বারা নূতন কিছু উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব নহে। জর্ম্মাণ পণ্ডিত Windish, আর এক কথা বলেন :—মৃচ্ছকটিকে যেরূপ বিদূষক, বিট, ও শকার দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীক কমেডিতেও তাহাদেরই অনুরূপ Servus currens, Parasitus edas ও Miles gloriosus, নামক পাত্রাদি দৃষ্ট হয়। তিনি আরও বলেন, যে সময় রোমকদিগের সহিত হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল, প্রায় সেই সময়কার নাটকেই, বিদূষকাদির উল্লেখ

পাওয়া যায়, ভবভূতীর নাটকাদিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু Windish সাহেব বোধ করি জানেন না, যে শৃঙ্গার-রস-প্রধান নাটকেই বিদূষকাদি পাত্রের অবতারণা প্রশস্ত, করুণ-রস ও বীর-রস-প্রধান নাটকে উহাদের অবতারণা আমাদের নাট্যশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তা ছাড়া, অ্যালেকজ্যাণ্ডারের পরবর্ত্তী কালে নূতন গ্রীককমেডির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়েই হিন্দুদিগের সহিত ব্যাক্‌ট্রিয়া অর্থাৎ বাহ্লিকস্থ গ্রীকদিগের গতিবিধি ছিল; অতএব তাঁহারা যে আমাদের নাটকের অনুকরণে বিদূষকাদির ন্যায় পাত্র-সমূহ তাঁহাদের নাটকে সন্নিবেশিত করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এই স্থলে মূল নিউকমেডির উল্লেখ করিলাম—কেন না, প্লোটাস্ ও টেরেন্সের রচনাগুলি, নিউকমেডিরই হুবহু নকলমাত্র।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হরিবংশে রোমক মুদ্রা দিনারের উল্লেখ পাওয়া যায়; অতএব যে সময়ে রোমদিগের সহিত হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল, সেই সময়েই যে হরিবংশ মূল-মহাভারতের সহিত সংযোজিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই হরিবংশে আমরা নাট্য-প্রয়োগের যেরূপ বর্ণনা পাই তাহাতে কি মনে হয়, সূত্রধর, বিদূষক প্রভৃতি নাটকীয় পাত্রগণ কোন বিদেশীয় জাতি হইতে গৃহীত হইয়া নাট্যে সদ্য প্রবর্ত্তিত?—না উহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে? শচীনাম্নী একটী হংসী, দৈত্যরাজ বজ্রনাভের নিকট এইরূপ বলিতেছে:—

"রাজন!—এক নটকে দেখিলাম, তিনি এক মুনির বর-প্রসাদে কামরূপী, সকলের প্রিয় ও নৃত্যকলাভিজ্ঞ হইয়া কখন উত্তরকুরু, কখন কলাপদ্বীপ, কখন ভদ্রাশ্ব, কখন কেতুমাল, কখন বা অন্যান্য স্থান, এইরূপ ত্রিভুবন বিচরণ করিতেছেন।" বজ্রনাভ কহিল "হংসি, অল্প দিন হইল, আমি সিদ্ধচারণ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রমুখাৎ ঐ নটের কথা অনেক শুনিয়াছি। তাঁহাকে দেখিবার জন্যও আমার ঔৎসুক্য

জন্মিয়াছে। যাহাতে সে আমার গুণাবলী শ্রবণ করিয়া এখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়, তুমি তাহাই কর।” হংসী কহিল, “দৈত্যরাজ! নটেরা স্বভাবতই গুণহার্য্য। মহারাজের গুণাবলী তাহার কর্ণগোচর হইলে অবশ্যই তাহাকে আপনার নগরে আগমন করিতে হইবে।” হংসী এই কথা কহিলে, বজ্রনাভ পুনরায় কহিল, “তবে যাহাতে সে আমার নগরে আগমন করে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর।” বজ্রনাভ আপনার কার্য্য উদ্দেশে হংসদিগের বিদায় দিলে, তাহারা দেবেন্দ্র ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্নের প্রতি বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতী-পরিণয় এবং বজ্রনাভ-বিনাশ, এই দুই কার্য্যের ভার প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি মায়াদেবীর প্রভাবে, যাদবগণকে নটবেশে সজ্জীভূত করিয়া প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যুম্ন নায়ক, শাম্ব বিদূষক, গদ ও অন্যান্য যাদবগণ পারিপার্শ্বিক, এবং বারবনিতাগণ নটীবেশে সজ্জীভূত হইয়া প্রদ্যুম্ন-বিহিত রথে অধিরোহণ পূর্ব্বক দেবগণের কার্য্য-সাধনার্থ প্রস্থান করিলেন। যথাকালে তাঁহারা দানবাকীর্ণ বজ্রপুরের সুপুর নামক উপনগরে উপস্থিত হইলেন। নট আসিয়াছে এই কথা শুনিয়া সুদূরবাসী দানবদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নটের বেশ-বিন্যাস জন্য তাহারা রাশি রাশি রত্ন প্রদান করিল। তাহার পর নট রঙ্গভূমিতে নৃত্য আরম্ভ করিলে পুরবাসীদিগের আর আহ্লাদ রাখিবার স্থান রহিল না। নৃত্যের পর, মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক নাটক আরম্ভ হইল। যখন এক একটি অংশ অভিনয় হইতে লাগিল, তখন দৈত্যেরা উঠিয়া মহানন্দে চীৎকার আরম্ভ করিল এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র, কণ্ঠী, বলয় ও বৈদূর্য্য-বিভূষিত হেমময় হার প্রভৃতি নানা উপহার প্রদান করিতে লাগিল। অর্থলাভের পর, যাদবগণও সঙ্গীত মধ্যে মুনি ও অসুরগণের নাম ও গোত্র নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর

ঐ উপনগর-নিবাসী দানববৃন্দ সেই সুনিপুণ নটের আগমনবার্ত্তা দানবেন্দ্রের কর্ণগোচর করিলে, দানবরাজ আনন্দিত হইয়া কহিল, "শীঘ্র তাহাকে পুরী মধ্যে আনয়ন কর।" আজ্ঞা মাত্র, উপনগর-নিবাসী দানবগণ নটবেশধারী যাদবদিগকে বজ্রপুরে লইয়া গেল। তখন দানব রুদ্র-মহোৎসব উপলক্ষ্য করিয়া সৈনিকদিগকে নাটকাভিনয় দর্শন করিতে আহ্বান করিল। অনন্তর সমাগত নট, সুন্দররূপে বিশ্রাম করিলে, তাহাদিগকে রত্নাদি প্রদান করিয়া নাটকাভিনয় করিতে আজ্ঞা করিল, এবং রঙ্গভূমির নিকটে যবনিকা মধ্যে অন্তঃপুরচারিনীদিগকে সংস্থাপন করিয়া, স্বয়ং জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নাটকাভিনয় দর্শনে সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। অনন্তর অদ্ভুত-কঠোর-কর্ম্মা যাদবগণ নেপথ্যবিধি সমাপনান্তে রঙ্গভূমে আসিয়া নৃত্যের উদ্যোগ করিলেন। প্রথমত বেণু, মুরজ, আনক এবং তন্ত্রীবদ্ধ বীণা সকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর বারবনিতাগণ গান্ধার, ছালিক্য প্রভৃতি অমৃতায়মান, শ্রবণ-সুখকর সঙ্গীত সকল গান করিতে আরম্ভ করিল। নিষাদ, ঋষভ ও গান্ধারাদি সপ্তস্বর, এবং মূর্চ্ছনা সহকারে গঙ্গাবতারণ নামক সঙ্গীত সমালোচিত হইতে লাগিল। তাল-লয়-সংযুক্ত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে দানবগণের আনন্দ সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। প্রদ্যুম্ন, গদ ও শাম্ব, নটবেশে নন্দিবাদ্য বাদন করিতে লাগিলেন। নন্দিবাদ্য (আখড়াই) শেষ হইলে প্রদ্যুম্ন অভিনয়ের সহিত গঙ্গাবতারণ গান মিশ্রিত শ্লোকপাঠ আরম্ভ করিলেন। প্রদ্যুম্নের মাথায় কৈলাশ পর্ব্বত কল্পিত হইল। তাঁহাদিগের পাদোত্তোলন পূর্ব্বক নৃত্য ও অভিনয়ে দানবগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না।"

এই নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, নাট্যকলা তখনও অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিত অবস্থায় ছিল; ইহার নৃত্যভঙ্গী ও ধরণধারণে যেরূপ গ্রাম্য-সরলতা লক্ষিত হয়, তাহাতে ইহা মৃচ্ছকটিকেরও পূর্ব্বে

রচিত বলিয়াই মনে হয়। ভারতে নাট্যকলার কিরূপ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহার যেন একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আভাষ পাওয়া যায়। অভিনয়-সহকারে নৃত্য, অভিনয়-সহকারে গান-মিশ্রিত শ্লোক পাঠ, এবং বিদূষকাদি পাত্র সমন্বিত প্রকৃত নাট্যপ্রয়োগ, এই তিনই ইহাতে দৃষ্ট হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মৃচ্ছকটিক নাটককে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সমস্ত অনুমান-যুক্তি বিন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রধার-বিদূষকাদি নাটকীয় পাত্রগণ মৃচ্ছকটিকে যে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহা মৃচ্ছকটিক-পাঠে এবং হরিবংশের এই নাট্য-বর্ণনা পাঠে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়।

ইতিপূর্ব্বে আমি তর্কস্থলে বলিয়াছিলাম, গ্রীকদিগের নিউকমেডির অনুবাদকারী প্লেটাস ও টেরেন্স প্রণীত নাটকের অঙ্কচ্ছেদ-পদ্ধতি, প্রস্তাবনা ও পাত্রাদি আমাদের প্রাচীন নাট্য-পদ্ধতি হইতেই গৃহীত; কিন্তু আমার আন্তরিক বিশ্বাস, বস্তুতঃ কেহ কাহারও অনুকরণ করে নাই। কি গ্রীস, কি ভারত, উভয় দেশেরই নাট্যকলা স্বাভাবিক প্রয়োজনের উত্তেজনায়, উভয় দেশেই স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। মানব চরিত্র সর্ব্বত্রই সমান। বিদূষক, বিট ও শকারের ন্যায় লোক সকল দেশেই বর্ত্তমান। সেইজন্য, রোমীয় নাটকে যদি অমরা ঐরূপ কোন পাত্র দেখিতে পাই, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ দেখা যায় না। সকল দেশের সাহিত্যের মধ্যেই, কোন না কোন অংশে পরস্পরের ছায়া ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, এবং কোন কোন অংশে ঐরূপ সাদৃশ্য দেখিলেই, তাহা অপর কোন জাতির অনুকরণ বলিয়া সহসা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহার দৃষ্টান্ত, ভবভূতীর উত্তর চরিতে, "নাটকের মধ্যে নাটক আছে"; সেক্‌সপিয়রের হ্যম্‌লেটেও তাহাই আছে। ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীর লোক, সেক্‌সপিয়র ষোড়শ শতাব্দীর

লোক। সেই ষোড়শ শতাব্দীতে, দুই একজন ইংরাজ এদেশে যে না আসিয়াছিলেন এমন নহে; এমন হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে সেক্‌সপিয়রের কোন বন্ধু ছিলেন। তিনি এই নাট্য-কৌশলটি ভারতবর্ষে অবগত হইয়া, দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বন্ধুর নিকট গল্পচ্ছলে প্রকাশ করেন এবং সেক্‌সপিয়র তদনুসারে এইরূপ দৃশ্য তাঁহার নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ কাকতালীয় যুক্তি উইণ্ডিশ্-প্রমুখ পণ্ডিতগণের যুক্তি-প্রণালীরই অনুরূপ। আসল কথা ধরিতে গেলে, প্লোটাস্ ও টেরেন্‌সের রচনার সহিত মৃচ্ছকটিকের অবান্তর বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

উক্ত রোমক নাট্যকারদিগের রচনা লঘুধরণের কমেডি মাত্র। কিন্তু মৃচ্ছকটিক নাটককে, কমেডি বলিব কি ট্রাজেডি বলিব, ভাবিয়া সহসা স্থির করা যায় না। উহাতে এক দিকে যেমন হাস্য-পরিহাস, আর এক দিকে তেমনি কারুণ্য-বিলাপ, এক দিকে যেমন নীচ ক্ষুদ্র চরিত্রের বর্ণনা, অপরদিকে তেমনি সদাশয় মহৎ চরিত্রের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এক কথায় উঁহা ঠিক কমেডিও নহে, ট্রাজেডিও নহে। যদি য়ুরোপীয় আদর্শ-অনুসারে কোনও শ্রেণীর মধ্যে উহাকে পরিগণিত ~~করিতে হয়,~~ তাহা হইলে উহাকে সেক্‌সপীয়র কৃত ইংরাজি নাটকাদি, কিম্বা স্পেন দেশীয় নাটকাদির ন্যায় Romantic—অর্থাৎ মিশ্র জাতীয় নাটক শ্রেণীর মধ্যে ধরা যাইতে পারে। আমাদের অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকই এই ধরণের। সেইহেতু প্রসিদ্ধ জর্ম্মান্ পণ্ডিত শ্লেগেল্, Sir William Jones-কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলার ইংরাজি অনুবাদ যখন প্রথম পাঠ করেন, তখন উহা সংস্কৃত নাটকের যথাযথ অনুবাদ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই; তিনি মনে করিয়াছিলেন, সেক্‌সপীয়রের রচনার প্রতি সার উইলিয়াম্ জোন্‌সের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার অনুবাদটিও সেক্‌সপীয়রের ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

তাহার পর যখন অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ অনুবাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, তখনই তাঁহার প্রত্যয় হইল। যদি ঘটনাক্রমে সেক্‌সপীয়র ও কালিদাস সমসাময়িক হইতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে গতিবিধির কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তিনিও Windisch প্রভৃতির ন্যায় নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করিতেন যে, কালিদাসের শকুন্তলা সেক্‌সপীয়রের অনুকরণে লিখিত।

অলঙ্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মধ্যে ভরত কৃত নাট্যশাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতেও দশরূপকের ভেদ ও সূত্রধার বিদূষকাদির লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। নাট্য সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা আর কোন অলঙ্কারশাস্ত্রে নাই। এই নাট্যশাস্ত্র কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার কতকটা আভাব পাইলে, জানিতে পারা যায়, তাহারও কতটা পূর্ব্ব হইতে সম্ভবতঃ ভারতে নাট্য-সাহিত্য ও নাট্য-প্রয়োগের আরম্ভ হইয়াছে। ভরত মুনিই নাট্যবিদ্যার প্রবর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব-বেদের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অথচ মহাভারতাদিতে ভরত মুনির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক তিনি যে একজন সুনিপুণ অভিনেতা ও প্রতিভাশালী নাট্যাচার্য্য ছিলেন তাহা নাট্যশাস্ত্রে ভরত-সংজ্ঞার যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই উপলব্ধি হয়। ভরত মুণির শিষ্যগণ ভরত নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। "ভরতাশ্রয়াচ্চ ভরতঃ" :—

"ধূর্য্যবদেকো যস্মাদ্ধারোহনেক ভূমিকাযুক্তঃ
ভাণ্ডগ্রহোপকরণৈর্নাট্যং ভরতো ভবেত্তস্মাৎ।"

বৃহৎ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, ধূর্য্যবান্ হইয়া, একাকী যিনি বহু ভূমিকাযুক্ত নাট্য, ভাণ্ডগ্রহ উপকরণ দ্বারা, অর্থাৎ সাজসজ্জার দ্বারা প্রদর্শন করেন তিনিই ভরত।

ভরত মুণির নাট্য-সূত্র অবলম্বন করিয়া, যে-নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থ কোন এক

সময়ে প্রণীত হয়, তাহাই অধুনা ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র নামে খ্যাত। ভরতের নাট্য-সূত্র বলিয়া আর কোন পৃথক গ্রন্থ ছিল কি না, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নাট্য-শাস্ত্রটীও একটি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীনত্বের একটা নিদর্শন এই, উহার গীতাধ্যায়ে রাগ-রাগিণীর কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তবু ইহা হইতে বুঝা যায় না, ইহা কত প্রাচীন; কেন না আমাদের কোন প্রাচীন নাটকেই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে এই গ্রন্থটা দুষ্প্রাপ্য ছিল; পণ্ডিতবর ওয়েবার অন্যান্য অলঙ্কার-গ্রন্থে ইহার কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত দেখিয়াছিলেন এবং দশ-কুমারের প্রকাশক "হল" সাহেব ইহার ৪ অধ্যায় মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র।

এতদিনের পর সৌভাগ্যক্রমে-সপ্তত্রিংশ-অধ্যায়যুক্ত এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বোম্বাই নগরীর নির্ণয় সাগর-যন্ত্রের প্রসাদে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রাচীন নাট্য-বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। আপাততঃ নাট্যকলার উৎপত্তি ও আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কি কি তত্ত্ব উদ্ধার করা যাইতে পারে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। প্রথমে দেখা যাউক, এই গ্রন্থখানি কোন্ সময়ে রচিত। ইহার একস্থলে উক্ত হইয়াছে—

"উৎসার্য্যানি ত্বনিষ্টানি পাষণ্ডাশ্রমিনঃ স্তথা
কাষায় বসনাশ্চৈব বিকলাশ্চৈব নরাঃ"।

অর্থাৎ "অনিষ্ট সমূহ এবং কাষায়বসন পাষণ্ডাশ্রমী ও বিকল মনুষ্য-দিগকে নাট্যমণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত করিবে।"

আর এক স্থলে আছে :—

"যাবত্তং পূরয়েদ্দেশং ধ্বনি-র্নাট্য সমাশ্রয়ঃ
ন স্থাস্যন্তি হি রক্ষাংসি তং দেশং ন বিনায়কাঃ"।

"যাবৎ কোন দেশ নাট্য-সমাশ্রিত ধ্বনির দ্বারা পূরিত হইবে,

তাবৎ সে দেশে রাক্ষসেরাও থাকিবে না, বিনায়কেরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরাও থাকিবে না।”

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই নাট্য-শাস্ত্র বৌদ্ধযুগে রচিত। শুধু তাহা নহে, যে সময়ে কোন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজার রাজত্ব ছিল, ইহা সেই সময়কার গ্রন্থ। ইতিহাসে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ সময়েই হিন্দু ও বৌদ্ধগণ, এখনকার শাক্ত বৈষ্ণবাদিগের ন্যায় পাশাপাশি থাকিয়া নির্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত; তবে যে সময়ে কোন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, সেই সময়েই কিছুকালের জন্য বৌদ্ধদিগের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ হইত। এমন কি, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কাশ্মীরের শক-রাজা কনিষ্কের বংশধর নৃপতিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম-নর যিনি আনুমানিক ১৯০ খৃষ্টাব্দে, মুকুল যিনি ২৫০ খৃষ্টাব্দে এবং মিহিরকুল যিনি ২৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন—ইহাদের নাম করা যাইতে পারে। প্রচলিত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেই মৃচ্ছকটিক খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দিতে রচিত বলিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। সেই মৃচ্ছকটিক নাটকে দেখা যায়, সে সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব বড় একটা ছিল না—প্রত্যুত সে সময়ে জনসাধারণ হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বৌদ্ধনীতির পক্ষপাতী ছিল। তাই মনে হয় এই গ্রন্থখানি মৃচ্ছকটিকের কিছু পূর্ব্বে রচিত—বহুপূর্ব্বে রচিত নহে। কেন না “দর্দ্দুর”* নামক বাদ্যযন্ত্র যাহা মৃচ্ছকটিকের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা এই নাট্য-শাস্ত্রেও আতোদ্যের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। এই দর্দ্দুর বাদ্য-যন্ত্রের উল্লেখ আর কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় না, এমন কি হরিবংশেও পাওয়া যায় না।

যাবত্তং পূরয়েদ্দেশং ধ্বনি র্নাট্য-সমাশ্রয়ঃ

ন স্থাস্যন্তি হি রক্ষাংসি তং দেশং ন বিনায়কাঃ।

"যাবৎ নাট্য সমাশ্রিত-ধ্বনি কোন দেশে থাকিবে, তাবৎ সেই দেশে বিনায়কেরা থাকিবে না" এই শ্লোকটি যাহা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে; তাহা হইতে হিন্দুদিগের মধ্যে বৌদ্ধ-বিদ্বেষের আর একটি সহজ কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। সে কারণটি এই, বৌদ্ধগণ নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদির বিরোধী ছিলেন। শাক্যসিংহ ভিক্ষুগণকে যে দশটি উপদেশ দেন, তাহার মধ্যে একটি উপদেশ এই যে (১)"নাট্য-ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে।" বৌদ্ধগণ যে নাট্যসঙ্গীতাদির বিরোধী ছিলেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই, তির্ব্বৎপ্রদেশে বৌদ্ধ-দিগের পুস্তকাগারে কালীদাসের কাব্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকের অনুবাদ পাওয়া যায় না। মৃচ্ছকটিকের পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকগুলি যে বিলুপ্ত হইয়াছে, শকদিগের আক্রমণ, ম্লেচ্ছদিগের আক্রমণ, রাজ্যবিপ্লবাদি ছাড়া, নাট্যসঙ্গীতাদির প্রতি বৌদ্ধ-দিগের অনাদরও বোধ হয় অন্যতর কারণ। এবং এইরূপ নাট্য-সঙ্গীতাদির প্রতি বৌদ্ধদিগের বিরাগ ও বিদ্বেষ, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রথম যুগের মধ্যে হওয়াই সম্ভব। কেন না, বৌদ্ধধর্ম্মের শেষযুগে এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশ বড় একটা রক্ষিত হয় নাই। তাই মনে হয়, এই নাট্যশাস্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগেরই গ্রন্থ।

এই নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থ হইতে আর একটি তথ্য এই জানা যায়, যে সময়ে বাহ্লীক অর্থাৎ ব্যাক্‌ট্রিয়া প্রদেশে গ্রীকেরা রাজ্য স্থাপন করে, সেই খৃঃ পূঃ সার্দ্ধ দুই শতাব্দীর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কেন না, নাট্যশাস্ত্রের আহার্য্যাভিনয়-অধ্যায়ের এক স্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—

(১) ঐতিহাসিক রহস্য।

"শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবা বাহ্লিকাশ্রয়া
প্রায়েন গৌরাঃ কর্ত্তব্যা উত্তরাং পশ্চিমাং দিশাম্"।

অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমদিকস্থ শক পহ্লব ও বাহ্লিকাশ্রিত যবনাদিগের প্রায় গৌরবর্ণ করাই কর্ত্তব্য। এই যবন ও শকশব্দে বাহ্লিকদেশস্থ গ্রীক ও ভারতবর্ষ-আক্রমণকারী জাতীই বুঝায়। গ্রীকদিগের এই বাহ্লিক রাজ্য খৃঃ পূঃ প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ সাতান্ন বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যবন কাম্বোজ ও পারদ জাতির সহিত শক ও পহ্লব নামক দুইটি জাতির নাম নানা সংস্কৃত গ্রন্থে একত্র লিখিত হইয়া থাকে। উহারা সকলেই ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর নিবাসী লোক। খৃষ্টাব্দের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করিয়া ক্রমশ উত্তরে, হিন্দুকোঃ পর্ব্বত হইতে দক্ষিণে, সিন্ধু নদীর মোহানা পর্য্যন্ত, আপনাদের অধিকার বিস্তার করে।(১)

এই গ্রন্থে যখন শক যবনের উল্লেখ আছে, তখন এই গ্রন্থখানি খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দিরও উত্তরকালে লিখিত ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে। তা ছাড়া, এই গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত "সুরঙ্গ" শব্দ হইতে জানা যায়, গ্রীকদিগের আগমনের অনেক পরে এই গ্রন্থখানি লিখিত। এই সুরঙ্গ শব্দটি গ্রীক শব্দ Syrenx হইতে উৎপন্ন। অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসরের কমে এই বিদেশীয় শব্দটী সংস্কৃতের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। অতএব শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলেও প্রতিপন্ন হয়, এই গ্রন্থখানি খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের শেষভাগে কিম্বা খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে রচিত হইয়াছিল।

"রঙ্গদৈবত পূজা বিধান" নামক নাট্যশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আর একটী তথ্য এই জানা যায়, নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মিত হইলে যথাবিধি সমস্ত পূজা সমাপ্ত করিয়া অবশেষে জর্জরের পূজা অর্থাৎ ইন্দ্রধ্বজের পূজা

(১) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত উপাসক-সম্প্রদায়।

হইত। এমন কি, অভিনয়ের পূর্ব্ব-রঙ্গে, রঙ্গপীঠে যখন সূত্রধার প্রবেশ করিবে তখন তাহার একজন পার্শ্বিককে "জর্জ্জর" বংশখণ্ড হস্তে লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে—এইরূপ নাট্যশাস্ত্রে বিধান আছে। এই ইন্দ্র-ধ্বজের উৎসব বর্ষারম্ভে ভারতের পশ্চিম প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। কনিষ্ক যিনি কাশ্মীরের প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজত্ব করেন তাঁহার সভা-কবি অশ্বঘোষ-প্রণীত বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্যের কোন কোন অংশে, উপমাস্থলে এই ইন্দ্রধ্বজের উল্লেখ আছে। অতএব ইহা হইতেও কতকটা প্রমাণ হয়, এই গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এই নাট্য-শাস্ত্রে যখন দশ প্রকার রূপকের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, এবং অভিনয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ঐ গ্রন্থ-সূচিত নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যকলা এইরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে যে অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর লাগিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নাট্যমণ্ডপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে—"ব্রহ্মা কহিলেন, সম্প্রতি ইন্দ্রধ্বজোৎসব উপস্থিত, এই অবসরে তুমি (ভরত) এই নাট্যাখ্য বেদ প্রদর্শন কর। তখন আমি "অসুর পরাজয়" অভিনয় আরম্ভ করিলাম। উহার প্রথমে আশীর্ব্বাদ-সংযুক্তা অষ্টপদা নান্দী রচনা করি। ঐ অভিনয়ে দৈত্যেরা যেরূপ দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, তাহার একটা অনুকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ফলতঃ এই নাট্যযোগ দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে নানারূপ উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এক উৎকৃষ্ট ধ্বজ, ব্রহ্মা কুটিলক, বরুণ ভৃঙ্গার, সূর্য্য ছত্র, বায়ু চামর, বিষ্ণু সিংহাসন ও কুবের মুকুট প্রদান করিয়াছেন। * * * * কিন্তু তৎকালে সভাস্থলে অসুরেরা অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং কহিল, আমরা এইরূপ নাট্য দর্শন করিতে কিছুতেই ইচ্ছুক নহি, চল সকলে প্রস্থান করি। এই বলিয়া উহারা তৎক্ষণাৎ মায়াবলে আমাদের বাক্য

দেহ-চেষ্টা স্মৃতি ও নৃত্য স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। ইন্দ্র সূত্রধারের সমস্ত প্রয়াস বিধ্বস্ত দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন. সমস্ত সভাস্থল বিঘ্নব্যাপ্ত; এবং সূত্রধার ও অন্যান্য পাত্রগণ সংজ্ঞাহীন ও স্তব্ধ। পরে তিনি ক্রোধাবেগে শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া ধ্বজ গ্রহণ করিলেন এবং রঙ্গপীঠ-গত বিঘ্ন ও অসুরগণকে দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দৈত্যেরা কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। উহারা প্রায়ই নাট্যের বিঘ্নাচরণ করিতে লাগিল। তখন আমি পুত্রগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিলাম, ভগবন্ নাট্যে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে ইহার রক্ষা হয় আপনি তাহার উপায় বিধান করুণ।

অনন্তর ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ধীমন্ তুমি যত্নসহকারে একটি নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহার আদেশে শীঘ্র এক বিশাল নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব, আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে সমস্তই প্রস্তুত করিয়াছি। আপনি আসিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুণ। তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত নাট্যমণ্ডপ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং যমকে উহার দ্বারদেশে রাখিয়া অপরাপর দেবতাদের উহার নানাস্থান রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তখন দেবতারা কহিলেন; ভগবন্, ব্রহ্মা অসুরদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য বিঘ্নাচরণ করিতেছ। অসুরেরা কহিল, আপনি দেবগণের ইচ্ছাক্রমে যে নাট্যবেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের তুষ্টির জন্য উহাতে আমাদের অবমাননা করা হইয়াছে। দেবগণের ন্যায় আমাদের প্রতিও আপনার সমদৃষ্টি থাকে এক্ষণে আমরা এই টুকু প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, অসুরগণ, তোমরা রুষ্ট হইও না, বিষাদ পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের ও দেবতাদের কর্ম্মভাব ও বংশ পর্য্যালোচনা

করিয়া এই নাট্যবেদ রচনা করিয়াছি ; ইহাতে কেবল যে তোমাদের ভাবানুবন্ধ আছে তাহা নহে—ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোকের ভাবানুকীর্ত্তনই এই নাট্য।”

যাহা হউক, নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র হইতে এই টুকু সার সংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, সার্ব্বর্ণিক লোক শিক্ষার উদ্দেশেই ভরত মুণি, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগে, নাট্যবিদ্যার প্রয়োগ, ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন ; এবং ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের সময় ভারতের পশ্চিম প্রদেশেই নাট্য-প্রয়োগের প্রথম আরম্ভ হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রমাসুন্দরী।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবগোপালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রমার পিতামাতা দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন,—নবগোপালের অনুরোধবশতঃ লছমীকে তাঁহারা রমার পরিচর্য্যায় রাখিয়া গিয়াছেন।

অমৃতসর স্থানটা নবগোপালের বেশ ভাল লাগিয়াছে। সে এখন কিছুদিন এইখানেই থাকিবার বাসনা করিয়াছে। বাড়ীটা মাস হিসাবে ভাড়া করিয়া লইয়াছে।

বিবাহের পর এক সপ্তাহকাল এই নবদম্পতির সহর দেখিয়াই কাটিল। প্রাতে স্নান ও কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, গাড়ী করিয়া দুইজনে সহর দেখিতে বাহির হইত,—মুকুন্দলাল কোচবাক্সে বসিয়া যাইত।

রেবার সাহেবের মন্দির,—বিবিধ মঠ,—শালের কারখানা,—সরকারী বাগান,—গোবিন্দগড় কেল্লার ভগ্নাবশেষ এই সকল একে একে তাহারা দেখিয়া ফেলিল। নবগোপাল পূর্ব্বে পশ্চিমে অনেকবার ভ্রমণে আসিয়াছে, কিন্তু রমার বঙ্গদেশের বাহিরে এই প্রথম পদার্পণ। নানাবিধ নূতন দৃশ্যাদি দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ আর ধরে না। এ কয়েক দিন তাহার সাহচর্য্যে,—তাহার তরুণহৃদয়ের সজীব মধুরতায় নবগোপাল আত্মীয়-বিচ্ছেদজনিত সমুদয় ক্লেশ প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের এক সপ্তাহ পরে একদিন অপরাহ্লকালে রমা ও নবগোপাল শয্যাকক্ষসংলগ্ন ছায়াময় বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। সে দিন প্রভাতে গদাধরের নিকট হইতে তাঁহাদের গ্রামে পৌঁছিবার সংবাদ আসিয়াছে। গদাধর গৃহদাহের বিবরণ সমস্তই লিখিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া নবগোপালকে নিষেধ করিয়াছেন যেন সে রমাকে এ সংবাদ না দেয়, কারণ বিদেশে বালিকা শুনিয়া অনর্থক দুশ্চিন্তান্বিত হইবে; সুতরাং নবগোপাল পত্রের এই অংশ গোপন করিয়া অপর সমুদয় অংশ পড়িয়া রমাকে শুনাইয়াছে।

রমা তাহার পিতার পত্রখানি সস্নেহে বারম্বার কর[illegible]রণ করিয়া বলিল—"আমি যদি পড়্‌তে পারতাম ত বেশ হত।"

নবগোপাল শুনিয়া বলিল—"রমা, তুমি লেখাপড়া শিখবে?"

রমা অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে তাহার সম্মতি জানাইল।

নবগোপাল বলিল—"তবে আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক্।"

একখানি প্রথম ভাগ কোথায় পাওয়া যায়? বঙ্গদেশের ক্ষুদ্রতম গ্রামেও যে দ্রব্য প্রতিদিন প্রাপ্তব্য, এ সুদূর পশ্চিমে শত চেষ্টাতেও তাহা হয়ত পাওয়া যাইবে না। কিন্তু উৎসাহ নূতন, বাধা মানিল না। নবগোপাল তাহার তোরঙ্গ হইতে একটি জুতা-জড়ান বাঙ্গলা সংবাদ-

পত্রের ছিন্নাংশ সন্ধান করিয়া আনিল। তাহার কলেবর হইতে এক একটি করিয়া অক্ষর বাছিয়া রমাকে চিনাইয়া দিতে লাগিল। সেই অপরাহ্নেই রমা ক-বর্গ ও চ-বর্গের প্রায় সমুদয় অক্ষরই আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

পরদিন একখানি প্রথম-ভাগের সন্ধানে নবগোপাল ভূপেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভূপেন্দ্র বলিল এখানে বাঙ্গলা প্রথম-ভাগ পাওয়া কঠিন,—কলিকাতা হইতে আনাইয়া লওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। ঠান্‌দি বলিলেন—"তোমার বউ ক খ শিখবে ত? তার জন্যে ভাবনা নেই, তার উপায় আমি করে দিচ্চি। আমার কাছে একখানি শিশুবোধ আছে, তাতে ক খ, আঙ্ক, আস্ক সব আছে। এইখানি নিয়ে যাও আপাতক, আর কলকাতায় চিঠি লেখ বই আনাবার জন্যে। কিন্তু তোমার বই এলেই আমার শিশুবোধ খানি দিয়ে যেও দাদা—ওতে একটি গঙ্গার স্তব আছে, সে আর কোথার পাওয়া যায় না।"

নবগোপাল বহি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এই শিশুবোধ খানি দেখিয়া তাহার জননার কথা বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহারও পূজার স্থানে চৌকীখানির উপর নিত্যকর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তকের সহিত এক একখানি শিশুবোধ সযত্নে রক্ষিত আছে;—সেও এই গঙ্গার স্তবটির জন্য।

সেদিন বাড়ী গিয়া নবগোপাল সন্ধ্যাকালে তাহার মাতাকে একখানি পত্র লিখিল। সে যখন পত্র লিখিতে ব্যাপৃত ছিল, তখন রমা আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। সে যে কয়েকটি অক্ষর চিনিয়াছিল, তাহার কোনওটি পত্রের কলেবরে পাওয়া যায় কিনা, তাহাই সে বিশেষ মনোযোগের সহিত অন্বেষণ করিতে লাগিল।

নবগোপালের লেখা সমাপ্ত হইলে রমা জিজ্ঞাসা করিল—"চিঠি কাকে লিখ্‌ছ গো?"

নবগোপাল অন্যমনে বলিল—"আমার মাকে।"

রমা একটু দুঃখিত স্বরে বলিল—"তোমার মাকে?"—'তোমার' টার উপর একটু জোর দিয়া বলিল।

নবগোপাল সহসা তাহার নববধূর মুখ খানির প্রতি চাহিয়া তাহার গের চক্ষু দুইটিতে তাহার মনোভাব পাঠ করিল। বলিল—মামাদের মাকে।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রমার লেখাপড়া শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে গিল। কলিকাতা হইতে রমার জন্য ছোট বড়, গদ্য, পদ্য, সচিত্র চিত্রহীন লাল কালো এবং বেগুণী কালীতে ছাপা অনেকগুলি বহি সিয়াছে। সুন্দর বাঁধানো দুইখানি খাতাও আসিয়াছে, তাহাতে রমা থ এবং নবীন, গোপাল, যাদব প্রভৃতির মনোজ্ঞ-কাহিনী অবিশ্রাম খিয়া যাইতেছে।

রমাকে লেখাপড়া শিখাইবার অবসর কালে নবগোপাল প্রতিদিন হার মাতার নিকট হইতে পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পত্র খার একপক্ষ পরে মাতার উত্তর আসিল তিনি বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ রিয়াছেন। লিখিয়াছেন কর্ত্তা ভয়ানক রাগিয়াছেন—তাঁহার সাক্ষাতে গোপালের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত কাহারও করিবার হুকুম নাই। নি গৃহিণীকে বারণ করিয়া দিয়াছেন যেন নবগোপালকে কোনও ত্রাদি না লেখেন। মা লুকাইয়া ইস্কুলের পণ্ডিত মহাশয় হারাধন ক্রবর্ত্তীর সাহায্যে এই পত্র প্রেরণ করিলেন। ইহা ছাড়া, পত্রমধ্য ইতে একশত টাকার একখানি নোটও বাহির হইল।

পত্র পাইয়া নবগোপাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। হারু চক্রবর্ত্তীর মে ঠিকানা দিয়া মাতাকে উত্তর লিখিল। একখানি ছোট খামে

মার চিঠি খানি ভরিয়া, একখানি বড় খামে তাহাকে প্রবেশ করাইল। পণ্ডিত মহাশয়কে অনুরোধ করিল তিনি যেন পত্রখানি গিয়া তাহার মাতাকে দিয়া আসেন।

রমা এখন দ্বিতীয় ভাগ ধরিয়াছে। ছাপার বহি পাইলে অনেক কথাই সে এখন পড়িতে পারে। একদিন সে একখানি ইংরাজি বহি লইয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে অক্ষর গুলির প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল। তাহা দেখিয়া নবগোপাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি ইংরাজী পড়তে শিখবে রমা ?"

রমা বলিল—"শিখব।"

নবগোপাল ভাবিতে লাগিল—যদি একজন মেম শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় যে রমাকে ইংরাজী পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে একটু সূচিকার্য্যও শিখাইয়া দিতে পারে—তাহা হইলে বড়ই সুবিধা হয়। ভূপেন্দ্রের নিকট সন্ধান লইয়া জানিল, এখানে একটি জেনানা মিশন আছে, সেখানে চেষ্টা করিলে মেম শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাইতে পারে। পরদিনই নবগোপাল জেনানা-মিশনে গিয়া শিক্ষয়িত্রীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিল —মেম সাহেব প্রত্যহ বৈকালে আসিয়া এক ঘণ্টা পাঠ এবং এক ঘণ্টা সূচিকার্য্য শিক্ষা দিয়া যাইবেন।

এইরূপে অমৃতসরে দুইটি মাস অতিবাহিত হইল। নবগোপাল যে শুধু রমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্যই ব্যস্ত ছিল,—তাহা নহে। নানা স্থানে কর্ম্মের সন্ধান করিতেছিল। কলিকাতায় তাহার পূর্ব্ব শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিল, একজন কতকটা আশাও দিয়াছেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই।

রমা মেমের কাছে সূচিকার্য্য যত শিখুক না শিখুক, চতুরা লছমী অনেকগুলি শিখিয়া লইয়াছে। তবে পড়ায় রমার উন্নতি ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। সে এখন বাঙ্গলা চিঠি আসিলে পড়িতে

পারে। একদিন নবগোপালের মাতার পত্র আসিল। রমা তাহা সমুদয় পাঠ করিতে পারিল। তাহা এইরূপ :—

"পরম কল্যাণীয়েষু—

বাবা নবগোপাল, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ও বধূমাতা ভাল আছ ইহা শুনিয়া সুখী হইলাম। উহাঁর মেজাজ এখন বড়ই খারাপ আছে,—এখনও রাগ পড়ে নাই। কেহ তোমার নাম তাঁহার সাক্ষাতে করিলে জ্বলিয়া যান। যাহা হউক আশা করি সময়ে তাঁহার মন নরম হইবে। সময় বুঝিয়া আমি একদিন তাঁহার কাছে তোমার কথা পাড়িব। বধূমাতা কেমন আছেন লিখিবে এবং পড়াশুনা কেমন হইতেছে লিখিবে। কিন্তু তুমি খৃষ্টান মেম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছ শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। কারণ খৃষ্টান মেমেরা নাকি আমাদের ঠাকুর দেবতাগণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক করে এবং সকলকে খৃষ্টান করিতে চেষ্টা করে। গত সোমবার বরিশাল হইতে মেজ কাকী আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন তাঁহাদের সেখানে খৃষ্টান মেমদিগের অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। গত শারদীয় পূজার সময় তাঁহাদের একটি প্রতিবেশী ভদ্রলোক তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক কন্যাকে লইয়া ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যাটি মেমেদের ইস্কুলে পড়িত। তিনি স্বয়ং প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া কন্যাকে বলিলেন—মা, প্রণাম কর। কন্যা বলিল না বাবা, মাটীর দেবতাকে প্রণাম করিব না—গুরুমা বারণ করিয়া দিয়াছেন। পিতা প্রথমে বুঝাইয়া পরে ক্রোধ করিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন,—মেয়ে কিছুতেই শুনিল না, বলিল আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি মাটীর পুঁতুলকে প্রণাম করিব না। সহস্র লোক সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক হইয়া রহিল। খবরের কাগজে পর্য্যন্ত নাকি এ ঘটনা ছাপা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, খুব সাবধান, যেন কোনও রূপ কুশিক্ষা না হয়। আর যদি সে মেম বধূমাতাকে

যীশুখৃষ্টের গান শিখাইয়া থাকে তবে সে সকল গানে "খৃষ্ট" কথাটার পরিবর্ত্তে "কৃষ্ণ" করিয়া লইয়া গাহিতে কোন আপত্তি নাই, কারণ শুনিলাম বরিশালে মেয়েরা সকলেই এইরূপ করিতেছে।

বধূমাতার চুল কত বড় এবং খোঁপা ভাল করিয়া বাঁধিতে জানেন কিনা লিখিও এবং একখানি ফটোগেরাপ্‌ তুলাইয়া আমাকে পাঠাইয়া দিও। তোমরা দুইজনে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও এবং বিশেষ সাবধানে থাকিও। ইতি।—

শুভাকাঙ্ক্ষিণী তোমার মাতা।"

এই পত্র পাইয়া নবগোপাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। শীঘ্রই রমার ছবি তোলাইয়া মাকে পাঠাইয়া দিল।

কয়েক দিন পরে কলিকাতা হইতে একটা সুসংবাদ আসিল। নবগোপালের পুরাতন শিক্ষক লিখিয়াছেন, কাশ্মীর রাজপরিবারের একটি বালকের জন্য একটি ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন—সেখানকার রেসিডেণ্ট তাঁহাকেই একটি উপযুক্ত শিক্ষক অন্বেষণ করিয়া দিবার ভারার্পণ করিয়াছেন। বেতন দুই শত টাকা। নবগোপাল যদি ইচ্ছা করে তবে তিনি তাহাকে এই কার্য্যটি দিতে পারেন।

[illegible] বাহুল্য নবগোপাল আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিল। কয়েক দিবসের মধ্যেই ঠানদি প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া,—রমা ও লছমীকে সঙ্গে করিয়া, নবগোপাল কাশ্মীর যাত্রা করিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঐস্‌লামিক যৎকিঞ্চিৎ।

বিগত ১৩০৯ সালের চৈত্র মাসের ভারতীতে "শক্তিপূজা ও তাহার পরিণাম" শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলমান ধর্ম্মের অন্ধ ও অনুদার সমালোচনা পাঠ করিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। লেখক ইস্‌লামের স্কন্ধে দোষের উপর দোষরাশি চাপাইয়া দিয়াছেন। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে আসুরিক শক্তিপূজার পরিণাম দেখাইতে গিয়া স্বকীয় যুক্তির সমর্থনার্থ ইস্‌লামের সাত্বিকতা-গন্ধ-বিহীন আসুরিকতার কথা তুলিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্ম এবং জাতীয় ইতিহাসের সমালোচনপ্রয়াসী হিন্দুগণ, অনুচ্চরণীয়নামা অস্পৃশ্য অদ্ভুতাচারী প্রতিবেশী মুসলমানগণের প্রতি তাঁহাদিগের আধুনিক স্বভাবজ ঘৃণাবিদ্বেষের প্রভাবে, তাহাদিগের দৈনিক জীবনের রীতিনীতি, ক্রিয়াকর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্মের জটিলতাবিহীন সহজগম্য অলিগলির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে না পারিয়া, একদেশদর্শী ঘৃণাবিকৃতচিত্ত ইউরোপীয় লেখকবৃন্দের যুক্তি বিহীন অথচ সুন্দর ভাষাচাতুর্য্যপরিপূর্ণ সমালোচনারাশির প্রতি অতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সুতরাং মুসলমান সম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু মুসলমানের ধর্ম্ম ও জাতির প্রকৃত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া উদারচেতা বহুদর্শী ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ সরল যুক্তিতর্ক দ্বারা ঐ সকল বিকৃত সমালোচনা সম্যক্ খণ্ডিত করিয়া যে গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন, * এবং যদ্দ্বারা ইস্‌লামকে জগতের সমক্ষে অভাবনীয়

* (১) Spirit of Islam, Syed Amir Ali. [S. K. Lahiri & Co., Calcutta].

(২) The Preaching of Islam, by T. W. Arnold [A. Constable & Co., Westminster].

অত্যুচ্চ গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের হিন্দুভ্রাতাগণের চক্ষু তাহার উপর পতিত হয় না; হইলে, মুসলমান-সমাজের সংস্পর্শ হইতে অতি সন্তর্পণে দূরে থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা আজ ঘৃণার অঙ্কুশাঘাতে উত্তেজিত হইয়া অপ্রতিহত বেগে মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে করিতে মুসলমান ধর্ম্মকে কঠিন সমালোচনা-যন্ত্রে নিষ্পেষিত করিয়া, তাহার "উঠিবার শক্তি ও আশা" সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া, এবং পাঠকবর্গকেও নিরাশ করিয়া, আপনাপন অশেষ কল্পনাপ্রবণতা* ও "Critical Scholarship"এর* পরিচয় প্রদান করিতে উদ্যত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে বহু পরিমাণে লেখনী সংযত করিতে হইত, সন্দেহ নাই।

(৩) Muhammad and Muhammadanism, by R. Bosworth Smith. [Smith Elder & Co., 15, Waterloo Place, London].
(৪) Carlyle's Lecture on Mahomet. [Hero as a Prophet].
(৫) An Apology for Muhammad and the Koran, by J. Davenport. [J. Davy & Sons, 137, Longacre, London].
(৬) A Short History of the Saracens, by Syed Amir Ali. [Macmillan].
(৭) Gibbon & Ockley's History of the Saracens. [Chando's Classics].
(৮) Gibbon's Roman Empire.
(৯) Story of the Saracens, by A. Gilman. [Story of the Nations Series].
(১০) Moors in Spain, by S. Lane Poole. [Story of the Nations Series.]
(১১) Hallam's Constitutional History.

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ আছে, কিন্তু ঐ কয়খানিই যথেষ্ট।

* Savage (Bengal) Landerএর মতে। ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৯, "পর্জ্জন-সরস্বতী-সংবাদ" দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"আরবের মরুবাসী কঠোর অথচ কবিতাপ্রবণ নরগণের উপযোগী করিতে গিয়া মহম্মদকে ইহুদী ধর্ম্মের কঠোরতাকে কঠোরতর, ভীষণকে ভীষণতর, নির্ম্মমতাকে নির্ম্মমতর করিতে হইয়াছিল। দুই চার পোঁচ অধিক রং লাগাইয়া মরুবাসিগণের হৃদয়গ্রাহী করিতে হইয়াছিল!" এ স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, মহাপুরুষ মহম্মদ ইহুদীধর্ম্মের কোন্ কঠোরতাকে কঠোরতর, কোন্ ভীষণকে ভীষণতর, কোন্ নির্ম্মমতাকে নির্ম্মমতর করিয়া লেখকমহাশয়ের প্রবেশার্থ ইস্লামে এরূপ ছিদ্র রাখিয়া গিয়াছেন? কপোলকল্পিত যুক্তিপ্রমাণ অন্যান্য জাতির বেলায় খাটিতে পারে, কেন না অন্যান্য সকল জাতিরই এক একটী "মিথিকাল" অথবা "ডার্ক-এজ" আছে; ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ আপনাপন অবসর-কল্পনা-বলে ইচ্ছামত যুক্তি দ্বারা ইচ্ছামত তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া কোন ক্রমে সেই অন্ধকারাবৃত কালের পঙ্কোদ্ধার করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু মুসলমান জাতির বেলায় কল্পনাবলে পঙ্কোদ্ধার করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিনা, কেন না তাহার জাতীয় ইতিহাসের অভাব নাই। দীর্ঘ ১৩০০ বৎসরের মধ্যে এতটুকুকালও অন্ধকারে আবৃত নাই; মেঘমুক্ত সমুজ্জ্বল ইতিহাস-মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর আলোকে ইহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ উদ্ভাসিত রহিয়াছে। অমূলক ছিদ্রান্বেষী সমালোচকগণ ইস্লামের স্কন্ধে দোষারোপ করিবার সময়ে আপনাপন দর্শনেন্দ্রিয় প্রাণপণে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। Dark ageএর অভাবে পঙ্কোদ্ধারকার্য্যে স্ব স্ব কল্পনাকুশলতা ও যুক্তিচাতুরী প্রদর্শনের অবসর না পাইয়া তাঁহারা ইস্লামের নির্ম্মল ইতিহাস-সাগরে পঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়াছেন। তাঁহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণে গালিবর্ষণ-প্রয়াসী হিন্দুভ্রাতৃবৃন্দকে একবার ইস্লামের প্রকৃত ইতিহাস অদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ

করি। না জানিয়া না শুনিয়া যুক্তিবিহীন বাক্যে গুণ লুকাইয়া শুধু অযথা দোষবর্ণনা করিয়া তাঁহারা প্রশংসনীয় Critical Scholarship প্রদর্শন করেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগেরই সমসুখদুঃখভাগী প্রতিবেশী ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ভ্রাতৃগণের অন্তরে কি প্রকার ভয়াবহ বিষাক্ত বাণ বিদ্ধ করেন, তাহা তাঁহাদের কল্পনায়ও আসিবে না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবশ্য ইস্‌লামের সমগ্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও ইতিহাস তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে না; কিন্তু সংক্ষেপে আমরা "ভারতীতে" প্রকাশিত আক্রমণ গুলির যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিব।

মহাপুরুষ মহম্মদ ইহুদী ধর্ম্মের কঠোরতাদিকে কোন প্রকার "তরে" পরিণত করেন নাই। বরং তাহাদিগের ভিতর যাহা কিছু কঠোর, ভীষণ, বা নির্ম্মম ছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া, কোমল, মনোরম, মমতাপূর্ণ * ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহুদীগণের সুদগ্রহণপ্রথা ও তজ্জনিত অসমর্থ অধমর্ণের প্রতি ভীষণ পাশবিক অত্যাচার, অতি প্রাচীন দাসত্বপ্রথা এবং হতভাগ্য ক্রীতদাসদিগের প্রতি ইহুদীগণের—শুধু ইহুদী কেন, বহু প্রাচীন জাতির †—নির্ম্মম আচরণ, যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণকে জীবন্ত প্রোথিত করিবার লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর রীতি,

* ইস্‌লামের মমতার প্রভাব মৃতদেহ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া মৃতদেহকে যত্ন, সম্মান ও ভক্তি সহকারে স্নাত, নববস্ত্র পরিহিত ও সুবাস লেপিত করিয়া সমাহিত করিবার বিধান করিয়া গিয়াছে।

† প্রাচীন দাসত্ব প্রথার কঠোরতা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। রোমের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই; হিন্দুর ত "শূদ্রন্তুকারয়েদ্দাসং ক্রীতমক্রীতমেব বা।" (মনু) এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রাচ্য প্রদেশে ও আমেরিকায় এই দাসত্ব প্রথা লইয়া কি হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল, কত যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছিল, তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। আর ইহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সপ্তম শতাব্দীতে ইস্‌লাম সেই দাসত্ব প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য কি সুকৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা দেখা যাউক। দাসত্ব প্রথার অতি প্রাচীনতার সম্মান না রাখিলে বিপ্লব বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ইস্‌লাম তাহা বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছিল—"তুমি নিজে যাহা ভক্ষণ করিবে, তোমার দাসও যেন তাহাই

অসংখ্য স্ত্রীগ্রহণ এবং স্ত্রীজাতির নিদারুণ শোচনীয় হীনাবস্থা, আরব জাতির জঘন্য পৌত্তলিকতা, নরবলিপ্রথা, * দস্যুতা, পরস্বাপহরণ, ব্যভিচার প্রভৃতি সমস্ত ইস্‌লামের প্রভাবেই সম্যক্ বিদূরিত হইয়াছিল। তদানীন্তন অধঃপাতিত মানবসমাজের ঘৃণিত বীভৎস আচার ব্যবহারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, পবিত্র সরল একেশ্বরবাদ বজ্রনিনাদে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষিত করিয়া, রাজা-প্রজা, প্রভু-ভৃত্য, ধনী-নির্ধন নির্ব্বিচারে প্রত্যেক মনুষ্যকে সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার প্রদান ও ভ্রাতৃপ্রেমে দীক্ষিত করিয়া, নারীজাতিকে হীনাবস্থা হইতে অভাবনীয় উচ্চাসনে উত্তোলিত ও পুরুষের সহিত সর্ব্ববিষয়ে প্রায় সমতুল্য অধিকার প্রদান করিয়া, মানবের গুরুভার দাসত্বশৃঙ্খল. সর্ব্বপ্রথম বিমোচিত করিয়া, মানুষে মানুষে পার্থক্য, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও তজ্জনিত একের সহিত অপরের অস্পর্শনীয়তা সর্ব্বপ্রথম জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সংস্থানের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ভ্রাতৃবৃন্দকে দান করিতে শাস্ত্রতঃ বাধ্য করিয়া † ইস্‌লাম জগতের ইতিহাসে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভক্ষণ করিতে পায়, তুমি নিজে যাহা পরিধান করিবে, তোমার দাসও যেন তাহাই পরিধান করিতে পায়।" আবার "একটী দাসকে মুক্তি প্রদান করার ন্যায় পুণ্যকর্ম্ম জগতে আর নাই।" ইস্‌লামের অধীনে দাসগণ সাধারণ স্বাধীন নগরবাসিগণেরই ন্যায়। রাজ্যের উচ্চ উচ্চ কাজও তাহাদের জন্য উন্মুক্ত। দাসবংশের সুলতানগণ তাহার মহৎ দৃষ্টান্ত।

* আরবজাতির ভিতর নরবলিপ্রথা অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে "পুরুষমেধ" (বৈদিক) এবং শক্তি-পূজায় নরবলিদান আচরিত হইত।

† প্রত্যেক মুসলমানকে তাহার সংস্থানের ৪০ ভাগের এক ভাগ দরিদ্র আত্মীয়কে অভাবে দরিদ্র প্রতিবেশীকে, অভাবে দরিদ্র বিদেশীকে দান করিতেই হয়। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রতঃ অবশ্য পালনীয় অন্যান্য দানও আছে। কিন্তু এইটীই সর্ব্বপ্রধান। উহাকে "জাকাৎ" কহে। জাকাৎদান যে শুধুই একটী নৈতিক কর্ত্তব্য, তাহা নহে। যে ৫টী কর্ত্তব্যের প্রত্যেকটী পালন না করিলে মুসলমান বলিয়া পরিচয়ই দেওয়া যায় না, জাকাৎ তাহার অন্যতম।

ইস্‌লামই প্রকৃতপক্ষে জগতে সর্ব্বপ্রথম সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার মহাপতাকা উড্ডীন করিয়া মানবসমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। পৃথিবী তাহার কঠোরতা, ভীষণতা, বা নির্ম্মমতায় রোমাঞ্চিত হয় নাই।

যে সুমহান উদার নীতি অবলম্বনে মহাপুরুষ মহম্মদ প্রাচীন মানব-সমাজের ঘৃণিত পাশবিক আচার ব্যবহারের মূলচ্ছেদ করিয়া সর্ব্বত্র সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, একদেশদর্শী অনুদার critical scholar বৃন্দের হস্তে আজ সেই উচ্চতম আদর্শের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে! দুঃখের বিষয়, তাঁহারা বেগবান কল্পনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া না জানিয়া শুনিয়া কেবল অন্ধভাবে সমালোচনা করিতেই থাকেন, ঐতিহাসিক যুক্তি তর্কের ধার আদৌ ধারিতে চাহেন না। * আলোচ্য প্রবন্ধের স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে —"ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিতে হইয়াছিল!" † ইহা অপেক্ষা অমূলক ভিত্তিহীন অপবাদ আর কি বা হইতে পারে? লেখক মহাশয় কি বলিতে চান যে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা ইস্‌লামের একটা পুণ্যকর্ম্ম? বিচারবিহীন ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা কি ইস্‌লামানুসারে

---

* বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকগণ, ইতিহাসকে মান্য করা দূরে থাকুক, তাহাকে পদ-দলিত করিয়া তাহার স্কন্ধে লাম্পট্য ও নৃশংসতার অবতার একদল মুসলমান সম্রাট চাপাইয়া তাঁহাদের উপন্যাসগুলিকে স্বদেশীয়গণের চিত্তরঞ্জক ও সুরসাল করিয়া তুলিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। কাব্যও এ লোভনীয় ঋজুমার্গ অবলম্বন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারে নাই—নহিলে কবিত্ব কি ততটা স্ফূর্ত্তি পায়? "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" মহানুভব আকবরকেও সম্রাট-সাধারণের তালিকা বহির্ভূত রাখিতে ঔপন্যাসিকগণের উদার অন্তঃকরণে ব্যথা বাজিয়া উঠিয়াছিল!

† দেবমন্দিরে শত শত সুন্দরী নর্ত্তকী-বৃন্দ-রক্ষণ—হিন্দুর এ প্রথা কি ধর্ম্মাঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা নহে? সোমনাথের মন্দিরে ৫০০ সুন্দরী যুবতীর চিত্তোন্মাদিকা নৃত্য-ভঙ্গিমা ভক্তবৃন্দের প্রাণে ভক্তিরসের মহাপ্লাবন উপস্থিত করিত। [Gibbons D & F vol. IV., p. 166 (Chandos)] মুসলমান নরপতিগণ ত হিন্দুরই নিকট হইতে এই ধরণের বিলাসিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন! তাই কি আজ হিন্দুরই মুখ হইতে গালি শুনিতে হয়?

স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিবার একটী চাবি? যুক্তিশাস্ত্রের কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি মুসলমানধর্ম্মে এরূপ ঘৃণিত কলঙ্ক লেপন করিতে সাহসী হইলেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা তাহা ভাবিয়াই পাই না! যে ইস্‌লাম শাস্ত্র "সম্মতির" দোহাই দিয়া ব্যভিচারের, এবং সমাজ-রক্ষণের দোহাই দিয়া বেশ্যাবৃত্তির অনুমোদন করিয়া প্রকাশ্য স্বাধীন লম্পটতার প্রশ্রয় দেয় নাই, বরং ইহ-পর-উভয়কালে কঠোরতম শাস্তির বিধান করিয়া ব্যভিচার ও লম্পটতার প্রাদুর্ভাব ইস্‌লামের রাজ্য হইতে তিরোহিত করিয়াছে, যে শাস্ত্রে একাধিক বিবাহ * করিবার অনুমতি প্রদান করা সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক স্ত্রীর পক্ষপাতদোষদুষ্ট স্বামীর প্রতি পরকালে অনন্ত নরক ভোগের বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কার্য্যতঃ বহুবিবাহের প্রবল প্রতিষেধ করিতেছে, মানব-দেহের পশুপ্রবৃত্তিনিচয় প্রশমিত রাখিয়া সংযমসাধনার্থ যে শাস্ত্র আবালবৃদ্ধ-বনিতার উপর নির্জ্জলা দীর্ঘ উপবাসের † কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছে দেহ পবিত্র ও কর্ম্মঠ, চিত্ত সংযত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার জন্য যে শাস্ত্রে প্রত্যহ পাঁচবার নিয়মিতরূপে "ওজু" করিবার ও নমাজ করিবার অতি অলঙ্ঘনীয় অনুশাসন রহিয়াছে, কল্পনা-ক্রীড়া-কুশল

* সহস্র বিবাহপ্রথা তুলিয়া দিয়া ৪টী পর্য্যন্ত বিবাহ করিবার অনুমতি দিয়াছে বটে, কিন্তু কৌশলে আবার ইস্‌লাম দ্বিতীয় বিবাহটী পর্য্যন্ত করা পাপরূপে গণ্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খল আরববাসিগণের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা দমন করিয়াছিল। কৌশলটী এই—

(১) কতকগুলি বিশেষ কারণ না থাকিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা নিষেধ; (২) সকল স্ত্রীকে সমান চক্ষে না দেখিতে পারিলে মহাপাতকী হইতে হইবে।—মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। মুসলমান শাস্ত্রে তবু ত একটী সীমা আছে। যদিও আধুনিক সভ্যতা প্রভাবে সকল জাতির মধ্যেই এক বিবাহ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে (হিন্দুরও কি?) তবু এরূপ সীমাবদ্ধতা কোন শাস্ত্রে নাই। ফলে ইস্‌লাম এক বিবাহেরই পক্ষপাতী।

† উপবাসকালে পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনটীরই বিলাসপ্রদ ব্যবহার করা যায় না। ইন্দ্রিয়দমন অভ্যাস করাই ইহার উদ্দেশ্য।

হিন্দু ঔপন্যাসিক-শিরোমণিগণের ভারত-সম্রাট-সমাজের লম্পট-চরিত্র-চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্যাধ্যক্ষতায় সমুৎসাহিত হইয়া, সেই পরম পবিত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া আক্রমণ করিতে প্রবন্ধকার একবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় !

অন্যত্র, "স্বার্থকে এতই প্রবল করিতে হইয়াছিল যে, শক্তি-স্বরূপিনী রমণীগণকে বিলাসের উপাদান মাত্রে পরিণত করিতে হইয়াছিল।" সত্যের সহিত এ বাক্যের এক তিলও সম্পর্ক নাই; ইস্‌লাম সেই শক্তিস্বরূপিনী নারীজাতিকে যতখানি স্বাধীনতা ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, নারীজাতির অবস্থা উন্নীত করিয়া পুরুষের সহিত যতখানি সমতুল্য করিয়া তুলিয়াছে, নারীকুলের আত্মার উৎকর্ষ পুরুষের সহিত সমতুল্য করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন করা নারীজাতির যতখানি অবশ্য পালনীয় শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে, জগতে আর কোন শাস্ত্রে তত খানি করে নাই !*

ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পৃথিবীতে নারীজাতির অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় ছিল, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবে না। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহারা পুরুষের হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলি মাত্র পরিগণিত ছিল। পুরুষে অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ করিত, কিন্তু স্বামীর আচরণের বিরুদ্ধে স্ত্রীগণের কোনই অধিকার ছিল না। এক স্ত্রীর বহুস্বামী গ্রহণও যে ঘৃণিত ছিল, তাহা নহে। সমাজে নারীগণ কোন স্থানই পাইত না। এই বিংশ শতাব্দীর উন্নত

* ভারতবাসী মুসলমান লইয়া পৃথিবীর মুসলমান জাতির বিচার চলে না। অধুনা ভারতে মুসলমানগণ শিক্ষার অভাবে অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। পুরুষেরই শিক্ষার অভাব, তা আর স্ত্রীলোকের দোষ কি ! কিন্তু অন্যত্র মোসলেম রমণীবৃন্দ স্বাধীনা এবং উচ্চ শিক্ষিতা। এখনও তুরস্করাজ্যে নারীসম্পাদিত সাময়িক পত্রের অভাব নাই।

ভারত-মুসলমানদিগের ঘৃণিত অবরোধপ্রথা শাস্ত্রসঙ্গত নহে। মহাপুরুষ মহম্মদের মৃত্যুর দ্বিশতাধিক বর্ষ পরে কতকগুলি লোক এই কুপ্রথার সৃষ্টি করেন।

সময়ে প্রাচ্য প্রদেশে নারীজাতিকে কতকটা অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শনার্থ একরাশ "আদবকায়দার" আইন জাহির হইয়াছে বটে* কিন্তু নারীজাতির শাস্ত্রসঙ্গত কোন অধিকার কোথায়ও নাই।† এমন কি, এই অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও প্রাচ্য-গৌরব-রবি ইংরাজ জাতির মধ্যে স্বামীর যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে স্ত্রীর কোন দাবী ছিল না।‡ বহু বিবাহ আধুনিক উন্নতির ফলে নিবারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে তাহা অননুমোদিত নহে §। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহ এবং স্ত্রীজাতির অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে পাঠকবর্গের তৃপ্তিকর হইবে না ভাবিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল।

একটী স্বাধীন মনুষ্যের যতগুলি স্বাধীন অধিকার সম্ভবে, নারী-জাতিকে ইস্লাম ততগুলিরই অধিকারিণী করিয়া দিয়াছে। "ন দায়ং, নিরিন্দ্রিয়া হ্যদায়াদাঃ স্ত্রিয়োহনৃতম্ ||" এই শ্রুতিবাক্যের অনুসরণ না করিয়া ইস্লাম কন্যাকে পুত্রের সহিত একযোগে পিতৃধনে অধিকারিণী করিয়া রাখিয়াছে, দাসীরূপে পরিণত করে নাই।¶ ইস্লাম স্ত্রীকে

* তাহাও স্পনিশ-মোস্লেম-শিভালরির প্রভাবে।

† অক্স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় নারীজাতিকে ডিগ্রীদান করিতে নিতান্ত নারাজ! এরূপ কার্য্য অবশ্য ইস্লাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

‡ Spirit of Islam, p. 215. (S. K. L.)

§ অধিক কি, ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজকগণও তাহার প্রমাণ দিয়া আসিয়াছেন। Spirit of Islam—Part II. Ch. IV. দ্রষ্টব্য।

|| বৌধায়ন।

¶ The contempt with which the Brahmanic Legislator speaks of women, and the complete servitude to which he subjects them, are astonishing. 'Women' says Manu, 'have impure appetites; they show weak flexibility and bad conduct. Day and night must they be kept in subjection." [Spirit of Islam, Introduction, p. XX].

যে শুধু সহধর্ম্মিণী করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে, এমত নহে, তাহাকে স্বামীর সহ-কর্ম্মিণী ও সহাধিকারভুক্তিনীও করিয়া দিয়াছে। কোন রমণীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিবার অধিকার ইস্‌লাম কাহাকেও প্রদান করে নাই; স্বয়ং সম্রাট্‌কেও নহে *। বিবাহের পরও নারীগণের যাবতীয় স্বত্বাধিকার ইস্‌লাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ফল কথা, পৃথিবীর কোন শাস্ত্রই নারীজাতিকে, এত উদার উন্নত চক্ষে দর্শন করিতে পারে নাই। মাতৃপদতলে স্বর্গের স্থিতি যে শুধু ইস্‌লামই নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা নহে, শক্তিস্বরূপিণী গরীয়সী জাতি বলিয়া নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা অনেকানেক শাস্ত্রে লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার Legal Status এতদূর উন্নীত করিয়া তাহাকে এতটা সম্মান প্রদর্শন করিতে অন্য কোন শাস্ত্র সক্ষম হয় নাই। ইস্‌লামের এই নারীমর্য্যাদা স্পেনে মোস্লেমসমাজে যে শিভাল্‌রির সৃষ্টি করিয়াছিল, ইউরোপের মধ্যযুগ তাহারই নিকট সেই শিভালরী শিক্ষা ও তাহার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল †। যে সময়ে প্রাচীন সভ্যতা-সূর্য্য অস্তমিত হইয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর

এতদ্ভিন্ন নারীজাতির আধ্যাত্মিক অবস্থাও শোচনীয়। দ্বিজজাতিত্রয় স্ত্রীগণকে শূদ্রের সহিত এক যোগে দ্বিজত্বহীন করিয়াছেন। "Women have no place in the scheme of salvation propounded by the Vedantic Philosopy."

* ইস্‌লামাভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পরেও ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ স্ত্রীলোকগণকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিতেন। হিন্দুরও সে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। বিবাহ দিবার সময়ে হিন্দু বালিকার (যুবতীর বলা যায় না) সম্মতি গ্রহণের কোন আবশ্যকতাই শাস্ত্রে লেখে না।'

† ভারতবাসী মোস্লেমগণের মধ্যে নারীজাতির আধুনিক হীনবস্থা কেবল শিক্ষাভাবের বিষময় ফল। কোন শাস্ত্রীয় কুপ্রথার ফল নহে। স্পেনে মুসলমানের শাসনকালে নারীজাতির অবস্থা কি ছিল, (শুধু স্পেনে কেন, সকল প্রদেশেই) তাহা Moors in Spain, Spirit of Islam, এবং History of the Saracens গ্রন্থত্রয়ে দ্রষ্টব্য। আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতির জন্য ইউরোপ মুসলমানের নিকট কতটা ঋণী, তাহাও ঐ গ্রন্থত্রয়ে জানা যায়।

প্রান্ত পর্য্যন্ত বিকৃত অবনতি ও ঘৃণিত কুসংস্কারের ঘোর অন্ধতামসে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, আরবের মরুভূমে সেই সময়ে ইস্লামের অমৃতনির্ঝর প্রবাহিত হইয়া নারীজাতিকে যে মহদোচ্চ আসনে উন্নীত ও স্থায়ীরূপে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিল, আধুনিক সভ্যতা ও সুসংস্কার-স্ফীত প্রাচ্য নারীজাতির আসন এখনও ততদূর উঠিতে পারে নাই।* তার সেই মোস্লেমরমণীবৃন্দকে প্রবন্ধলেখক এক কথায় "বিলাসের সামগ্রী" মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন!

আবার অন্যত্র—"কাফের-নাশকে, কাফেরের প্রতি অত্যাচারকে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, এবং স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত করিতে হইয়াছিল। সমৃদ্ধিশালী দেশ, নগর ছারখার হইতে লাগিল। এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কোরাণ ধরিয়া মুসলমানগণ সবলে আপনাদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল।"

সেই পুরাতন কথা! বহুপূর্ব্বে অনুদার ক্ষুদ্রদর্শী খ্রীষ্টীয় লেখকগণ ঐ সকল মিথ্যা অপবাদ দিয়া ইস্লামকে জগতের চক্ষে ঘৃণিত ও অপদস্থ করিয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু অধুনা কয়েকজন চিন্তাশীল বহুদর্শী লেখক তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাহাদিগের লেখনী সংযত করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এক্ষণে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুভ্রাতৃগণ আবার সেই ধুয়া ধরিয়া বসিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদ এত হইয়াগিয়াছে যে এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র; কিন্তু তথাপি এতৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

প্রথমতঃ, ইস্লাম তরবারি দ্বারা পচারিত হয় নাই। তরবারি ব্যবহৃত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু তাহা শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থ। ইহুদী, খ্রীষ্টান, এবং আরবীয় পৌত্তলিকগণ নবদীক্ষিত মুসলমানগণের প্রতি যেরূপ ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, যে অত্যাচার সহ্য করিতে না

* The Spirit of Islam, ২১৫, ২১৬ পৃঃ।

পারিয়া স্বয়ং মহাপুরুষ মহম্মদকে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আত্মরক্ষার্থ অসি নিষ্কোষিত না করিয়া আর উপায় ছিল না। কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি ইস্‌লামপ্রচারার্থ কখনও সে অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় নাই। "তোমার ধর্ম্মশত্রুগণের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা কর, কিন্তু অগ্রে তাহাদিগের প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না; কেন না, ঈশ্বর প্রথমাক্রমণকারীকে ঘৃণা করেন।" * কোরাণের এই অনুজ্ঞা ইস্‌লাম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছে। এক হস্তে কোরাণ এবং অন্য হস্তে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার পতাকা লইয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, গগণভেদী কণ্ঠে আপনাকে প্রচার করিয়াছে; তাই আজ মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত, সাইবিরিয়া হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, এমন কি সভ্যতা-শিখর-বিহারী সুদূর ইংলণ্ডের লিভারপুল পর্য্যন্ত তাহার পবিত্র অমৃতজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া, লক্ষ লক্ষ অভ্র-চুম্বিত-চূড় উপাসনা-মন্দিরের বেদী-মঞ্চ হইতে প্রত্যহ পাঁচ পাঁচবার সুগম্ভীর নিনাদে "আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর" রব উত্থিত হইয়া অষ্টাদশ কোটী ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানকে, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, প্রভু ভৃত্য নির্ব্বিশেষে এক যোগে এক প্রাণে একই শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়া সেই পরম করুণাময় জগৎপিতা "একমেবাদ্বিতীয়ং" এর উপাসনার্থ আহ্বান করিতেছে! কে বলিল "মুসলমান হেঁটমুণ্ডে পতিত হইয়াছে?" "ভগ্নপদ বিধ্বস্ত ভীষণ শার্দ্দূলের ন্যায় পড়িয়া আছে?" তাহার "উঠিবার শক্তি নাই, উঠিবার আশা নাই," এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? আজ না সুবিশাল চীনসাম্রাজ্যে এবং মহাদেশ আফ্রিকায় প্রবল বেগে ইস্‌লাম প্রচারিত হইতেছে? খ্রীষ্টধর্ম্ম না তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না! আজ না এই বঙ্গদেশের

* কোরাণ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৮৬ শ্লোক।

আদম সুমারিতে দিন দিন মুসলমানসংখ্যার প্রবল-বৃদ্ধি-দর্শনে সংবাদ পত্রাদিতে হিন্দুর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই? ইহা কি ইস্‌লামের কঠোরতা, নির্ম্মমতা, ভীষণতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, শাণিত তরবারি,—মোটের উপর "আসুরিক শক্তি সাধনের" ফলে? *

দ্বিতীয়তঃ, কাফেরনাশকে, কাফেরের প্রতি অত্যাচারকে পুণ্য কর্ম্মে পরিণত করিতে, এবং স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত করিতে হইয়াছিল, এরূপ অদ্ভুত অকোরাণিক কথা লেখক কোথা হইতে বাহির করিলেন, ভাবিতে গেলে দিশাহারা হইতে হয়! বিধর্ম্মীর প্রতি সদয় ব্যবহার এবং ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করিতে ইস্‌লাম যেমন পদে পদে আদেশ প্রদান করিয়াছে, অন্য কোন শাস্ত্র তেমন করে নাই, কোরাণের শত শত বচন উদ্ধৃত করিয়া এ কথা সমর্থন করা যায়। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও একথা সপ্রমাণ হইবে। খ্রীষ্টান মুসলমানে দীর্ঘকালব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধে ক্ষণবিজয়ী খ্রীষ্টানগণ যেরূপ নির্ব্বিচারে আবালবৃদ্ধবনিতা অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি (!) সঞ্চয় করিয়াছিলেন, চিরবিজয়ী মুসলমানগণ তেমনি খ্রীষ্টানবন্দীগণকে মুক্তি, আহারীয় এবং পাথেয় দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন! † মহাপুরুষ মহম্মদ স্বয়ং খ্রীষ্টানগণকে যে charter ‡ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিধর্ম্মীর প্রতি ইস্‌লামের উদার ব্যবহারের

---

* প্রশ্ন হইতে পারে, তবে ইস্‌লাম কি করিয়া প্রচারিত হইল? ইহার উত্তর এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবে না। The Preaching of Islam (by T. W. Arnold) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

† Amir Ali's History of the Saracens, p. 356. The Spirit of Islam, p. 181. সিরিয়াবিজিগীষু সৈন্তদলের প্রতি আবুবেকারের আদেশ Gibbon D and F, Vol. III. p. 541 (Chandos) দ্রষ্টব্য। পরে ৫৪৪ হইতে ৫৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুসলমানের উদারতা ও বীরত্ব; এবং খ্রীষ্টানের ক্ষুদ্রত্ব ও কাপুরুষতা ও নৃশংসতার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ The Spirit of Islam, pp. 54, 55. History of the Saracens, p. 14.

অভ্রভেদী স্মৃতিস্তম্ভ। স্পেন অধিকার করিয়া মুসলমানগণ বিধর্ম্মী স্পানীয়ার্ডদিগের প্রতি যেরূপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং ৮০০ বৎসরকাল করিয়া আসিয়াছিলেন, ৮০০ বৎসর পরে স্পেনে মুসলমানগণের পতন হইলে স্পানিয়ার্ডগণ সেইরূপ নিষ্ঠুর আচরণে কতক হত্যা করিয়া, কতক বা নিরবলম্বনে আফ্রিকার উপকূলে নির্ব্বাসন দিয়া স্পেন নির্ম্মুসলমান করিয়া ছাড়িয়াছিল! কই মুসলমানশাসনের দীর্ঘ ৮০০ বৎসরের মধ্যে স্পেন ত নিক্রিশ্চিয়ান হয় নাই! পক্ষান্তরে ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে বিতাড়িত হইয়া হতভাগ্য ইহুদীগণ বহুকাল হইতেই দলে দলে "উৎপীড়ক" (Tyrant) তুরস্করাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছে। তুর্কী মোস্লেমগণ চিরশত্রু * ইহুদীগণকে অন্ন ও আশ্রয় দিয়া, এমন কি কেহ কেহ মৃত্যুকালে তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থ কিছু কিছু সম্পত্তিও দান করিয়া অদ্যাপি হতভাগ্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। † কই অসহায় অবস্থায় হাতে পাইয়াও বিধর্ম্মী-গণকে হত্যা করিয়া, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, "পরপীড়ক" "স্বেচ্ছাচারী" তুর্কীগণ ধর্ম্মসঞ্চয় করিবার খুব একটা প্রবল তৃষ্ণা ত কখনও প্রদর্শন করেন নাই, বা করিতেছেন না!

তৃতীয়তঃ, "সমৃদ্ধিশালী দেশ, নগর ছারখার হইতে লাগিল!" একথায় আর কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে? ইস্লামের অভ্যুদয়কালে পৃথিবীর কোন্ স্থানে কতগুলি সমৃদ্ধিশালী দেশ, নগর ছিল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। যদিও দুই একজন অত্যাচারী ব্যক্তি দুই এক স্থানে মন্দিরাদি ভগ্ন বা নগর লুণ্ঠন করিয়া পৃথিবীর

---

* ইস্লামের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ হইতেই ইহুদীগণ মুসলমানদিগের সহিত ঘোর শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে।

† An Apology for Mahomet and the Koran, by J. Daven port —১২৫ পৃঃ।

একটু ক্ষতি করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ইস্‌লাম কোন ক্রমেই দায়ী হইতে পারে না। অধিকন্তু, স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া মুসলমানগণ যে অসংখ্য অতুলনীয় নগর, বিচিত্র প্রাসাদ, সুদীর্ঘ রাজপথ, অগণিত অতিথিশালা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতা ও উন্নতিশৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় সে ক্ষতিটুকু গণিতশাস্ত্রের সূক্ষ্মবিধানানুসারে গণনাই করা যাইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অত্যাচারী, কাফেরনাশক প্রভৃতি বলিয়া মুসলমানের যে অখ্যাতি আছে, পৃথিবীর যাবতীয় জাতির সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে সে অখ্যাতিটুকু আর কাহারো অন্তরে স্থান পায় না। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কথা ধরিতে গেলে, ইস্‌লামশাস্ত্র যে তাহার কত বিরোধী, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্র মানিতে গেলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়া চলে না। সম্রাটদিগের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা যদি শাস্ত্র নাই মানিয়া চলেন, তজ্জন্য ইস্‌লাম দায়ী হইবে কেন? আর পৃথিবীর সম্রাটসমাজের কথা তুলিলে মুসলমানের সমসাময়িক কোন জাতীয় সম্রাটই ইন্দ্রিয়পরায়ণ তালিকার বহির্ভূত হন না। প্রাচ্য ইতিহাসও এ কথার সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক রাজবৃন্দ উক্ত তালিকার যে বড় নিম্ন স্থান অধিকার করেন, তাহা বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী, কাফেরনাশক অপবাদের কথা। দিগ্বিজিগীষু হইলে কতটা অত্যাচারী ও ধ্বংসপ্রিয় হইতে হয়, তাহা শান্ত হিন্দুগণ অবগত নহেন। এস্থলে অবশ্য উল্লেখ করিতেই হইবে যে, আর্য্যগণকে প্রথমতঃ ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যগণের হস্ত হইতে এদেশ জয় করিয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু জয় করিয়া তাঁহারা বিজিতগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা "শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং

ক্রীতমক্রীতমেববা” এই মনুবাক্য হইতেই সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। মুসলমানের দিগ্বিজয় অত্যাচারের সহিত, আমেরিকার আদিম নিবাসীগণের প্রতি স্পানিয়ার্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয়-গণের অত্যাচারের তুলনা করিয়া দেখুন! সেও ত মুসলমান অভ্যুদয়ের বহুবর্ষ পরে, পৃথিবী যখন উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তখনকার কথা! পুনশ্চ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসানে, পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সূর্য্যোদ্ভাসিত-চিত্ত খ্রীষ্টানগণ কর্তৃক আফ্রিকার হতভাগ্য বিজিত মুসলমান অধিবাসিগণের ভীষণ হত্যার কথা স্মরণ করুণ, তাহা হইলে মুসলমানের দিগ্বিজয়-অত্যাচারবিভীষিকা আর থাকিবে না। দিগ্বিজয়ের ধর্ম্মই এই! তবু মুসলমান দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কিই বা করিয়াছিল! আবার বিধর্ম্মী প্রজার উপর রাজগণের অত্যাচার কতদূর হইতে পারে, তাহা ইউরোপের হীদেন, ইহুদী ও মুসলমান জাতীয় প্রজার উপর খ্রীষ্টান রাজগণের অমানুষিক লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর আচরণের কথা, এবং সামান্য ধর্ম্ম বিবাদ লইয়া ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃপুনঃ কি প্রকার মহামারী ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার কথা একবার স্মরণ করিলে কতকটা উপলব্ধি হইতে পারে। মুসলমান রাজার অধীনে বিধর্ম্মী প্রজা সামান্য মাত্র কর* দিয়াই নিরাপদে আপন ধর্ম্ম, দেহ, ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া চিরদিন বাস করিয়া আসিয়াছে। ইস্‌লাম তাহাদিগের ধর্ম্মে কখনও অনধিকার হস্তক্ষেপর্ন করিয়া আসুরিক ধর্ম্ম সঞ্চয়ের চেষ্টা প্রদর্শন করে নাই। আহ্বান করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইস্‌লাম গ্রহণার্থ কখনো বল প্রয়োগ করে নাই।† মুসলমানগণ ভারতবর্ষে

* জিজিয়া।

† Hallam's Constitutional History—Vol. I., Chapter II.

মুসলমানগণ যাহা কিছু বলপ্রয়োগ বা কাফের নাশ করিয়াছে, তাহা দিগ্বিজয়ার্থে মাত্র, ধর্ম্ম প্রচারার্থ নহে। দিগ্বিজয় করিয়া পরে তাহারা ধর্ম্ম গ্রহণার্থ আহ্বান করিয়াছে, বলপ্রয়োগ করে নাই।

৬১০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছেন, কই, ভারতবর্ষ ত এ দীর্ঘকালের মধ্যেও নির্হিন্দু হয় নাই! বিজেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে ত কোন পার্থক্য দেখা যায় নাই; মুসলমান সম্রাটের অধীনে হিন্দু মুসলমান সমান ভাগে উচ্চ উচ্চ রাজপদ ভোগ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম ত কখনও পালন করিতে নিষেধ করা হয় নাই; মৃত্যুভয় দেখাইয়া হিন্দুগণকে ইস্‌লামে দীক্ষিত করিয়া "এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে কোরাণ" এই দুন্দুভিনিনাদের ত কখনও সার্থকতা করা হয় নাই! তবে বিধর্ম্মী রাজার অধীনে বহুকাল বাস করিতে হইলে প্রজাগণকে ক্বচিৎ কখনও একটু আধটু অত্যাচার ভোগ করিতেই হয়। কিন্তু তজ্জন্য বিধর্ম্মীরাজার ধর্ম্ম বা সমগ্র জাতিটাই যে অপরাধী হইবে, এ কোন্ বিচারের কথা? ধর্ম্মের প্রভাব যদি প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিত, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যদি তাহা প্রতিফলিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? দুই একজন অধার্ম্মিকই যদি না থাকিল, তবে ধর্ম্মের মর্য্যাদা কোথায় রহিল?

মুসলমানদিগের সমসময়ে, দিগ্বিজয় ও বিধর্ম্মী প্রজার উপর রাজত্ব করার অগ্নিপরীক্ষায় পৃথিবীর যতগুলি জাতি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইতিহাস মুসলমানকে তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিতে কখনও কৃপণতা করিবে না। হিন্দুগণ প্রকৃতপক্ষে সে পরীক্ষায় কখনও পতিত হন নাই। যতটুকু পড়িয়াছিলেন, তাহাতে "শূদ্রস্তুকারয়েদ্দাস্যং

"A pernicious tenet has been imperted to the Mahometans, the duty of *extirpating* all other religions by the sword. This charge of ignorance and bigotry is refuted by the Koran, by the history of Musulman conquerors, and by their public and legal toleration of the Christian (and Hindu too) worship"—Gibbon D & F, Vol. IV., p. 193 (Chandos.)

ক্রীতমক্রীতমেব বা" এই শ্লোকার্দ্ধই তাঁহাদিগকে "ফেল" করিয়া দিয়াছে।

"মধুরতা সন্নিবেশের প্রয়াসে সুফীর মধুর নিনাদ উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন মাত্র"—ইহাও আলোচ্য প্রবন্ধলেখকের অন্যতম তীব্র কটাক্ষ। ইস্‌লামের কঠোরপ্রাণতায় সুফীর সে মধুর নিনাদ অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তজ্জন্য লেখক আর্ত্তনাদ করিয়াছেন। স্বীকার করি, তাঁহার মধুরতা বোধশক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি জানেন না, পারস্য সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে সেই মধুরতা-সুধা-স্রোত কি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া অদ্যাপি মানব সমাজের মন প্রাণ কি গভীর শান্তিপূর্ণ অলৌকিক প্রেমরসে আপ্লুত করিয়া দিতেছে! তিনি জানেন না, পৃথিবীর স্থানে স্থানে কতগুলি সুফী সম্প্রদায় মুসলমান জাতির ভিতর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে!* তিনি জানেন না, একাধারে ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ম্মপ্রাণ ইস্‌লামের মর্ম্মে মর্ম্মে কতখানি সুফীত্ব মিশিয়া রহিয়াছে! সুফীত্ব ইস্‌লামেরই একাঙ্গ; যতদিন ইস্‌লাম থাকিবে সুফীত্বের অবসান হইবে না। লেখক যাহার "পরিসমাপ্তি" করিয়াছেন, তাহা সুফীত্বের Extreme vain Religious Sentimentalismটুকু মাত্র। ধর্ম্মপ্রাণ ইস্‌লামের কর্ম্মপ্রাণতার সহিত তাহা মিশ্ খাইতে পারে না। এই জন্যই তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইস্‌লাম পৃথিবীতে কাজ করিতে আসিয়াছে। ধর্ম্ম ও তত্ত্বকথা ও পরিত্রাণ কেবল কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মনুষ্যের সামাজিক গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আসে নাই। এই জন্য ইস্‌লাম "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্"

* মুসলমান ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অপরাপর বহু প্রদেশেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুধু ভারতবর্ষের মুসলমান—আধুনিক ভারতবর্ষের অশিক্ষিত হীনদশাপন্ন মুসলমানের কথা লইয়াই মুসলমানের বিচার অবশ্য হইতে পারে না। ঐতিহাসিক বিচারের বেলায়ও ঐ কথা। সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান জাতির ইতিহাস লইয়া মুসলমানের দোষগুণের বিচার করিতে হইবে।

এই মহানীতির সম্যক্ অনুসরণ করিয়া Golden mean অবলম্বন করিয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের, সকল জাতির, সকল মনুষ্যের জন্য সকল সময়ের উপযোগী হইয়া ইস্‌লাম ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে। আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম কর্ম্মাদির কঠোরতার লাঘব করিয়া উদারতা অবলম্বন করিতে গেলেই, কার্য্যতঃ ইস্‌লামেরই সনাতন নীতি সমূহের দিকে অগ্রসর হইয়া পড়িতে হয়। ইস্‌লামে কিছুই দূষ্য নাই; ইহাতে অভাব কিছুরই হইতে পারে না। কালধর্ম্ম প্রভাবে ইস্‌লামের রাজ্য অধুনা হীনবল হইয়াছে, সত্য, কিন্তু ইস্‌লাম এখনো উন্নত মুণ্ডে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এখনও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। রাজ্য অনিত্য, কিন্তু ধর্ম্ম নিত্য। তবুও ইহুদী ও হিন্দুর রাজ্য ত বহুদিন হইল, অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু বহু ঝঞ্ঝাবাতে ছিন্ন ভিন্ন বিকলাঙ্গ হইয়াও অদ্যাপি আফ্‌গানিস্থান হইতে আফ্রিকা এবং তুরস্ক পর্য্যন্ত ইস্‌লামের একাধিপত্য বিরাজ করিতেছে। অনেকানেক প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজ্যের ন্যায় ইস্‌লামের রাজ্যও এ দীর্ঘ ১৩০০ বৎসরের মধ্যেও এক কালে ভূবিলুণ্ঠিত হইয়া ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই! ধর্ম্ম ত এখনো জগৎ পিতার কৃপায় ক্রমশঃ বিস্তৃতই হইতেছে। সুতরাং ইস্‌লামের মুণ্ড অনন্তকালেও হেঁট হইবার নহে!*

শ্রীইমদাদল হক।

* "It is not the propagation, but the permanency of his religion that deserves our wonder: the same pure and perfect impression which he engraved at Mecca and Medina, is preserved, after the revolutions of twelve centuries, by the Indian, the African, and the Turkish proselytes of the Koran!"
Gibbon's D. & F. Vol. III., p. 527. (Chandos).

গ্রন্থসমালোচনা।

"একটী ফুল। (সামাজিক উপন্যাস)—শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য ।০ আনা।" এই সামাজিক উপন্যাসখানি মোট ৪৬ পৃষ্ঠায় শেষ; তা' পয়সা দিবে ষোলটী, উপন্যাস পড়িবে কি ২০০ পৃষ্ঠার? ঠিক উপন্যাস অনুযায়ীই মূল্য স্থির করা হইয়াছে, অথবা মূল্য অনুযায়ী উপন্যাস হইয়াছে। তবে কথা এই, এই ক্ষুদ্র গল্পটীর উপন্যাস নাম না দিলেও চলিত, কিন্তু তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে "প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক" বলিয়া পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

গল্পটী চলন সই গোছের। কোন নূতনত্ব নাই। কুলীনকন্যা "কুসুম"ই "একটী ফুল"। কুসুমের কোরকেই কীট প্রবেশ করিয়াছিল। অবশেষে সেটী "বালক নখচ্ছিন্ন" হইয়া নষ্ট নয়। কৌলিন্যের অনুরোধে তাহার অভিভাবক মাতুল গোপী মুখুয্যে এক বুড়া "পূর্ববাঙ্গালের" সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। কন্যাটী বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেই তাহার প্রণয়পাত্র সুরেন্দ্রনাথের নামে যথারীতি একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আত্মহত্যা করে। এই হইল গল্পের সারাংশ।

হিন্দুসমাজে কৌলিন্যদানবের স্বাভাবিক মৃত্যু সুনিশ্চিত। দিনে দিনে তিল তিল করিয়া তাহার দেহের ক্ষয় হইতেছে। কিন্তু তাহাকে হঠাৎ মারিতে হইলে দিক্‌কম্পনকারী কামানের প্রয়োজন। রেবতী বাবুর এই ক্ষুদ্র চপেটাঘাতে তাহার কি হইবে? তবুও তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল। তাঁহার লেখাটীও ভাল, তবে সম্পূর্ণ দোষশূন্য নহে।

"গুরুভোজনজনিত অজীর্ণ রোগে প্রপীড়িত কোন কোন নৌকাগুলি ঝপ্ ঝপ্ করিয়া উদরস্থ পদার্থ উদ্গীর্ণ করিতেছে।"

এ কিরকম রুচি? ছি!

অশ্রুবিন্দু। (শোকোচ্ছাস)—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত ছোট ছোট চারিটী কবিতা। কবি পুত্রশোকে অধীর হইয়া ইহা লিখিয়াছেন। ইহাতে ভাবের কোন নূতনত্ব নাই, তবে উহা আবেগপূর্ণ ও সুবোধ্য।

অশ্রুহার। নামেই বুঝা যাইতেছে, ইহা একখানি কবিতাপুস্তক। "অশ্রু" কথাটা আজকাল যেন কবিদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের নাম নাই, দাম কত তাহাও লেখা নাই। বইখানার ছাপা ও কাগজ ভাল। ইহাতে ২১টী কবিতা আছে। তাহার প্রত্যেকটী নিরাশপ্রণয়ের হাহুতাশে পরিপূর্ণ।

"ভালবাসি তায়, ভাল সে বাসে আমায়
তবে কেন কেঁদে মরি দুইজনে হায়।
ভেসে যাক এ সংসার
পরলোক হো'ক ছার।
প্রলয় পড়ুক পোড়া ধরণী মাথায়।
ছেড়ে দাও যাই মোর জীবন যেথায়॥"

ইহাই কবির গানের ধূয়া। তাঁহার হৃদয়ের ভাবটুকু আন্তরিক হইতে পারে, কিন্তু তাহা অপবিত্র। তাঁহার প্রণয়িণী অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন জানিয়া শুনিয়াও, তাঁহাকে দেখিবার জন্য গাছতলায় বসিয়া থাকা, উঁকি ঝুঁকি মারা তাঁহার নিকট চুম্বন প্রার্থনা করা ইত্যাদি কলুষিত ভাবের কোন প্রকারে সমর্থন করা যায় না। এসব কেন? কবির এই প্রেম কামজমোহ; ইহা ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে উপরে উপরে ভাঙ্গিয়া বেড়ায়। যে প্রেম আত্মাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার ভাষা অন্যরূপ। তাঁহার প্রেমে আধ্যাত্মিকতা নাই বলিয়া, তিনি পরলোক মানেন না, পাপকে কথার কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, আর "ধর্ম্ম কোথায়" বলিয়া তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। আধ্যাত্মিক প্রেমে বিরহ আছে, কিন্তু হাহুতাশ নাই; মিলন আছে, কিন্তু তাহা পাপে নহে, ধর্ম্মে;—পরলোকে।

যাহা হউক, ভাব অপবিত্র হইলেও কবিরছন্দে হেমচন্দ্রের ঝঙ্কার আছে, যেমন—

হৃদয় মুকুরে হায়! তুমি কেন বল না
ফেলে ছায়া ক্ষণ তরে
পুনরায় গেলে সরে
তুমিত সরিয়া গেলে ছায়াটুকু গেল না
ছায়ায় আমার হ'ল'বুক ভরা বাসনা॥"

বঙ্গমঙ্গল। মূল্য ৵০ আনা। আজকাল বাঙ্গালী কবিগণ প্রায়ই "ভালবাসা," "অশ্রুধারা," "মলয়ানিল" "চাঁদের আলো," "কোকিলের ঝঙ্কার" প্রভৃতি বিষয় লইয়া কবিতা লিখিতে ব্যস্ত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কাব্যের কবি সেদিক দিয়া যান নাই। তিনি বাঙ্গালী জাতির সুখদুঃখ, আশাভরসার একটী উচ্ছ্বাসময় জ্বলন্তচিত্র উদ্দীপ্ত ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাবগুলি তাঁহার আন্তরিক, ভাষায় তাহা বেশ ফুটিয়াছে।

রাজর্ষি কুমার। শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এই খণ্ডকাব্যখানি ধ্রুবোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এখানি মোটের উপর বেশ হইয়াছে।

লেখকের কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়। ধ্রুবচরিত্র সম্বন্ধে গদ্য পদ্য নাটকাদি অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং বিষয়ের কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু লেখকের দক্ষতাগুণে ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে নূতন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার বেশ দখল আছে। তবে তিনি একটী নিতান্ত অকাজ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত ধ্রুবচরিত্রের উপরে তিনি এক হাত চালাইতে গিয়া খারাপ করিয়াছেন। ধ্রুবমাতা সুনীতিদেবীর নির্ম্মল চরিত্রে অন্যায় কলঙ্কারোপ করিয়া তাঁহাকে সীতাদেবীর ন্যায় বনে পাঠানর কি প্রয়োজন ছিল? বস্তুতঃ সাতটী সর্গের মধ্যে প্রথম তিনটী সর্গ রচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। পুস্তকের ছাপা অপরিষ্কার ভুল ও যথেষ্ট। আবার দুই একটী ভুল আছে, তাহা ছাপার ভুল বলিয়া ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, যেমন "প্রেমফুয়ারা," "ওহারে" ইত্যাদি। গ্রন্থকার ময়মনসিংহ জেলা হইতে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা টাইটেল্ পেজে না লেখা থাকিলেও শুদ্ধ এই কয়টী ভুল হইতে তাহা অনুমান করা যাইত।

অর্ঘ্য।

৺কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে।

সংসারের আর্ত্তনাদে, মানবের করুণ ক্রন্দনে,
বধির শ্রবণ-পথ ক্লিষ্ট-তনু গভীর বেদনে।
শুনায়েছ দেব-গীতি, তারি মাঝে, ওগো অন্ধ কবি,
গাহিয়াছ প্রেম-গাথা, দেখায়েছ ত্রিদিবের ছবি।
রচিয়াছ কত ছন্দে, জননীর বিষাদের কথা,
অরাতির উৎপীড়ন, মরমের মৌন-কাতরতা।
ঢালিয়াছ মার পায় যাতনার তপ্ত-অশ্রু-বারি,
কাঁদিয়াছ ভয়ে ভয়ে, অন্তরেতে গুমরি গুমরি।
আজ বীণা ছিন্ন-তন্ত্রী, থেমে গেছে মহান্-রাগিণী,
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, তবু তার র'বে প্রতিধ্বনি।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

হেমচন্দ্র।

প্রণয় সুষুপ্তি সুখে যত বঙ্গবাসী
আছিল সোহাগে, প'রে দাসত্বশৃঙ্খল ;
নিভেছিল হৃদয়ের দীপ্ত বহ্নিরাশি,
নিভৃতেতে ধূমরাশি আছিল কেবল।
যাহার সঙ্গীত স্বনে প্রধূমিত ধূমে
জ্বলিল নির্ব্বাণমুখে হৃদয় অনল,
'প্রতাপ'-প্রসূতি নম্য। এই বঙ্গভূমে
শিথিলিত হ'ল ধীরে মায়ার শৃঙ্খল,
সেই কলকণ্ঠ পিক বসন্তের শেষে
ত্যজি মরধাম গিয়েছে অমর দেশে।

শ্রীবিজয়কুমার দত্তগুপ্ত।

রঘুনাথের মনুষ্য সৃষ্টি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি ২৪ বৎসর মাষ্টারি করিয়া কার্য্য হইতে অবসর লইলাম। কলিকাতায় যাইব স্থির করিয়া জিনিস পত্র গুছাইতে বসিয়াছি। সন্ধ্যা বেলা বহু পুরাতন চিঠি পত্রে পরিপূর্ণ একটি ভাঙ্গা টিনের বাক্স খুলিয়া বসিলাম, যাহা ফেলিয়া দিব তাহা এক ধারে জড় করিয়া রাখিলাম। কত বৎসরের স্মৃতি আজ জাগিয়া উঠিল। কোন চিঠি বার বার পড়িয়া রাখিলাম, কোনটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। কোনটা পড়িয়া একটু হাসিলাম। হঠাৎ একটি ভাঁজকরা ইংরাজি সংবাদ পত্র বাহির হইল, অন্যমনস্ক ভাবে তাহা খুলিয়া দেখিলাম নীল পেনসিলে দাগ দেওয়া একটি ছোট পারাগ্রাফ্ রহিয়াছে। কুতূহলী হইয়া পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে হাত হইতে কাগজখানা পড়িয়া গেল। স্মৃতিপথে একটি বালকের তরুণ ভীত চমকিত বিবর্ণ মুখচ্ছবি আসিল। সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে সে ছবি মিশাইয়া গেল, কেবল হৃদয়ে একটা অতীতের অস্পষ্ট করুণ ছায়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

অনেক দিনের কথা। তখন আমি প্রথম চাকরী আরম্ভ করি। ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি বড় গ্রামের ইস্কুলে হেড্ মাষ্টার ছিলাম। আমি পরের অন্নে পালিত, পরের অর্থে অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মের যোগাড় করিলাম। বাল্যকাল হইতে পিতৃমাতৃহীন। আমার জেঠা মহাশয়ের সহিত পিতার সদ্ভাব ছিল না, যখন অনাথ হইলাম তখন তিনি আমাকে আশ্রয় দিলেন না। এই স্থানে আসিবার দুই মাস পরে বঙ্গদেশের উপর দিয়া এক ভয়ঙ্কর তুফান চলিয়া গেল। সকলে বোধ হয়—শালের সাইক্লোনের কথা অবগত আছেন। প্রত্যহ ইস্কুলে সারাদিন

ছেলেদের সহিত বকিয়া সন্ধ্যাবেলা নির্জন গৃহে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতাম। তখনও আমি বিবাহ করি নাই। একদিন একাকী বসিয়া আছি। মহা ঝটিকা সমস্ত প্রকৃতির উপর তাহার নির্দয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। সম্মুখে বড় বড় বৃক্ষখণ্ড পড়িয়া ছিল। বারাণ্ডার একধার ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, জানালাও দু একটা বিদায় লইয়াছিল। হঠাৎ পদশব্দ শুনিতে পাইয়া চাহিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির এক পার্শ্বে একজন অপরিচিত বাঙ্গালী যুবক দাঁড়াইয়া আছে। যুবক অল্পবয়স্ক,—বালকের ন্যায় আকৃতি ও মুখ, বড় বড় চোখ, গৌরবর্ণ। মুখখানা সুন্দর কিন্তু একেবারে রক্তশূন্য, ফেকাসে, অঙ্গে একটা সাদা সার্ট ও ধুতি চাদর। তাহাকে দেখিবা মাত্র মনে একটা কেমন কৌতূহল জন্মিল-- কেন জানি না, ছেলেটি সাধরণ বাঙ্গালী যুবক, কোন বিশেষত্ব নাই। বোধ হয় তাহার বড় বড় ভীত চমকিত উজ্জ্বল চক্ষু দুটিই তাহার কারণ। বালকটি নিকটে আসিয়া বলিল "মশায়, আপনার বাড়ীতে কি আজ থাকিতে দিতে পারেন? আমি সে দিনকার ঝড়ে ট্রেনে ছিলাম, মাথায় আঘাত পাইয়া একজনের বাড়ীতে এত দিন ছিলাম, এখন বাড়া যাইতে চেষ্টা করিতেছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছেলেটি রহিয়া গেল। আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম সে মেডিক্যাল্ কলেজের ছাত্র, ছুটিতে বাড়ী যাইতেছিল, পথে এই বিপদ। বালকটি শান্ত, অল্পভাষী ও অন্যমনস্ক—যেন সর্ব্বদা কি চিন্তা করিতেছে। আমার শয়ন কক্ষে তাহার ভিন্ন শয্যা প্রস্তুত হইল। মধ্য রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখিলাম বালক উঠিয়া বসিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতেছে, কাণ পাতিয়া শুনিলাম, "উঃ কি ভয়ানক চোখ।

বুকে এত বড় ছেঁদা কেন? আমাকে এখনি মেরে ফেলবে। এখনি পালাতে হবে। চাবি কই? ব্যাগে এত হাড় কেন? উঃ কি দুর্গন্ধ!"

এই কথা গুলি বলিয়া ধড়াস করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। গিয়া দেখিলাম ছেলেটি অচেতন হইয়া গিয়াছে। জল আনিয়া মুখে ছিটাইলাম। একটু পরে চোখ খুলিয়া আমাকে দেখিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল "কি হয়েছে?"—তাহার পরে ঘুমাইয়া পড়িল। পর দিন প্রভাতে এ বিষয় কিছু বলিলাম না, স্কুলে চলিয়া গেলাম। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসিয়া একত্র জল পান করিলাম। বাড়ীতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও এক চাকর সমুদায় কাজ করিত। সন্ধ্যা বেলা দুজনে নীরবে বারণ্ডায় বসিয়া আছি। দেখিলাম যুবক এক মনে কি ভাবিতেছে, তখন বলিলাম "আপনার বুঝি কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই?" তৎক্ষণাৎ চেয়ারে ফিরিয়া বসিয়া বলিল "কেন জিজ্ঞাসা করছেন?"

"আপনি উঠে বসে অনেক কথা বলেছিলেন, তার পর অজ্ঞান হয়ে গেলেন সমস্ত দিন ঘুমের ঘোর ছিল।"

"না আমি কিছু জানিনে"। এই বলিয়া যুবক সহসা উঠিয়া উত্তেজিত ভাবে বারণ্ডার এক দিক হইতে আর এক দিকে হাঁটিতে লাগিল। ভাবিলাম ছেলেটি পাগল না কি? কি করে তাহা দেখিবার নিমিত্ত কুতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আমার হাত ধরিল—"মাষ্টার মশায়, আপনাকে একটা গল্প বলব। কিন্তু আমাকে পাগল মনে করবেন না। ভগবান জানেন আমি যা বলছি তা সত্য কথা। কাউকে বললে বোধ হয় মনের এই ভয়ানক ভারটা কমে যাবে।"

আমি নীরব রহিলাম। তখন সে আমার হাত সবলে টানিয়া আমাকে চেয়ারে বসাইল, আর একটা চেয়ার নিকটে টানিয়া নিজে বসিল। তাহার চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকম জ্বলিতেছে। আমার

দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া অনুজ্ঞার স্বরে বলিল "বসুন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন্।"

আমার তৎক্ষণাৎ এই লাইন গুলি মনে পড়িল

"He holds him with his glittering eye
The wedding guest stood still
And listens like a three years child
The mariner hath his will".

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"আমার নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আমি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। প্রায় এক মাস হল ফরিদপুরে আমার মাতুলের নিকট যাবার জন্য কলিকাতা হতে যাত্রা করেছিলাম। সিয়ালদহ ষ্টেসনে গিয়ে একটা ইণ্টারমিডিয়েট্ গাড়ীতে উঠলাম। সারা দিন বৃষ্টি পড়ছিল। দেখিলাম গাড়ীতে আরও দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন; একজন বৃদ্ধ, ধুতি চাদর পরা বাবু, অপরজন মধ্যমবয়স্ক, পরিধানে চাইনা কোট ও পেণ্টলুন। বৃদ্ধ বাবু দুই ষ্টেসন পরেই নেবে গেলেন, আমরা দুইজন রইলাম। গাড়ীতে এক বড় কাঠের বাক্স ছিল, তাতে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা আছে—Dr. Raghunath Ray। সহযাত্রীর প্রতি চাইলাম। লোকটি সাধারণ বাঙ্গালী অপেক্ষা দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ সুগঠিত মুখ, উজ্জ্বল চোখ, তাতে গম্ভীর চিন্তাশীল ভাব। অল্পক্ষণ পরেই প্রবল বাতাস বইতে লাগল আর ভারি বৃষ্টি পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল। মাঠ, বন, গ্রাম, নগর পার হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুলতে দুলতে ট্রেণ ধীরে ধীরে চলল। প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটিত হয়ে কোথাও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে উড়ে পড়ল। ট্রেণের গতি রোধ হবার যোগাড় হল, অবশেষে কাঁপতে

কাঁপতে একটা মাঠের মধ্যে ভয়ঙ্কর শব্দে গাড়ী একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আমরা স্তব্ধ হয়ে প্রকৃতির এই ভয়াবহ প্রলয়মূর্ত্তি দেখছিলাম, হঠাৎ আমার অঙ্গে প্রবল ধারায় জল এসে পড়ল। বিজ্রের ন্যায় শব্দ হল, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। সংজ্ঞা হলে দেখলাম শুয়ে আছি। উঠে বসতে চেষ্টা করলাম, দর দর করে মাথার ক্ষত স্থান হতে রক্ত পড়তে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল। হঠাৎ দেখলাম রঘুনাথ রায় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন ও গম্ভীর স্বরে বলছেন "উঠতে চেষ্টা করো না, তোমার মাথা কেটে গেছে।" তৎক্ষণাৎ ঝড়ের কথা মনে পড়ল, ক্ষীণ স্বরে বললাম "আমি কোথায় ?"

"কুষ্টিয়া ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে। আমাদের গাড়ী ভেঙ্গে গিয়েছিল, সারা রাত একটা মাঠের মধ্যে পড়ে ছিল, আমরাও সেই ভাঙ্গা গাড়ীতে ছিলাম। আজ ভোরে অন্য গাড়ী এসে যাত্রীদের এখানে নিয়ে এসেছে। ভয়ানক সাইক্লোন হয়ে গেছে, অনেক ট্রেণ ভেঙ্গে গেছে, নৌকা জাহাজও ডুবেছে, অনেক মানুষের প্রাণ নষ্ট হয়েছে।" চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম বড় বড় গাছ, কাষ্ঠ খণ্ড, ভাঙ্গা গাড়ী ইত্যাদি পড়িয়া আছে। ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে অত্যন্ত ভীড়, লোকের কলরবে ও রোদন বিলাপের শব্দে পরিপূর্ণ! কেহ মৃত সন্তান কোলে লইয়া কাঁদিতেছে —হায় হায়, মাগো, বাপরে—এমনই অস্পষ্ট কাতর ডাক চারিদিকে শুনা যাইতেছে। রঘুনাথ একটি ব্যাগ খুলিয়া কাপড়, মলম, ঔষধ ইত্যাদি বাহির করিলেন ও ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘণ্টাকাল সকলের সেবা ও চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন! ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া মলম দিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া যথাসাধ্য সকলের কষ্ট নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। শেষে আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন —

"আমরা কুষ্টিয়া পৌচেছি, আমাকে এখান হতে নৌকায় যেতে হবে। তোমার জন্যে কিছু করতে পারি ?" আমি বলিয়া উঠিলাম "আমাকে

আপনার সঙ্গে নিয়ে যান্। শরীর সারলে বাড়ী যাব। আমার কাছে পয়সা কড়ি কিছু নেই।" একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন "আচ্ছা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একটা বৃহৎ নৌকায় চড়িলাম। প্রথমে বিশাল পদ্মাবক্ষের উপর, তাহার পর নদীর শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া কখন গুন্ টানিয়া, কখনও দাঁড় বাহিয়া, কখনও পাল তুলিয়া, ধান ক্ষেত, বালুচড়, পাটের ক্ষেত, ছোট গ্রাম, দেখিতে দেখিতে চলিলাম। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে একটি গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। সেখান হইতে পাল্কীতে চড়িলাম। গ্রাম ছাড়াইয়া দুই মাইল গিয়া একটি ছোট পাকা কোঠা বাড়ীর সম্মুখে পাল্কী থামিল। এই রঘুনাথ রায়ের বাড়ী। নিকটে কোন লোকালয় নাই, দূরে গ্রামের কুটীরগুলি ও নদীর সাদা জল দেখা যাইতেছে। এক দিকে ছোট বন, আর এক দিকে বড় মাঠ; আশে পাশে ঘন গাছপালা। বাড়ীতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাচক ও এক বৃদ্ধা ঝি, আর কেহ নাই। কেন জানি না বাড়ীতে ঢুকিয়াই প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল।

তিন দিন কাটিয়া গেল, আমি একটু হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিলাম। বাড়ীতে তিনটি ঘর। একটি আমার ও রঘুনাথবাবুর শয়নকক্ষ, আর একটি বড় হল, তাহাতে চারিটা বড় বড় আলমারি, মাঝখানে একটি টেবিল ও দুই তিনটা চেয়ার। আর একটি ঘর ছিল, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা তালাবদ্ধ থাকিত, শুনিলাম উহা রঘুনাথের ডাক্তারখানা। সমস্ত দিনের মধ্যে রঘুনাথের সহিত আমার অল্পই দেখা হইত, কথাবার্ত্তা আরও কম। রঘুনাথ মৌনস্বভাব, অল্পভাষী। সারা দিন নিজের কার্য্যে নিযুক্ত। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া, এক বাটি দুধ খাইয়া সেই তালাবদ্ধ

ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেন। বেলা দুপুরে বাহিরে আসিয়া স্নানাহার করিতেন। আহারের পর বৈকাল পর্যান্ত মাঝের ঘরে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন, আটটা নয়টার আগে বাড়ী ফিরিতেন না। আমি সারা দিন একা একা নীরবে দিন কাটাইতাম। আহারের সময় কখনও দু একটা কথা হইত। এক দিন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীর কোন চিঠি পাইয়াছ?" "না, মামাকে তিনখানা চিঠি লিখিয়াছি, এখনও পত্রের উত্তর পাই নাই।" সে দিন আমার অভিভাবকের নাম, বাড়ী কোথায়, কি করি ইত্যাদি, সমুদায় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও সেদিন তাঁর সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে তিনি বিলাতে গিয়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া কিছু দিন ডাক্তারি প্র্যাক্‌টিস্ করেন। ঘটনাক্রমে এক জন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই সন্ন্যাসী, চিকিৎসাবিদ্যায় আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। অনেক ব্যক্তির দুরূহ রোগ আরাম করিয়া দেন, এবং আরও অনেক অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করেন।

তাঁহার সহিত রঘুনাথ রায় ছয় বৎসর পশ্চিমাঞ্চলের এক পর্ব্বতে বাস করিয়া তাঁহার নিকট বহুবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা করেন, তাঁহার নিকট লব্ধবিদ্যার সাফল্য লাভের জন্য কোন পরীক্ষার নিমিত্ত এই নির্জ্জন স্থানে জমিদারের পুরাতন বাটী ক্রয় করিয়াছেন। রঘুনাথ রায় যে অসাধারণ বুদ্ধি বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই।

আর এক দিন রঘুনাথ বলিলেন "তোমার বোধ হয় খুব একা বোধ হয়, পড়বার ঘরে যে বইগুলি আছে ইচ্ছা হলে সেই সব নিয়ে পড়ো।"

আমি তাহাই করিলাম। চারিটা আলমারি পরিপূর্ণ বহুমূল্য, দুষ্প্রাপ্য, ইংরাজি, সংস্কৃত, হিন্দি বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসগ্রন্থ। এক দিন

রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি ঐ ছোট ঘরে অনেক্ষণ পরিশ্রম করেন। আমি কি আপনার কোন সাহায্য করতে পারি?" রঘুনাথ একটু চমকিত ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, বোধ হয় কোন সাহায্য করতে পারবে না।" দিনগুলি এইরূপে কাটিতে লাগিল। কিন্তু ঐ একটি ঘরে কি আছে, রঘুনাথ কি করেন তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াইতে যাইতাম, গ্রামনিবাসীগণ নূতন ডাক্তারবাবুর বিষয় কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল তিনি যে বিনা অর্থে গ্রামশুদ্ধ লোকের চিকিৎসা করিতেন এবং ঔষধ দিতেন ইহাই জানিতে পারিলাম। ক্রমে যেন মনে হইল রঘুনাথের ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সর্ব্বদা যেন কি এক চিন্তায় মগ্ন। খাওয়া দাওয়া একেবারে কমিয়া গেল। অস্থিরভাবে মাঝে মাঝে বারাণ্ডায় পদচারণ করিতেন ও অস্পষ্ট ভাষায় আপন মনে কি বলিতেন। কখনও দেখিতাম স্থির নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। কখনও অলসভাবে সব কাজ ফেলিয়া বসিয়া আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে মামার কোন চিঠি না পাইয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। হাতে একটি পয়সা নাই। এই নির্জ্জন স্থানে এক অদ্ভুত স্বভাবের ব্যক্তির সহিত বাস করা যেন অসহ্য হইয়া পড়িল। এক দিন সন্ধ্যা বেলা বারাণ্ডায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া দূরে গ্রাম ও নদীর সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছি, এমন সময় দেখিলাম রঘুনাথ তাঁহার ব্যাগ হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। এত শীঘ্র বাড়ী আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি বারাণ্ডায় আসিলেন কিন্তু আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, দ্রুতপদে পাশ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলেন, কিন্তু যখন

নিকটে আসিলেন, একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলাম। তখনি সেই তালা-বন্ধ-ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। কখন বাহির হইলেন জানি না, আমি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলাম। তার পরদিন উঠিয়া দেখি একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্রমে সন্ধ্যাবেলা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু রঘুনাথ নিয়ম মত তাঁহার ব্যাগ হাতে লইয়া বাহির হইলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরে খুব ঝড় উঠিল। আমি খাইয়া শয়ন করিতে গেলাম, রঘুনাথ এই ঝড়ে কোথায় আছেন তাই ভাবিলাম। পরদিন অতি ভোরে বৃদ্ধা ঝি আসিয়া জাগাইয়া বলিল—

"নরেন বাবু, ডাক্তার বাবুর বোধ হয় জ্বর হয়েছে, আজ ভোরে বাড়ী ফিরেছেন, তার পর কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। একবার উঠে দেখুন।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম, দেখিলাম যথার্থই রঘুনাথের জ্বর—জ্বরে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, আর মাঝে মাঝে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছেন। আমি সেবা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাবেলা রোগী আরও ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। চোখ দুটি রক্তবর্ণ। চারিদিকে চাহিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন।

"এবার সব যোগাড় করেছি, কাজও প্রায় শেষ হয়েছে। উঃ ভাবলে কি আনন্দ হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে ও মানুষের চেষ্টায় কিছুই অসাধ্য নয়। ভগবান আমাকে বল দাও! উদ্দেশ্য সাধনে যদি পাপ করতে হয় ক্ষমা কর! কার্য্য সাধন হলে কি মহৎ উপকার হবে! ভারতবর্ষ এক নূতন, শ্রেষ্ঠ, বলবান মনুষ্য জাতিতে পরিপূর্ণ হবে। দেহ ত প্রস্তুত হয়েছে, কেবল প্রাণ দিতে হবে। সন্ন্যাসীর শিক্ষা কি নিষ্ফল হবে?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রঘুনাথ আবার বলিতে লাগিলেন "প্রত্যেক

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শিরা, অস্থি, মাংস, রক্ত, সব সম্পূর্ণ, কেবল একটি জিনিস নেই। কিন্তু কোথায় পাব। কোথায় একটি নব উৎপাটিত উষ্ণ মনুষ্য হৃদয় পাব। ওর দেহে সংলগ্ন করব। পাপ! এই বালকটির সামান্য জীবন এই মহৎ কার্য্যে উৎসর্গ করলে কি পাপ হবে? কখনও নয়! তবে দেরী করি কেন। এই একটি অভাবে কি সমুদায় পরিশ্রম চেষ্টা বৃথা হবে? উঃ কি তুফান! গাড়ী বুঝি ভাঙ্গল এখনি মরতে হবে। উঃ এ কি!"—বলিয়া রঘুনাথ ধড়াস করিয়া শুইয়া পড়িয়া অচেতন হইলেন। আমি মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই অভূতপূর্ব্ব কথা শুনিতেছিলাম। মেডিক্যাল কলেজে বৃথা দুই বৎসর পড়ি নাই। ক্রমে ইহার অর্থ যেন বুঝিতে লাগিলাম, কিন্তু মস্তিষ্ক ও হৃদয় উহা গ্রহণ করিতে চায় না, যত বার বুঝিতে চেষ্টা করিলাম ততবার দূর করিয়া দিলাম। হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ঐ ছোট ঘরে গিয়া একবার দেখিব কি আছে, তাহার পর এই স্থান হইতে পলাইব। উদ্বিগ্ন চিত্তে ঘরের চাবি খুঁজিতে লাগিলাম, অবশেষে রঘুনাথের কোটের পকেটে চাবি পাইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কোন রকমে দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। তৎক্ষণাৎ এক প্রবল এসিডের গন্ধ নাকে প্রবেশ করিল, আমি চারিদিক চাহিলাম। ঘরখানা ছোট, দেওয়ালে অনেক উঁচুতে দুটি ছোট উন্মুক্ত জানালা। নীচে দেওয়ালের গায়ে চারি পাশে তক্তা বসান, তাহার উপর নানা প্রকার ঔষধের ছোট বড় শিশি, বাক্স, ও নানা প্রকার অদ্ভুত যন্ত্র। ঘরের মধ্যস্থানে একটি লম্বা টেবিল তাহার উপর একটা দশ এগার ফুট দীর্ঘ টিনের টব উহা সাদা কাপড়ে ঢাকা। এই টেবিলের উপর আমার দৃষ্টি যেন একটা কি অজ্ঞাত-

ভাবে আকৃষ্ট হইল। বুঝিলাম এই কাপড় খানা তুলিলেই এই গুপ্ত ঘরের রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। ভয়ে ও কৌতুহলে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। হাত কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু যেন একটা মন্ত্রের দ্বারা চালিত হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাপড় খানা তুলিলাম। হে ভগবান!"—বলিয়া যুবকটি এক হাত দিয়া চোখ-ঢাকিল। একটু পরে হাত সরাইয়া আবার বলিতে লাগিল।

"যাহা দেখিলাম, তাহাতে রক্ত হিম হইয়া গেল। সেই দৃশ্য ইহা জীবনে ভুলিব না। একটা টিনের দর্ঘ টব, তাহাতে এক তরল হল্‌দে পদার্থের মধ্যে এক প্রকাণ্ড দশ ফুট্ লম্বা মনুষ্য দেহ ভাসিতেছে। কোথাও অসম্পূর্ণতা নাই, মুখের সমস্তই সুগঠিত। বড় বড় চক্ষু দুটিতে কোন ভাব নাই। মৃত মানুষের চক্ষের ন্যায় স্থির ভাবে নির্নিমেষ চাহিয়া আছে। উহার তারা কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অন্য অংশটি হল্‌দে। নীলবর্ণ শিরা রক্তে পরিপূর্ণ ধমনী, কিন্তু একটি জিনিসের অভাব, আর তাহাতেই সমুদয় যেন এক ভয়ঙ্কর অমানুষিক ভাব ধারণ করিয়াছে। যেখানে হৃৎপিণ্ড হইবে সেখানে এক বড় ফাঁক। শরীরের মাঝখানে এক ক্ষুধার্ত্ত রক্তবর্ণ শূন্যতা রাক্ষসের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া যেন কিছু চাহিতেছে। মানব দেহের সমুদায় যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে কেবল হৃদয় যন্ত্রটি নাই। বুঝিলাম এই অভাব পূর্ণ হইলে এই অদ্ভুত মনুষ্যদেহটি সজীব হইয়া উঠিবে। এই মানবহস্তরচিত বাক্যহীন, প্রাণবিহীন, হৃদয়হীন, না মৃত না জীবিত মনুষ্যের চক্ষুর উপর আমার মোহাকৃষ্ট চক্ষু স্থির ভাবে স্থাপন করিলাম। দেখিতে দেখিতে মনে হইল যেন সেই চক্ষু দুটিতে এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ভাব আসিল, যেন বলিল "আমার হৃদয় নাই, একটা হৃদয় দাও।" মনে হইল যেন এখনি বুঝি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রকাণ্ড দুই হাতে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিজের অভাব পূর্ণ করিবে।

আর চাহিতে পারিলাম না। বার বার শরীর শিহরিয়া উঠিল। চক্ষু বুজিলাম। বোধ হয় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম। আবার যখন চোখ খুলিলাম দেখিলাম দেওয়ালে ঠেস দিয়া কাঁপিতেছি। শীতল বাতাস অঙ্গ স্পর্শ করিল, বাতাসে দ্বারা খুলিয়া গিয়াছে। আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সোজা বাহিরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম, তালা বন্ধ করিলাম। রঘুনাথ তখনও অচেতন। চাবিটা ঘরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাড়ী ত্যাগ করিলাম, গ্রামাভিমুখে চলিলাম। শান্তিময় ক্ষুদ্র গ্রামটি। নবোদিত সূর্য্যকিরণ, নদীর স্বচ্ছ জল, সবুজ মাঠ, নৌকা, মাঝি, সব যেন আমাকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল—"সব স্বপ্ন, সব মিথ্যা, সে কি সম্ভব?" পিছনে চাহিয়া দেখিলাম বহুদূরে গাছপালার মধ্যে ডাক্তার রঘুনাথ রায়ের সাদা ছোট বাড়ীটি দেখা যাইতেছে। নৌকায় উঠিয়া নদী পার হইলাম। সেই স্থান হইতে আজ দুই দিন দুই রাত্রি হাঁটিয়া চলিতে চলিতে আপনাদের এই গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গল্প শেষ হইল, দেখিলাম যুবকের ওষ্ঠ শুষ্ক, ললাট ঘর্ম্মসিক্ত, মুখ বিবর্ণ। ভাবিলাম "এ ছেলেটির ডাক্তারি পড়া উচিত ছিল না। ইহার মন ও স্নায়ু নিশ্চয় অত্যন্ত দুর্ব্বল। হাড় ঘাঁটাঘাঁটি ও মৃতদেহ কাটাকাটি করিতে করিতে মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে। ইহার পাঁচ ছয় দিন পরে তাহার মাতুলের নিকট হইতে মণিঅর্ডারে টাকা আসিল। আমার নিকট বিদায় লইয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে "পদ্মা উইক্লি" (Padma Weekly) সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত প্যারাটি পড়িলাম :—

A living Human Monster :—A startling horrible tale

comes to us from the little village of S.—on the banks of one of the branches of the River Padma. We are told that a monster man about ten or eleven feet in height, appeared suddenly one morning in the village and went about killing men, women and cattle. He was quite naked. No one can say from where he came. He was first seen to issue from Dr. Raghunath Ray's house, which is a lonely little building on the outskirts of the village. After going about among the panic-stricken villagers and roaming in the woods, the monster returned at night to the said Doctor's house. The next morning he was found dead by some woodcutters in a little jungle close by. From the appearance of the huge dead body which was torn and mangled, it seemed as if he had been killed by some wild animal, probably a small leopard or wolf, which are often seen in these parts. It is difficult to believe that a living Rakshhas appeared in this age, but nevertheless about thirty or forty villagers and some policemen of the local thana solemnly affirm the truth of this awful tale. Dr. Raghunath Ray was subsequently found dead in his room. A huge stone was lying on his breast. It is believed that he met his death at the hands of this monster by a blow caused by the stone."

উহার মর্ম্মানুবাদ এই :—"এক অপূর্ব্ব রাক্ষস।—পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী স-গ্রাম হইতে এক ভীষণ ও লোমহর্ষণ কাহিনী আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এই গ্রামে হঠাৎ এক দিন প্রাতঃকালে এক এগার ফুট দীর্ঘ প্রকাণ্ড মনুষ্য দেখা যায়, এবং সে লোক জন ও ছাগল গরু আক্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই রাক্ষসতুল্য মনুষ্য সম্পূর্ণ নগ্ন ছিল।

কোথা হইতে, কবে আসিয়াছে কেহ বলিতে পারিল না। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম তাহাকে সেখানকার ডাক্তার রঘুনাথ রায়ের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই বাড়ী নির্জন স্থানে গ্রামের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত। ভীত গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সারাদিন দৌরাত্ম্য করিয়া এই অদ্ভুত মানব সন্ধ্যাবেলা পুনরায় উক্ত ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করে। পরদিন কয়েকজন কাঠুরিয়া তাহাকে নিকটস্থ বনে মৃত অবস্থায় পায়। তাহার প্রকাণ্ড শরীরের ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিয়া মনে হইল যে কোন হিংস্র জন্তু—সম্ভবতঃ সেই অঞ্চলের নেকড়ে বা চিতায়—তাহার প্রাণ লইয়াছে। এই কলিকালে এই প্রকারের বৃহদাকার রাক্ষস-তুল্য মনুষ্য যে জীবন্ত থাকিতে পারে তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, তথাপি প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন নরনারী এবং স্থানীয় থানার কতিপয় পুলিশ তাহাকে চাক্ষুষ করিয়াছে বলিয়া সাক্ষী দিতেছে। পরে ডাক্তার রঘুনাথ রায়ের মৃতদেহ তাঁহার বাটির এক কক্ষে পাওয়া যায়। তাঁহার বক্ষের উপর এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড। সকলের বিশ্বাস যে এই বিকটাকার প্রকাণ্ড রাক্ষসের হস্তেই প্রস্তরাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

বাঙ্গালা ভাষায় নাটক।

যখন পাইকপাড়ার স্বর্গীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ এবং মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি ধনী, বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যামোদী মহোদয়গণের যত্নে ও বিপুল অর্থব্যয়ে বেলগেছিয়ায় প্রথম রঙ্গভূমি স্থাপিত হয়, তখন বাঙ্গালা ভাষায় নাটক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথমে কতকগুলি সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালায় অনুদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। পরে ৺রাম নারায়ণ

শিরোমণি প্রণীত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব', 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি কতিপয় সামাজিক নাটক ঐ রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয়।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত উৎকৃষ্টতর নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার কৃপায় "শর্ম্মিষ্ঠা," "কৃষ্ণকুমারী" ও "পদ্মাবতী" রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

শুভ কি অশুভক্ষণে বলিতে পারি না, স্বর্গীয় মহাকবি থিয়েটারের সৃষ্টি করিয়া যান। পুরুষে স্ত্রীলোকের অভিনয় সুচারুরূপে করিতে পারে না, সুতরাং অভিনয় কার্য্যে স্ত্রীলোক আবশ্যক, এই বিশ্বাসে মাইকেল "থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করেন। থিয়েটারের সৃষ্টির পর মাইকেল অধিক দিন জীবিত ছিলেন না।

ইহা একপ্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, থিয়েটারের সৃষ্টির পর হইতে আমাদের বঙ্গভাষার নাটক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল,—এক ভাগ রঙ্গমঞ্চের জন্য—শুদ্ধ দর্শকবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য লিখিত এবং অপর ভাগ কাব্যের বিকাশের জন্য লিখিত।

স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারের চূড়ামণি। তাঁহার নাটক পড়িলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করেন নাই। অন্য মহত্তর উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। "নীলকর বিষধর"দিগের অত্যাচার কাহিনী সাধারণকে জানাইবার জন্য, প্রেমিকপ্রেমিকার বিশুদ্ধ প্রণয়চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে জলধরের ন্যায় "নাদাপেটা হাঁদারাম"-দিগের পাপকলুষিত চরিত্র সাধারণ্যে ব্যক্ত করিয়া সাধারণের উপকারের জন্য, সুরাপায়ী লম্পটদিগের দুর্দ্দশা জানাইয়া সকলকে সাবধান করিবার জন্য এবং রাজীবলোচনের ন্যায় বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর প্রতি অপেক্ষাকৃত নব্যদিগের ঘৃণা উৎপাদনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার হাস্যরসের আকর নাটকাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি অভিনয়ের জন্য

নাটক রচনা করিতেন, তাহা হইলে কদাচ নাটকে রুচিবিগর্হিত শব্দের বা বাক্যের প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহার ন্যায় এক জন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির জানা ছিল, যে এমন অনেক কথা আছে যাহা লিখিতে পারা যায় কিন্তু সকলের সমক্ষে বলা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, যে তিনি অভিনয়ের জন্য নাটক লেখেন নাই।

যাঁহারা অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাম অগ্রগণ্য। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে এমন বিষয় অতি অল্পই আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তিনি নাটক রচনা করেন নাই। গিরীশবাবু অভিনয়োপযোগী এক প্রকার নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তক।* সে ছন্দে মধুর অনুপ্রাসপূর্ণ পদবিন্যাসে বলিবার ও শুনিবার সুখ হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। নাটক যত স্বাভাবিক হয় ততই ভাল। নাটকের পাত্রপাত্রী পদ্যে কথা কহিবেন কেন? সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকাদিতে গদ্যে পদ্যে কথাবার্ত্তা আছে—বোধ হয় ইহা তাহারই অনুকরণ।

গিরীশবাবুর বিষয়নির্ব্বাচনের তত সুখ্যাতি করিতে পারি না। রামায়ণ বা মহাভারতের সকল বিষয়ই কিছু নাটকের উপাদান হইতে পারে না। নাটকে বৈচিত্র্য থাকা আবশ্যক। নাট্যোলিখিত পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র কাব্য বা ইতিহাসোক্ত পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে দর্শক বা পাঠকের চিত্তপটে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক। 'নীলদর্পণ' নাটকের গল্পটি যদি কেহ আমাদের কাছে করে, তবে আমরা কি এত বিচলিত হই? পুরাণোক্ত কোন চরিত্রই গিরীশবাবু আমাদিগকে উজ্জ্বলতররূপে দেখাইতে পারেন নাই। কাব্যে মধুসূদন যেমন রামচরিত্র দেখাইয়াছেন, নাটকে গিরীশ-

* এই ছন্দের আদি প্রবর্ত্তক ৺কবি রাজকৃষ্ণ রায়। কিন্তু তাঁহার নাম তত পরিচিত নহে। ভাঃ সং।

শিরোমণি প্রণীত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব', 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি কতিপয় সামাজিক নাটক ঐ রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয়।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত উৎকৃষ্টতর নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার কৃপায় "শর্ম্মিষ্ঠা," "কৃষ্ণকুমারী" ও "পদ্মাবতী" রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

শুভ কি অশুভক্ষণে বলিতে পারি না, স্বর্গীয় মহাকবি থিয়েটারের সৃষ্টি করিয়া যান। পুরুষে স্ত্রীলোকের অভিনয় সুচারুরূপে করিতে পারে না, সুতরাং অভিনয় কার্য্যে স্ত্রীলোক আবশ্যক, এই বিশ্বাসে মাইকেল "থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করেন। থিয়েটারের সৃষ্টির পর মাইকেল অধিক দিন জীবিত ছিলেন না।

ইহা একপ্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, থিয়েটারের সৃষ্টির পর হইতে আমাদের বঙ্গভাষার নাটক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল,—এক ভাগ রঙ্গমঞ্চের জন্য—শুদ্ধ দর্শকবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য লিখিত এবং অপর ভাগ কাব্যের বিকাশের জন্য লিখিত।

স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারের চূড়ামণি। তাঁহার নাটক পড়িলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করেন নাই। অন্য মহত্তর উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। "নীলকর বিষধর"দিগের অত্যাচার কাহিনী সাধারণকে জানাইবার জন্য, প্রেমিকপ্রেমিকার বিশুদ্ধ প্রণয়চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে জলধরের ন্যায় "নাদাপেটা হাঁদারাম"-দিগের পাপকলুষিত চরিত্র সাধারণ্যে ব্যক্ত করিয়া সাধারণের উপকারের জন্য, সুরাপায়ী লম্পটদিগের দুর্দ্দশা জানাইয়া সকলকে সাবধান করিবার জন্য এবং রাজীবলোচনের ন্যায় বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর প্রতি অপেক্ষাকৃত নব্যদিগের ঘৃণা উৎপাদনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার হাস্যরসের আকর নাটকাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যদি অভিনয়ের জন্য

নাটক রচনা করিতেন, তাহা হইলে কদাচ নাটকে রুচিবিগর্হিত শব্দের বা বাক্যের প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহার ন্যায় এক জন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির জানা ছিল, যে এমন অনেক কথা আছে যাহা লিখিতে পারা যায় কিন্তু সকলের সমক্ষে বলা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, যে তিনি অভিনয়ের জন্য নাটক লেখেন নাই।

যাঁহারা অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাম অগ্রগণ্য। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে এমন বিষয় অতি অল্পই আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তিনি নাটক রচনা করেন নাই। গিরীশবাবু অভিনয়োপযোগী এক প্রকার নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তক।* সে ছন্দে মধুর অনুপ্রাসপূর্ণ পদবিন্যাসে বলিবার ও শুনিবার সুখ হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। নাটক যত স্বাভাবিক হয় ততই ভাল। নাটকের পাত্রপাত্রী পদ্যে কথা কহিবেন কেন? সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকাদিতে গদ্যে পদ্যে কথাবার্ত্তা আছে— বোধ হয় ইহা তাহারই অনুকরণ।

গিরীশবাবুর বিষয়নির্ব্বাচনের তত সুখ্যাতি করিতে পারি না। রামায়ণ বা মহাভারতের সকল বিষয়ই কিছু নাটকের উপাদান হইতে পারে না। নাটকে বৈচিত্র্য থাকা আবশ্যক। নাট্যোলিখিত পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র কাব্য বা ইতিহাসোক্ত পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে দর্শক বা পাঠকের চিত্তপটে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক। 'নীলদর্পণ' নাটকের গল্পটি যদি কেহ আমাদের কাছে করে, তবে আমরা কি এত বিচলিত হই? পুরাণোক্ত কোন চরিত্রই গিরীশবাবু আমাদিগকে উজ্জ্বলতররূপে দেখাইতে পারেন নাই। কাব্যে মধুসূদন যেমন রামচরিত্র দেখাইয়াছেন, নাটকে গিরীশ-

---

* এই ছন্দের আদি প্রবর্ত্তক ৺কবি রাজকৃষ্ণ রায়। কিন্তু তাঁহার নাম তত সুপরিচিত নহে। ভাঃ সং।

বাবু তাহার লক্ষাংশের এক অংশও পারেন নাই। অথচ কাব্য অপেক্ষা নাটক স্পষ্টতর হওয়া উচিত। গিরীশবাবুর পৌরাণিক নাটক যেন গল্প; তবে গ্রন্থকার তাহাদের কথা নিজে না বলিয়া যার যা তার মুখে বলাইয়াছেন। তাঁহার পাত্রপাত্রীদিগের কোন কার্য্যে বা ব্যবহারে আমাদের পূর্ব্ব সংস্কারের উন্নতি হয় না।'

স্যর্ এডুইন্ আর্ণল্ড্ প্রণীত The Light of Asia নামক গ্রন্থাবলম্বনে গিরীশবাবু "বুদ্ধদেবচরিত" নামক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার গুণটুকু স্যর্ এডুইনের দোষটুকু গিরীশবাবুর। Light of Asiaকে নাটকে করিতে গেলে Light আরও বাড়াইতে হয়, কিন্তু তাহা না হইয়া উহা অতি মৃদু ও ক্ষীণ দীপরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

সামাজিক নাটকের মধ্যে "বিল্বমঙ্গল" ও "প্রফুল্ল" অতি উচ্চ স্থানে অবস্থিত। বিল্বমঙ্গলে বহু দোষ আছে,—প্রফুল্লে দোষ নাই বলিলেও হয়। তাঁহার অসংখ্য নাটকাবলীর মধ্যে "প্রফুল্ল" বাস্তবিকই প্রফুল্ল। অন্যগুলি ইহার কাছে নিতান্ত ম্লান।

গিরিশবাবু "চণ্ড" নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন। উহা তাঁহার অন্যান্য অনেক নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। "মুকুলমুঞ্জরা" কাব্যাংশে উত্তম।

"বেল্লিকবাজার" "সপ্তমীতে বিসর্জ্জন," "বড় দিনের বক্‌সিস্" "সভ্যতার পাণ্ডা" প্রভৃতি প্রহসন গিরীশচন্দ্রের কলঙ্ক। তাঁহার গীতিনাট্যের মধ্যে একখানিও ভাল নহে। "মলিনা বিকাশের" দুই একটি সঙ্গীতমাত্র প্রাণমুগ্ধকারী।

গিরীশবাবুর লেখনী এখনও পরিশ্রান্ত নহে। সাধারণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত পুস্তক লিখিতে গিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিতেছেন। তবে আশা হয়, যে গোবরে সালুক ফোটার মত

হয় ত ইহার মধ্য হইতে কালে "প্রফুল্লের" সমকক্ষ নাটক রচিত হইবে।

এই শ্রেণীর নাট্যকারের মধ্যে ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম গিরীশবাবুর পরেই উল্লেখযোগ্য। তাঁহার "অবসর সরোজিনী," রামায়ণ, মহাভারত, ও গল্পকল্পতরুর একমাত্র পুষ্প "হিরণ্ময়ী" বাঙ্গালীর আদরের বস্তু। উদরান্নের জন্য লালায়িত প্রতিভাসম্পন্ন কবি শেষে মূর্খের মনোরঞ্জনের জন্য "দেখা বেটা সব খুলে, নৈলে গাল্ দেব বাপ্ তুলে" গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বীণারঙ্গমঞ্চে অভিনীত গ্রন্থাবলী অধিকাংশই অপদার্থ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য-উপাখ্যানগুলির আলোচনা করিয়া স্বর্গীয় কবির ভক্তদিগের মনে ব্যথা দিবার ইচ্ছা নাই। একটা কথা বলা যাইতে পারে যে তিনি যে কোন পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলগুলির মধ্যেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়—বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার প্রতিভা বিপথে পরিচালিত হইয়াছিল। শেষ দশায় তিনি কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি নিতান্ত মন্দ নহে। কবিত্ব সকলগুলিতেই আছে।

গিরীশচন্দ্রের ছোট বড় অনেক শিষ্য আছেন। তন্মধ্যে বাবু অমৃতলাল বসু ধনঞ্জয়ের ন্যায় গুরুকেও পরাজিত করিয়াছেন। তাঁহার এই "গুরু মারা বিদ্যা" আমাদিগকে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উপহার দিয়াছে। "তরুবালা" যাবতীয় বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের শীর্ষস্থানীয়। পুরাতন বিজয়-বসন্তের গল্পের রাণীকে Lady Macbeth এর ছাঁচে ঢালিয়া তিনি আমাদিগকে নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। "চণ্ডকৌশিকের" ছায়াবলম্বনে লিখিত হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রকে তিনি আরও উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন।—দুঃখের বিষয়, এই তিনখানি ব্যতীত তাঁহার আর নাটক নাই। ইহাতে বুঝা যায়, যে গিরীশচন্দ্রের বা রাজকৃষ্ণের উর্ব্বরতা তাঁহার নাই কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে। তাঁহাকে

নাটক লিখিতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, অনেক বিলম্ব হয়, কিন্তু লিখিত নাটকগুলি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হয়।

"বিবাহ বিভ্রাট" নামক প্রহসনের কথা এখানে না লেখাই ভাল। আমার পূর্ব্বে অনেক উৎকৃষ্টতর লেখক ইহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী তাঁহাদের ন্যায় গুছাইয়া বলিতে পারিব কি?—Uncle Tom's Cabin বা নীলদর্পণের যাহা মূল্য বিবাহ বিভ্রাটের মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তিনি আরও অনেক প্রহসন রচনা করিয়াছেন সেগুলি বিবাহবিভ্রাটের সমকক্ষ না হউক, মন্দ নহে, আধুনিক "মুখসর্ব্বস্ব" বাঙ্গালী বীরদিগের নিখুঁৎ ফটোগ্রাফ। গ্রীসদেশীয় পরিহাসরসিক Aristophanesএর ন্যায় তাঁহার গ্রন্থাবলী যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ।

অমৃতবাবুর পুস্তকের অনেক স্থল অশ্লীলতা দোষদুষ্ট। সেগুলির পরিহার একান্ত বাঞ্ছনীয়। সমাজবিশেষকে বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া বিদ্রূপ করা আর উচিত হয় না। লেবু অধিক কচ্‌লাইলে তিক্ত হইয়া যায়। তিনি "একাকার" বা "গ্রাম্যবিভ্রাটের" ন্যায় পুস্তক রচনা করুন ক্ষতি নাই—কিন্তু "বাবু" বা "বৌমার" ন্যায় পুস্তক বাঞ্ছনীয় নহে। "কালাপানির" ন্যায় গ্রন্থে হুজুকপ্রিয়গণকে তিরস্কার করুন সহ্য করিব, কিন্তু "রাজবাহাদুরের" ন্যায় গ্রন্থে অনাবশ্যক সম্প্রদায়বিদ্বেষ সহ্য করিতে পারিব না। অনাবশ্যক অশ্লীলতার অবতারণায় রসভঙ্গ ঘটিয়াছে। অনেক দর্শক ঐ সব দেখিতে ভালবাসেন। অমৃত বাবুই তাহাদিগের রুচি কতকটা বিকৃত করিয়াছেন। আবার তিনিই চেষ্টা করিলে উহার উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন। অমৃতবাবুর লেখনীও নিশ্চল নহে। আশা আছে, তিনি উৎকৃষ্ট নাটক এবং শিক্ষাপ্রদ প্রহসনের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবেন।

থিয়েটারের জন্য লিখিত নাটকের আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশের ভূমি সাতিশয় উর্ব্বরা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে উক্তদেশের লেখকের মস্তিষ্ক আরও অধিক উর্ব্বর। কথোপকথনের প্রণালীতে পুস্তক মাত্রই নাটক এবং তাহা কোন প্রকারে একবার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাইতে পারিলে আর রক্ষা নাই, সেক্সপিয়ার, কালিদাসের ন্যায় তাঁহার ভক্তের ছড়াছড়ি, বিশেষতঃ যদি সে নাটকে নাচ গানের প্রাচুর্য্য থাকে।

অশুভক্ষণে মাইকেল থিয়েটারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন কি, যে কালে থিয়েটার কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলার মুণ্ডচর্ব্বণ করিবে? তিনি জানিতেন কি যে কালে সেই থিয়েটারের জন্য লিখিত পুস্তকাবলা দীনা বঙ্গভাষাকে হত্যা করিবে? তিনি জানিলে এমন কুকর্ম্ম কদাচ করিতেন না।

সমাজে থিয়েটারের আবশ্যকতা কি? দর্শকদিগকে বিশুদ্ধ আমোদ দেওয়া, রহস্যচ্ছলে শিক্ষা দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরসাস্বাদন করান। এখন থিয়েটারে আমোদ দেয় বেশ্যার বিলাসভঙ্গী সমন্বিত নৃত্য, সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলের রঙ্গমঞ্চের উপর সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বেল্লিকপনা! শিক্ষা দেয় যে তোমরা আসিয়া ইহা দেখ—তোমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হইবে।—কাব্য কি? না—অশ্লীল সঙ্গীত এবং "আহা! আহা!!" "উহু! উহু!!" "গেলেম! গেলেম!!"—নয় বক্তৃতা।

নাটক পড়িয়া অর্থ করে কাহার সাধ্য? পরের গল্প গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লেখকের নাই, আছে খালি নাচ আর গান! সে গানের না আছে মাথা না আছে মুণ্ড! না আছে স্থান অস্থানের বিচার, না আছে সম্ভব অসম্ভব জ্ঞান। যিনি গুরু ভোজনে চলচ্ছক্তি রহিত, তিনিও নাচিয়া, গাহিয়া, "ক্যাপিটেল" "এন্‌কোর" লইয়া যান। যিনি সামান্য ক্রীতদাসী তিনি সুশিক্ষিতা নায়িকাজনোচিত

প্রেমপরিপূর্ণ গীত গাহিতেছেন, চাকরের সহিত জঘন্য ইয়ারকি দিতেছেন আবার প্রভুপুত্রের প্রণয়ে হাবুডুবু খাইতেছেন, মনিব বা মনিবের স্ত্রীর সহিত গান গাহিয়া কথা কহিতেছেন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়া রঙ্গমঞ্চের উপর বেলেল্লা কাণ্ড করিতেছেন। আসন্নমৃত্যু যমভয়ভীত, জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির অভিনয় দেখিয়া লোকে হাসিয়া অস্থির হয়। তাঁহার বাক্যবিন্যাস এমনই সুসঙ্গত! গল্পে যে স্থান পড়িয়া দুঃখে, ভয়ে অভিভূত হইতে হয়, নাটকে অভিনয় দেখিয়া মনে হয় যে সে বেশ মজা করিতেছে! দর্শকেরও স্ফূর্ত্তি দেখে কে? এক একজন সাত সাতজনের গলা লইয়া বাহবা দিতেছে. নাট্যকার ও অভিনেতা একেবারে গলিয়া যাইতেছেন! হা মাতঃ বঙ্গভাষা! কতদিনে তুমি এই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কসাইদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবে?

বঙ্কিমবাবুকে লইয়া টানাটানি থিয়েটার মহলে একটা "ফ্যাসান্" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "ইন্দিরা," "দেবীচৌধুরাণী" বা "আনন্দমঠের" অভিনয় দেখিতে যাও—বঙ্কিমকে চিনিতে পারিবে না। যথেষ্ট নাচ গান কিন্তু আছে। প্রহসনকার সাধ করিয়া বলেন নাই যে "নাচ গানের অভাব কি? মেজবৌকে খিড়কীর পুকুরে নাচাইলেই চলিবে।"—যাহারা বঙ্কিমের উপন্যাসের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে না—তাহারা তাঁহার পুস্তক লইয়া নাটক লিখিতে যায়, ইহা কি সামান্য বিড়ম্বনা!

কলিকাতার কোন রঙ্গমঞ্চে এমন একখানি প্রহসন অভিনীত হয় যে তাহা পুলিশ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। দোষ দিব কাহার? গ্রন্থকর্ত্তার না শ্রোতৃমণ্ডলীর? আমাদের বোধ হয় যে উভয়েই সমান দোষী।

বলা বাহুল্য যে ইহার প্রতীকার প্রার্থনীয়। কিন্তু প্রতীকার করে কে? যদি কোন থিয়েটার সম্প্রদায় ইহার প্রতীকারপরায়ণ হন,

তবে তাঁহাদের নাট্যশালায় আর দর্শক হইবে না। দেশের সাহিত্যিক মহারথীগণ "থিয়েটার অশ্লীল" বলিয়া ইহার দিকে ফিরিয়াও চাহেন না—তবে কি কোন উপায় নাই ?

আপাততঃ কোনও উপায় নাই দেখিয়া ঢাকা কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ মিঃ ই এফ্ মণ্ডি মহাশয় ছাত্রগণের থিয়েটার গমন নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও সত্বাধিকারিগণ যদি এই নিয়ম করেন তবে অভদ্র থিয়েটার সম্প্রদায়গুলি বড় জব্দ হয়। অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ছাত্রগণই অধিক থিয়েটারে গিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যিনি রঙ্গভূমির সহিত আদৌ পরিচিত নহেন, তিনি দৃশ্যকাব্য প্রণয়নের অধিকারী নহেন। দৃশ্যকাব্য রচনা করিতে হইলে অভিনেতৃবর্গের মুখপানে একটু চাহিতে হয়। একথা মুদ্রারাক্ষসকার বিশাখদত্ত বলিয়া গিয়াছেন।

"সঙ্গীত সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইলে মনে করিয়াছিলাম যে উহাতে অনেক গুণীব্যক্তির সমাবেশ আছে অতএব আশা করা যাইতে পারে যে, এইবার অভিনয়োপযোগী দৃশ্যকাব্য রচিত হইতে আরম্ভ হইবে। কিন্তু হায়! পর্ব্বত মূষিকশিশুও প্রসব করিল না। সঙ্গীত সমাজের রঙ্গমঞ্চে চর্ব্বিতচর্ব্বণ চলিয়াছে।

নাটক জাতিবিশেষের গৌরবচিহ্ন। রোম, গ্রীস, পুরাতন ভারত, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সমস্ত দেশেই উৎকৃষ্ট নাটক আছে—নাই কেবল আমাদের। আমরা অবশ্য কোন বিষয়েই উক্ত দেশসমূহের সমকক্ষ নহি। কিন্তু আমরা কাব্যে বা উপন্যাসে যতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, নাটকে ততদূর পারিতেছি না কেন ?

এক্ষণে, কেবল মাত্র কাব্যালোচনার জন্য যে সমস্ত নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

৺দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থের কথা প্রথমেই একটু বলিয়াছি। তিনি আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান নাট্যকার। এত অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট নাটক কোন বঙ্গীয় নাট্যকারের লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। তাঁহার নাটকাবলী অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু অমেধ্য হইতে কাঞ্চনের ন্যায় উহার মধ্য হইতে নীতি বা কাব্যটুকু আমাদের সর্ব্বাংশে গ্রহণীয়।

সুরুচিসঙ্গত নাটক অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের দিকে চাহিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নাটকাবলী অতি উপাদেয়। কিন্তু আমার মতে তাহাদের ভাষা নাটকোপযোগী নহে। সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে নাটকের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে। সেই ভাষায় রচিত না হইলে নাটকের বলভঙ্গ হয়। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। অনেকেই অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। উপসংহারে "ক্ষম গো সখা" গীতে যদি "এন্‌কোর্‌" পড়ে, তবে কাব্যকার কি করিবেন? তবে মুসলমানবিদ্বেষী প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতীর সেলিমের প্রতি ভালবাসা কেমন অসম্ভব মনে হয়। মোট কথা জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর নাটকের কথা লোকের কাছে বলিবার যোগ্য—বলিয়া গৌরব করিবারও যোগ্য।

আমাদের গৌরবরবি রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটকের সমালোচনার সময় আসে নাই। কারণ রবীন্দ্রবাবুর নিকট আমরা এখনও অনেক আশা করি—তিনি যদি আমাদের কথা শুনিয়া এরূপ মনে করিয়া বসেন যে লোকে আমার নাটক বুঝেনা, দূর ছাই, তবে কাহার জন্য নাটক লিখিব?—আর লিখিব না; তবে ক্ষতি আমাদেরই। অতএব এসম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মাকৃত "নব-বৃন্দাবন নাটক" ধর্ম্মমূলক। ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র সুতরাং আলোচনাও

তন্ত্র হওয়া উচিত। আর বোধ হয়, আলোচনা করিবার লোকও তন্ত্র হইলে ভাল হয়। তবে তাহাকে অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য অভিনেতৃবর্গ যে "We are reformed Hindoos" প্রভৃতি নিয়োজনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না। দেবালয়ে আবর্জ্জনা আনিতে নাই।

কবিবর হেমচন্দ্রের "নলিনী-বসন্ত" সেক্সপীয়রের The Tempest নামক নাটক অবলম্বনে লিখিত। উভয়ে প্রভেদ বিস্তর। নলিনী-বসন্ত পড়িতে ভাল লাগে না। অভিনয় করিলেও ভাল লাগিবে না।

আমরা নাটকাকারে গল্প বা কাব্যের পক্ষপাতী নহি। সেইজন্য বঙ্গভাষায় যে সমস্ত "না-মিষ্টি-না-টক" আছে তাহাদের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই।

শুনিয়াছি বঙ্কিমবাবু বলিতেন যে, "বাঙ্গলায় নাটক লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।" সেইজন্যই বোধকরি, তিনি নিজে নাটক লেখেন নাই। বঙ্গভাষার উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সময় কি আজও আসে নাই? যদি আসিয়া থাকে তবে নাটক কই? যদি না আসিয়া থাকে তবে আরও কতকাল বেল্লিকের প্রাবল্য থাকিবে?

শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

৺দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থের কথা প্রথমেই একটু বলিয়াছি। তিনি আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান নাট্যকার। এত অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট *নাটক কোন বঙ্গীয় নাট্যকারের লেখনী হইতে বাহির হয় নাই।* তাঁহার নাটকাবলী অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু অমেধ্য হইতে কাঞ্চনের ন্যায় উহার মধ্য হইতে নীতি বা কাব্যটুকু আমাদের সর্ব্বাংশে গ্রহণীয়।

সুরুচিসঙ্গত নাটক অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের দিকে চাহিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নাটকাবলী অতি উপাদেয়। কিন্তু আমার মতে তাহাদের ভাষা নাটকোপযোগী নহে। সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে নাটকের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে। সেই ভাষায় রচিত না হইলে নাটকের বলভঙ্গ হয়। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। অনেকেই অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। উপসংহারে "ক্ষম গো সখা" গীতে যদি "এন্‌কোর্" পড়ে, তবে কাব্যকার কি করিবেন? তবে মুসলমানবিদ্বেষী প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতীর সেলিমের প্রতি ভালবাসা কেমন অসম্ভব মনে হয়। মোট কথা জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর নাটকের কথা লোকের কাছে বলিবার যোগ্য— বলিয়া গৌরব করিবারও যোগ্য।

আমাদের গৌরবরবি রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটকের সমালোচনার সময় আসে নাই। কারণ রবীন্দ্রবাবুর নিকট আমরা এখনও অনেক আশা করি—তিনি যদি আমাদের কথা শুনিয়া এরূপ মনে করিয়া বসেন যে লোকে আমার নাটক বুঝেনা, দূর ছাই, তবে কাহার জন্য নাটক লিখিব?—আর লিখিব না; তবে ক্ষতি আমাদেরই। অতএব এসম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মাকৃত "নব-বৃন্দাবন নাটক" ধর্ম্মমূলক। ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র সুতরাং আলোচনাও

স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। আর বোধ হয়, আলোচনা করিবার লোকও স্বতন্ত্র হইলে ভাল হয়। তবে তাহাকে অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য অভিনেতৃবর্গ যে "We are reformed Hindoos" প্রভৃতি গানযোজনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করিতে পারি না। দেবালয়ে আবর্জ্জনা আনিতে নাই।

কবিবর হেমচন্দ্রের "নলিনী-বসন্ত" সেক্সপীয়রে The Tempest নামক নাটক অবলম্বনে লিখিত। উভয়ে প্রভেদ বিস্তর। নলিনী-বসন্ত পড়িতে ভাল লাগে না। অভিনয় করিলেও ভাল লাগিবে না।

আমরা নাটকাকারে গল্প বা কাব্যের পক্ষপাতী নহি। সেইজন্য বঙ্গভাষায় যে সমস্ত "না-মিষ্টি-না-টক" আছে তাহাদের বিস্তারিত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা নাই।

শুনিয়াছি বঙ্কিমবাবু বলিতেন যে, "বাঙ্গলায় নাটক লিখিবার সময় এখনও আসে নাই।" সেইজন্যই বোধকরি, তিনি নিজে নাটক লেখেন নাই। বঙ্গভাষার উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সময় কি আজও আসে নাই? যদি আসিয়া থাকে তবে নাটক কই? যদি না আসিয়া থাকে তবে আরও কতকাল বেল্লিকের প্রাবল্য থাকিবে?

শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

অর্জ্জুন

(১)

সাধনা ।

ওহে দেব-দেব ! পূর্ণ করহ কামনা !
এই নির্জ্জন গিরি-কন্দরে
আমি ভরিয়া এনেছি অন্তরে
ক্ষুদ্র আমার ক্ষুব্ধ-হৃদয়-যাতনা ।
অতি তুচ্ছ স্বার্থ লভিতে
প্রভো আসেনি পার্থ নিভৃতে,
সম্পদে সুখে নাহিক তাহার ভাবনা ।
নহি সন্ন্যাসী যতি আমি গো,
নহি যোগী তপস্বী, স্বামী গো !
পরম মোক্ষ করিতে আসিনি যাচনা । ১ ।

ওহে দেব-দেব ! শুনহ আমারে বেদনা !
কভু পারিনা এ জ্বালা সহিতে
প্রভো নরাধম যারা মহীতে
পাপিষ্ঠ যারা কাপুরুষ, করে ছলনা,
তারা সম্পদে সুখে বিভবে
সদা গৌরবে রবে এ ভবে ;
কলঙ্কে রবে তোমার এ ধরা মলিনা !
তাই সংসার সুখ তেজিয়া
এই বিজনে কুটীর রচিয়া
কহিতে এসেছি, সহিনু দুঃখ যত না ! ২ ।

ওহে দেব-দেব পূর্ণ করহ কামনা!

আমি নাহি চাহি বর অন্য

কর পাণ্ডব-কুল ধন্য :

সফল করহ কঠোর আমার সাধনা।

দেহ ক্ষত্রিয়োচিত বীর্য্য,

দেহ চঞ্চল চিতে ধৈর্য্য,

দীপ্ত করহ বৈরী-বিনাশ-বাসনা।

দেহ বীরের মন্ত্রে দীক্ষা,

দেহ ধর্ম্ম-যুদ্ধ শিক্ষা,

দুর্জ্জন বধে অর্জ্জুনে দেহ মন্ত্রণা। ৩

---

(২)

প্রতিজ্ঞা।

সপ্তরথী মিলিয়া যদি

বধিল মম কুমারে—

করিব হত যোদ্ধা শত

নিঠুরতর সমরে।

পশুর মত অশূরোচিত-

কর্ম্মীগণে বধিব।

বাজারে ভেরী শঙ্খ তুরী,

একাকী রণে যুঝিব। ১

আনহ অসি সমরে পশি ;

দেহ গো ধনু গাণ্ডীব ;

কৌরবের গৌরবের

ধূলিতে পদ মণ্ডিব।

সিন্ধু যত সিন্দূরিত
করিব কুরু-রুধিরে।
শঙ্খতুরী পণগভেরী
বাজারে আজি অধীরে। ২

সাক্ষীরহ সূর্য্যগ্রহ,
না যেতে তুমি অস্তে—
বধিব আজি সিন্ধুরাজে
একেলা এই হস্তে।
শুনহ সবে ত্রিদিবে ভবে
ভীষণপণ-ঘোষণা!
পণগতুরী শঙ্খভেরী
বাজারে রণ বাজনা। ৩

যদি গো ভবে জীবিত রবে
পামর রথী নিশাতে,
তুচ্ছ প্রাণ করিব দান
আপনা শর আঘাতে।
জীবন-পণে পশিনু রণে,
রহগো রবি জাগিয়া!
বাজারে ভেরী শঙ্খ তুরী
সিন্ধু-রাজে ডাকিয়া। ৪

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

———

বর্ণ-মালার ইতিহাস।*

(১)

আমরা অক্ষরের সাহায্যে নানাপ্রকার মানসিক ভাব প্রকাশ করি। অ, আ, ক, খ প্রভৃতি অক্ষর সমূহ এক্ষণে আমাদের নিকট অতিসহজ ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় মনুষ্য বুদ্ধিবলে যত পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছে, তন্মধ্যে অক্ষরের আবিষ্কার অত্যন্ত দুরূহ ও সবিশেষ বিস্ময়জনক। অক্ষর মানবজাতির অভ্যুদয়ের সমুজ্জ্বল জয়-পতাকা এবং ইহাই আমাদের উন্নতির প্রধান সাধন।

অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বের সভ্যতা।

অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বে মানবজাতি অসভ্য ছিল, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। অক্ষর আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও মনুষ্য কোন কোন বিষয়ে অভ্যুন্নতি লাভ করিয়াছিল। শিল্প, ধাতুবিদ্যা, সংগীত ও কাব্য এ সকল বিষয়ের উন্নতি অক্ষরের আবিষ্কারের উপর সবিশেষ নির্ভর করে না। ছাতা, বেড়ী, হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ অক্ষর-সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের ব্যবহার অতিপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। প্রকৃতির স্নিগ্ধ-গম্ভীর বা উগ্র-রুক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া মনুষ্য অতিপুরাকাল হইতেই উদ্বেলিত হৃদয়ে গান করিত এবং বিশ্বসংসারের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল সন্দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে কবিতা আবৃত্তি করিত। "নিরক্ষর হইলেই লোক মূর্খ হয়" একথা নিরক্ষর বা মূর্খ লোকেই বলিয়া থাকে।

---

* এই প্রসঙ্গে মদীয় "ক—কার" ও "বর্ণমালা বিচার" নামক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য (ভারতী ১৩০৮)—প্রবন্ধ লেখক।

সেই দিনই প্রকৃত প্রস্তাবে মানব-সভ্যতার আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষাই যদি সভ্যতার কারণ হয়, তাহা হইলে অক্ষর সমূহই সকল সভ্যতার নিদান।

অক্ষর সৃষ্টির পদ্ধতি।

পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মনুষ্য যত পদার্থের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে অক্ষরের উদ্ভাবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সমধিক দুরূহ। অক্ষর এক দিনে সৃষ্ট হয় নাই। যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া মানব নানা কৌশল অবলম্বন করতঃ অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছে। অক্ষর সৃষ্টি সম্বন্ধে মানবজাতি যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার প্রায় কোনই নিদর্শন নাই। উহাদের অনেক চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। পরিশেষে যে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল তাহার সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অক্ষর সৃষ্টির পাঁচটি ক্রমিক পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পাঁচটি পথ অবলম্বন করিয়াই মনুষ্য বর্ত্তমান অক্ষর সমূহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই পাঁচটী পদ্ধতির নাম:—(১) বস্তু-চিত্র, (২) ভাব-চিত্র, (৩) শব্দ-চিত্র, (৪) শব্দাংশ-চিত্র ও (৫) বর্ণ-চিত্র।

বস্তু-চিত্রই* অক্ষর আবিষ্কারের প্রথম সোপান। এই অবস্থায় মানব কোন বস্তুর বিষয় প্রকাশ করিতে হইলে ঐ বস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেখাইত। মনুষ্য, গো, অশ্ব, বৃক্ষ ইত্যাদি শব্দ তত্তৎশব্দবাচ্য বস্তুর আকৃতি দ্বারা প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান সময়েও এই প্রথার অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে। আমরা এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা রোমান্ অক্ষরে লিখিতে হইলে যথাক্রমে একদাঁড়ি, দুইদাঁড়ি, তিনদাঁড়ি

* বস্তুচিত্রই Hieroglyphic অক্ষরের বীজ। Hieroglyphic শব্দটী সচরাচর চিত্রাক্ষর নামে অনুবাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ornamental character সমূহই চিত্রাক্ষর বা অলঙ্কৃতাক্ষর নামে বর্ণিত হওয়া উচিত। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন Hieroglyphic এর "মৌর্ত্তিক অক্ষর" এইরূপ অনুবাদ করাই সুসঙ্গত। প্রঃ লেঃ।

প্রভৃতি লিখিয়া থাকি। রোমান্ পাঁচ লিখিতে হইলে হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলি বক্র করিলে যাহা হয় সেইরূপ আকৃতি আঁকিয়া থাকি। চারি লিখিতে হইলে পাঁচের বামে একদাঁড়ি লিখিয়া থাকি, ইহার অর্থ এক কম পাঁচ। ছয় লিখিতে হইলে পাঁচের দক্ষিণে একদাঁড়ী বসাইয়া থাকি, ইহার অর্থ পাঁচের সহ এক যুক্ত। দশ লিখিতে হইলে দুই পাঁচ একত্র যুক্ত করিলে যাহা হয় তাহার আকৃতি আঁকিয়া থাকি। এই সংখ্যা সমূহ প্রাচীন কালীন বস্তুচিত্রের উদাহরণ।

বর্ণবিকাশের দ্বিতীয় অবস্থা ভাব-চিত্র। এই অবস্থায় হর্ষ, ক্রোধ, লোভ, দুঃখ, মোহ, প্রণয় প্রভৃতি ভাবসমূহ প্রকাশ করিতে হইলে তত্তদ্ ভাবব্যঞ্জক দ্রব্যের প্রতিকৃতি আঁকিতে হইত। যে যে বস্তুর সহ ঐ সকল ভাবের সম্বন্ধ আছে ঐ সকল বস্তুর প্রতিকৃতি আঁকিয়া সেই ভাবসমূহ ব্যক্ত করিতে হইত। এই ভাব-চিত্রের অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। কোন বাক্য লিখিয়া তাহার শেষে একটী দাঁড়া ও তন্নিম্নে একটা বিন্দু বসাইলেই উহাতে বিস্ময়-ভাব প্রকাশ হয়। যদি "রাম দশ হস্ত দীর্ঘ" এই বাক্য লিখিয়া, উহার শেষে একটী আশ্চর্য্য-বোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে লেখক এই বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কএর পর দুইটী সমান্তরাল রেখা টানিয়া খ লিখিলেই বুঝিতে হইবে, ক আর খ দুইটী পরস্পর সমান। ঐ সমান্তরাল রেখাদ্বয় সমত্ব-বোধক চিত্র। এইরূপ অন্যান্য ভাবও চিত্রিত হইয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্রালয়ের দ্বারে মনুষ্যের হস্ত অঙ্কিত থাকে। উহার অর্থ ঐ স্থানে হস্ত দ্বারা অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। এইরূপ মনের ভাবসমূহ নানা চিহ্ন দ্বারা পরিব্যক্ত হয়। বস্তুচিত্র ও ভাবচিত্র এই দুই এর সাধারণ নাম আভিধেয় মূর্ত্তি। প্রত্যক্ষ ও মানসিক বিষয়সমূহ আভিধেয় পদেরই অন্তর্ভুক্ত।

শব্দ-চিত্র বর্ণবিকাশের তৃতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় কোন বস্তু অঙ্কিত

করিয়া ঐ বস্তুকে তদ্বস্তু-বাচক শব্দের প্রতিকৃতি বলিয়া পরিগণিত করা হইত। শব্দ-চিত্র হইতেই শব্দাংশ-চিত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই অবস্থায় শব্দের অংশসমূহ ঐ শব্দ-ব্যঞ্জক বস্তুর বিভিন্ন অংশ দ্বারা প্রকাশিত হইত। মনে করুন আমি একটী অশ্ব আঁকিলাম। এই অশ্বটী অশ্বশব্দের প্রতিকৃতি। আর উহার মুখ "অ"—কারের প্রতিকৃতি এবং অবশিষ্ট অংশ "শ্ব"-কারের প্রতিকৃতি।

এই শব্দাংশ-চিত্র হইতেই বর্ণ-চিত্র বা অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল। অশ্ব শব্দটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় উহাতে "অ" "শ" "ব" ও "অ" এই কয়েকটী শব্দাংশ বা মূল শব্দ বিদ্যমান আছে। আর অঙ্কিত "অশ্ব" নিরীক্ষণ করিয়া উপলব্ধ হয় উহার মুখ, স্কন্ধ, উদর, পদ ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। উহার মুখই যেন "অ"কারের প্রতিকৃতি হইল, স্কন্ধই যেন "শ" হইল, উদর যেন "ব" হইল, ইত্যাদি। এইরূপ অনুভূত নানা বস্তুসমূহের অংশ বিশেষের প্রতিকৃতি হইতে অক্ষর সমূহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারই নাম বর্ণ-চিত্র। বর্ণ-চিত্র হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দচিত্র, শব্দাংশচিত্র ও বর্ণচিত্র এই তিনের সাধারণ নাম শাব্দিক মূর্ত্তি বা মূর্ত্ত শব্দ।

কোন অক্ষর কোন্ বস্তুর প্রতিকৃতি দর্শনে উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহার নিশ্চিত ইতিহাস বিদ্যমান নাই। ফরাসী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডি রুজে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে মীসরের প্যাপিরস্ প্রিস্‌সে (Papyrus prisse) নামক মৈায়াবাইট্ প্রস্তরলিপি দর্শন করিয়া অনুমান করিয়াছেন মীসরদেশে ইগল্ পক্ষীর আকৃতি হইতে অকারের (a) উৎপত্তি হইয়াছিল, সারস পক্ষীর সাদৃশ্যে ব (b) সৃষ্ট হইয়াছিল। সিংহাসনের আকৃতি হইতে গ (g) কল্পিত হইয়াছিল। হস্তের প্রকৃতিই দ (d) এর উৎপত্তির মূল। রাজপথের বক্রগতিই হ (h) এর ব্যঞ্জক। ছিরাষ্টিস্ (Cerastes) নামক পক্ষীর প্রতিকৃতি দর্শনে ফ (f) এর সৃষ্টি

হইয়াছিল। হংস দেখিয়া ঝ (z) এর কল্পনা করা হইয়াছিল। এইরূপ চালনা হইতে খ (kh), চিম্‌টা হইতে থ (th), সমান্তরাল রেখা হইতে ই (i), কমণ্ডলু হইতে ক (k), সিংহ হইতে ল (l), পেচক হইতে ম (m), জল হইতে ন (n), কাষ্ঠাসনের পৃষ্ঠদেশ হইতে স (s), গবাক্ষাবরণ হইতে প (p), সর্প হইতে চ (ts), কোণ হইতে ক (q), মুখ হইতে র (r), উদ্যান হইতে ষ (sh) এবং পাশবন্ধ হইতে ত (t) এর উৎপত্তি হইয়াছিল।

নানা প্রমাণ দেখিয়া বোধ হয় যথার্থই বস্তুর প্রতিকৃতি দর্শনে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল। বহু সহস্র বৎসর অতীত হওয়ায় প্রত্যেক দেশের প্রাচীন অক্ষরসমূহের নাম ও আকৃতির অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তজ্জন্য উহাদের উৎপত্তি প্রণালী নির্ণয় করা এক্ষণে সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কোন কোন দেশের অক্ষরে উহাদের আদিম সৃষ্টি প্রণালীর সুস্পষ্ট নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপে সেমিটিক্ অক্ষরের আলোচনা করিতে পারি। সেমিটিক্ অক্ষর সমূহের নাম, যথা :—আলেফ্, বেথ্, গিমেল্, ডালেথ্, হে, বৌ, ঝয়িন্, ছেথ্, টেথ্, যোদ্, কফ্, লমেদ্, মেম্, নুন্, সমেথ্, আয়িন্, পে, চদে, কোফ্, রেষ্, ষিন্, তৌ।

আলেফ্ এর অর্থ বৃষ, বেথ্ এর অর্থ গৃহ, গিমেল্ এর অর্থ উষ্ট্র, ডালেথ্ এর অর্থ দ্বার, হে এর অর্থ গবাক্ষ, বৌ এর অর্থ পেরেক, ঝয়িন্ এর অর্থ কাস্তিয়া, ছেথ্ এর অর্থ বেড়া, টেথ্ এর অর্থ সর্পের ফণা, য়োদ্ এর অর্থ হস্ত, কফ্ এর অর্থ হাতের তল, লমেদ্ এর অর্থ শলাকা, মেম্ অর্থ জল, নুন্ এর অর্থ মৎস্য, সমেথ্ এর অর্থ ছত্র, আয়িন্ এর অর্থ চক্ষুঃ, পে এর মুখ, চদে এর অর্থ শল্য, কোফ্ এর অর্থ মর্কট, রেষ্ এর অর্থ মস্তক, ষিন্ এর অর্থ দন্ত, এবং তৌ এর অর্থ রেখা।

উল্লিখিত অর্থ সমূহের বিচার দ্বারা বোধ হয় আলেফ্, বেথ্ প্রভৃতি অক্ষর বৃষ ইত্যাদি জন্তু ও গৃহ ইত্যাদ বস্তুর প্রতিকৃতি সাদৃশ্যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। যদিও অধুনা উক্ত অক্ষর সমূহের আকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তথাপি উহাদের নাম প্রায় পূর্ব্ববৎ অবিকৃত আছে।

ভারতীয় অক্ষর সমূহের নাম শুনিয়া উহাদের উৎপত্তি প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। আলেফ্, বেথ্ প্রভৃতি অক্ষর যেমন বস্তু বিশেষের নামের সহ সংস্পৃষ্ট, ভারতীয় অ, আ, ক, খ প্রভৃতি অক্ষর সেইরূপ কোন দ্রব্যের সহ সম্পৃক্ত নহে। সুতরাং অ, আ ক, খ ইত্যাদি অক্ষর কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া সমধিক কষ্টকর। কিন্তু ভারতীয় অক্ষরও যে মূলে বস্তুর প্রতিকৃতি দর্শনে উদ্ভূত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সকলেই জানেন জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ জন্মপত্রিকা রচনাকালে জাতকের দুইটী নাম লিখিয়া থাকেন—একটী রাশি নাম ও অপরটী প্রকাশ নাম। রাশি নাম নির্ণয় করিবার একটী প্রথিত সঙ্কেত আছে। যাহার মেষ রাশি তাহার নামের পূর্ব্বে "অ" বা "ল" থাকা চাই। বৃষ রাশির নামের পূর্ব্বে "উ" বা "ব" থাকে। এইরূপ মিথুন রাশির ক ছ, কর্কটের ড হ, সিংহের ম ঠ, কন্যার প থ, তুলার র ত, বৃশ্চিকের ন য, ধনুর ধ ভ, মকরের খ ঘ, কুম্ভের গ শ, এবং মীনের দ চ আদ্যক্ষর নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন মতে মীনের আদ্যক্ষর ঘ ঞ ক্ষ, ধনুর ফ ঢ, কন্যার ট ন ঙ এবং বৃষের ই উ। জন্ম পত্রিকায় এই রাশি নাম লেখার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা নামকরণাদি সংস্কারকালে ব্যবহৃত হয়। কি কারণে এই রাশি নাম লেখার প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। আমার বোধ হয় যে যে বস্তু হইতে যে যে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার একটী নিদর্শন রাখাই এই রাশি নামের মুখ্য উদ্দেশ্য। মেষ

রাশির আদ্যক্ষর "অ ল"; ইহার অর্থ এই যে মেষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাদৃশ্যে "অ" ও "ল" এই দুইটী অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ বৃষের প্রতিকৃতি হইতে "উ" ও "ব" সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য দ্রব্য হইতে অন্যান্য অক্ষরও এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। বর্ত্তমান দেবনাগর অক্ষর-সমূহের সহ মেষ, বৃষাদি জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু প্রাচীনতম অক্ষর সমূহের সহ উহাদের অনেক পরিমাণে আকৃতিসাম্য ছিল ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে নভোমণ্ডলকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদিগের মেষ বৃষাদি নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং কোন্ সময়েই বা মেষ বৃষাদি জন্তুর সাদৃশ্যে অকারাদি অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই উভয় প্রশ্নের মীমাংসাই আমাদের সাধ্যাতীত।

বস্তুর প্রতিকৃতি দর্শনে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল এসিদ্ধান্ত এক-প্রকার অভ্রান্ত। চীনদেশীয় অক্ষর পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা আর কিছুই নহে, বস্তু-বিশেষের চিত্রমাত্র। চীনলিপি এখনও অক্ষরের অবস্থায় উপস্থিত হয় নাই। উহা এখনও এক একটী বস্তুর প্রতিকৃতিরূপে বিদ্যমান আছে। কুকুর, অশ্ব, পর্ব্বত ইত্যাদি দ্রব্যের প্রতিকৃতি লইয়া চীনলিপি গঠিত হইয়াছে। যদিও অধুনা প্রাচীন চীনলিপির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি উহাতে এখন পর্য্যন্ত সুপরিচিত বস্তু সমূহের সৌসাদৃশ্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তু-চিত্র, ভাব-চিত্র ও শব্দ-চিত্র এই তিন প্রকার চিত্রই চীন লিপিতে বিদ্যমান আছে। ঐ সকল চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া চীনদেশে বর্ণ-চিত্র বা অক্ষরের এখনও সৃষ্টি হয় নাই। এইহেতু চীন দেশের এক একটী অক্ষরই এক একটী শব্দ। চীন ভাষায় শব্দ ও অক্ষরে কোন প্রভেদ নাই। অন্যান্য ভাষায় যেমন এক দুই বা ততোঽধিক অক্ষরের সমবায়ে এক একটী শব্দের উৎপত্তি হয়, চীন-

ভাষায় শব্দোৎপত্তির প্রণালী সেরূপ নহে। উহাতে অক্ষর ও শব্দ উভয়ই পরস্পর সমান। প্রত্যেক শব্দ আবার তৎশব্দ-বাচ্য বস্তুর প্রতিকৃতি সাদৃশ্যে লিখিত হইয়া থাকে। এইরূপে সেমিটিক, চীন ও অন্যান্য অক্ষরের পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় অক্ষরসমূহ বস্তু বিশেষের সৌসাদৃশ্য দর্শনে সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

কোন্ জাতি অক্ষরের প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিল?

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরের আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ফিনিসিয়ান্‌গণ সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরের আবিষ্কার করেন। অপর কোন কোন পণ্ডিতের মতে ক্রীট্ দ্বীপে অক্ষরের প্রথম সৃষ্টি হয়। কেহ বলেন ব্যবিলোনিয়াই অক্ষরের জন্মভূমি। অপর পণ্ডিতগণের মত এই যে মীসর হইতে জগতে অক্ষরের প্রচার হইয়াছিল। এই সকল মতের কোন্‌টী ঠিক, অথবা কোনটীই ঠিক নহে ইহার বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। অধিকাংশ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে মীসরেই সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল। সক্রেটিসের শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন, অক্ষরের জন্মভূমি মীশর দেশেই অন্বেষণ করিতে হইবে। প্লুটার্ক, ট্যাসিটস্ প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন মীসরই অক্ষরের জন্মস্থান। মীসর হইতে কোন্ সময়ে কি প্রকারে জগতে অক্ষরের প্রচার হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চিত ইতিবৃত্ত নাই। পুরাবিদ্‌গণ বলেন আব্রাহাম যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের অন্ততঃ উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে মীশর হইতে ইজ্‌রেলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে সেমিটিক্ জাতির মধ্যে মীসরের অক্ষর প্রথম প্রবেশলাভ করে। মীশরবাসিগণ ক্ষুদ্রকায় ও শান্ত স্বভাব ছিলেন, তাঁহাদের রাজশাসন মৃদু ও ধর্ম্মবিধি অত্যন্ত পবিত্র

ছিল। তাঁহাদের দেশে সভ্যতা কোন্ সময়ে আরব্ধ হইয়াছিল তাহার কোন সীমাই নাই। তাঁহারা দুই হাজার বৎসরকাল সুখে ও শান্তিতে স্বদেশ ভোগ করেন। তাঁহাদের রাজধানী মেম্ফিস নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নগর অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। ইহার পিরামিড্ এখনও জগতে একটী পরমাশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত। যীশুখ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম এসিয়ার দুর্দ্ধর্ষ সেমিটিক্ জাতি মীশর আক্রমণ করে। এই জাতির ভাষা কর্কশ, ব্যবহার ঘৃণিত ও ধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত। মীশরবাসিগণ মনে করিলেন স্বয়ং পাপ নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মীশরে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা উহাদের বিরুদ্ধে সবল দণ্ডায়মান না হইয়া নিজেরাই চারিদিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। সেমিটিকগণ আভরিস নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া পাঁচশত বৎসরকাল মীশরে রাজত্ব করে। উহাদের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২২০০-খৃঃ পূঃ ১৭০০। এই কাল মধ্যেই মীশরের অক্ষর পশ্চিম এসিয়ার নিনেভা প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করে। এই সময়ে মীশরের অক্ষর ফিনিসিয়া দেশেও প্রবিষ্ট হয়। হিব্রু, ফিনিসিয়ান্ প্রভৃতি জাতি এইরূপে মীশর হইতে অক্ষর প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু, পারসীক ও গ্রীক্‌গণ সেমিটিক্ জাতির নিকট হইতে লিপি-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। মীশরে অক্ষরের প্রথম উদ্ভাবন হয়, সেমিটিকগণ উহার বহুল প্রচার করেন এবং আর্য্যজাতি উহার চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। জগতের তিনটী পরম বুদ্ধিশালী জাতির হস্তে পড়িয়া অক্ষর এক্ষণে অমূল্য নিধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোন্ সময়ে অক্ষরের প্রথম প্রচার হয়?

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেমিটিক্ জাতি মীসর হইতে যে অক্ষর আনয়ন করিয়াছিলেন, উহাই কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

মূল সেমিটিক্ অক্ষর প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ সেমিটিক্ ও ফিনিসিয়ান্ অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই দক্ষিণ সেমিটিক্ অক্ষর দুই তিন প্রকার পরিবর্ত্তনের পর প্রাচীন ভারতের অশোক অক্ষরে পরিণত হইয়াছিল। অশোক অক্ষর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথাঃ—নাগরী, পালি ও দ্রাবিড়ীয়। নাগরী অক্ষর হইতে তিব্বতীয়, গুজরাটী, কাশ্মীরী, মহারাষ্ট্রী ও বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। পালি অক্ষর হইতে বর্ম্মা, শ্যাম, জাবা, সিংহল ও কোরিয়া দেশের অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে। মলয়, তেলুগু, কানারী, তামিল ও গ্রন্থম্ অক্ষর দ্রাবিড়ীয় অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফিনিসিয় অক্ষর সিডোনিয়, ক্যাড্মিয় ও টিরীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। সিডোনিয় অক্ষর বহুপরিবর্ত্তনের পর একদিকে আরবিক, তুরস্ক ও পারসিক অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছে, অপর দিকে উহা হইতে মঙ্গোলিয়, মাঞ্চু ও ক্যাল্মক অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে। ক্যাড্মিয় অক্ষর হইতে হেলেনিক্ ও ইটালীয় অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল। হেলেনিক্ অক্ষর অনেক পরিবর্ত্তনের পর গ্রীক, মইসো গথিক, রুসিয়ান্ প্রভৃতি অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। ইটালীয় অক্ষর হইতে ল্যাটীন এবং তাহা হইতে কালসহকারে ইংরাজী, জার্ম্মান্ প্রভৃতি অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।

জগতে সর্ব্বদেশীয় অক্ষরের প্রচার সম্বন্ধে ইউরোপের গণ্যমান্য পণ্ডিতগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এস্থলে লিখিত হইল। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তে আমার সম্পূর্ণ ঐকমত্য নাই। এ বিষয়ে আমার মত পরে প্রকাশ করিব।

আল্‌ফাবেট্ ও আলিফ-কালি।

অক্ষর সমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে দুইটী প্রধান প্রণালী দৃষ্ট হয়। একটী প্রণালী অনুসারে সর্ব্ব প্রথমে অ, তদনন্তর ব, তাহার পর গ, তদনন্তর দ, তাহার পর ক্রমান্বয়ে হ, ব, ঝ, ছ, ট, য, ক,

ল, ম, ন, স, আ, প, চ, ক, র, ষ, ত। অপর প্রণালী অনুসারে সর্ব্বপ্রথম অ, তদন্তর আ, তাহার পর ই, ও তদনন্তর ক্রমান্বয়ে ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ। হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় প্রথম প্রণালী এবং সংস্কৃত, বার্মীজ, সিংহলী, শ্যাম, কোরিয় প্রভৃতি ভাষায় দ্বিতীয় প্রণালী পরিলক্ষিত হয়। হিব্রু ভাষার অক্ষর সমূহের যথাক্রম নাম, যথাঃ— আলেফ্, বেথ্, গিমেল্, ডালেথ্, হে, বৌ, ঝয়িন্, ছেথ্, টেথ্, য়োদ্, কফ্, লমেদ্, মেম্, মুন্, সমেথ্, আয়িন্, পে, চদে, কোফ্, রেস্, ষিন্, তৌ।

গ্রীক্ অক্ষর হিব্রু অক্ষরের প্রায় তুল্য, কয়েকটা অক্ষরের পরস্পর পৌর্ব্বাপর্য্যে কিছু প্রভেদ আছে। গ্রীক্ ভাষার অক্ষর সমূহের নাম, যথাঃ—

আল্‌ফা, বিটা, গামা, ডেল্‌টা, এপ্‌ছিলন্, বৌ, ঝিটা, ইটা, থিটা, আইওটা, কপ্পা, লম্বদা, মু, নু, ক্সি, ওমিক্রন্, পি, সান্, কোপ্পা, রো, সিগ্‌মা, তৌ।

গ্রীক্ ও ইংরাজী অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রায় একই রূপ। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। ইংরাজী অক্ষর সমূহের নাম শুনিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ইংরাজী অক্ষর, যথাঃ—এ, বি, সি, ডি, ই, এফ্, জি, এচ্, আই, জে, কে, এল্, এম্, এন্, ও, পি, কিউ, আর, এস্, টি, ইউ, ভি, ডব্লিউ, এক্স, ওয়াই, জেড্।

হিব্রু, গ্রীক্, ইংরাজী প্রভৃতি অক্ষর যে শ্রেণীর অন্তর্গত, আরবিক অক্ষরও সেই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। আরবিক অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য হিব্রু, গ্রীক্, ইংরাজী প্রভৃতি অক্ষরের প্রায় সদৃশ। আরবিক অক্ষর যথা—

আলিফ্, বে, পে, তে, থে, জিম্, ছিম্, হ, খ, দাল্, জাল্, রে, জে, ঝে, ছিন্, ষিন্, ষড্, ডদ্, ট, ঝ, আইন্, ঘাইন্, ফে কফ্, কেফ্, গেফ্, লম্, মিম্, নুন্, ওয়া, হে, ইয়ে।

ভারতীয় সংস্কৃত অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য হিব্রু, আরবিক, গ্রীক্ প্রভৃতি অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে অ, তদনন্তর আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ।

বাঙ্গলা, আসামী, কাশ্মীরী, গুজ্‌রাটী প্রভৃতি অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য সংস্কৃত অক্ষরের সম্পূর্ণ অনুরূপ। সিংহলী, বার্মিজ, শ্যাম, কোরীয় প্রভৃতি অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য ও সংস্কৃত অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রায় তুল্য। বার্মীজ, সিংহলী, শ্যাম প্রভৃতি অক্ষরের নাম, যথাঃ—অ, আ, ই, ঈ, উ ঊ, এ, ও, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, স, হ, ল।

প্রাচীন পারসীক বা জেন্দ অক্ষর সংস্কৃত অক্ষরের প্রায় অনুরূপ। যদিও জেন্দ অক্ষরও সংস্কৃত অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্যে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়; তথাপি উভয় অক্ষর মূলতঃ একই শ্রেণীর অন্তর্গত। জেন্দ ভাষার অক্ষর সমূহের নাম শুনিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। জেন্দ অক্ষর, যথাঃ—অ, আঁ, এ, আ, এই, অঁ, ই, ঈ, উ, ইয়, ঊ, ঊব্, এ, এ̂, ও, ও̂। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, জ, চ, ঝ, ঝ, ত, ড, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ম, য, ল, র, ব, উ অ, শ, ষ, স, হ, হ্ব।

তিব্বতীয় ভাষার অক্ষরও সংস্কৃতের অনুরূপ। তিব্বতীয় অক্ষর, যথাঃ—

ক, খ, গ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ,. ত, থ, দ, ন, প, ফ, ব, ম,
| | | | ‖
চ, ছ, জ, ব, ঝ, জ, হ্‌, য, র, ল, শ, স, হ, অ।

উল্লিখিত অক্ষর সমূহের সম্যক্‌ আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় উহার দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীতে সর্ব্ব প্রথমে অ (আল্‌ফা), তদনন্তর ব (বিটা) ইত্যাদি। অপর শ্রেণীতে সর্ব্বপ্রথমে অ, তদনন্তর আ, ই ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীকে আল্‌ফাবেট্‌ বলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন বিশেষ নাম নাই। তিব্বতদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ থোন্‌মি সম্ভোট ইহাকে আলি-কালি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আলি শব্দের অর্থ স্বরবর্ণ। অ ও আলি এই দুইএর সন্ধিতে আলি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার আবয়বিক অর্থ অকারের পংক্তি অর্থাৎ অ, আ ইত্যাদি। আর কালি শব্দের অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ। ক ও আলি এই দুইএর সন্ধিতে কালি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার আবয়বিক অর্থ ককারের পংক্তি, অর্থাৎ ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, জেন্দ, তিব্বতীয়, বার্ম্মীজ, সিংহলী, শ্যাম প্রভৃতি বর্ণমালাকে আলি-কালি বলা যায়। অবশিষ্ট সমস্তই আল্‌ফাবেট্‌ শব্দ বাচ্য। গ্রীক, জার্ম্মাণ, ইংরাজী, ফিনিসিয়ান্‌, হিব্রু প্রভৃতি বর্ণমালা আল্‌ফাবেট্‌ নামে অভিহিত হয়।

মীশরে যখন সর্ব্বপ্রথমে অক্ষর সমূহের সৃষ্টি হয়, তখন উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য কিরূপ ছিল নিশ্চিত বলা যায় না। মীশরে যখন অক্ষরের প্রথম উৎপত্তি হয় তখন বোধ হয় উহা আলি-কালি বা আল্‌ফাবেট্‌ ইহার কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন মীশরে আদিম কালে তকার হইতে বর্ণমালার আরম্ভ হইত। মীশরের বর্ণমালা এইরূপ ছিল, যথাঃ—

ত, স, আ উ, অ, প, ম, ন, হ, ণ, স, ট, ব ইত্যাদি। ই, ক, ক,

গ, র এই কয়েকটী অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য কিরূপ ছিল তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য।

প্রাচীনগণ কি প্রণালীতে বর্ণমালায় অক্ষর সমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া সুকঠিন। বর্ণমালায় কোন্ বর্ণ সর্ব্বপ্রথমে বসিবে, তাহার পর কোন্ বর্ণ বসিবে, তদনন্তর কোন্ বর্ণ স্থান পাইবে, ইত্যাদি নিরূপণ করিবার আদৌ কোন নিয়ম ছিল কি না, তাহাও জানা যায় না। ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন বর্ণমালার অক্ষর বিন্যাসের চারিটী প্রণালী সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। সেই চারিটী প্রণালী; যথাঃ—(১) উচ্চারণ স্থানের ভেদ, (২) আকৃতির ভেদ, (৩) অর্থের ভেদ, ও (৪) আবিষ্কারকালের ভেদ।

আলিকালি শ্রেণীর বর্ণমালা প্রথম প্রণালীর অন্তর্গত। ইহাতে উচ্চারণভেদে অক্ষর সমূহকে স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বরের মধ্যে আবার হ্রস্ব স্বর সমূহ দীর্ঘ স্বরের পূর্ব্বে বসিয়াছে; যথা—অ আ; ই ঈ; উ ঊ; ঋ ৠ; ঌ ৡ। এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ ইহারা সকলেই দীর্ঘস্বর, সুতরাং ইহারা সর্ব্বশেষে বসিয়াছে। কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, মূর্দ্ধা ও দন্ত হইতে যথাক্রমে উচ্চারিত হয় বলিয়া অ, ই, উ, ঋ, ঌ ইহারা যথাক্রমে একের পর অপরটী বসিয়াছে। এ ঐ, ইহারা অকার ও ইকারের সংযোগে উৎপন্ন। অকারের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ এবং ইকারের উচ্চারণ স্থান তালু, এইহেতু এ ঐ এই দুই বর্ণকে কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ বলে ও ঔ ইহারা অকার ও উকারের সংযোগে উৎপন্ন। উচ্চারণের স্থান অনুসারে ইহাদের নাম কণ্ঠৌষ্ঠ। তালুর পর ওষ্ঠ এই হেতু কণ্ঠতালব্য বর্ণের পর কণ্ঠৌষ্ঠ বর্ণ বসিয়াছে। অনুস্বার ও বিসর্গের উচ্চারণ ভেদে অং ও অঃ এই দুইটীও যথাক্রমে একের পর অপরটী বসিয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের

পৌর্ব্বাপর্য্য ও উচ্চারণ স্থানের ভেদ অনুসারে নিয়মিত। জিহ্বামূল, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ এই সকল স্থান হইতে যথাক্রমে উচ্চারিত হয় বলিয়া কবর্গ, চবর্গ ইত্যাদি বর্ণ, যথাক্রমে একের পর অপরটী বিন্যস্ত হইয়াছে। ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণের নাম স্পর্শ বর্ণ। শ, ষ, স ও হ ইহাদের উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য থাকে বলিয়া ইহাদিগকে উষ্ম বা বায়ু প্রধান বর্ণ বলে। য, র, ল, ব ইহারা স্পর্শ ও উষ্ম এই উভয় বর্ণের মধ্যস্থলে নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থবর্ণ বলে। এইরূপ বিবার, সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, অনুনাসিক, অননুনাসিক ইত্যাদি নানাপ্রকারে সংস্কৃতশাব্দিকগণ অক্ষর সমূহের উচ্চারণ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংস্কৃত বর্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসে একটু সামান্য বিরোধ দৃষ্ট হয়। স্বরবর্ণের তালিকায় দেখা যায় ওষ্ঠবর্ণের পর মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্যবর্ণ সন্নিবিষ্ট। কিন্তু বঞ্জনবর্ণের তালিকায় মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্যবর্ণের পর ওষ্ঠবর্ণ বিন্যস্ত। স্বরের মধ্যে উ ঊ এই দুইটী ওষ্ঠবর্ণ, ঋ ৠ এই দুইটী মূর্দ্ধন্যবর্ণ এবং ঌ ৡ এই দুইটি দন্ত্যবর্ণ। ব্যঞ্জনের মধ্যে পবর্গ ওষ্ঠবর্ণ, টবর্গ মূর্দ্ধন্য বর্ণ এবং তবর্গ দন্ত্যবর্ণ। স্বরের তালিকায় দেখা যায় উকারের পর ঋ ঌ বসিয়াছে, কিন্তু ব্যঞ্জনের তালিকায় পবর্গের পূর্ব্বে টবর্গ তবর্গ বসিয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসে কিঞ্চিৎ অনৈক্য আছে। এই অনৈক্যের কারণ কি? প্রকৃত প্রস্তাবে ওষ্ঠবর্ণ পূর্ব্বে বিন্যস্ত করা উচিত, কিংবা মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্যবর্ণ পূর্ব্বে বসান উচিত? অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অন্তরুন্মুখতা ও বহিরুন্মুখতা বিচার করিলে বোধ হয়, মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্যবর্ণের পর ওষ্ঠবর্ণ বিন্যস্ত করা উচিত। মূর্দ্ধা ও দন্ত অপেক্ষা ওষ্ঠ অধিকতর বাহ্যঅঙ্গ। অতএব ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত বর্ণ মূর্দ্ধা ও দন্ত হইতে উচ্চারিত বর্ণের পরে সন্নিবিষ্ট হইবে। সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় পবর্গের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে উহা ন্যায্য। প্রকৃত পক্ষে

টবর্গ ও তবর্গের পরেই পবর্গ বিন্যস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু স্বরবর্ণের তালিকায় উবর্ণকে কেন ঋ ৯-কারের পূর্ব্বে বসান হইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা সমধিক দুরূহ। উচ্চারণের স্থান অনুসারে বিচার করিলে ঋ ৯-কারের পর উবর্ণ বিন্যাস করা উচিত। স্বরবর্ণ সমূহকে অ, আ, ই, ঈ, ঋ, ৠ, ৯, ৡ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এইরূপ পর্য্যায়ে পাঠ করাই সঙ্গত। প্রাচীন শাব্দিকগণ কেন ঋ ৯কে উকারের পরে বসাইলেন তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা আমার সাধ্য নহে। তবে আমার বোধ হয় অ, ই, উ এই তিনটী স্বর মূলবর্ণ বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে বসিয়াছে। ঋ ৯ এই দুইটী স্বরবর্ণ মৌলিক নহে। উহারা র ল এই দুই ব্যঞ্জনের বিকার মাত্র। এই হেতু উহাদিগকে উকারের পরে বসান হইয়াছে। জগতের সকল বর্ণমালায়ই অ, ই, উ এই তিনটী স্বর দৃষ্ট হয় কিন্তু ঋ ৯ সংস্কৃত ভিন্ন অপর কোন বর্ণমালায় দেখা যায় না। এমন কি বার্মীজ, সিংহলী, শ্যাম প্রভৃতি যে সকল বর্ণমালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ঋ ৯ এই দুইটী বর্ণ নাই। প্রাচীন পারসীক বা জেন্দ অক্ষর বহুল স্বরবিশিষ্ট। তাহাতে স্বরের নানা বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু উহাতেও ঋ ৯ নাই। ইহাতে বোধ হয় হিন্দুজাতি অন্যান্য আর্য্য জাতি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িবার পর ঋ ৯ এই দুই বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঋ ৯ ভারতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। উহারা অন্যান্য স্বরের পর সৃষ্ট হওয়ায় অ, ই উ এই তিনের পর বসিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে উহারা এ, ঐ, ও, ঔ ইত্যাদির পূর্ব্বে বসিল কেন। ইহার উত্তর এই যে এ, ঐ, ও, ঔ, সংযুক্ত-স্বর। অ ই ইহাদের সংযোগে একারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং অ উকারের সংযোগে ওকারের সৃষ্টি হইয়াছে। ঋ ৯ সংযুক্ত বর্ণ নহে। সুতরাং উহারা এ, ঐ, ও, ঔ ইত্যাদির পূর্ব্বে বসিয়াছে। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া বোধ হয় ঋ ৯ সংস্কৃত বর্ণমালায়

নূতন প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যখন সকল আর্য্য জাতি একত্র ছিলেন তখন ঋ ৯ বিদ্যমান ছিল না। ভারতীয় আর্য্যগণ অন্যান্য আর্য্যজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার পর বর্ণমালার অনেক উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। সংস্কৃত অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে, উহা আদর্শ বৈজ্ঞানিক প্রণালী। উচ্চারণস্থান অনুসারে অক্ষর সমূহের বিন্যাস কিরূপ হইতে পারে, সংস্কৃত বর্ণমালা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বর্ণমালায় অক্ষর বিন্যাসের দ্বিতীয় প্রণালী উহাদের আকৃতি ভেদ। এই প্রণালী অনুসারে যে যে বর্ণের আকৃতি এক প্রকার তাহাদিগকে একত্র বসাইতে হয় এবং ভিন্নাকৃতির বর্ণ পরে বিন্যস্ত হয়। যে বর্ণ যাহার অত্যন্ত সদৃশ সে তাহার অব্যবহিত পরে বসে। তদনন্তর ক্রমে বিসদৃশ বর্ণ সংস্থাপিত হয়। আরবিক, ইথিওপিক ও রুণিক অক্ষর সমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য এই প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

অক্ষর বিন্যাসের তৃতীয় প্রণালী উহাদের অর্থভেদ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অক্ষর সমূহের অর্থের সামান্যত্ব ও বিশেষত্ব অনুসারে উহারা বর্ণমালায় যথাক্রমে বিন্যস্ত হইয়া থাকে। অত্যন্ত পরিচিত বস্তুর ব্যঞ্জক অক্ষর সর্ব্ব প্রথমে বসে। তদনন্তর ক্রমশঃ বিশেষ অর্থবাচক অক্ষর বিন্যস্ত হয়। যেমন ডালেথ এই অক্ষরের পর হে এই অক্ষর বসিয়াছে। ডালেথের অর্থ দ্বার এবং হের অর্থ গবাক্ষ। গবাক্ষের অপেক্ষা দ্বার অধিকতর সামান্য অর্থের বাচক বলিয়া ডালেথ ও হের পরস্পর পৌর্ব্বাপর্য্য ঘটিয়াছে।

অক্ষর বিন্যাসের চতুর্থ প্রণালী উহাদের আবিষ্কারের কালভেদ। যে অক্ষর যত পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে তত পূর্ব্বে বসিয়াছে। আর যে অক্ষর যত পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল সে তত পরে বসিয়াছে। যেমন ইংরাজী ভাষায় ভি এই অক্ষর ডব্লিউ এই অক্ষরের অপেক্ষা পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া উহা শেষোক্ত অক্ষর অপেক্ষা পূর্ব্বে

বসিয়াছে। গ্রীক, কপ্‌টিক, জর্জিয়ান্‌, ও রুশীয় অক্ষর এই প্রণালীর অন্তর্গত।

উপরে যে চারিটী প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রথমটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বিজ্ঞান-সম্মত। ভারতীয় অক্ষরে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। সংস্কৃত অক্ষর বিন্যাসের প্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে উহাতে উহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হয়। যে অক্ষর যত পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা তত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সংস্কৃত অক্ষর যদি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হইত, তাহা হইলে উহাতে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইত। ইহাতে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন হিন্দুগণ অক্ষর লেখার আভাষ অপর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহারা স্বকীয় অসাধারণ বুদ্ধি বলে এই প্রণালীর এত উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন যে জগতের বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হউক না কেন, ইহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সংস্কৃত বর্ণমালা অপেক্ষা অধিকতর কৌশলপূর্ণ বর্ণমালা জগতে আর উৎপন্ন হইবে না।

ভারতে অক্ষরের প্রাচীনতা।

কতকাল পূর্ব্বে ভারতে অক্ষরের প্রথম সৃষ্টি বা প্রচার হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে লিপি-কৌশল ভারতে প্রথম প্রবেশ লাভ করে। তাঁহারা বলেন প্রাচীন সেমিটিক অক্ষর হইতে অশোক অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং অশোক অক্ষর হইতেই ভারতের অন্যান্য অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। সেমিটিক অক্ষরই আবার ফিনিসিয়ানগণ ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্‌ (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) বলেন ফিনিসিয়ার ক্যাড্‌মস্‌ নামক কোন রাজপুত্র ইউরোপা নামক রমণীর অন্বেষণে গ্রীসে

গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় থীবস্ নগরে ফিনিসিয়ান্ অক্ষর প্রথম প্রচার করেন। ক্যাড্মসের প্রবর্ত্তিত ফিনিসিয়ান্ অক্ষর হইতে গ্রীক্ অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল। ক্যাড্মস্ খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে গ্রীসে গমন করিয়াছিলেন, অতএব তথায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে অক্ষরের প্রচার ছিল। গ্রীসে খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে অক্ষরের প্রথম প্রচার হয় এ সিদ্ধান্তে আমাদের বিশেষ কোন মতভেদ নাই। কিন্তু ভারতে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বে অক্ষরের প্রচার ছিল না, একথা আমাদের নিকট নিতান্ত অসমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মহারাজ অশোকের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারত জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে উন্নত ছিল। বেদের সূক্ত সমূহ অবশ্য বহু শত বৎসর ঋষিগণের শ্রুতিপথে বিচরণ করিত। যখন বেদের প্রথম প্রকাশ হয় তখন অবশ্য ভারতে অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই। মহাভারতে লিখিত আছে "বেদবিক্রয়ী, বেদলেখক ও বেদদূষক ইহাঁদের সকলকেই নরকে গমন করিতে হইবে।" এই উক্তি দ্বারা বোধ হয় মহাভারতের সময়ে এদেশে লেখন প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু তখনও অধিকাংশ লোক বেদ মুখে মুখে অভ্যাস করিত। বেদ লেখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্যাকরণাদি গ্রন্থ যে অক্ষর সৃষ্টির বহু পরে রচিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পাণিনি ব্যাকরণ মহারাজ অশোকের অন্ততঃ এক শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, পাণিনির পূর্ব্বে ভারতে বহু বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন। প্রাতিশাখ্য অর্থাৎ বৈদিক ব্যাকরণ অত্যন্ত প্রাচীন। যাস্কের নিরুক্ত ও নিতান্ত আধুনিক নহে। এই সকল ব্যাকরণ গ্রন্থ যখন বিরচিত হইয়াছিল তখন ভারতে অক্ষরের প্রচার অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। অক্ষর সমূহের পরিবর্ত্তন প্রণালী নির্দ্দেশ করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাণিনি ব্যাকণের প্রারম্ভেই ১৪টী মাহেশ্বর সূত্র নিবদ্ধ আছে।

মাহেশ্বর সূত্রগুলি আর কিছুই নহে সংস্কৃত বর্ণমালার ব্যাকরণোপযোগী শ্রেণী-বিভাগ। আর পাণিনি স্বীয় ব্যাকরণের ৩-২-২১ সূত্রে লিপিকর শব্দের সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি পাণিনির সময়ে লিপি বা লেখন প্রণালী না থাকিত তাহা হইলে তিনি কোন ক্রমেই লিপিকর শব্দের উল্লেখ করিতে পারিতেন না। মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ১৬৮ শ্লোকে যে প্রসঙ্গে "লেখিত" শব্দের উল্লেখ আছে তাহাতে অনুমান হয় মনুর সময়ে এদেশে লেখার বহু প্রচলন ছিল। জাতক নামক সুপ্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থের মোর জাতকে "সুবণ্ণপট্টে লিখাপেত্বা" অর্থাৎ "সুবর্ণপত্রে লেখাইয়া" এইরূপ পদসমূহের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে জাতক গল্প সমূহ খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে প্রথম বোধিসঙ্গম-কালে বিদ্যমান ছিল। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে ভারতে লিপি কৌশল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর ললিত বিস্তর গ্রন্থে দেখা যায় অন্যূন দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে অন্ততঃ ৬৪ প্রকার* লিপি প্রচলিত ছিল। এত লিপির উৎপত্তি একদিনে হয় নাই। এই সকল লিপি প্রবর্ত্তিত হইতে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সকল

---

* বুদ্ধদেব যে চতুঃষষ্ঠি প্রকার লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার নাম যথা :—

ব্রাহ্মী, খরোষ্ট্রী, পুষ্করসারী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, মাঙ্গল্যলিপি, মনুষ্যলিপি, অঙ্গুলীয়লিপি, শকারিলিপি, ব্রহ্মবল্লীলিপি, দ্রাবিড়লিপি, কিনারিলিপি, দক্ষিণলিপি, উগ্রলিপি, সংখ্যালিপি, অনুলোমলিপি, অর্দ্ধধনুর্লিপি, দরদলিপি, খাস্যলিপি, চীনলিপি, হূণলিপি, মধ্যাক্ষর বিস্তরলিপি, পুষ্পলিপি, দেবলিপি, নাগলিপি, যক্ষলিপি, গন্ধর্ব্বলিপি, কিন্নরলিপি, মহোরগলিপি, অসুরলিপি, গরুড়লিপি, মৃগচক্রলিপি, চক্রলিপি, বায়ুমরুল্লিপি, ভৌমদেবলিপি, অন্তরীক্ষদেবলিপি, উত্তরকুরুদ্বীপলিপি, অপর গৌড়ানিলিপি, পূর্ব্ববিদেহলিপি, উৎক্ষেপলিপি, নিক্ষেপলিপি, বিক্ষেপলিপি, প্রক্ষেপলিপি, সাগরলিপি, বজ্রলিপি, লেখপ্রতিলেখলিপি, অনুদ্রুতলিপি, শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি, গণনাবর্ত্তলিপি, উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপি, অধ্যাহারিণী, সর্ব্বরুত সংগ্রহণীলিপি, বিদ্যানুলোমালিপি, বিমিশ্রিতলিপি, ঋষিতপস্তপ্তা, রোচমানা, ধরণীপ্রেক্ষণলিপি, সর্ব্বৌষধিনিঃষ্যন্দা, সর্ব্বসারসংগ্রহণী ও সর্ব্বভূতরুতসংগ্রহণীলিপি (ললিত বিস্তর)।

প্রমাণ দেখিয়া আমার অনুমান হয়, যীশুখ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের অন্ততঃ এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে অক্ষরের প্রচার ছিল। কোন্ সময়ে এ দেশে উহার প্রথম সৃষ্টি হয় তাহা নিরূপণ করা আমাদের দুঃসাধ্য। আমার বোধ হয় অক্ষর সৃষ্টির পরে এ দেশে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে তাহাই আমাদের লৌকিক সাহিত্য, আর অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল তাহাই বৈদিক সাহিত্য বা শ্রুতি। বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যের এইরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। আমি এস্থলে কেবল বেদের সংহিতা বা মন্ত্র অংশকেই বৈদিক সাহিত্য নামে অভিহিত করিয়াছি। বেদের ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্ অংশ ও বৈদিক সাহিত্য বা শ্রুতি নামে অভিহিত হয় বটে কিন্তু ঐ দুই অংশ এস্থলে আমার লক্ষ্য নহে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ভাগে অক্ষরের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৭—১) বর্ণ, স্বর ও মাত্রা, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পর্শ, উষ্ম ও স্বরবর্ণের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অক্ষর, অক্ষর পংক্তি, চতুরক্ষর, বর্ণ ইত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সামবেদের গোপথ ব্রাহ্মণে (১—২৪) অক্ষর বা বর্ণের লক্ষণ বিবৃত আছে। এতদ্ব্যতীত তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, শাঙ্খ্যায়নসূত্র ও কাত্যায়ন-সূত্র ইত্যাদি গ্রন্থে অক্ষর ও লেখনপ্রণালীর আভাষ পাওয়া যায়। আমার মতে ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও সূত্রসমূহ লেখনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে বিরচিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সকল গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রুতি নহে। বেদের সংহিতা অংশই যথার্থ শ্রুতি। যাহাহউক এস্থলে বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যের আমি যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি তদনুসারে বলিতে পারি। যতদিন লৌকিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে ততদিনই অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। কথিত আছে মহর্ষি বাল্মীকিই লৌকিক সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা। আমার বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে ও

ভারতে অনেক লৌকিক কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে যখন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতে অনেক লৌকিক সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। কপিল, কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অক্ষরের ব্যবহার ব্যতীত সাহিত্যের প্রকৃত সৃষ্টি বা পুষ্টি হইতে পারে না এবং লেখার প্রথা না থাকিলে অক্ষরের ব্যবহার হয় না। ভারতের সাহিত্য অতি প্রাচীন, অতএব এদেশে অক্ষরের ব্যবহারও অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল।

অশোক অক্ষর।

এতকাল পুরাবিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল অশোক অক্ষরের পূর্ব্বের কোন অক্ষর ভারতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু সংপ্রতি কতিপয় বিশিষ্ট লিপির আবিষ্কার হওয়ায় এই বিশ্বাস কতক পরিমাণে নির্মূল হইয়াছে। অল্প কয়েক বৎসর হইল মিঃ পেপী কপিলবস্তুর সান্নিধ্যে পিপ্পরাও নামক স্থানে এক স্তূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ স্তূপে এক প্রস্তরপাত্রে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ ও এক প্রকার উৎকীর্ণ লিপি দৃষ্ট হয়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অনুমান করেন ঐ লিপি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকালে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মধ্যভারতের সাঞ্চী নামক স্থানে বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের দেহাবশেষ বিশিষ্ট যে প্রস্তরপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ও এক প্রকার লিপি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন উহা ও বোধ হয় খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মগধের প্রাচীন গিরিব্রজনগরে জরাসন্ধস্তম্ভ বা জরাসন্ধের বৈঠক নামক স্থানের সন্নিধানে এক প্রকার উৎকীর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। উহা ও বোধ হয় কোন অতি প্রাচীন লিপির ধ্বংসাবশেষ। নানা কারণে এই সকল প্রাগশোক অক্ষরকে বর্জ্জন করিয়া কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অশোক অক্ষরকেই সর্ব্বপ্রচীন বলিয়া

অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন প্রকৃত প্রস্তাবে অশোক অক্ষরের পূর্ব্বের কোন অক্ষর এখনও ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু আমরা বলি অশোক অক্ষরের পূর্ব্বের কোন অক্ষর এক্ষণে বিদ্যমান নাই বলিয়াই যে অশোক অক্ষর সর্ব্ব প্রাচীন এ কথা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। মহারাজ অশোক সর্ব্বসাধারণকে স্বীয় শাসন বিজ্ঞাপন করিবার জন্য ভারতের নানাস্থানে প্রস্তর খণ্ড সমূহের উপর ঐ সকল শাসন লেখাইয়া রাখিতেন। প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহাদের শিক্ষা ও লিপি সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত। এইহেতু তাঁহারা প্রাচীন শিলাস্তম্ভের উপর উপ-দেশাদি লেখার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। প্রকাশ্য রাজপথাদিতে উপদেশাদি লেখার প্রথা বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি বৌদ্ধগণ রোগের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত স্তম্ভাদিতে লিখিয়া রাখিতেন। চিকিৎসক-পরিব্রাজকগণ নানাস্থানে রোগীর চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেন এবং নিত্য-ব্যবহার্য্য ঔষধের নাম ও উপাদান প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তরাদির উপর লিখিয়া রাখিতেন। প্রাচীন হিন্দু ঋষি-গণের অবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যে অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা করিতেন, তাহার সার মর্ম্ম শিলাস্তম্ভে লিখিত হইলেও উহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের কোন বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা ছিল না। "সোহহং" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপদেশ সাধারণ লোকে ধারণা করিতে পারে না। শমদমাদি গুণ বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ লোক ব্রহ্মচর্য্যা অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সাধনার পর ঋষিগণের নিকট হইতে ঐ সকল উপদেশ লাভ করিতেন। ঐ সকল উপদেশ শিলাস্তম্ভে লিখিত হওয়ার যোগ্য নহে। প্রাচীন ঋষিগণের উৎকীর্ণ কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই বলিয়াই যে তাঁহারা লিপি-কৌশল জানিতেন না এরূপ অনুমান যুক্তি বিরুদ্ধ।

প্রাচীন হিন্দুগণ কিরূপ অক্ষর ব্যবহার করিতেন এবং ঐ সকল অক্ষরের এখনও কোন অবশেষ আছে কি না, এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। এক্ষণে ভারতে যত প্রকার অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে হয়ত অশোক অক্ষরই সর্ব্ব-প্রাচীন। মহারাজ অশোকের শাসন সমূহ যে অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহার নাম অশোক অক্ষর। এই অক্ষর সমূহ যে অশোক কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল এরূপ নহে। সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বেও ঐ সকল অক্ষর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে ঐ সকল অক্ষরের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই বলিয়া পণ্ডিতগণ উহাদিগকে আপাততঃ অশোক অক্ষর নামেই অভিহিত করিয়াছেন। অশোক অক্ষর দুই প্রকার। এক প্রকারের নাম (Ariano-Pali) আর্য্য-পালি ও অপর প্রকারের নাম (Indo-Pali) ভারতীয় পালি। সিন্ধুনদ ও পারস্য দেশ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশকে আর্য্যদেশ বলিত। এইস্থানে প্রাপ্ত অশোক লিপির নাম আর্য্য-পালি। ভারতে প্রাপ্ত অশোক-লিপির নাম ভারতীয় পালি। প্রথমটীকে কেহ Indo-Bactrian অর্থাৎ ভারত-বাহ্লীক বা ইরাণীয় অক্ষর এই নাম প্রদান করিয়াছেন। কেহ কেহ বা আর্য্য-পালি ও ভারতীয় পালি এই দুই অক্ষরকে যথাক্রমে উত্তর-অশোক ও ভারতীয় অশোক অক্ষর এইরূপ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

উত্তর-অশোক লিপিতে লিখিত শিলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সাহাবাজ গিরি ও ম্যান্‌সেরা নামক স্থানদ্বয়ে যে দুইটী প্রস্তর-শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাই উত্তর-অশোকলিপির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সিন্ধু নদ ও পারস্য দেশ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশে যে সকল গ্রীক বা শক-রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত কতিপয় মুদ্রায়ও এই উত্তর-অশোক লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। তুরস্কবংশীয় রাজা কনিষ্কের সময়ের শিলালিপি ও উত্তর-

অশোকলিপি প্রায় তুল্য। অশোকের সময়ে উৎকীর্ণ অন্যান্য প্রস্তর ও স্তম্ভ ভারতীয় অশোক লিপিতে লিখিত। গীর্‌নার, খণ্ডগিরি, ধৌলি, এলাহবাদ, দীল্লি, কৌশাম্বী, শাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শাসন সমূহ এই ভারতীয় অশোক লিপিতে লিখিত।

উত্তর-অশোক লিপি ও ভারতীয় অশোক লিপির পরস্পর প্রধান প্রভেদ এই যে প্রথমটী আরবিক প্রভৃতি ভাষার ন্যায় দক্ষিণ হইতে বামাভিমুখে পড়িতে হয়, আর দ্বিতীয়টী সংস্কৃত, বাঙ্গালা ইত্যাদির ন্যায় বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখে পঠিত হইয়া থাকে। ভারতীয় অশোক লিপি অত্যন্ত সহজ, ইহার প্রত্যেক অক্ষর কেবল দুই একটী সরল রেখা দ্বারা গঠিত। ক্বচিৎ কোন কোন অক্ষর বর্ত্তুলের অংশবিশেষের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

অশোক লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন গ্রীক অক্ষর হইতে উহার সৃষ্টি হইয়াছে। অপর কাহারও মতে সেমিটিক অক্ষরই রূপান্তরিত হইয়া অশোক অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত এই যে অশোক অক্ষর প্রাচীন ভারতের দ্রাবিড়ীয় জাতির উদ্ভাবিত। এই তিনটী মতের মধ্যে সেমিটিক অক্ষর হইতে অশোক অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতটীই অধুনা অত্যন্ত প্রবল। আমার মত এই যে অশোক অক্ষর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত ত্রিবিধ অক্ষরের কোনটী হইতেই উৎপন্ন হয় নাই। শিশুনাগ, মৌর্য্য এবং অন্য অনেক রাজবংশ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান হইতে ভারতে আগমন করিয়া এদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। বোধ হয় ঐ সকল রাজবংশের কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অশোক অক্ষর ভারতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। গান্ধার, বাহ্লীক, উদ্যান প্রভৃতি দেশসমূহ প্রাচীনকালে ভারতের সহ সংসৃষ্ট ছিল। আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিম অংশই আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসভূমি। সম্ভবতঃ ঐ দেশ অশোক-অক্ষরের ও জন্মস্থান।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ্ সাহেব ভারতীয় অশোক অক্ষর সমূহের পরিশুদ্ধরূপে পাঠ ও অশোকের শাসন সমূহের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই অশোক অক্ষর যথার্থভাবে বুঝিতে পারেন নাই। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট উইল্‌ফোর্ড সাহেব ইলোরার গহ্বর-লিপি পাঠ করিবার চেষ্টা করেন এবং একজন প্রাচীন ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সাহায্যে উহার এক প্রকার অর্থও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার উদ্ভাবিত পাঠ ও অর্থ উভয়ই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তাঁহার মতে যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণের অরণ্য পরিভ্রমণ সম্বন্ধীয় নানা রহস্য ইলোরা, দীল্লি, এলাহাবাদ, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানের প্রস্তর স্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে। উইল্‌ফোর্ড বলেন পাণ্ডবগণ অরণ্যে বিচরণকালে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন কোন ব্যক্তির সহ কথা কহিতেন না। বিদুর ও ব্যাস তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সংবাদ সমূহ পর্ব্বত গহ্বর বা প্রস্তর স্তম্ভে সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিয়া রাখিতেন। এই সঙ্কেত তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারিতেন, অন্যান্য লোক উহার অর্থগ্রহ করিতে পারিত না। উইল্‌ফোর্ড সাহেব এই প্রকারে মহাভারতের ঘটনা লক্ষ্য করিয়া অশোক শাসন সমূহের নানা প্রকার বিকৃত পাঠ ও বিকৃত অর্থ প্রচার করেন।

অশোক লিপির ব্যাখ্যা।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ষ্টার্লিঙ্‌ সাহেব অশোক শাসন সমূহের যে পাঠ ও অর্থ প্রচার করেন তাহাও সম্পূর্ণ অদ্ভুত। তিনি উড়িষ্যার খণ্ডগিরি শাসন দেখিয়া বলেন উহার কোন কোন অক্ষর প্রাচীন গ্রীক অক্ষরের সুসদৃশ। বস্তুতঃ, এই সময়ে ও ইহার পূর্ব্ব হইতেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন দীল্লির প্রস্তর স্তম্ভ প্রভৃতি গ্রীকবীর আলেক্‌জান্দরের কীর্ত্তিস্তম্ভ। তাঁহাদের মতে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে আলেক্‌জান্দর

ভারতের নানা স্থান অধিকার করিয়া যে সকল জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন, তাহাই দীল্লিস্তম্ভ প্রভৃতিরূপে বিদ্যমান আছে।

এইরূপ নানা ভ্রান্ত মত প্রচারিত হওয়ার পর ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে প্রিন্সেপ্ সাহেব অশোক-লিপির যথার্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। দীল্লি, এলাহাবাদ, ধৌলী, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানের শাসনসমূহ একই প্রকার অক্ষরে লিখিত এই তত্ত্ব তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। তদনন্তর তিনি বলেন গ্রীক অক্ষরের সহ ক্বচিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও এই সকল শাসনের অক্ষরসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক অক্ষর নহে। ঐ সকল অক্ষর নিশ্চয়ই প্রাচান সংস্কৃত অক্ষর। তদনন্তর একটী শাসনের প্রত্যেক পংক্তির শেষে একই প্রকার দুইটী অক্ষর দেখিয়া তিনি অনুমান করেন এই শাসনটী কোন দানপত্র হইবে এবং এই দুইটী অক্ষর "দানং" ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার পর তাঁহার মনে হয় "দানং" ইহার পূর্ব্বে অবশ্য দাতার নাম থাকিবে, অতএব উহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকাই সম্ভবপর। এই প্রকার কল্পনা করিয়া ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন "স" উদ্ধার করেন। এইরূপে ক্রমে রাজা "পিয় দসি" (প্রিয়দর্শী) বা অশোক এই নাম আবিষ্কার করেন। কিয়ৎকাল পরে সমস্ত শাসন পত্র পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। অশোক-শাসনের একটী বিশেষত্ব এই যে উহাতে স্থানে স্থানে ভারতের বিভিন্ন নৃপতি ও গ্রীকরাজগণের নাম লিখিত আছে। ইহা হইতে ঐতিহাসিকগণ অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

অশোক-লিপি ভিন্ন ভারতে আরও অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তুরস্ক, শক, অন্ধ্র, গুপ্ত, বলভী, চালুক্য, সেন প্রভৃতি রাজ বংশের সময়ে প্রচলিত লিপি, প্রাচীন তাম্রফলক, প্রস্তর শাসন, দানপত্র ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়। আমি এস্থলে প্রাচীনতা অনুসারে প্রধানতঃ কয়েক শ্রেণীর লিপির উল্লেখ করিতেছি। খৃঃ পূঃ ৩য়

শতাব্দীতে মৌর্যবংশীয় রাজা অশোকের সময়ে গীরনার পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানের লিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। গীরনার পর্ব্বতে আর এক প্রকারের লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় উহা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ক্ষত্রপ বংশীয় রাজা রুদ্র দামের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়ের লিপি আলাহাবাদ শিলায় দৃষ্ট হয়। মন্দসর শিলায় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর রাজা যশোধর্ম্ম ও বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময়ের অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাকাটক বংশীয় রাজা প্রবরসেন ও গুর্জরবংশীয় রাজা দদ্দের দানপত্রে ৫ম শতাব্দীর অক্ষরের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বল্লভীর রাজা ধরসেনের অক্ষর পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মেবারের গুহিল রাজা অপরাজিত, কোটার রাজা শিবগণ এবং নেপালের রাজা অংশুবর্ম্মের অক্ষর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮ম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটের রাজা কর্করাজ ও মারবারের পড়িহার রাজা কুক্কুকের অক্ষর পাওয়া যায়। এস্থলে যে কয়েক প্রকারের অক্ষরের নাম লিখিত হইল উহারা সকলেই মূলতঃ এক শ্রেণীর অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নেপালের রাজা অংশুবর্ম্ম লিচ্ছবি বংশ সম্ভূত এবং অশোক মৌর্য্য বংশে সমুদ্ভুত হইয়াছিলেন। মৌর্য্য ও লিচ্ছবি উভয় বংশেরই প্রাচীন বাসভূমি উদ্যান বা আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিমাংশ। অতএব এই সমস্ত অক্ষর যে মূল অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা বোধ হয় আর্য্যগণের একটী যে শেষ সম্প্রদায় ভারতে আগমনকালে উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম-দেব, গঙ্গাবংশের রাজা কোঙ্গণী, চালুক্যবংশীয় রাজা পুলিকেশী, পল্লব-বংশীয় রাজা নন্দিবর্ম্মা, কাকত্যবংশীয় রাজা রুদ্রদেব প্রভৃতি রাজগণের দানপত্র সমূহে যে বিভিন্ন অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহার সহ উল্লিখিত অক্ষরের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে এমন বহু শ্রেণীর অক্ষর বিদ্যমান ছিল যাহাদের সহ

অশোক অক্ষরের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খৃষ্ট পরবর্ত্তী ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বৎসরের লিপি সমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্ত্তমান দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরের ইতিহাস নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

দেবনাগর ও বাঙ্গলা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেক সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে দেবনাগর, পালি ও দ্রাবিড়ীয় এই ত্রিবিধ অক্ষর অশোক অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় এ মত যথার্থ নহে। দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরের তুলনায় অশোক অক্ষর অতি সহজ। একটী ঊর্দ্ধাভিমুখে দণ্ডায়মান সরল রেখার উপর আর একটী ক্ষুদ্র সরল রেখা বিপর্য্যস্ত ভাবে বসাইলেই অশোকের ক হইল। কিন্তু বাঙ্গালায় ক লিখিতে হইলে তিনটী সরল রেখা ত্রিভুজাকৃতি করিয়া বসাইতে হয় ও তাহার দক্ষিণে একটী প্রকাণ্ড শুণ্ড যোগ করিতে হয় এবং মস্তকে এক লম্বা মাত্রা দিতে হয়। অশোকের ক পাঁচবার লিখিতে যে সময় লাগে বাঙ্গালার ক একবার লিখিতে তাহার তুল্য সময় লাগে। দেবনাগর কও নিতান্ত সহজ নহে, তবে উহা বাঙ্গলা ক অপেক্ষা কিছু সরল। প্রকৃতির নিয়ম এই যে দ্রব্য সমূহ ক্রমে সহজ হইয়া আইসে। সহজকে কঠিন করা মানুষের ইচ্ছা নহে। অশোক অক্ষরই যদি ভারতের আদিম অক্ষর হইত, তাহা হইলে উহা ত্যাগ করিয়া ভারতবাসী কখনই কঠিন বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষরের সৃষ্টি করিতেন না। বাঙ্গালা বা দেবনাগরের এক একটী অক্ষর লিখিতে যে সময় ও সামর্থ্য বৃথা নষ্ট হইয়া যায় তদ্দ্বারা অন্য অনেক অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। আমার বোধ হয় বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষর যে মূল অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অশোক অক্ষর অপেক্ষা অনেক প্রাচীনতর।

বাঙ্গলা ও দেবনাগর এই উভয় অক্ষরের কোন্‌টী অধিকতর প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। আমাদের দেশীয় এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকেরই বিশ্বাস দেবনাগর হইতে বাঙ্গলা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় এ মত ভ্রান্তিমূলক। বাঙ্গলা অক্ষর অতি প্রাচীন। "ললিত বিস্তর" নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে বুদ্ধদেব যে চতুঃষষ্ঠি লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্গলিপি তাহাদের অন্যতম। ললিতবিস্তর অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। অতএব অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত ছিল। অবশ্য বর্ত্তমান বাঙ্গলা অক্ষর ও তখনকার বাঙ্গলা অক্ষর অবিকল একরূপ নহে।

দেবনাগর বা নাগরী এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন উহা নগর শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বারাণসী নগরে এই লিপি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে নাগরী লিপি বলে। অপর কেহ কেহ বলেন "ললিত বিস্তর" গ্রন্থে যে নাগ-লিপির উল্লেখ আছে, তাহা হইতে নাগরী লিপির উৎপত্তি হইয়াছে। অপর কাহারও মতে গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়া এই লিপিকে নাগরী বলে। অন্যান্য পণ্ডিতের মত এই যে সাহ বা ক্ষত্রপ রাজগণের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা নাগরী নামে অভিহিত হয়। সাহ রাজগণ নাগ নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত অক্ষর নাগরী নামে প্রচলিত হইয়াছিল। এই সকল মতের কোনটীই সন্তোষজনক নহে।

দেবনাগর ও বাঙ্গলা এই দুই অক্ষর একই দেশে পাশাপাশী অবস্থিতি করিয়া যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় উহারা কেহই অপরটী হইতে উৎপন্ন হয় নাই। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে উহারা

উভয়েই এক মূল অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অক্ষরের আকৃতি ও ইতিবৃত্ত দেখিয়া বোধ হয় বাঙ্গলা দেবনাগরের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। বাঙ্গলা অক্ষর বঙ্গদেশ ও আসাম এই উভয় স্থানে প্রচলিত। নেপালে দুই প্রকার অক্ষর আছে। এক প্রকারের নাম নেওয়ারী, উহা দেবনাগরের তুল্য। তথায় আর এক প্রকারের অক্ষর আছে, উহার নাম ব্যঞ্জন মালা, উহা বাঙ্গালার তুল্য। তিব্বতের উচেন অক্ষর দেবনাগর জাতীয়, কিন্তু লাঞ্ছা অক্ষর বাঙ্গালার তুল্য। জাপান হইতে যে হোরিউঝি অক্ষর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে উহাও বাঙ্গালার অবিকল অনুরূপ। বেরিলি, গয়া প্রভৃতি স্থানে কতিপয় শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উহা কুটিল অক্ষরে লিখিত। কুটিল অক্ষর দেবনাগরেরই প্রকারভেদ। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দাতে বাঙ্গালাদেশের রাজা বিজয়সেনের সময়ের শিলালিপিতে এবং ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গরাজ লক্ষ্মণ সেনের দানপত্রে বর্ত্তমান সময় হইতে আটশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষর কিরূপে লিখিত হইত তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দাতে বিজয় পালের সময়ের যে লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে উহা বাঙ্গালা ও দেবনাগর উভয়েরই অনুরূপ। ১২শ শতাব্দীতে হৈহয় বংশীয় রাজা জাজল্লদেব ও ১৩শ শতাব্দীতে চৌহাণ রাজা চাচিগদেব যে অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান দেবনাগর অক্ষরের অনুরূপ। তিব্বতীয় অক্ষরের সহ দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। কথিত আছে তিব্বতরাজ স্রংসন্‌গম্ পোঁ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে নেপালরাজ অংশুবর্ম্মের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই নেপাল-রাজকন্যা তিব্বতে ভারতীয় অক্ষর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তিব্বতদেশে যে লাঞ্ছা অক্ষর প্রচলিত আছে, কেহ কেহ বলেন উহা রঞ্জিত সংস্কৃত অক্ষর ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহাদের মতে লাঞ্ছা শব্দ রঞ্জা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু চীন ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন

ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে লাঞ্চাউ নামে এক দেশ ছিল। আমার বোধ হয় ঐ দেশ হইতে গৃহীত অক্ষরই তিব্বতের লাঞ্চা অক্ষরের উৎপাদক। এতদ্ভিন্ন তিব্বতে যে বামিয়াক্ অক্ষর প্রচলিত আছে উহা তুর্কিস্থানের সন্নিহিত বামিয়ান্ দেশ হইতে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক এ সকল বিদেশীয় অক্ষরের আলোচনা না করিয়া আমি আমাদের দেশীয় অক্ষর সমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

হৈহয়বংশ, পালবংশ ও সেনবংশের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি সমূহের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ভারতে দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত ছিল। তাহার আর কত কাল পূর্ব্বে ভারতে দেবনাগর অক্ষরের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল নিশ্চিত জানা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন গুপ্তরাজগণের সময়ে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল তাহা হইতে দেবনাগর ও বাঙ্গালা উভয়বিধ অক্ষরেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের মতে গুপ্ত অক্ষর সমূহ আবার অশোক অক্ষরেরই পরিণতি মাত্র। সংপ্রতি দেবনাগর অক্ষর প্রায় সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে উহার প্রসর এত অধিক ছিল না। উহা একটী সামান্য প্রাদেশিক অক্ষর ছিল। বোধ হয় কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন বা ঐরূপ কোন পরাক্রান্ত নরপতির অনুগ্রহে দেবনাগর অক্ষর শনৈঃ শনৈঃ চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইয়াছিল। সংপ্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার করায় উহা ভারতে ও ইউরোপে শীঘ্র শীঘ্র সবিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছে। মান্দ্রাজ, বোম্বে, পঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তত্তদ্দেশীয় ছাত্রগণকে বাধ্য করিয়া দেবনাগর শিক্ষা দেওয়ায় উহা বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে আরও অধিক

বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও দেবনাগর অক্ষর প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব চলিতেছে। এই প্রস্তাব যদি কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে সমগ্র ভারতে দেবনাগর অক্ষর পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। এই অক্ষর সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ সমূহকে ও আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পালিগ্রন্থ সমূহ ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে দেবনাগর অক্ষর যে পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় আর অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে উহা প্রায় সমগ্র এসিয়া মহাদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।

আজকাল দেবনাগর ও বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতে আরও বহু অক্ষরের প্রচলন আছে। এই সকলের মধ্যে গুরুমুখী, উড়িয়া, গুজরাটী, সিন্ধী, মুলতানী, তেলুগু, কানারীজ, তুলু, তামিল, কিওসা, বার্মীজ, সিংহলী, পেগু, আহোম্, বত্তক, রেজাঙ্, লম্পোঙ, তগল, বিষয়, মাকাসর, বুগী প্রভৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে এই সকল অক্ষরও অশোক অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অক্ষর গুলির আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় ইহাদের সহ অশোক অক্ষরের কোন সম্পর্ক নাই। এ বিষয়ে আমার মত এই যে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালার নাম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই নাম ভারতের ও উহার বহির্ভাগের বহুজাতি গ্রহণ করিয়াছিল। তদনন্তর উহারা স্ব স্ব ভাষায় ঐ সকল অক্ষরের সদৃশ শব্দবাচক বস্তুর অনুকরণে অক্ষর গুলির আকৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল। বস্তুতঃ অক্ষর সমূহের আকৃতি দেখিয়া উহাদের জাতি নিরূপণ হয় না। অক্ষর সমূহের নাম দেখিয়া উহাদের জাতিত্ব নির্দ্ধারণ করাই উচিত। নাম-অনুসারে বিচার করিলে দেখা যায় প্রাচীন পারসীক, তিব্বতীয়, সিংহলী, বার্মীজ, শ্যাম, কোরীয় প্রভৃতি অক্ষর পরস্পর এক জাতিত্বে বদ্ধ। ভারতের

সকল প্রকার অক্ষর প্রায় এক নামে পরিচিত। কোন্ সময়ে কি প্রকারে এক নামের অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ভারতের দ্রাবিড়ীয় ও অম্বুগঙ্গ জাতি-সমূহ কতিপয় ভিন্নাকৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল। আর লিচ্ছবি, শক, হূণ, খস, দরদ, আভীর, পল্লব, তুরস্ক প্রভৃতি বিদেশীয় জাতি সমূহ ভারতে প্রবেশ করিয়াও এদেশে নানা প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট অক্ষরের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এক একটী প্রকারের অক্ষর এক একটী জাতি বা রাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ এরূপ কত প্রকারের অক্ষর বিদ্যমান আছে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগরার ডেড্ লেটার আফিসে আবদ্ধ চিঠির এক অক্ষরানুযায়ী তালিকা বাহির হয় তাহাতে ৬০ প্রকারের অক্ষর দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, ভারতীয় অক্ষর সমূহের উৎপত্তি, বিস্তার ও ধ্বংস নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যিনি পৃথিবীর সমস্ত ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন তিনিও ভারতের ভাষা সমূহ আয়ত্ত করিতে অক্ষম। ভারতের ইতিহাস যত বৈচিত্র্যপূর্ণ, জগতের ইতিহাস তত বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে।

মীসরের প্রাচীনতম অক্ষর বা বস্তু চিত্র।

(খৃঃ পূঃ ৪০০০)।

অ	হ	ক	চ
ব	[illegible]	ল	ক
গ	ঝ	ম	র
দ	থ	ন	য
	থ	স	ত
	ই	প	

নিনেভার ফিনিসিয় অক্ষর

(খৃঃ পূঃ ৯০০)।

অ	ব	ক	আ	ষ
ম্ব	ঝ	ল	প	ত
গ	ছ	ম	চ	
দ	ট	ন	ক	
হ	জ	স	র	

ইজ্‌রেলের ফিনিসিয় অক্ষর

(খৃঃ পূঃ ৮০০)।

অ	র	ক	আ	ষ
ম্ব	ঝ	ল	প	ত
গ	ছ	ম	চ	
দ	ট	ন	ক	
হ	জ	স	র	

মীসরের আরামীয় অক্ষর

(খৃঃ পূঃ ৩০০)।

অ ব ক আ ষ

ব্ব ঝ ল প ত

গ ছ ম চ

দ ট ন ক

হ জ স র

কার্থেজের ফিনিসিয় অক্ষর

(খৃঃ পূঃ ২০০)।

অ ব ক আ ষ

ব্ব ঝ ল প ত

গ ছ ম চ

দ ট ন ক

হ জ স র

ক্যাল্‌ডিয়ার উত্তর সেমিটিক অক্ষর

(খৃঃ পূঃ ১০০)।

অ	ব	ক	আ	র
ৱ	ঝ	ল	প	ষ
গ	ছ	ম	চ	ত
দ	ট	ন	ক	
হ	জ	স		

জেন্দ্‌ বা পারসীক অক্ষর

(খৃষ্টাব্দ ৯০০)।

অ	ইয়্‌	গ	থ	ল
আঁ	উ	ঘ	দ	র
এ	উব্‌	ঙ	ধ	ব
আ	এ	জ	ৱ	উয়্‌
এই	এ̂	চ	প	শ
অঁ	ও	ঝ	ক	ষ
ই	এ̂	ঝ	ৱ	স
ঈ	ক	ত	ম	হ
উ	খ	ড	য	হ্ব

অশোক অক্ষর, গীরনার পর্ব্বত

(খৃঃ পূঃ ৩০০)।

অ	ক	ঋ	ত	ন	(য) র
আ	খ	ঞ	থ	প	ল
ই	গ	ট	দ	ফ	ব
উ	ঘ	ঠ	ধ	শ্ব	স
এ	চ	ড		ভ	
ও	ছ	ঢ		ম	হ
অং	জ	ণ		য	

ক্ষত্রপ বংশীয় রুদ্রদাম

(খৃঃ ১০০)।

অ..	ঘ	ঢ	ন্ব	ল	ল
আ	চ	ণ	ভ	ব	
ই	ছ	ত	ম	শ	
এ	জ	থ	য	ষ	
ক	ঞ	দ	র	স	
খ	ট	ধ		হ	
গ	ঠ	ন			
	ড	প			
		ফ			

সমুদ্র গুপ্ত, আলাহাবাদ

(খৃঃ ৪০০)।

অ	ঘ	ড	দ	ব	ব
আ	ঙ	ঢ	ধ	ভ	শ
ই	চ	ণ	ন	ম	ষ
উ	ছ	ত	প	য	স
এ	জ	থ	ফ	র	হ
ক	ঞ			ল	ল
খ	ট				
গ	ঠ				

কুমার গুপ্ত, মন্দসোর,

(খৃঃ ৪০০)।

অ	জ	ত	ন	য	হ
ই	ঞ	থ	প	র	
ক	ট	দ	ফ	ল	
খ	ঠ	ধ	ব	ব	
গ	ড		ভ	শ	
ঘ	ঢ		ম	ষ	
ঙ	ণ			স	
চ					

যশোধর্ম্মন্‌ ও বিষ্ণু বর্দ্ধন

(খৃঃ ৫০০) মান্দাসোর।

অ আ ই উ এ ঐ ক খ

গ ঘ ঙ চ ছ জ ঞ ট ঠ

ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র ল

ব শ ষ স হ

নেপালরাজ অংশুবর্ম্মের সময়ের অক্ষর

(খৃঃ ৬২৯)।

ক গ ঙ চ ছ জ ঞ

ট ঠ ড ণ ত থ

দ ধ ন প ব ভ ম

য ল ব শ ষ স হ

রাজা বিজয়পাল, অলবর

(খৃঃ ৯৬২)।

অ	ঘ	ত	ম
আ	চ	থ	য
ই	ছ	দ	ব
উ	জ	ধ	ল
এ	ঞ	ন	ব
ঐ	ট	প	শ
ক	ঠ	ব	ষ
খ	ড	ভ	স
গ	ণ		হ

বাঙ্গালার রাজা বিজয় সেন

(খৃঃ ১১০০)।

অ	ঘ	ড	প	ল
আ	ঙ	ঢ	ফ	ব
ই	চ	ণ	ব	শ
উ	ছ	ত	ভ	ষ
এ	জ	থ	ম	স
ক	ঞ	দ	য	হ
খ	ট	ধ	র	
গ	ঠ	ন		

বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণ সেন

(খৃঃ ১২০০)।

অ	ঘ	ড	প	ব
আ	ঙ	ঢ	ফ	শ
ই	চ	ণ	ব	ষ
ঈ	ছ	ত	ভ	স
উ	জ	থ	ম	হ
ক	ঞ	দ	য	
খ	ট	ধ	র	
গ	ঠ	ন	ল	

[ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

রমাসুন্দরী।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীরে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে, তন্মধ্যে মরী কার্টরোড্ পথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও শীঘ্র। এই পথ রাওলপিণ্ডি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাওলপিণ্ডি হইতে টোঙ্গা লইয়া একেবারে শ্রীনগর যাওয়া যায় (মরী পথমধ্যে অবস্থিত)—তাহাতে দুই দিন লাগে। যাঁহাদের সময়ের ত্বরা নাই, তাঁহারা বরামুলা অবধি টোঙ্গায় গিয়া, সেখান হইতে নৌকাযোগে ঝিলমের বক্ষ দিয়া শ্রীনগরে পৌছিয়া থাকেন। পথের এই অংশটি অত্যন্ত উপভোগ যোগ্য,—প্রাকৃতিক শোভায় মনোহর।

রাওলপিণ্ডিতে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া, প্রত্যূষে নবগোপাল স্ত্রী ও লছমীকে লইয়া টোঙ্গায় আরোহণ করিল।

টোঙ্গা ছাড়িলে প্রথম কিয়ৎক্ষণ রমা মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া রহিল। দাদার নিকট সস্নেহ বিদায় গ্রহণ তাহার মনে একখানি বাষ্পখণ্ড বিস্তার করিয়াছিল। দুই তিন মাইল অতিক্রান্ত হইলে, দুই পার্শ্বের নব নব দৃশ্য তাহার মনকে আবার প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। এখন দুইধারে শস্যক্ষেত্র,—সম্মুখে, কিন্তু দূরে,—পর্ব্বতমালা। রমা নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করিল "ঐ পাহাড়ের কাছে যখন আমরা আস্‌ব, তখন গাড়ী কি করে উপরে উঠবে?" নবগোপাল বলিল,—"পাহাড়ের গায়ে গায়ে রাস্তা আছে। সে রাস্তা ত সটান পাহাড়ের উপর ওঠে না,—পাহাড়কে যেন ঘিরে ঘিরে ওঠে।"

রমা ইহা ভাল বুঝিতে পারিল না। নবগোপাল তাহার পকেট হইতে "গাইড" বাহির করিয়া বলিল,—"শৈলগ্রাম থেকে আমরা

পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করব,—আর দশ ক্রোশ পরে,—[illegible]
বুঝ্‌তে পার্‌বে।”

বারাকু পর্য্যন্ত পথটি বৃক্ষছায়া সম্পন্ন ছিল। বারাকু ছাড়াইলে, পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষও কমিয়া গেল,—সূর্য্যের তেজও প্রখর হইতে লাগিল। রমার হাসিখুসী তখন হইতে একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল।

৬

দেখিতে দেখিতে ত্রেতের ডাকবাঙ্গলাও পার হইয়া গেল—এখান হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর আরোহণ আরম্ভ। টোঙ্গার গতি কমিল। পর্ব্বত আরোহণ আরম্ভ হইলে, রমা আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পথের একধারে উচ্চ পর্ব্বতগাত্র,—অন্যধারে অল্পোচ্চ রেলিং,—তাহার পর খদ নামিয়া গিয়াছে। দুই ধারেই বহু বৃক্ষ,—সমস্তই সবুজ। বেলা যখন দশটা হইবে,—তখন টোঙ্গা যে স্থানে পৌঁছিল তাহার নাম চত্বর। সেখানে ঘোড়া বদল হইল। ড্রাইভার কিয়দ্দূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক হিন্দীতে বলিল—“বাবু, ঐখানে একটি সুন্দর বাগান আছে। আপনারা যদি একটু বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উহার ভিতর যাইতে পারেন।”

রমা সে বাগান দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। নবগোপাল বলিল, “চল তবে বাগান দেখে, ঐখানে কিছু খেয়ে নিয়ে, আবার যাওয়া যাবে।” তাহাদের সঙ্গে সারাদিনের উপযুক্ত খাদ্য সংগৃহীত ছিল। তাহা লইয়া তিনজনে টোঙ্গা হইতে অবতরণ করিয়া বাগান অভিমুখে অগ্রসর হইল।

সকলেরই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। একটি মনোরম স্থান অন্বেষণ করিয়া, তিনজনে বসিয়া গল্প ও আমোদের মধ্যে আহার শেষ করিল। আহারান্তে নবগোপাল তাহার সিগারেট ধরাইবার জন্য দেশলাই খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু পকেটে কোথাও পাইল না। তখন রমা ও

মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, আবার টোঙ্গা ছাড়িয়া দিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে শৈলগ্রাম সেতু পার হইতে হইল;—তাহার পর হইতেই রীতিমত পর্ব্বত আরোহণ আরম্ভ। এতক্ষণ বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল,—এখন বড় বড় দেবদারু বৃক্ষের সারি আরম্ভ হইল। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল। দেবদারু বৃক্ষগুলি দুলিয়া দুলিয়া পথিকগণকে যেন অভিবাদন করিতেছে। তাহাদের তলদেশে শুষ্কপত্রের শয্যা রচিত। টোঙ্গার শব্দ শুনিয়া মাঝে মাঝে এক আধটা জন্তু কোথা হইতে বাহির হইয়া, মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসে এবং নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া ধাবমান টোঙ্গার প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

ক্রমে সূর্য্য আকাশের মধ্যভাগে আরোহণ করিলেন। কিন্তু গ্রীষ্ম বাড়িল না,—বরং একটু একটু কমিয়া আসিতেই লাগিল। ক্রমে একটি বাঙ্গলা দৃষ্টিপথে আসিল। সেখানে টোঙ্গা পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়াইল,—ঘোড়াও বদল হইল। সেখান হইতে নিম্নে সমতলভূমির বহুদূর বিস্তৃতি দেখা যায়। নবগোপাল গাইড দেখিয়া বলিল,—"আমরা এখন চার হাজার ফুট উঠেছি।"

টোঙ্গা যত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল,—ক্রমে বেশ শীত করিতে লাগিল। একটা ঘোড়া বদল করিবার স্থানে নামিয়া, টোঙ্গার পশ্চাদ্ভাগে আবদ্ধ তোরঙ্গ খুলিয়া নবগোপাল গাত্রবস্ত্রগুলি বাহির করিয়া আনিল।

অপরাহ্ণ সময়ে পথটি দ্বিশাখাবিশিষ্ট হইয়া দেখা দিল। ড্রাইভার একটি বাঙ্গলা দেখাইয়া হিন্দিতে বলিল—"এই সানিবঙ্ক ডাকবাঙ্গলা।

দক্ষিণে ঐ পথ মরীতে গিয়াছে।" টোঙ্গা আসিবামাত্র, বাঙ্গলার বারান্দায় একজন খানসামা আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে ড্রাইভারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, হস্তদ্বারা চা পান করিবার মত ইঙ্গিত করিল। ড্রাইভার নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হুজুর, চা আবশ্যক আছে ?"

নবগোপাল বলিল—"তিন পেয়ালা।"

ড্রাইভার তাহার তিনটি স্থূল হস্তাঙ্গুলি উত্থিত করিয়া খানসামাকে সঙ্কেত করিল। খানসামা তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, খানসামা একটি ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া টোঙ্গার নিকট দাঁড়াইল। তাহাতে তিন পেয়ালা অত্যুষ্ণ চা,—কিছু রুটি, মাখন এবং কয়েকটি চুরট। নবগোপালের হিসাবে ভুল হইয়াছিল। লছমী চা গ্রহণ করিল না।

চা পান শেষ হইলে টোঙ্গা আবার অগ্রসর হইল। দক্ষিণে মরী সহর পড়িয়া রহিল। দেবদারু বৃক্ষের অন্তরালে অন্তরালে মরীর ক্যাণ্টনমেণ্ট, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি দেখা যাইতে লাগিল।

মরী ছাড়াইয়া, পূর্ব্বমত প্রতি পাঁচ মাইলে ঘোড়া বদল হইল বটে,—কিন্তু আর একটিও ডাকবাঙ্গলা দেখা গেল না। ড্রাইভার বলিল, কোহালা পৌঁছিবার পূর্ব্বে আর ডাকবাঙ্গলা নাই। কোহালায় রাত্রিযাপন করিবার জন্য নবগোপাল পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

মরী ছাড়াইয়া প্রথম কয়েক মাইল প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত রমনীয় দেখা গেল। ক্রমে কিন্তু পর্ব্বতগাত্র অপেক্ষাকৃত বন্ধুর ভাব ধারণ করিল। রমা ঢুলিয়া ঢুলিয়া শেষে লছমীর কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কোহালায় যখন টোঙ্গা আসিয়া দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যা সমাগত, কোহালা, পঞ্জাব ও কাশ্মীরের সীমান্ত রেখার উপর অবস্থিত। ইহা

একটি ক্ষুদ্র গ্রাম—বাজার, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে। পূর্ব্বে হইতে এখানে নবগোপালের জন্য একটি ক্ষুদ্র বাড়ী একরাত্রির জন্য স্থির করা ছিল। সেই বাড়ীতে নামিয়া, সামান্য কিঞ্চিৎ রন্ধনাদির পর ক্ষুধার্ত্তগণ ভোজন সমাধা করিল। তাহার পর যে নিদ্রোপভোগ তাহা কেবল এইরূপ পরিক্লান্ত পান্থজনের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লছমী সারাদিনের উপযুক্ত লুচী ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া লইল। কিঞ্চিৎ আহারাদির পর বেলা দশটার সময় আবার টোঙ্গা ছাড়িল।

কোহালা হইতে বরামুলা একশত মাইল। পূর্ব্বদিনের ক্লান্তি তখনও সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই, তাই নবগোপাল স্থির করিল অদ্য মধ্যপথে ছাগোতি ডাকবাঙ্গালায় বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিবে।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই দুলাইয়ের ক্ষুদ্র ডাকবাঙ্গলাটি পথপার্শ্বে মস্তক উন্নীত করিল। লেডি রিপণ এইটির "হনিমুন কটেজ" নামকরণ করিয়া গিয়াছেন।

বামে, মধ্যে মধ্যে ঝিলম নদী দেখা যাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে টোঙ্গা সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে, আলোক অত্যন্ত কমিয়া আসে, আবার দুই এক মিনিটের মধ্যে সূর্য্যালোকে বাহির হইয়া পড়ে।

ক্রমে জেমল ও তাহার ডাকবাঙ্গলা পশ্চাতে পড়িল। এইখানে কৃষ্ণগঙ্গা আসিয়া ঝিলমে মিশিয়াছে। ক্রমে দূরে মোজফরাবাদের দুই একটা গৃহচূড়া বৃক্ষাবল্লীর মধ্যে দেখা গেল।

ডোমলের পর আবার বৃক্ষগুলি একটু ক্ষুদ্রাকার, ঘনসন্নিবদ্ধ। এক প্রকার নুতন বৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল; ড্রাইভার বলিল ইহার নাম চেনার। যখন কোনও পার্ব্বতীয় গ্রামের নিকট ঝিলম দৃষ্টিপথে

আসে, তখন মাঝে মাঝে দেখা যায়, রজ্জুসেতুতে মানুষ নদী পার হইতেছে। নদীর পরিসর অল্প,—স্রোত অত্যন্ত প্রখর। নদীর দুইধারে দুইটি কাষ্ঠস্তম্ভে একটি রজ্জু লম্বিত আছে। একপ্রান্তে, একটা ঝুলির মত পদার্থে মানুষ বসিল। ঝুলিটি উপরের রজ্জুতে অবলম্বিত। ঝুলি ছাড়িয়া দিবা মাত্র প্রথমটা খানিক নামিয়া যায়, মধ্যপথে গিয়া থামে। ওপারে লোক আছে, সে তখন রজ্জু টানিয়া ঝুলিকে ওপারে লইয়া যায় এবং পথিকের নিকট তাহার যৎসামান্য প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়।

অপরাহ্ণ সময়ে টোঙ্গা ছাগোতি পৌঁছিল। সেখানে ডাকবাঙ্গালায় নামিয়া আহারাদি এবং সে রাত্রি বিশ্রাম। বাঙ্গলার অনতিদূরে ঝিলম। সেখানেও একটি "ঝুলা" আছে। রমা অনেকক্ষণ ধরিয়া কৌতূহলের সহিত মানুষ পার হইবার প্রণালী দেখিতে লাগিল। সে "ঝুলা"টি নদীর অনেক উচ্চে। নদীর বেগও সেখানে প্রচণ্ড। যদি কোন ক্রমে ঝুলাটি ছিঁড়িয়া নদীতে পড়িয়া যায়, তবে হতভাগ্য পথিকের পরলোকপ্রাপ্তি হাতে হাতে।

পরদিন টোঙ্গা যখন বরামুলাতে পৌঁছিল, তখন বেলা দুইটা। এখান হইতে ঝিলমের বক্ষ প্রশস্ত,—গতিও প্রচণ্ড নহে। নৌকা অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে।

টোঙ্গাকে বিদায় দিয়া, নবগোপাল নদীতীরে নৌকা ঠিক করিতে গেল। ছোট, বড়, মাঝারি অনেক প্রকার নৌকা আছে। কয়েকখানি নৌকা আছে, তাহা নৌকা বলিলেও হয়, গৃহ বলিলেও হয়। কাশ্মীর ভ্রমণকারীরা অনেক সময় এইরূপ গৃহ-নৌকা* কয়েক মাসের জন্য ভাড়া করিয়া লন। জলপথে কাশ্মীরের অনেক স্থানেই যাওয়া

* House-boats.

যায়। রাজধানী শ্রীনগরের প্রধান রাজপথটি নদী। শ্রীনগরবাসী অনেকেই জলচর।

নৌকাগুলি দেখিলে মনে হয় অত্যন্ত ভারী। নৌকার উপর মজবুৎ ঝাঁপকাঠির গৃহনির্ম্মিত। যেগুলি অধিক সৌখীন, তাহার গৃহভিত্তি খোদাই করা কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত। নৌকার সম্মুখভাগ আরোহীর জন্য। পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়িমাঝিগণ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া বসবাস করে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ পর্য্যন্ত সকলেই সাধ্যানুসারে পালাক্রমে দাঁড় টানিয়া থাকে। জল যেখানে অগভীর, সেখানে লগীও ঠেলিতে হয়। কখনও কখনও বা তীরে নামিয়া গুণ টানিয়াও যাইতে হয়।

নবগোপাল যে নৌকাটি ভাড়া করিল তাহা অধিক বড় নহে। সেদিন রাত্রে নৌকাতেই সকলে শয়ন করিল। পরদিন প্রভাতে শ্রীনগরাভিমুখে নৌকা ছাড়িল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রণয় মাধুরী।

ভালবাসি তাই দিনরাত
পড়ে আছি মুখপানে চেয়ে ;—
দেখিতেছি মাধুরীর ধারা
গড়ায়ে পড়িছে তোমা ছেয়ে।
গাহ গান—তাই গাহে পাখী,
হাস তুমি—তাই ফোটে ফুল ;
নাচিতেছ—তাই আজো বায়ু
ছুটিতেছে উন্মাদ, ব্যাকুল।
তুমি যবে এলাইয়া দেহ
নগ্ন তব তনু দেহখানি—
তখন সে জ্যোৎস্না ফুটে' ওঠে
সুপ্ত হয় মোহমুগ্ধ প্রাণী !
তুমি পুনঃ মেল যবে আঁখি—
তখনি আবার ওঠে রবি,
তখনি জাগিয়া সপুলকে
ধন্যগান গাহে যত কবি।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

"হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য।"

"সম্বন্ধ আভাষণপূর্ব্ব" এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। ইহার অন্য যে অর্থ থাকুক না কেন, দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপনের পূর্ব্বে আভাষণ অর্থাৎ পরিচয় যে, নিতান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাইবেলে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। এক ব্যক্তি বলিতেছিল "দূরে পর্ব্বতপার্শ্বে দেখিতে পাইলাম অদ্ভুত কিমাকার একটি জীব বিচরণ করিতেছে; উহা আমার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলে বুঝিলাম সে একজন মানুষ। যখন একেবারে আমার সমীপবর্ত্তী হইল, দেখিলাম সে আমার সহোদর।" বস্তুতঃ অপরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক সময়ে এইরূপ আকারই পরিগ্রহ করে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে হইলে উহাদের ব্যবধান খুব কম হওয়া আবশ্যক; সর্ব্বপ্রকার চিন্তা, ভাব এবং ভাবনার আদান প্রদান হওয়া নিরতিশয় প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত কারণবশতঃ গত বৈশাখ মাসের "ভারতী"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ইমদাদল হক সাহেব লিখিত "হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। প্রবন্ধটি বিষয়-গৌরবে সময়োপযোগী এবং লেখকের মনোগত উদ্দেশ্য-বিবেচনায় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যতদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে ঘৃণার পরিবর্ত্তে সহানুভূতির চক্ষে না দেখিবে ততদিন কাহারও মঙ্গল নাই। সুতরাং যাঁহারা এই মনোমালিন্য দূরীকরণার্থ চেষ্টাপরায়ণ তাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী। শ্রীযুক্ত হক

প্রণয় মাধুরী।

ভালবাসি তাই দিনরাত
পʼড়ে আছি মুখপানে চেয়ে ;—
দেখিতেছি মাধুরীর ধারা
গড়াʼয়ে পড়িʼছে তোমা ছেʼয়ে।
গাহ গান—তাই গাহে পাখী,
হাস তুমি—তাই ফোটে ফুল ;
নাচিতেছ—তাই আজো বায়
ছুটিতেছে উন্মাদ, ব্যাকুল।
তুমি যবে এলাইয়া দেহ
নগ্ন তব তনু দেহখানি—
তখনি সে জ্যোৎস্না ফুটেʼ ওঠে
সুপ্ত হয় মোহমুগ্ধ প্রাণী !
তুমি পুনঃ মেল যবে আঁখি—
তখনি আবার ওঠে রবি,
তখনি জাগিয়া সপুলকে
ধন্যগান গাহে যত কবি।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

"হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য।"

"সম্বন্ধ আভাষণপূর্ব্ব" এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। ইহার অন্য যে অর্থ থাকুক না কেন, দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপনের পূর্ব্বে আভাষণ অর্থাৎ পরিচয় যে, নিতান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাইবেলে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। এক ব্যক্তি বলিতেছিল "দূরে পর্ব্বতপার্শ্বে দেখিতে পাইলাম কিম্ভূত কিমাকার একটি জীব বিচরণ করিতেছে; উহা আমার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলে বুঝিলাম সে একজন মানুষ। যখন একেবারে আমার সমীপবর্ত্তী হইল, দেখিলাম সে আমার সহোদর।" বস্তুতঃ অপরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক সময়ে এইরূপ আকারই পরিগ্রহ করে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে হইলে উহাদের ব্যবধান খুব কম হওয়া আবশ্যক; সর্ব্বপ্রকার চিন্তা, ভাব এবং ভাবনার আদান প্রদান হওয়া নিরতিশয় প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত কারণবশতঃ গত বৈশাখ মাসের "ভারতী"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ইমদাদল হক সাহেব লিখিত "হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। প্রবন্ধটি বিষয়-গৌরবে সময়োপযোগী এবং লেখকের মনোগত উদ্দেশ্য-বিবেচনায় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যতদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে ঘৃণার পরিবর্ত্তে সহানুভূতির চক্ষে না দেখিবে ততদিন কাহারও মঙ্গল নাই। সুতরাং যাঁহারা এই মনোমালিন্য দূরীকরণার্থ চেষ্টাপরায়ণ তাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী। শ্রীযুক্ত হক

সাহেবের উত্তম সাধু এবং প্রশংসনীয়। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেরই ধন্যবাদার্হ।

প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিলাম হিন্দুর প্রতি মুসলমানের ক্ষোভের কারণ কি। এই ক্ষোভ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত যত লুক্কায়িত না থাকে ততই মঙ্গল। উভয় শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার চিন্তার আদান প্রদানই বাঞ্ছনীয়। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ; ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আমরা আবশ্যক মনে করিতেছি। আদৌ বলা উচিত যে, আমরা প্রবন্ধের প্রতিবাদ-প্রয়াসী নহি। আমাদের বিশ্বাস গরিমার অঙ্গহানি হেতু লেখকের মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে না সেই দুই একটি বিষয়ের যোজনা করিতে অভিলাষী মাত্র।

প্রবন্ধটি পাঠ করিলে পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হইবে 'এক্ষেত্রে হিন্দুই সম্পূর্ণ দোষী'। "তাঁহারা মুসলমানদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন; (প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক আছে কি?)।" মিথ্যা বলিতে পারি না। অপরন্তু ইহাও সত্য যে, মুসলমানও হিন্দু জাতিকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। লেখক এইটুকুর উল্লেখ আদৌ করেন নাই। এ ঘৃণা যে উভয়েই বর্ত্তমান তাহা আমরা কেহই অবিদিত নহি। এই মহা অনিষ্টকারী প্রবৃত্তি উভয় হইতে দূরীভূত হয় আমরা তাহাই দেখিতে প্রয়াসী।

লেখক স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির এবং বর্ত্তমান নবীনবাবু প্রভৃতির মুসলমানবিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সে সকল বিষয়ে লেখকের সহিত একমত হইবার মত ঐতিহাসিক সময় উপস্থিত না হইলেও তাহার কোন প্রতিবাদ করিতেছি না। বরং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার্থ এতটুকু বলিতে প্রস্তুত যে, পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবু প্রণীত "রাজসিংহ" পড়িবার সময়ে আমাদের যে একটু

কষ্ট না লাগিয়াছিল তাহা নহে। আমাদের বোধ হইয়াছিল রাজসিংহে তাঁহার গৌরব বুঝি কিছু লঘু হইল। কিন্তু এই হিন্দুসাহিত্যরথিগণের দোষ একেবারে অমাৰ্জ্জনীয় নহে ; কারণ মূলে বর্ত্তমান তাঁহারা নহেন। লেখকও স্বীকার করিয়াছেন এজন্য ইউরোপীয় জাতিগণই প্রধানতঃ দায়ী। মুসলমান-ইতিহাস-সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা প্রধানতঃ 'প্রাতাচ্য খ্রীষ্টান' হইতে লব্ধ। উল্লিখিত সাহিত্যাচার্য্যগণ যখন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তখন তাহাতে তাঁহাদের তৎকালাৰ্জ্জিত জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন। সে বিশ্বাস যে ভ্রমাত্মক তাহা কেহ তখন প্রদর্শন করে নাই। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের কর্ত্তব্য ছিল সেই সমস্ত ভ্রান্তসংস্কারের সংশোধন করা। হিন্দু যে যে ক্ষেত্রে ভ্রম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে, সে সে স্থলে নিজের দোষ যথেষ্ট ক্ষালন করিয়াছে। অক্ষয় বাবুর 'সিরাজউদ্দৌলা,' বিহারীবাবুর ইংরেজের জয়, তাহার প্রমাণ।

হিন্দুর দোষ লাঘবের পক্ষে আরও একটি কথা আছে সেটি মানবের প্রকৃতিগত বৃত্তি। জীবজগতে মানব যতই কেন উন্নতিসাধন করিয়া থাকুক না কেন, সে এখনও হিংসা বা প্রতিহিংসাবৃত্তিকে একেবারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু নিজের দেশে ৭ শতবৎসর মুসলমানের পদানত ছিল। কত অত্যাচার অবিচার সহ্য করিয়াছে। সে কি সব বিস্মৃত হইয়াছিল ? তাহা নহে, চাপিয়া রাখিয়াছিল। দেশে ইংরাজ আসিল। মুসলমানের ভয় গেল। এই সময়ে সে যে হৃদয়ের অন্তঃস্তলনিহিত মর্ম্মবেদনার একটু অভিব্যক্তি দেখাইবে তাহা বিচিত্র নহে—ইউরোপীয় গ্রন্থাদিও তাহার সহায় হইল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দুর মুসলমানবিদ্বেষ প্রদর্শনের ইহা এক প্রধান কারণ। মানুষের এই স্বভাবগত দৌর্ব্বল্য একটু ক্ষমার উপযোগী। হিন্দু-মুসলমান এখন পরস্পরের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন ; দেখিতে পাইতেছেন যে, কাচ-নির্ম্মিত একই গৃহে তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন ; পরস্পরের প্রতি

লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে কাচখণ্ড উভয়ের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিবে। সুতরাং অতীতের কথা বিস্মৃত হইয়া উভয়েই একটু উদারভাবাপন্ন হয়েন ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং পরমেশপদে প্রার্থনীয়।

আমরা শিশুকাল হইতে শিখিয়া আসিতেছি "কোরাণের মতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বল এবং অস্ত্রপ্রয়োগে পাপ নাই, বরং পুণ্য আছে।" সুতরাং মুসলমান বিজয়ীর "এক হস্তে কোরাণ, অন্য হস্তে শাণিত তরবারি" এইরূপ একটি সংস্কার দৃঢ়মূল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমরা যে এই সংস্কার সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি তাহার আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিহারে অবস্থানকালে আমাদের কোন গ্রাজুয়েট বন্ধু তদীয় এক মুসলমান গ্রাজুয়েট বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, মুসলমানধর্ম্মসম্বন্ধে সাধারণের উপরোক্তরূপ যে ধারণা আছে তাহা ভ্রমাত্মক। আমাদের বন্ধু উক্তবাক্যে এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন যে, প্রকাশ্য সভায় যেখানে মুসলমানধর্ম্মসম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করা হইতেছিল, তথায় তিনি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এ ক্ষেত্রে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের কর্ত্তব্য যে, ঐতিহাসিক গবেষণাদ্বারা তাঁহারা সাধারণের মন হইতে ভ্রমপূর্ণ সংস্কারসমূহ নিরসন করেন। সেজন্যও বঙ্গসাহিত্যরঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "মুসলমানেরা বাঙ্গালাসাহিত্য পড়িবে কি কেবল গালি খাইবার জন্য?" উপরে যে কয়েকটি কথা লিখিত হইল তাহা হইতেই বোধ হয় এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। যাঁহারা গালি দিয়াছেন তাঁহাদের চারিদিকের অবস্থা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের একটু স্মরণ রাখিতে হইবে। মুসলমানের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণাপরিবর্ত্তনেরও একটু লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই সুযোগ যেন মুসলমানগণ, শিক্ষিত মুসলমান-

গণ কখন অবহেলা না করেন। কুসংস্কার দূরীকরণের এইই প্রকৃষ্ট সময়।

তারপর আর একটি কথা মুসলমানমাত্রই যে হিন্দুর চক্ষে ঘৃণ্য আমরা এই উক্তির পোষকতা করিতে পারি না। এরূপ উক্তি আমরা আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের সাধারণ 'গালি' বলিয়া মনে করিতেও পারি। কেননা হিন্দু এখনও 'পীরের দরগায়' মানসা করিয়া থাকে। মুসলমানের মধ্যে অতি মহাশয় মহাশয় ব্যক্তি আছেন; যথেষ্ট ধীর প্রকৃতি উদারচরিত্র এবং নিষ্ঠমুসলমান মহম্মদের পবিত্র নাম উজ্জ্বল করিতেছেন। অনুদার অশিক্ষিত লোক হইতেই যত অনিষ্টের উৎপত্তি। শিক্ষিত হিন্দু উদার প্রকৃতির মুসলমানকে কখন ঘৃণা করেন না। আপনি তাহাকে একটু বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হউন দেখিতে পাইবেন আপনি অকৃত্রিম সাদর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইবেন।

প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা। উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, যে যে কারণে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ তাহা নির্ণয় করা এবং সে সমস্ত দূরীভূত করা আমাদের কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের মঙ্গল নাই। আর একটি কথা। শ্রীযুক্ত হক্‌-সাহেবের মত শিক্ষিত মুসলমানের কর্ত্তব্য হিন্দুর সহিত তিনি একটু চিন্তার আদান প্রদান করেন। উভয় সমাজের একটু মিলামিশা হইলে সকলেরই প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সিংহ।

বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান।

সরল মনে যাহা বিশ্বাস করি, এই প্রবন্ধে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। যদি আমার কোন কথা ভ্রান্তিমূলক বা কুসংস্কার-প্রসূত হয়, মুসলমানগণ তাহা প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞ ও সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিব।

আজকাল শিক্ষিত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের ব্যবহারে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের যে সকল অন্তরায় দেখিতেছেন, তদ্বিরুদ্ধে স্পষ্টাক্ষরে অভিযোগ করিতেছেন। এই অভিযোগ আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ; যেহেতু এতদুপলক্ষে আমরা মুসলমান প্রতিবেশী-দিগের নিকট আত্মসমর্থন ও আত্মপরিজ্ঞাপনের অবসর পাইয়াছি। আমাদের প্রত্যুত্তরে মুসলমানগণ তাঁহাদের অভিযোগের ভ্রান্তিমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে শিখিবেন, অপরাংশ সম্বন্ধে আমরা অধিকতর সাবধান হইব; অধিকন্তু মুসলমানদের সম্বন্ধে আমাদের যে অভিযোগ আছে, তাহাও তাঁহাদিগকে জানাইতে পারিব। সংক্ষেপতঃ, এই অভিযোগ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারিবে। তাই আমরা অভিযোগকারীদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের অবস্থিতিতে হিন্দুদিগের বিশেষ কোন আপত্তির কারণ দেখি না। আস্তিকও হিন্দু, নাস্তিকও হিন্দু; ব্রহ্মবাদীও হিন্দু, জড়বাদীও হিন্দু; শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, কর্ত্তাভজা, পৌত্তলিক, অঘোরপন্থী, কবীরপন্থী, নানক-পন্থী প্রভৃতি কেহই অহিন্দু নহেন। এমন ধর্ম্মমত জগতে অল্পই আছে, যাহা কোন না কোন সম্প্রদায়ের হিন্দুর মত নয়। কাজেই এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত খৃষ্টপন্থী বা মহম্মদপন্থী প্রতিবেশী হইলে

তাহাও হিন্দুদের বিশেষ কিছু আপত্তির কারণ হইতে পারে না। অন্যদিকে, আর্য্য, অনার্য্য, শক, হুন, ইণ্ডো-চাইনীজ, দ্রাবিড়ীয়, নিগ্রেটো ও বহু সংখ্যক সঙ্কীর্ণ জাতি, সকলেই হিন্দু। মুসলমানদিগের মধ্যে এই সকল জাতিই আছে। তাই তদুপরি আর কয়েকজন মঙ্গোলীয়, শেমিটিক বা আবিসিনিয়ান প্রভৃতি থাকাতে হিন্দুদের কোন কষ্টের কারণ হইতে পারে না। খাদ্য সম্বন্ধে, শূকর, মহিষ, কুক্কুট, পলাণ্ডু প্রভৃতি সকলই স্থান ও পাত্রভেদে হিন্দুসমাজে চলে। তাই গোমাংস ভোজনে হিন্দুদিগের বিরক্তি জন্মিলেও তাহাতে ঐক্যের অন্তরায় জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ মুসলমানসমাজে আজকাল গোমাংস ভোজন খুব কমিয়া যাইতেছে; এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে কোন কোন হিন্দুশ্রেণীতেও গোমাংস এখন একবারে নিষিদ্ধ নয়। তার পর টুপী, পাগড়ী, শামলা, চোগা, চাপকান, হ্যাট্, কোট প্রভৃতি সকলই হিন্দুর পরিচ্ছদ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়েও মুসলমানের গুরুতর কোন নূতনত্ব নাই। অতএব যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক, মুসলমানে এমন কিছুই দেখি না, যাহা হিন্দুর পক্ষে নিতান্ত বিরক্তি বা আপত্তির কারণ হইতে পারে।

তবে হিন্দু মুসলমানে যে একটুকু বিরোধের ভাব দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ কি? ইতিপূর্ব্বে মুসলমানগণ জেতা ও হিন্দুগণ বিজিত ছিলেন। জেতা ও বিজিতের মধ্যে কখনও পূর্ণ সৌহার্দ্দ সম্ভব নয়। তাই মুসলমানাধিকারে পূর্ণ সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমভাবে বিজিত। এই কারণেই গ্রাম্য বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল কোন কোন স্বার্থান্বেষী লোকের প্ররোচনায় আবার সে বিরোধ একটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক অধিকতর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যখন উভয় সম্প্রদায় নিজ

নিজ প্রকৃত হিত বুঝিতে পারিবেন, তখন এই সকল স্বার্থান্বেষী লোকের কুপরামর্শে কেহ ভুলিবেন না।

এবিষয়ে একটা কথা সকলেরই স্মরণ রাখা আবশ্যক। বিরোধ ও প্রতিযোগিতা এক কথা নয়। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ দুঃখজনক, কিন্তু প্রতিযোগিতা সুখের কথা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা চলিতেছে, একই সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়েও সেইরূপ প্রতিযোগিতা চলে; এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারাই সমাজ অপর সমাজের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয়। পাশ্চাত্য জগতে ধনী ও শ্রমী, জমিদার ও রাইয়ত প্রভৃতির মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতির মধ্যেও একটা প্রতিযোগিতা ভাব আছে। সেইরূপ যতদিন বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায় থাকিবে, ততদিন উভয়ের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিবে। তাহা স্বাভাবিক এবং তাহাতে কোন কষ্টের কারণও নাই। উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ শিক্ষা ও অবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক সংস্কারাদির জন্য চেষ্টা করিবেন। কিন্তু হিন্দুগণ যেমন আপনাদের বহুধর্ম্মমত, শোণিতবৈষম্য, খাদ্যাখাদ্যভেদ এবং পরিচ্ছদাদির পার্থক্য, এবং বর্ণগত বিভিন্ন স্বার্থসত্ত্বেও আবশ্যক স্থলে পরস্পরের ভ্রাতার ন্যায় একত্র সম্মিলিত হইতেছেন, মুসলমানগণও ঠিক সেইরূপ আপনাদের স্বার্থসত্ত্বেও আবশ্যক স্থলে হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র দেশের মঙ্গলানুষ্ঠান করিবেন। অর্থাৎ ঘরে ঘরে পাঁচ ভাই ও একশত ভাই, অথচ পরের নিকট একশত পাঁচ ভাই হইতে হইবে। সে প্রতিযোগিতায় যেন কোন জ্বালা বা তীব্রতা না থাকে।

এখন ভূমিকা ছাড়িয়া আমরা মুসলমানদিগের অভিযোগগুলির আলোচনা করিব। মুসলমানগণ বলেন আমরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করি। এ ক্ষেত্রে আমরা ঘৃণা শব্দ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নহি;

ঘৃণার পরিবর্ত্তে আমরা অবজ্ঞা বলিব। যাহা হউক আমরা যে মুসলমানদিগকে অবজ্ঞা করি, একথা আদৌ মিথ্যা। প্রকৃত কথা এই যে, বঙ্গীয় হিন্দুগণ বঙ্গীয় মুসলমানগণকে অবজ্ঞা করেন; তাহাতে মুসলমানধর্ম্ম বা সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না।

উক্ত অবজ্ঞার প্রথম কারণ এই যে, জগতের সকল সমাজই আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট ও পরকে অপকৃষ্ট জ্ঞান করে। ম্লেচ্ছ, যবন, বার্বেরিয়াণ, হিদেন, প্যাশান, নেটিব, নিগার, কাফের প্রভৃতি শব্দের ব্যঞ্জনাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। ইংরেজ, ফরাসি, জর্ম্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই আপনাদিগকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া থাকেন। অল্পদিন হইল আমার কোন আত্মীয় এক জাপানী যুবকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে জাপানী বলিয়া উঠিলেন, 'আমার জাতি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' (My nation! it's the greatest on the earth)। অন্য কথা দূরে থাকুক, যে বন্য ভুটিয়াদিগের পরিচ্ছদ, খাদ্য ও আচারব্যবহার দেখিলে সভ্য লোকমাত্রেরই অনিবার্য্য বিবমিষা জন্মে, তাহারাও বলে 'বাঙ্গালারা বড় অপরিষ্কার, তাহারা গায়ে তেল দেয়'। তাই বলি, এই কারণে আমরা মুসলমানদিগের প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করি, মুসলমানগণ আমাদিগকে তাহা ক্ষমা করিতে পারেন। তাঁহারাও কি সদৃশ কারণেই আমাদের সম্বন্ধে কোন অবাঞ্ছনীয় ভাব পোষণ করেন না? এবিষয়ে শুধু কি আমরাই দোষী?

এই অবজ্ঞার একমাত্র ঔষধ পরস্পরের সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান। এই কারণেই হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের সাহিত্য, ইতিহাসাদির অধ্যয়ন ও অলোচনা আবশ্যক। হিন্দুগণ তাহা আরম্ভ করিয়াছেন, এবং অধিকতর জ্ঞানের সহিত পূর্ব্ব অবজ্ঞার ভাব ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

আর এক কারণেও বঙ্গীয় হিন্দুগণ বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে অবজ্ঞা

করিয়া থাকেন। তাহা বঙ্গীয় মুসলমানদিগের আপেক্ষিক শিক্ষাভাব ও অনুন্নত সভ্যতা। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, শিক্ষা ও সভ্যতায় বঙ্গীয় মুসলমান এখনও বঙ্গীয় হিন্দুর বহু পশ্চাতে। মুসলমানগণ স্মরণ রাখিবেন যে এস্থলে ব্যক্তি, পরিবার বা বংশ বিশেষের কথা হইতেছে না; সাধারণভাবে বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কথা বলিতেছি মাত্র। যাহাহউক অযোগ্য ব্যক্তি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। তাহা মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ। ইয়ুরোপেরও উন্নততর শ্রেণীসমূহ কি স্বদেশীয় নিম্নশ্রেণী সমূহকে কিয়ৎ পরিমাণে অবজ্ঞা করে না? উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা করেন না? হিন্দু রাজামহারাজাগণ কি নগণ্য হিন্দুদিগকে আপনাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিতে পারেন? উন্নত মুসলমানশ্রেণীসমূহ কি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিকে তুচ্ছ করেন না? তাই বলি, বঙ্গীয় মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞা প্রকৃত প্রস্তাবে অযোগ্যতার অবজ্ঞা; তাহাতে মুসলমান ধর্ম্ম বা সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না। যেখানে যোগ্যতা দেখা যায়, সেখানে মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হিন্দুগণ কখনও কুণ্ঠিত নহেন। মুর্ষিদ-কুলি ও আলিবর্দ্দিখার ন্যায় নরপতিগণের নাম হিন্দুগণ শ্রদ্ধা ও গৌরবের সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। মহম্মদ মহসীন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর কম শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। কোন্ হিন্দু ঢাকার স্বর্গীয় নবাব খাজে আবদুলগণি, ভূপালের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী নবাব আবদুল জব্বর, বরিশালের নবাব মীর মোয়াজ্জেম হোসেন বাহাদুর প্রভৃতিকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা ও সম্মান না করেন? ফরিদপুরের অন্তর্গত কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদারগণ তাঁহাদের হিন্দু কর্ম্মচারী ও প্রতি-বেশীদিগের নিকট বোধ হয় মুসলমানদের অপেক্ষাও অধিকতর শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন। ইহার কারণ তাঁহাদের অভিজাতোচিত গুণাবলী।

হিন্দু ডেপুটী কবিবর নবীন চন্দ্র সেন, ফেণীর মুসলমান সাধক পাগলা মিয়ার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছেন ; তথায় আজিও হিন্দুমুসলমানের সমভাবে গতায়াত হইয়া থাকে। মৌলবী সিরাজুল ইস্‌লাম সাহেবকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিতে মুসলমানগণের ন্যায় হিন্দুগণও কি চেষ্টা করেন নাই ? কিন্তু যে পদস্থ মুসলমান স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করে, অথবা পদলেলিহান রসনার গুণে ঘটিরামের নথর লাভ করিয়া কাপুরুষোচিত সিংহত্ব প্রদর্শনে ব্যগ্র হয়, তাহাকে হিন্দুগণ অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, এবং আশা করি মুসলমান জনসাধারণও তাহা-দিগেকে ভক্তি করেন না। আর যে হিন্দু তাদৃশ আচরণ করে হিন্দুগণ তাহাকেও তদ্বৎই ঘৃণা করেন। ইহা হইতেই প্রতীত হইবে যে হিন্দুর অবজ্ঞা মুসলমানের প্রতি নহে, পরন্তু বঙ্গীয় মুসলমানের অনুন্নত সভ্যতার প্রতি।

বঙ্গীয় মুসলমান-জীবনে যে সকল বিষয় হিন্দুদিগের বিরক্তি জন্মায়, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ, মুসলমান-দিগের শিক্ষার হীনাবস্থা। সুশিক্ষিত লোক কোনক্রমেই অশিক্ষিতকে সম্মান করিতে পারেন না ; তাহাতে হিন্দু-মুসলমান-ভেদ নাই ; জগতের সর্ব্বত্রই মানবপ্রকৃতি এইরূপ। দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানদিগের বান্দী রাখার রীতি। ইহা যে অতিশয় কুরীতি ও ইহাতে বঙ্গীয় মুসলমানদের যে অনেক ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, শিক্ষিত মুসলমান-গণ তাহা অস্বীকার করেন না ; এবং এই কুফল বুঝিতে পারিয়া এই রীতি পরিহার করিবার জন্য শিক্ষিত মুসলমানেরা চেষ্টাও করিতেছেন। এস্থলে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের বহুবিবাহের প্রতি কটাক্ষ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ কার্য্যতঃ রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ। বঙ্গে ব্রাহ্মণসংখ্যা (১৮৯১ সনের সেন্সাস্‌ অনুসারে

যতদূর মনে পড়িতেছে) ১১।১২ লক্ষের অধিক নহে। ইঁহাদের অতি অল্পাংশমাত্র রাঢ়ীয় কুলীন। তাই সমগ্র হিন্দুসমাজের সংখ্যার তুলনায় বহুবিবাহকারী হিন্দু অতি অল্প। ইংরেজী শিক্ষায় হিন্দুসমাজের বহু বিবাহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হইয়াছে; এমনে কি ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা বিবেচনায় সময়ে সময়ে যখন কাহারও দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণ শিক্ষিত প্রতিবেশিগণও অন্যায় মনে করেন না, তখনও হিন্দুস্বামী সহজে আবার বিবাহ করিতে প্রস্তুত হন না। কিন্তু এমন সবহুল মুসলমান পরিবার অতি অল্প যেখানে অন্ততঃ কয়েকটা বান্দী নাই। ইহা আমাদের নিকট অতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়। তৃতীয়তঃ, মুসলমানদিগের বিলাসিতা। হিন্দুসমাজে বিলাসিতা নাই, তাহা নহে; বিশেষতঃ ধনী হিন্দুদিগের মধ্যে অতি জঘন্য বিলাসিতাও প্রচুর। কিন্তু তথাপি আমরা একথা বলিতে বাধ্য যে, হিন্দুগণ মুসলমানদের ন্যায় অপরিণামদর্শী বিলাসিতায় মত্ত নহেন। হিন্দু রাজা-মহারাজাদিগের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু মুসলমান জমিদারদিগের মধ্যে গ্রাজুয়েট খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এমনও শুনা গিয়া থাকে যে, মুসলমান ধনিসন্তান শিক্ষালাভার্থ নগরে প্রেরিত হইলে লেখাপড়া ছাড়িয়া জঘন্য বিলাসতরঙ্গে গা ঢালিয়া দেন। তার পর সাধারণ অবস্থাপন্ন মুসলমান তালুকদারের পত্নীর পায়ে পর্য্যন্ত স্বর্ণাভরণ না হইলে চলে না। সাধারণ আয় বিশিষ্ট মুসলমানের গৃহিণী গৃহকর্ম্মে কুণ্ঠিতা; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আয় বিশিষ্ট হিন্দুর গৃহিণী অতি শ্রমসাধ্য গৃহকর্ম্মও আনন্দে সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে আয়ের হিন্দুর একজন চাকরে চলে, সে আয়ের মুসলমানের সাধারণতঃ ২।৩ জন দাস দাসী চাই। ৫০৲ বেতনের পণ্ডিতের পোষাক অপেক্ষা ২০৲ বেতনের মৌলবীর পোষাকের মূল্য অধিক। মুসলমানদিগের এইরূপ অপরিণামদর্শিতা ও অমিতব্যয়িতা তাঁহাদের বিলক্ষণ ক্ষতিও করিতেছে, দর্শকের চক্ষে

তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনও করিতেছে। চতুর্থতঃ, মুসলমানগণের পরিষ্কৃতির অভাব। আমরা সাহেবদের অপেক্ষা অনেক অপরিষ্কার; মুসলমানগণ আমাদের অপেক্ষাও নোংড়া। পঞ্চমতঃ, মুসলমানগণ সময়ে সময়ে অতি নিকট সম্পর্কিতদিগকে, এমন কি যাহাদিগকে হিন্দুগণ গুরুজন মনে করেন, তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকেন। অনেক স্থলেই হয়ত সম্পত্তিবিভাগ উক্তরূপ বিবাহের কারণ। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানও ইহার অপকারিতা প্রমাণ করিতেছে; এবং হিন্দুর চক্ষে ঈদৃশ বিবাহ অতিশয় বিসদৃশ বোধ হয়। ষষ্ঠতঃ, বঙ্গদেশে ফৌজদারী মকর্দ্দমায় যে সকল আসামী গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হয়, তাহার অধিকাংশই মুসলমান। সপ্তমতঃ, পথ চলিবার সময় মুসলমান-বালকদিগের যে জঘন্য অশ্লীল ভাষা অহরহঃ শুনিতে পাই, তাহাতে আমাদের নিতান্তই বিরক্তি জন্মে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যেও অশ্লীল ভাষার বিলক্ষণ বাড়াবাড়ি আছে; কিন্তু মুসলমান-বালকদিগের মুখে যাহা শুনি, হিন্দুসমাজে তাদৃশ ঘৃণাকারজনক কিছু দেখি না। যাহাহউক, এই সকল কারণেই বঙ্গীয় হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে আপনাদের অপেক্ষা সভ্যতার নিম্নতর সোপানে অবস্থিত মনে করেন; এই কারণেই তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা।

উপরে এই কয়েকটী কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি—

১। হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম্ম বা সমাজকে অবজ্ঞা করেন না, কিন্তু বঙ্গীয় হিন্দুগণ বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে অবজ্ঞা করেন বটে।

২। কিন্তু এ বিষয়ে শুধু হিন্দুগণই দোষী নহেন; মুসলমানেরাও হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা করেন।

৩। এই অবজ্ঞার এক কারণ পরস্পরের সম্বন্ধে অবজ্ঞা, অপর কারণ বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সভ্যতার হীনাবস্থা।

৪। উক্ত দুই কারণে পৃথিবীর সকল সমাজেই এক শ্রেণীর প্রতি

অপর শ্রেণীর অবজ্ঞা জন্মিয়া থাকে। তাই এই অবজ্ঞার জন্য হিন্দুদিগের দোষ দেওয়া যায় না। উহা মানব-প্রকৃতির দোষ। এই অবজ্ঞার সহিত হিন্দুত্ব বা মুসলমানত্বের কোন সম্পর্ক নাই।

এই অবজ্ঞা মুসলমানদিগের পক্ষে কষ্টের কারণ বটে, হীনাবস্থকে সে মনোকষ্ট চিরকালই ভুগিতে হয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের ক্রোধের কারণ নাই। ইহার একমাত্র প্রতীকার তাহাদের আত্মোন্নতির সাধন। মুসলমান-সমাজে শনৈঃ শনৈঃ শিক্ষা প্রবেশ করিতেছে, হিন্দুদিগের মনেও ক্রমেই অবজ্ঞার ভাব কমিয়া প্রতিযোগিতার ভাব আসিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সমান শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন; তখন আপনা হইতেই হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে সমকক্ষ জ্ঞান করিবেন।

উপরে যে অবজ্ঞার কথা বলা হইল, তাহা হিন্দুমুসলমান উভয়েরই অন্তর্নিহিত থাকিবে তাহার স্পষ্ট বিকাশ নাই। কিন্তু মুসলমানগণ আজকাল হিন্দুদিগের সাহিত্যাদিতে ব্যক্ত মুসলমান-বিদ্বেষ-সম্বন্ধেই খুব অভিযোগ করিতেছেন। তাই সে সম্বন্ধেই এখন কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমেই বলা কর্ত্তব্য যে, মুসলমানের সহিত ঐক্য বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা হিন্দুর মুখের কথা নহে, পরন্তু অন্তরের। কারণ আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, মুসলমানের হাত না ধরিয়া আমরা জগতের সমক্ষে স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিব না। তাই আর না হউক, অন্ততঃ স্বার্থানুরোধেই আমাদিগকে মুসলমানের সহিত মিলিত হইতে হইবে; এবং এ জগতে স্বার্থ অপেক্ষা দৃঢ়তর বন্ধন আর কিছুই নাই।

হিন্দু-সাহিত্যে মুসলমানদিগের প্রতি স্থানে স্থানে অন্যায় কটাক্ষ আছে, ইহা একবারে মিথ্যা নয়। এ বিষয়ে মুসলমানগণ অভিযোগ করিতে পারেন। এবং প্রত্যেক হিন্দু লেখকেরই মুসলমান-সমাজ-সম্বন্ধে

কলম ধরিতে সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তথাপি আমরা বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে যতদূর অভিযুক্ত হইয়াছি, আমরা তত দোষী নহি। কোথাও আমরা অপরিহার্য্য অজ্ঞতাবশতঃ অভিযোগের পাত্র হইয়াছি, কোথাও মুসলমানগণ আমাদের আচরণের অতি ভ্রান্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কোথাও বা মুসলমানেরাই অভিযোগের কারণ সংঘটনের জন্য দায়ী। ক্রমে ক্রমে আমার কথা সমর্থন করিব।

কবিবর নবীন চন্দ্র সেন মহাশয় সিরাজউদ্দৌলার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে মুসলমানগণ ব্যথিত হইতে পারেন। কিন্তু উহাতে আমাদের মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় নাই, উহা আমাদের অপরিহার্য্য অবজ্ঞার ফল। পূর্ব্বে যে সকল গল্প ইতিহাস নামে পরিচিত ছিল, নবীন বাবু তাহা পড়িয়াই "পলাশির যুদ্ধ" লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য পন্থাও ছিল না। মুসলমানগণ তাহাদের প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশের পরেও যদি নবীন বাবু ওরূপ লিখিতেন, তবে অভিযোগের কারণ হইত বটে। কিন্তু মুসলমানগণ সিরাজ-চরিত্রের কলঙ্কাপনয়ন করিতে কি চেষ্টা করিয়াছেন? মুসলমানদের পক্ষে বাঙ্গালার এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার অন্ততঃ অধিকাংশই হিন্দু কর্ত্তৃক। সিরাজউদ্দৌলার ন্যূনাধিক সমর্থন করিয়াছেন অক্ষয় বাবু ও নিখিল বাবু। আওরেংজেব সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা এখন পোষণ করি, তাহা দুই একজন সহৃদয় য়ুরোপীয় এবং হিন্দুদের লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়নের ফল। মুসলমান সাধুদের চরিত্র শিখিয়াছি হিন্দুর লেখা হইতে; মহম্মদের মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন হিন্দু চরিতাখ্যায়ক। এরূপ অবস্থায় হিন্দুগণ যদি অনিবার্য্য অজ্ঞতাবশতঃ স্থানে স্থানে মুসলমানদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত ব্যক্ত করেন, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া উচিত নহে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা বলিতে চাই। যিনি নিজের সম্মান নিজে রক্ষা না করেন, নীরবে নিন্দা ভোগ করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহার

পক্ষে সম্মান পাওয়া কঠিন। ইহাই জগতের নিয়ম। তাই যখন কেহ মুসলমান-সমাজ-সম্বন্ধে অন্যায় মন্তব্য করেন, তখন মুসলমানগণ তাহার ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মসমর্থন না করিলে নিন্দাভাজনই থাকিবেন। সেজন্য তাঁহাদের অলসতা বা ঔদাসীন্য যত দোষী, অজ্ঞ সমালোচক বোধ হয় তত নহেন। যাহা হউক হিন্দুগণ অল্পদিন যাবৎ মুসলমান ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই ব্রতে মুসলমানগণ তাঁহাদের সহায় হইয়া দাঁড়াইলে অবিলম্বে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিন্তা-স্রোত অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন আর নবীন বাবুর সিরাজের ন্যায় চিত্র দেখিয়া আমাদের প্রতিবেশীদিগকে ব্যথিত হইতে হইবে না।

স্থলে স্থলে মুসলমানগণ আমাদিগকে অকারণে দোষী করেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে মুসলমান-বিদ্বেষের অভিযোগ অতি প্রবল। তাঁহার "রাজসিংহ" পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই ; তাই তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু একজন উপাধিধারী, সুশিক্ষিত, পদস্থ মুসলমান একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "দুর্গেশনন্দিনী"ও মুসলমান-বিদ্বেষের প্রমাণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা মুসলমানবিদ্বেষের চিহ্নমাত্র পাই না। দুর্গেশনন্দিনীর সর্ব্বোচ্চ চিত্র আয়েষা ; তিলোত্তমা তাঁহার পার্শ্বে নিতান্ত ম্লান পুত্তলিকা। নায়কদ্বয়ের মধ্যে ওস্‌মান, চরিত্র-গৌরবে জগৎসিংহের নিকট বিন্দুমাত্র হীন নহেন। কেবল কতলু খাঁ বিলাসপরতন্ত্ররূপে চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ রমণীপূর্ণান্তঃপুর নরপতি মুসলমানদের মধ্যে কি কেহ ছিলেনই না ? হয়ত কতলু খাঁর প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। কিন্তু যদি সাহিত্যের প্রয়োজনে অন্য মুসলমান নরপতির দোষ কতলু খাঁতে অর্পিত হইয়াই থাকে, তবুও পাশাপাশি আয়েষা, ওস্‌মান ও কৎলু খাঁকে স্থাপন মুসলমানবিদ্বেষের প্রমাণরূপে প্রতিভাত হয় না। আর ব্যক্তি বিশেষের চিত্র ম্লান হইলেই সমাজের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে না।

প্রতাপাদিত্যের কথা ছাড়িয়াই দিই;—দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম চন্দ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামচন্দ্র আজিও চন্দ্রদ্বীপবাসীর স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহাকে রবীন্দ্র বাবু 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' যে বলীবর্দ্দের বেশে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কি রবীন্দ্রবাবুর হিন্দু-বিদ্বেষের ফল? অধিকন্তু কতকগুলি ভাল চিত্র দেখিতে চাহিলে তাহার পার্শ্বে কতকগুলি মন্দ চিত্রও দেখিতে হয়। কারণ দোষ নাই কোন্ সমাজে? ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে লইয়া ওরূপ নাড়াচাড়াটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে; কিন্তু ওটা উপন্যাসের সনাতন প্রথার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাহা হউক, আমাদের মনে হয়, দুর্গেশ-নন্দিনীতে মুসলমানগণ যেরূপ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার তুলনা অল্পই মিলিবে। এরূপ স্থলে মুসলমানগণ কেন যে অভিযোগ করেন, বুঝিতে পারি না।

এ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য আছে। সমাজের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যতীতও ব্যক্তি, ঘটনা, বা রীতি বিশেষের বিরুদ্ধবাদ সম্ভব। অনেক হিন্দু বক্তা ও লেখক অতি তীব্র ভাষায় হিন্দু রীতি নীতি ও হিন্দু-নেতাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। তাহা বক্তা বা লেখকদিগের হিন্দুবিদ্বেষমূলক বলিয়া কেহই মনে করেন না, বরং হিন্দুর মঙ্গল-কামনাবশতঃই যাহা অমঙ্গল বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাহার প্রতি তীব্র কশাঘাত করেন। জগতের প্রত্যেক সভ্য সমাজে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। সেইরূপ অনেক হিন্দু-মুসলমানের যাহা দোষ বলিয়া সরল মনে বিশ্বাস করেন, তাহার সম্বন্ধে অপ্রিয় ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হইতে পারে তাদৃশ বিশ্বাস নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত; কিন্তু তাহা বিদ্বেষমূলক মনে করা নিতান্ত ভ্রম।

শিক্ষিত মুসলমানগণ চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন আজকাল মুসলমানদিগের লেখায় ও বাক্যে হিন্দুদিগের প্রতি যত আক্রমণ থাকে,

হিন্দুদিগের লেখায় বা বাক্যে মুসলমানদিগের প্রতি তাহার এক আনা আক্রমণও থাকে না। অধিকন্তু মুসলমানগণ সর্ব্বদাই হিন্দুদিগের প্রতি অসৎ উদ্দেশ্য (bad motur) আরোপ করিয়া থাকেন; কিন্তু হিন্দুর লেখনী হইতে মুসলমানের প্রতি অসৎ উদ্দেশ্যের আরোপ অতি দুর্লভ। মুসলমান-সমাজের এই দোষ বা ঐ দোষ, এইরূপ কথা হিন্দুগণ অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা বা ন্যায়তঃই সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন। ('ন্যায়তঃ' বলিবার কারণ এই যে, কোন কোন দোষ নিশ্চয়ই মুসলমান-সমাজে আছে; তাঁহারাও আর সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত নহেন)। মুসলমানগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন কম; তাই হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে ওরূপ লেখা তাঁহারা বেশী লিখেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা লেখনীচালনা করেন, তখন যে ওরূপ একবারেই লিখেন না এমন নহে। আর হিন্দুগণ মুসলমানের মনে কষ্ট দিবার জন্য ইহা লিখিয়াছেন, 'মুসলমানকে ঘৃণা করিয়া উহা লিখিয়াছেন' ইত্যাদি রূপ অভিযোগ মুসলমানেরা সর্ব্বদাই করেন। হিন্দুদিগের সম্বন্ধে ঈদৃশ দুরভিসন্ধিকল্পনা মুসলমান-দিগের নিতান্তই বুঝিবার ভুল।

দুইটী শিশু ভাই ঝগড়া করিলে ছোটটী অবোধ বলিয়া পিতামাতা বড়টীকে তাহার আব্দার রক্ষা করিতে বলেন। তেমনি মুসলমান ভ্রাতাদিগের শিক্ষার অনুন্নত অবস্থা দেখিয়া আমরা তাঁহাদের অনেক কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করি; কিন্তু তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে তাদৃশ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না।

ধর্ম্ম, সমাজ, ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল academic বিষয় লইয়া হিন্দুগণ মুসলমানদিগের সমালোচনা করেন, মুসলমানগণ সেই সকল বিষয় লইয়া যদি আমাদের সমালোচনা করেন ও প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত হইতে পারি, কারণ নিজের দোষ দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়? কিন্তু তাহাতে আমরা কখনও মুসল-মান সমালোচকের প্রতি বিরক্ত হইব না, বা তাঁহার প্রতি দুরভিসন্ধি,

বা ঘৃণা, বা বিদ্বেষ প্রভৃতি আরোপ করিব না। আর একত্র বাস করিতে হইলে উভয়েরই মঙ্গলের জন্য তাদৃশ সমালোচনা আবশ্যক, এবং পরস্পরকে তাদৃশ সমালোচনা করিতে দেওয়া উচিত। পরন্তু তাদৃশ সমালোচনা করিলেই মধ্যে মধ্যে প্রতিকূল কথা শুনিতে হইবে; কারণ সকলের সকল রীতি নীতি বা মতামত ভাল বোধ হইতে পারে না। তবে, এই সমালোচনার ভাষা সংযত হওয়া চাই বটে।

হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল লেখকের মতামতের জন্যই সমাজ দায়ী নহে। এই সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের দিনে অনেক ঔৎকেন্দ্রিক বা সঙ্কীর্ণ হৃদয় ব্যক্তি সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্বে পিত্তপ্রবণতার পরিচয় দিতে পারেন।

এ বিষয়ে আমার সর্ব্বশেষ বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে এদেশে জাতীয়তার ভাব বিশেষ ছিল না। হিন্দুমুসলমান যে কখনও একত্র হইতে পারেন, বা তাহার যে কোনও আবশ্যকতা আছে, তাহা পূর্ব্বে বাঙ্গালীর চিন্তার অতীত ছিল। তাই তখন কোন সম্প্রদায়ই বোধ হয় পরস্পরের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবে নূতন জাতীয়ভাবের উদ্রেক হওয়াতে উভয় সম্প্রদায়েই ঐক্যবন্ধনের আকাঙ্ক্ষা লক্ষিত হইতেছে। অতএব এখন পূর্ব্বের ব্যবহার দ্বারা পরস্পরকে বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। অতীত বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমান দ্বারা নব-যুগদ্দীপ্ত সহানুভূতির চক্ষেই পরস্পরের বাক্য ও ব্যবহারের অর্থগ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, তবু কথা শেষ হইল না। ক্রমে আরও বলিব।

এস্থলে অনেক অপ্রিয় কথা লিখিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা মুসলমানদের গুণ সম্বন্ধে অন্ধ বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। আমরা জানি মুসলমানসমাজের এমন অনেক গুণ আছে, যাহা পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্র দুর্লভ। সময়ান্তরে সেগুলিরও আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের প্রবেশ।

(টেনিসন্ হইতে)

প্রেম প্রবেশিল জানালার পথে
ধন প্রবেশিল দ্বারে।
"ধনেরে দেখিয়া আসিতেছ বুঝি"
শুধা'লাম আমি তারে।
প্রেম পাখানাড়ি' কহিল কাঁদিয়া
করুণ মধুর স্বরে ;—
"গরিবের গৃহে যেমন আমার,
তেমনি ধনীর ঘরে।"
ধন বাহিরিল জানালার পথে
দারিদ্র্য ঢুকিল দ্বারে।
"ধনের সঙ্গে যা'বেনা এবার ?"
শুধা'লাম আমি তারে।
প্রেম পাখানাড়ি' কহিল কাঁদিয়া,
"মিথ্যা কহিছ কেন ?
ধন—সে তোমারে ছাড়িল বলিয়া
আমি আরো কাছে জেন"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আজিকার ভারতবর্ষ।

ইংরাজ-সহর ও ইংরাজ-সমাজ।

ফরাসী-পর্য্যটক অধ্যাপক মেত্যাঁ তাঁহার "আজিকার ভারতবর্ষ" নামক নব প্রকাশিত গ্রন্থে, ইংরাজ-সহর ও ইংরাজ-সমাজ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি ইংরাজ-সহরগুলি প্রায় এক ছাঁচের—কেবল আয়তন ও পরিমাণে যা' প্রভেদ। দেশী সহরের মধ্যে ইংরাজরা কখনই বাস করেন না। এমন কি, তাঁহাদের কথার ভাবে মনে হয়, তাঁহারা দেশী সহরকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। যে সকল ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের সহধর্ম্মিণীগণ বহু দিবস হইতে এদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহারা জানাইতে চাহেন যে, তাঁহারা হিন্দু-সহরে কখন প্রবেশ করেন নাই। প্রবেশ না করিবার এই কারণ দেখান যে, হিন্দু-সহরে কৌতুহলজনক বিশেষ কিছুই দেখিবার নাই, অথবা উহা বড় অপরিষ্কার। সমর-বিভাগের ও শাসন-বিভাগের উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা বাগান-বাটীতে বাস করেন—বাগান-বাটীর চারিদিকে উদ্যান। ইংরাজ-সহরের মধ্যে চারিদিকেই তরু-বীথি-শোভিত প্রশস্ত রাজপথ—এত জটিল যে তাহার অন্ধি-সন্ধি পাওয়া যায় না—কেবল মধ্যে মধ্যে গির্জার চূড়া দেখিয়া পথ নির্ণয় করা যায়। মনে হয়, উইলিয়াম মরিসের কল্পনা-স্বপ্ন, প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার মানসেই বুঝি তত্রস্থ বাসগৃহগুলি হরিৎ-শোভার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী দুইটী বাড়ীর মধ্যে কেবল শাদ্বল ভূমি ও উদ্যান-ক্ষেত্রের ব্যবধান। ইংরাজসহর দেশীয় সহর হইতে প্রায়ই বহুদূরে স্থাপিত; এতদূরে যে একটি হইতে অপরটি দৃষ্টিগোচর হয় না। ইংরাজ-সহরের অধিকাংশ স্থান তরু-বীথিকায়

ও উদ্যানাদিতেই অধিকৃত। লাহোর ও মাদ্রাজের আয়তন প্রায় প্যারিস্ নগরের সমান এবং উহার $\frac{১}{৩}$ অংশ অল্প সংখ্যক ইংরাজ-মণ্ডলীর দ্বারাই অধিকৃত; এদিকে, অসংখ্য দেশীয় অধিবাসিগণ, স্বল্প জমির উপর, অতিপূর্ণ গৃহে, প্রাচীন সহরের সংকীর্ণ পথের ধারে গাদাগাদি করিয়া বাস করে। বোম্বাই ও কলিকাতা—এই দুই বন্দর-নগরীতে, সহরের কেন্দ্রস্থলে সওদাগরি আফিস-অঞ্চল অবস্থিত। লণ্ডনের যে স্থানকে (City) "সিটি" বলে, ইহা কতকটা তাহার মত। সেই সকল আফিস্-গৃহ দিনের বেলা লোকজনে পূর্ণ থাকে; রাত্রে কেহ সেখানে বাস করে না। সন্ধ্যা হইলেই ইংরাজেরা নিজ নিজ বাগান-বাটীতে প্রস্থান করে। গ্রীষ্মকালে শৈলনিবাসে বিশেষতঃ ভাইস্রয়ের গ্রীষ্মনিবাস সিম্‌লাশৈলে, উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ও অবসর-ভূয়িষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গমন করেন। য়ুরোপের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানগুলির ন্যায় ঐ সকল শৈলনিবাস সৌখীন লোকদিগের সমাগমস্থল। ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের পত্নীগণ্ স্বীয় পতিদিগকে তাপদগ্ধ নিম্নভূমির কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত রাখিয়া আপনারা স্বচ্ছন্দে সেই সকল শৈলনিবাসে গিয়া অবস্থিতি করেন। দুর্মুখের কিম্বদন্তী ও কিপ্লিংএর কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, দেবদারু ও "পাইন" গাছের তলায় প্রেমলীলাময়ী অনেক ইংরাজ-রমণীকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরাজ কর্ম্ম-চারিগণ দৃঢ়-স্বরে এই কথা বলেন যে, উহা উপন্যাস মাত্র; এবং আরো বলেন, উপন্যাস-লেখক ঐ সব বিষয় চুপ্ করিয়া গেলেই ভাল হইত, কেননা ঐ সব কথায় দুই "সার্বিসের" সুনাম নষ্ট হয়।

অশ্বারোহণ, বিবিধ ক্রীড়াকলাপ, সামাজিক সম্মিলনী—এই সমস্ত ব্যাপারেই ভারতবর্ষীয় ইংরাজের চিত্তবিনোদন হইয়া থাকে। এবং এই সকল বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রাদিতে যতটা স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেরূপ ইংলণ্ডেও দেখা যায় না।

"ব্যাড্‌মিণ্টন্‌" খেলার কোন একটা নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হইলে, অমনি উহা সংবাদপত্রাদিতে মহা উৎসাহ সহকারে বিজ্ঞাপিত হয়। কাজকর্ম্ম শেষ হইলেই, ইংরাজ পুরুষদিগের মধ্যে, ঘোড়দৌড়, পোলো, শীকার—এই সকল বিষয় লইয়াই কথাবার্ত্তা চলে; তাহাদের অবসর-মুহূর্ত্তগুলি ঐ সকল আমোদেই উৎসর্গীকৃত হয়। উহাদের মধ্যে অনেকেই খুব অল্প বয়সে ভারতবর্ষে আইসে; সুতরাং প্রবাসের প্রথম বৎসরগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কাজকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগেই অতিবাহিত হয়। পড়াশুনা করিবার রুচি তাহাদের বড় একটা থাকে না। আর, দেশীয় লোকদিগের সহিত মেলা-মেশার কথা যদি বল, দেশীয় লোকদিগের সহিত মিশিতে তাহাদের ভাল লাগে না। উহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার অন্য দেশ-অপেক্ষা ভারতবর্ষেই ইহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করে। সর্ব্বত্র—এমন কি হোটেলেও, "ডিনারের" (dinner) জন্য সকলের দস্তুর মত "পোষাকি" পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়। ভারতবর্ষে আসিয়া ইংরাজ, ভারতবর্ষের কতকটা আদব-কায়দা অবলম্বন করিয়াছে। তাঁরা বিনা গাড়ী-ঘোড়ায় কোথাও পা বাড়ান না এবং তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক চাকর-বাকর রাখিতে হয়। এই ভৃত্যবর্গের মধ্যে জাতিভেদ প্রবল থাকায়, এত প্রকার কর্ম্মবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহা য়ুরোপে অজ্ঞাত। একজন শুধু সাফ্‌ জল লইয়া আসে, আর একজন শুধু ময়লা জল বাহির করিয়া দেয়। আস্তাবলে কোচ্‌মান ছাড়া আরও তিন চার জন পরিচারক থাকে। এই প্রত্যেক ভৃত্যের বেতন য়ুরোপীয় ভৃত্যের তুলনায় যৎসামান্য; কিন্তু সংখ্যা ধরিতে গেলে, সর্ব্বসমেত অধিক অর্থ ব্যয় হয়। ভারতবর্ষে ইংরাজেরা জাঁকজমক দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবং কতকটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরও বশে, দেশীয় ধনীলোকদিগের চাল চলন অনুসারে, অনুচরবর্গে পরিবৃত হইবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে।

ইংরাজ-সমাজে, রণ-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষেরাই, সামাজিক নীতি ও ধরণ-ধারণের নিয়ন্তা ও প্রবর্ত্তক। ইংরাজ-সমাজে গণ্যমান্য হইতে গেলে ধনী হওয়া আবশ্যক, অর্থব্যয় করা আবশ্যক. ইংরাজ-ভদ্র-সমাজের রীতি-নীতি রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, দেশীয় ম্যুনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ একটা বাজারের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করায়, একজন ইংরাজকে "এক-ঘরে" হইতে হইয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ যদি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-সমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ের "খুজ্‌রা" কাজে স্বয়ং লিপ্ত হইতে পারেন না। পণ্ডিত ও অধ্যাপকের যোগ্যাযোগ্যতা বিচার করিবার সময়, বিদ্যায় কে কিরূপ পারদর্শী সে কথা বিবেচনার মধ্যে না আনিয়া, বিদ্যা-ছাড়া আর অন্য বিষয়ে কিরূপ যোগ্যতা তাহারই বিচার করা হয়। যে সকল য়ুরোপীয় পর্য্যটক ভারত-ভ্রমণ করিতে আইসেন, উপাধি ও সুপারিসের বলাবল-অনুসারে, কেহ বা ইংরাজের আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়া, কেহ বা তাঁহাদিগের উপেক্ষায় মর্ম্মাহত হইয়া দেশে ফিরিয়া যান।

দেশীয় লোকের নিকট ইংরাজ-সমাজের দ্বার একেবারে রুদ্ধ—নিয়মের দ্বারা রুদ্ধ। একদিন আমরা একটা ক্লবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে এক হোটেলেই একজন বিদেশী য়ুরোপীয় বাস করিত। ক্লবের লোকেরা মনে করিয়াছিল, তিনি আমাদেরি সহ-পর্য্যটক। তাহারা বলিল, "দেখ, ঐ ব্যক্তির রং একটু 'মেটে মেটে', যদি সে এদেশীয় লোক হইত তাহলে সে কখনই ক্লবে স্থান পাইত না। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম-স্থল নাই। মনে করিয়া দেখ, আমরা পারস্য কিম্বা তুর্কির "কনসল্"কে (স্থায়ী দূত) এখানে নিমন্ত্রণ করিতে পারি না"। যেখানেই "সিবিল সর্ব্বিসের" অন্তর্ভুত কোন অল্প বয়স্ক কর্ম্মচারীর সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, তিনি

যখনই শুনেন, আমরা দেশীয় লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে চাহি, অমনি তিনি লজ্জিত হইয়া পড়েন এবং তিনি আমাদিগকে এইরূপ পরামর্শ দেন যে, যদি ইংরাজ-সমাজে সাদরে গৃহীত হইবার আমাদের বাসনা থাকে, তাহা হইলে যেন দেশীয় লোকের সহিত আমরা কোন সম্পর্ক না রাখি। যখনি তাঁহার নিকটে স্বীকার করি, ঐ সব খারাপ লোকেরই সহিত আমরা দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছি, তখন হইতেই দেখা যায়, তিনি আমাদের সহিত আর তেমন হৃদ্যতার সহিত ব্যবহার করেন না—আমাদের প্রতি নিতান্ত ঔদাস্য ও উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করেন।

আবার, যে সকল ইংরাজ অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থাপন্ন, দেশীয় লোকের প্রতি তাহাদেরি অবজ্ঞা যেন আরো অতিরিক্ত বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কোন ব্রাহ্মণ, যদি কোনও হোটেলে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তিনি প্রবেশের অনুমতি পান না। কোন রেল-ষ্টেশানে "জেন্‌টেল্‌ম্যান"দের জন্য যে "অপেক্ষা করিবার ঘর" নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেখানে দেশীয় লোকের প্রবেশ নিষেধ। অনেকগুলি রেলওএ-কোম্পানী, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য ট্রেন্‌-গাড়ীতে পৃথক্ কাম্‌রার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই পার্থক্য সকল বিষয়েই পরিলক্ষিত হয়। আমরা যখন আবুগিরি দেখিতে গিয়াছিলাম, আমরা জুতা খুলি নাই, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে একটি দেশীয় "আফিসার" গিয়াছিলেন, তাঁহার জুতা খুলিতে হইয়াছিল। এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করায়, শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা অনুভব করে। যাহারা য়ুরোপে গিয়াছে, কিম্বা যাহাদিগের য়ুরোপীয় শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোনপ্রকার ধারণা আছে, তাহারা ইংরাজদিগের কাষ্ঠবৎ দুর্নম্য ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া দোষারোপ করে; পক্ষান্তরে য়ুরোপীয় মহাদেশে তাহারা

যে আদর অভ্যর্থনা সহজে প্রাপ্ত হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া বিস্তর প্রশংসা করে। একজন যুবা মুসলমান ব্যারিষ্টারের সহিত জাহাজে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়; তিনি জর্ম্মান-দেশ ছাড়িয়া আসিতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিলেন; বলিলেন, "জর্ম্মানেরা সকল জাতি অপেক্ষা আমুদে ও অমায়িক। তাহাদের দেশে মদের ভাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র সেখানকার লোকেরা আসিয়া আলাপ করে, প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে ও প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয়।" ভারতবর্ষে, য়ুরোপীয়দিগের সহিত দেশীয় লোকের সম্বন্ধ—প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, মুরব্বি-উমেদারের সম্বন্ধ। প্রাচ্যদেশে কোন উচ্চপদস্থ লোকের নিকট যেরূপ ভাবভঙ্গী-সহকারে সম্মান প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ ভাবভঙ্গীর সহিত আফিসের কেরানীরা, উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট মস্তক নত করিয়া, হাত যোড় করিয়া সেই হস্তদ্বয় ললাট পর্য্যন্ত উত্তোলন করে।

কেবল যে সকল দেশীয় লোক খুব উচ্চবংশের ও খুব ধনী—যেমন কোন রাজা মহারাজা, কিম্বা কোন মহম্মদের বংশধর, কিম্বা বাণিজ্য-প্রধান নগরাদির কোন একজন বড় শেঠ, কিম্বা কোন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী (যাহা অতি বিরল)—ইঁহারাই ইংরাজ-সমাজে গৃহীত হন। তবে, যাঁহারা পদমর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ এবং নিমন্ত্রণাদি করা যাঁহাদিগের পদোচিত কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য, তাঁহারাই শুধু নিজালয়ে দেশীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। তাই, ইংরাজের বৈঠকখানা-মজ্‌লিসে, দেশীয় লোকদিগকে কখন-কখন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাও আবার উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের সরকারি লৌকিকতার নিমন্ত্রণে এবং যে-সকল স্থানে অনেক দিন হইতে প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সংস্রব ঘটিয়াছে—সেই বম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি নগরেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল মজ্‌লিসে যেরূপ ধরণের হইয়া থাকে তাহা কতকটা কিপ্লিং বর্ণিত টেনিস্-

খেলার ন্যায়—যাহাতে একদিকে কালো ও অপর দিকে সাদা স্থাপিত হয়। উভয় জাতির সংমিশ্রণের ইহাই অপূর্ব্ব পূর্ব্ব-উদ্যোগ!

দেশীয় লোক যে অবস্থারই হোক্ না কেন, তাহার সহিত ভদ্র-সমাজস্থ ইংরাজের বৈবাহিক সম্বন্ধ কখনই ঘটে না। একজন ইংরাজ রাজপুরুষ যদি কোন দেশীয় রমণীকে বিবাহ করে অমনি সে সমাজ-চ্যুত হয় এবং সমাজ-শাসনের প্রভাবে দায়ে পড়িয়া, তাহাকে নিজকর্ম্মে ইস্তফা দিতে হয়। আমরা জানি, কোন-কোন বিদেশীয় "কন্‌সল্‌" দেশীয় রমণীকে বিবাহ করায়, বাধ্য হইয়া তাহাকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইংরাজেরা উপহাস করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে ফ্রান্স ও পোর্টুগ্যালের যে দুই এক টুক্‌রা জমি এখনও রহিয়াছে, তাহার একমাত্র প্রয়োজনীয়তা এই যে, ঐ গুলি থাকাতে কতকগুলা মেটে-ফিরিঙ্গির বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বর্ণভেদের বাহ্য লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে, বর্ণের এইরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় যে, একদল লোক যাহার সহিত অন্য দলের আহার ব্যবহার ও বিবাহাদি চলে না। এই ভাবে দেখিলে, অন্য বর্ণের মধ্যে, ভারতবর্ষের ইংরাজদিগকেও আর একটি অতিরিক্ত বর্ণ বলিয়া উপলব্ধি হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুমার উদয়াদিত্য।

বঙ্গীয় শিশু অতিশৈশবে সেকালের পদ্যপাঠে পড়িত,—

শ্রাবণের বারিধারা প্রায়
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।

বাদল, সিংহল-রাজকুমারী চিতোররাজ্ঞী পদ্মিনীর স্বজন। যখন আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হয়, তখন দ্বাদশবর্ষীয় সিংহলরাজ-কুমার বাদল পিতৃব্য গোরার সহিত চিতোর রক্ষার্থ অসমসাহসিকতা প্রকাশ করেন। তাই রাজস্থানের কবিগণ বাদলের স্মৃতি তাঁহাদের গাথায় চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। কর্ণেল টডের রাজস্থানের ইতিবৃত্তেও উহার নাম ও কীর্ত্তি অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত ইংরাজ মহাপুরুষের অনুগ্রহে বঙ্গীয় কবিগণ বাদলের সহিত পরিচিত হইয়া স্বজাতীয় শিশুগণকে উহার কীর্ত্তিপীযূষ পান করাইবার অবসর পাইয়াছেন। যদি মাতৃহৃদয়ে দুগ্ধ না থাকে, তবে ধাত্রী-বক্ষের সাহায্যেই শিশুকে পুষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু যদি মাতার বক্ষ স্তন্যধারায় উপপ্লাবিত হইয়া যায়, অথচ শিশুকে প্রাণধারণার্থ কখন এ ধাত্রী, কখন সে ধাত্রীর নিকট লইয়া যাওয়া হয়, মাতার প্রসারিত বাহুমধ্যে তাহাকে স্থান দেওয়া না হয়, তবে দুঃখিনী নিরপরাধিনী মাতার পক্ষেও তাহা মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ ক্লেশের কারণ হয়, এবং সন্তানকেও তাহার প্রকৃতিদত্ত জীবনধারণোপায় হইতে বঞ্চিত করিয়া হীনবল করা হয়।

মাতা বঙ্গভূমির হৃদয় কি শুষ্ক? তাঁহার সন্তানদের বলবীর্য্যে পুষ্ট করিবার জন্য খাঁটি ক্ষীরধারা কি তাঁহার বক্ষে সঞ্চিত নাই? হে মাতঃ, অঞ্চল অপসরণ কর। তোমার শোণিতমথিত দুগ্ধরসে আমাদের

প্রথম পুষ্টি সাধিত কর। আমরা সুস্থ, সবল, পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হই। প্রাপ্তবয়সে বলিষ্ঠ আমরা দেশবিদেশের অন্নপান জীর্ণ করিয়া বলিষ্ঠতর হইব; নতুবা সকলই বিফল!

উদয়াদিত্য অবজ্ঞাতা, অকথিত-কীর্ত্তিকথা বঙ্গমাতার সন্তান। হে বঙ্গীয় কবিগণ, অভিমন্যুর ন্যায় শত্রুপরিবৃত, সম্মুখসমরে নিহত, এই ঊনবিংশ বর্ষীয় তরুণ বাঙ্গালীর বীরত্বের গান কীর্ত্তন কর। বাদল, হামির প্রভৃতি ভারতের অন্যান্যাংশের বীরবালকগণের বীরত্ব ঘোষণা করিয়াছ। কিন্তু যে বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল, তাহাকে কেবলই প্রণয়ের কুসুমশয্যায় শায়িত দেখাইয়া কেন আত্মহত্যা করিতেছ?

পঞ্চবিংশতিবার মোগলসম্রাট, বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সসৈন্য সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতিবার সম্রাট-সেনানী বঙ্গীয় সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। পঞ্চবিংশতিবার প্রতাপাদিত্য, পুত্র উদয়াদিত্য ও মিত্র ও অমাত্য শঙ্কর, সূর্য্যকান্তাদির সহিত জন্মভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধে ঘোর বিক্রমে রণস্থলে অসি সঞ্চালন করিয়াছেন। কেবলই কি রাণা লক্ষ্মণ সিং ও ভীম সিং চিতোরে সপুত্র এই কীর্ত্তি দেখাইয়াছেন? কর্ণেল টডের প্রসাদে চিতোরের জয় জয়কার আজ সমস্ত অবনীমণ্ডলে ধ্বনিত। বাঙ্গলার টড নাই। সুতরাং প্রতাপ ও তাঁহার তরুণ পুত্রগণের নাম কে করে?

আজ বঙ্গের দ্বারে তাহার স্বাধীনতাহরণোদ্দেশ্যে দিল্লীর সম্রাটের ষট্‌বিংশতিতম সেনাপতি মানসিংহ উপস্থিত। তাঁহার সহায়, গৃহছিদ্র উদ্‌ঘাটনকারী কচুরায় ও পাষণ্ড ভবানন্দ মজুমদার। কচুরায় প্রতাপাদিত্যের দুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবরণ অবগত করাইয়া, এবং ভবানন্দ খাদ্য, নৌকা ও আশ্রয়দানে বর্ষাকালে বিপন্ন মানসিংহকে সাহায্য করিয়া, তাহাকে অমিতবল করিয়া তুলিয়াছে। মানসিংহ ঘোরতর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু উদয়াদিত্য প্রভৃতি বঙ্গীয়

সেনানায়কগণের বিক্রমে মানসিংহের সৈন্য সকল দিন দিন নিহত হইতে লাগিল। প্রতাপকে পরাজয় করা সহজ কার্য্য নহে বুঝিতে পারিয়া, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এবং রাঘবরায়, ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি স্বদেশশত্রু নরপিশাচগণকে আহ্বান করিয়া, মানসিংহ তাহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। এবং কচুরায়ের উপদেশনুসারে অতি সমারোহের সহিত ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া সৈন্যমধ্যে এরূপ জনরব প্রচার করিলেন যে, "ভক্তবৎসল ভগবতী, মানসিংহের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া প্রতাপের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে প্রতাপকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।" ইত্যাদি নানাপ্রকার কথায় সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া মানসিংহ পুনরায় যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপ, মানসিংহের সৈন্যগণকে অগ্রসর দেখিয়া সেনাপতিগণকে চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সূর্য্যকান্ত, মদন, সুখা, রুডা এবং ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক কুমার উদয়াদিত্য আপন আপন সৈন্যগণকে পরমোৎসাহিত করিয়া বিজয় লাভের জন্য শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর সূর্য্যকান্ত অনন্যসাধারণ বীরতাপূর্ব্বক মানসিংহের ব্যূহভেদ করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন, দলিত, মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মোগলসৈন্যগণ সূর্য্যকান্তের চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত করিল, প্রবল দাবানল ইন্ধনবিহীন হইয়া যেরূপ নিস্তেজ হইয়া আইসে, সেইরূপ সূর্য্যকান্তের সৈন্যগণ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। মহাবীর উদয়াদিত্য, সেনাপতি সূর্য্যকান্তকে বিপদসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া সৈন্যগণসহ তাঁহার সাহায্যের জন্য গমন করিতে লাগিলেন। মানসিংহ উদয়াদিত্যকে সূর্য্যকান্তের সাহায্যের জন্য আগমন করিতে দেখিয়া, কতকগুলি সৈন্যকে তাঁহার অবরোধের জন্য প্রেরণ করিয়া সূর্য্যকান্তের নিধন জন্য অপর কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ

করিলেন। মানসিংহপ্রেরিত সৈন্যগণ বিপুল পরাক্রমে সূর্য্যকান্তকে আক্রমণ করিল, সূর্য্যকান্ত ইহাদিগকে কোনরূপে রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না, রণস্থলে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। কুমার উদয়াদিত্য সূর্য্যকান্তের পতনে অত্যন্ত দুঃখাভিভূত হইয়া, মধ্যাহ্নকালীন আদিত্যের ন্যায় ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, দ্রুতবেগে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। যখন তিনি প্রলয়কালীন মহারুদ্রের ন্যায় যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় বিপক্ষ-পক্ষ-নিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলক, তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে অমরধামে প্রেরণ করিল।*

মূর্চ্ছিতো মানসিংহস্তু পপাত ধরণীতলে।
ততশ্চৈতন্যমাস্থায় প্রগ্রহীতোঽসি চর্ম্মণী॥
বঙ্গভূপং সংজুহাব যুদ্ধার্থায় মহীতলে।
অবরুহ্য গজাত্তূর্ণং খড়্গাচর্ম্মসমন্বিতঃ॥
তদা প্রবর্ত্তিতে যুদ্ধং প্রতাপো বীরপুঙ্গবঃ।
ততঃ খড়্গামুদাদায় পূর্ণচন্দ্র প্রভাসমং॥
অভ্যধাবত্তদা ক্রুদ্ধো জলদগ্নি শিখোপমঃ।
ছিত্বা চর্ম্মাণিঘাতেন মুষ্টি ঘাতেন ভূপতিঃ॥
মানং নিপাতয়ামাস মহী পৃষ্ঠে মহাবলঃ।
আরুহ্য হৃদয়ংতস্য কালান্তক যমোপমঃ॥
ততস্তন্নিধনার্থায় বিমলং খড়্গামাদদে।
অতর্কিতমুপায়াতো দৃষ্ট্বৈবং রাঘবো রুষা॥
অচ্ছিদদ্দক্ষিণং হস্তং প্রতাপস্য সখড়্গাকং।
মূর্চ্ছিতো বঙ্গভূপালো নিপপাত মহীতলে॥

* উল্লিখিত বিবরণ প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

সর্ব্বং তদৈব তদৃষ্ট্বা রণং হিত্বাগমক্রুতং।
দৃষ্টৈবং সূর্য্যকান্তশ্চ কুমারোপ্যুদয়স্তথা॥
জহি মানং ক্রুতং গচ্ছমিত্যুবাচ মুহুর্মুহুঃ।
শর জালং ততঃ কৃত্বা মহাঘোরতরং রণে॥
বিংশ সাহস্র্য সৈন্যানি শক্রসৈন্যাম্যপাহনৎ।
আযযৌ সমরং কর্ত্তুং দৃষ্টা তৌ রাঘবঃ পুনঃ॥
সূর্য্যকান্তো জঘানাসৌ শূল ঘাতেন সত্বরং।
উদয়ং সপিঘাতেন শর জালেন সৈনিকান॥

ঘটককারিকা।

প্রণয়িনীর বাহুপাশে বদ্ধ উদয়াদিত্যের চিত্র মধুর সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুরতর চিত্র সেই, যাহাতে কর্ত্তব্যের আহ্বানে সে বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া বীরযুবক

কহে—"প্রিয়ে নিলেম অবসর
এসেছে ঐ মৃত্যুসভার ডাক!"
বৃথা এখন ওঠে হুলুধ্বনি
বৃথা এখন বেজে ওঠে শাঁক।

শ্রীসরলা দেবী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথম অধ্যায়

অর্জ্জুন বিষাদ।

কৌরব পাণ্ডব উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইলে, বেদব্যাস কুরুকুলপতি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"মহারাজ! আপনি কি স্বচক্ষে এই যুদ্ধব্যাপার দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন?" ধৃতরাষ্ট্র ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দূতরূপে নিয়োগ করেন, এবং তাঁহাকে তদুপযোগী অশেষবিধ ক্ষমতায় সুসম্পন্ন করিয়া, যুদ্ধবিবরণ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণগোচর করিতে তাঁহার প্রতি আদেশ করেন। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সারথী ও অর্জ্জুন রথিরূপে শ্বেতাশ্বযুক্ত স্যন্দনে আরূঢ় ছিলেন। রণক্ষেত্রে পিতা পুত্র, পিতামহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু সমবেত দেখিয়া অর্জ্জুনের মনে নানা তর্ক বিতর্ক ও সন্দেহ উদয় হইয়া যুদ্ধে বিরাগ জন্মে, সেই সকল সন্দেহ দূর করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দেন। এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া ভগবদগীতা বিরচিত ও কৃষ্ণোপদিষ্ট সারগর্ভ গভীর তত্ত্বসকল গীতায় অভিব্যক্ত হয়। যুদ্ধের প্রারম্ভে সমরক্ষেত্র হইতে সঞ্জয় সংবাদ লইয়া আগত হইলে,

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে
সমবেত যবে সৈন্যদ্বয়,
কৌরব পাণ্ডব পক্ষে,
কি করিল বল, হে সঞ্জয়।১

সঞ্জয়ের উত্তর—

হেরিয়ে সম্মুখে, নৃপ,
ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডুসৈন্যগণ
দ্রোণাচার্য্যে সম্বোধিয়ে,
কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন।২

দেখ দেখ, হে আচার্য্য,
পাণ্ডবের সেনা অগণনা—
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য তব
করে কিবা ব্যূহের রচনা।৩
সাত্যকি, বিরাট আর
মহামতি দ্রুপদ নৃপতি,
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান,
কাশীরাজ বীর্য্যবান্ অতি ;
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ,
শৈব্য, সব বলের প্রধান,
উত্তমৌজা মহাতেজা,
যুধামন্যু যুদ্ধে আগুয়ান,
দ্রৌপদীর পুত্রগণ,
অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন,
ধনুর্দ্ধর, মহাবলী,
ভীমার্জ্জুন সম যোদ্ধাগণ। ৪-৬
আমার পক্ষেতে আছে
প্রমুখ সেনানী যত জন,
সমর-কুশল সব,
তাও কহি কর হে শ্রবণ।৭
আপনি ও ভীষ্ম, কর্ণ,
কৃপাচার্য্য অজের সমরে,
আরো কত শত বীর,
শুন তবে কহি পরে পরে ;
জয়দ্রথ মহারথী,
অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্য্য-সুত,
সোমদত্ত-পুত্র যিনি
ভূরিশ্রবা ভুবন-বিশ্রুত ;
বিকর্ণ দ্বিতীয় কর্ণ,
দক্ষ নানা শস্ত্র প্রহরণে,
নহে যারা সঙ্কুচিত
প্রাণ দিতে আমার কারণে।৮-৯
অপর্য্যাপ্ত* সৈন্যবল আমাদের,
ভীষ্ম সুরক্ষিত—
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব সৈন্য, রহে যারা
ভীম সুরক্ষিত ১০
ব্যূহমুখে যথাভাগে,
সাবধানে, হয়ে অবস্থিত
ভীষ্মের রক্ষণে সবে,
প্রাণপণে হও সচেষ্টিত।১১
এতেক শুনিয়া ভীষ্ম
সিংহনাদে ছাড়ে শঙ্খধ্বনি,
মহারাজ দুর্য্যোধন
পুলকিত সে নিনাদ শুনি।
বাজি উঠে রণ-বাদ্য
শঙ্খ, ডঙ্ক, পটহ, মর্দ্দল,
উঠিল গগণভেদী
তুমুল সে জয়-কোলাহল।১৩

* পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত এই দুই শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। আমার বিবেচনায় ইহাদের প্রচলিত সহজ অর্থই সঙ্গত। পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত, অপর্য্যাপ্ত =অপরিমিত।

শ্বেত অশ্ব-যুক্ত রথে,
অতঃপর, মাধব, পাণ্ডব,
দিব্য শঙ্খ বাজাইলা—
দিগন্ত প্রসারে সে আরব।১৪
হৃষীকেশ "পঞ্চজন্য"
"দেবদত্ত" বাজান অর্জ্জুন,
ভীমকর্ম্মা বৃকোদর
"পৌণ্ড্র" ধ্বনি করে সুনিপুণ,
বাজাইলা শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির,—
"অনন্ত বিজয়,"
নকুল ও সহদেব
"সুঘোষ" "পুষ্পক" শঙ্খদ্বয়।
বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন,
অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন,
শিখণ্ডী, সাত্যকি, কাশ্য,
ঘোষে তারা বিজয়-নিঃস্বন।
দ্রুপদ, দ্রৌপদী-পুত্র,
আর যত সেনার নায়ক
রণোন্মাদে শঙ্খনাদ
করে সবে পৃথক পৃথক।১৫-১৮
কি কব সে জয় রব—
কৌরবের হৃদয় বিদরি
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
কাঁপিল ভৈরব রবে ভরি।১৯
ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যগণ
রণভূমে দেখি ব্যবস্থিত,
ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ
উপস্থিত হেরি সশঙ্কিত,
ধনঞ্জয় মহাবাহু
মহাধনু করি উত্তোলন,
উভয় সৈন্যের মাঝে রাখ রথ,
কহিলা তখন।২০-২১

অর্জ্জুন।

রাখ রথ, ওই দেখ
ঘোরতর সমর উদ্যম,
দেখি আমি এ সমরে
কে আমায় যুঝিতে সক্ষম;
দেখিব হে এই ভূমে
আসিয়াছে কোন্ বীরগণ,
দুর্ব্বুদ্ধি সে দুর্য্যোধন
তারই বা হিতেচ্ছু কয় জন।২২-২৩

সঞ্জয়।

অর্জ্জুন বচন শুনি
পুরাইয়া পার্থ মনোরথ,
উভয় সেনার মাঝে
হৃষীকেশ থামাইলা রথ।২৪
ভীষ্ম দ্রোণ আর যত
মহারথী মহীপতিগণ,
তাদের সম্মুখে কৃষ্ণ
কহে পার্থে করি সম্বোধন।
সুসজ্জিত হেরি সৈন্যে
হর্ষভরে হৃষীকেশ বলে,
দেখ হে কৌরব সৈন্য
সমবেত হেথা দলবলে।২৫

উত্তর সৈন্যের পানে
নিরখিয়া দেখিলেন তবে
পিতা পিতামহ পূজ্য
স্বজনাদি মিলিত আহবে ;
আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা,
পুত্রপৌত্র সবে অস্ত্রধারী
শ্বশুর, শ্যালক, বন্ধু,
দাঁড়াইয়া যুদ্ধে সারি সারি।২৬
এ সব বন্ধু বান্ধব
রণক্ষেত্রে হেরি সম্মুখীন,
কেশবে কহিলা পার্থ,
কৃপাবিষ্ট, বিষাদে মলিন।২৭

অর্জ্জুন।

আত্মীয় স্বজনে হেরি,
হে মুরারি, যুদ্ধে সম্মিলিত,
শুকায় আনন মম,
সর্ব্বঅঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত
শিহরি উঠিছে গাত্র,
কাঁপে দেহ থর থর তাহে,
হাত হ'তে গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে,
শোষে তনু দাহে।২৮-২৯
আর না তিষ্ঠিতে পারি,
উতলা আমার হল মন,
নানা কুলক্ষণ, সখা,
দিশি দিশি করি নিরীক্ষণ।
স্বজনে বধিলে রণে
কোন মতে নাহি পরিত্রাণ,
চাহিনা বিজয় আমি,
রাজ্যসুখ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান।
সাম্রাজ্যে কি হবে, কৃষ্ণ,
ভাগ্যবলে অথবা জীবনে,
এ সব যাদের তরে,
তারা যদি হত এই রণে।...৩২
পিতা, পুত্র, পিতামহ,
আমাদের আচার্য্য যাঁহারা,
প্রাণ দিয়া, ধন দিয়া,
তাঁরা সবে যুদ্ধে মাতোয়ারা।
মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র,
শ্যালকাদি আত্মীয় স্বজন,
আমার মরণ ভাল—
মারিতে না উঠে মোর মন।
মহী থাক্ দূরে মোর
ত্রৈলোক্য রাজ্যও যদি হয়,
কি লাভ তাহাতে বল
সংগ্রামে এদের করি জয়।৩৩-৩৪
আততায়ী শত ভাই,
মহাপাপ তাদেরও নিধনে,
কি সুখ বধিয়ে রণে
আত্মীয় স্বজন বন্ধুগণে।৩৫-৩৬
অতি লোভে হ'য়ে অন্ধ
নাহি দেখে যদিও ইহারা,
মিত্র-দ্রোহ কুলক্ষয়,
পাপভাগী হইব আমরা।৩৭
যাহে হেন মহাপাপ,
জাতিকুল-ক্ষয়, জনার্দ্দন,

মোরা সব জেনে শুনে
কেমনে করিব বল রণ ?৩৮
সনাতন কুলধর্ম্ম
কুলক্ষয়ে সমূলে বিনাশ,
ধর্ম্ম নষ্ট হলে, দেব,
অধর্ম্মেতে করে কুলগ্রাস ।৩৯
অধর্ম্মের হলে জয়
কুলনারী হয় কলুষিতা,
বর্ণ সঙ্করের সৃষ্টি,
হয় যবে বনিতা দূষিতা ।৪০
সঙ্কর হইতে কুল
কুলঘ্নের নরকে নিপাত,
পিণ্ডোদক হয়ে লোপ
পিতৃকুল যায় অধঃপাত ।৪১
বরণ সঙ্করকারী
কুলঘ্নের এই মহাপাপে,
রসাতলে যায় ধরা
জাতি কুলধর্ম্ম অপলাপে ।৪২

কুলধর্ম্ম ভ্রষ্ট যারা
নরকে নিবসে নিত্য তারা,
না হয় অন্যথা তার,
শুনিয়াছি গুরু পরম্পরা ।৪৩
অহো কি অঘোর কৃত্য
দেখ মোরা করিতে উদ্যত,
রাজ্য সুখ প্রলোভনে
স্বজন নিধনে ধরি ব্রত ।৪৪
বসিব নিরস্ত্র আমি,
আসুক্ শত্রুরা শস্ত্রপাণি,
বধুক্ এখনি মোরে,
আমি তাহা শ্রেয় বলে মানি ।৪৫

সঞ্জয়।

এতেক কহিয়া কৃষ্ণে,
ধনঞ্জয়, শোক-দগ্ধ-হিয়া
দূরে ফেলি ধনুর্ব্বাণ,
অধোমুখে রহেন বসিয়া ।৪৬
ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান।*

অনন্তকালকে মানুষের আয়ত্তযোগ্য করিবার জন্য ঐতিহাসিকেরা তাহাকে কতকগুলি যুগে যুগে বিভক্ত করেন। ভারতের প্রাচীন আর্ষ ঐতিহাসিকেরা তাহাকে সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা ও কলি এই চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মুখ্য বক্তব্যের প্রয়োজন অনুসারে স্বেচ্ছামত যুগসংখ্যা ও যুগনামকরণ করিয়া থাকেন। যথা বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ; হিন্দুযুগ, বৌদ্ধযুগ; রামমোহনযুগ, চৈতন্যযুগ—ইত্যাদি।

মহাজনগণের পন্থানুসরণ করিয়া আমিও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমার প্রতিপাদ্যের প্রয়োজন অনুসারে কতকগুলি বিশিষ্ট যুগে খণ্ডিত করিব। তাহা এই :—

(১) অনার্য্য বনাম আর্য্যযুগ।
(২) আর্য্য বনাম আর্য্যযুগ।
(৩) হিন্দু বনাম মুসলমানযুগ।
(৪) প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্যযুগ।

পুরাতত্ত্ব, অতীতে উজান বাহিয়া যতদূরে পৌঁছিয়া স্থিতি করিয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই ভারতের আদিমনিবাসী, দাস বা দস্যু—

অনার্য্য বনাম আর্য্যযুগ।

বা তদুপরি বিজয়ী আর্য্যদের সহিত ভেদব্যঞ্জকতায় অনার্য্য-নামক জাতি। সেই অনার্য্যদের মধ্যেও নিশ্চয়ই নানা শ্রেণীবিভাগ, নানা জাতিবিভাগ ছিল; তাহাদের পরস্পর-আক্রমণ-প্রতিরোধ, দ্বন্দ্ববিরোধ বহুবার ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস তাহার সম্বাদ রাখে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেইখান হইতেই প্রারব্ধ হইল, যেখানে একদিকে সম্মিলিত, পরস্পর-সূক্ষ্ম-ভেদলক্ষণ-বিলুপ্ত, অনার্য্য-আখ্যেয়, ভারত-উপদ্বীপের অগণিত আদিম

* এই প্রবন্ধ কলিকাতার আলবার্ট হলে "থিওলজিকাল সোসাইটি"র বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হয়।

অধিবাসী; এবং অপরদিকে তাহাদের স্বাধীনতা, প্রভুত্ব ও অন্নাপহরণ-প্রয়াসী, বহির্ভারত হইতে আগত আর্য্য-আখ্যেয় এক নব জাতি। বেদ হইতে ও পুরাণ হইতে অসংখ্য শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে এই বিজিত-বিজেতৃ-সম্বন্ধযুক্ত দুই জাতির বিরোধ কতকাল যাবৎ কত তীক্ষ্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এ তথ্যটি এখন এতই সুবিদিত যে, সেই চেনা ব্রাহ্মণের জন্য আর শ্লোকরূপ পৈতা বাহির করা নিষ্প্রয়োজন।

আর্য্য বনাম আর্য্যযুগ।

কিন্তু আর একটি তথ্য আছে, যাহা এখনও সর্ব্বসাধারণ্যে সুপ্রচারিত নহে। রাজপুতানার ইতিবৃত্ত-সংগ্রাহক কর্নেলটড্ সর্ব্বপ্রথমে উহা আবিষ্কার ও আলোচনা করেন, এবং এসিয়াটিক রিসার্চ সোসাইটির পরন্তন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুরা তাহা সমর্থন ও পরিপোষণ করিয়াছেন। বিষয়টি সংক্ষেপতঃ এই। ম্যাক্সমূলরপ্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলস্বরূপ, এ দেশের লোকের যে বদ্ধমূল সংস্কার হইয়াছে যে, আর্য্যগণ একদিন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করিয়া, পরদিন বহির্ভারতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত। এখন যাঁহারা ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত বলিয়া গণনীয় তাঁহারা যে প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতে বাস করিতেছেন, এবং ভারতের বহিঃপ্রদেশের লোক চিরকালই ম্লেচ্ছ আছে তাহা নহে। আর্য্যাবর্তভুক্ত সকলেই একই সময়ে একদলবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে আসেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দলে বহির্ভারত হইতে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। যতদিন ভারতের বাহিরে, ততদিন তাঁহারা ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অ-ভারতীয়; যখনই ভারতবর্ষে জোরদখলে অবস্থিত, তখনই তাঁহারাও আর্য্য। এমন কি, সেই বৈদিক সময়েও একই শাখার বিভিন্ন রাজগণের মধ্যে যখন শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তখন

প্রতিদ্বন্দী ভ্রাতৃবর্গ পরস্পরের প্রতি শত্রুতা ও ঈর্ষাবশতঃ পরস্পরকে "যজ্ঞরহিত" বলিয়া গালি দিয়াছেন। পরাজিত দুর্ব্বলের বিগর্হণ ও অমান্য সেই আদিকাল হইতেই প্রবাহিত।

সুদাস নামে একজন রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু বিনা ভ্রাতৃরক্তপাতে নহে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলটি উহাঁর যজ্ঞের দানের স্তবে, এবং উহাঁর বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র দশজন আর্য্য রাজার প্রতি ইন্দ্রের বজ্রপাতের আমন্ত্রণে পূর্ণ। মহাভারতোক্ত যযাতি রাজা ও তাঁহার পঞ্চপুত্র অতি প্রাচীন, তাঁহারা প্রথমাগত আর্য্য-বংশজ। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডল হইতেই তাঁহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ সুদাস রাজা যযাতিবংশীয়গণের পরে পঞ্চনদতীরে সমাগত। সুদাস তাঁহার আর্য্যশত্রুদের "দুষ্টমিত্রমিলিত," অর্থাৎ অনার্য্য রাজাদের সহিত মিলিত বলিয়াছেন। যযাতির পঞ্চপুত্রের মধ্যে তুর্ব্বসু, অনু ও দ্রুহ্যু সুদাসের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে তুর্ব্বসু অপেক্ষাকৃত পরাক্রমশালী হওয়ায় সুদাস তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অনু ও দ্রুহ্যু তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া সমুদ্রপথে পলায়ন করেন, এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হন। সুদাস ও তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠাতা বশিষ্ঠবংশীয় ঋষিগণের এই অনু দ্রুহ্যু ও তাঁহাদের পুত্রগণের প্রতি আক্রোশ অপরিসীম। যখন মহাভারত রচিত হয়, তখন বংশাবলীক্রমে এই শত্রুতার স্মৃতি চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং মহাভারতকার লিখিলেন তুর্ব্বসু, অনু ও দ্রুহ্যুর বংশে যবন ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে দেখিতে পাইতেছি, সেই বৈদিক ও পৌরাণিক কালেও আর্য্যের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ আর্য্য দণ্ডায়মান হইলেই, সেও 'যজ্ঞরহিত' 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। এবং তাহার বিপরীত ঘটনাও ঘটিয়াছে। অর্থাৎ যে অনার্য্য রাজারা পরাক্রম ও সৌহার্দ্দ্য উভয়ই দেখাইয়াছেন তাঁহারা ক্রমে আর্য্যীকৃত হইয়াছেন।

বেদ ও পুরাণের পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক কালেও সেই একই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দুই একটি প্রথমে ম্লেচ্ছপর্য্যায় গণ্য, কিন্তু পরে আর্য্যীকৃত জাতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি।

মৌর্য্যজাতি—আন্দাজ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তখন ইহাঁরা নবাগত। কিন্তু ৪০০ বৎসর পরে ইহাঁদের বংশধরগণ কনিষ্ক প্রভৃতি তুরস্ক-রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে কনিষ্কের বংশধরগণও ভারতে বদ্ধমূল হয়।

তুরস্ক—কনিষ্ক ও তাঁহার পূর্ব্বতন কতিপয় নায়ক যখন খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন তখন নবাগত। কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ইহাঁরাই হূনগণের সহিত যুদ্ধ করেন।

হূনগণ—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এক প্রকার নবাগত। কিন্তু আন্দাজ ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে ইহাঁরা ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মহাকুলীন।

শকগণ—ইহাঁদের বহুশাখা বহুসময়ে ভারতে আসিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে। প্রাচীনতর শাখা নবীনতর শাখার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া 'শকারি' উপাধি ধারণ করিয়াছে, এখন সমস্ত শকগণই নির্ব্বিশেষে ভারতের রাজপুতজাতির অন্তর্নিবিষ্ট।

এইরূপ অনেকানেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বার্থ ও প্রভুত্ব রক্ষার বৃত্তিদ্বারা প্ররোচিত বিরোধাত্মক দ্বিতীয় কালবিভাগ একটি নির্ণয় করিতে পারি, যখন অনার্য্য-মিশ্রিত আর্য্যের সহিত অবিমিশ্রিত বিশুদ্ধ নবাগত আর্য্যের সংঘর্ষ হইয়াছে। আবার বিজিত-বিজেতৃর দ্বন্দ্ব। আবার ভারতের পূর্ব্বতন অধিবাসীদের পরস্পর-বিরোধ বিলুপ্ত হইয়াছে,

এক্ষণে শূদ্রনামান্তরিত দাস বা দস্যু ও তাহাদের অভিভবকারী* আর্য্য এক বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্তর্গত, এক জাতি, এক হইয়া বিদেশীয় অধিকার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, নিজেদের স্বত্ব ও প্রভুত্ব রক্ষা করিতে যত্নবান হইয়াছে।

হিন্দু বনাম মুসলমান যুগ।

তারপর মুসলমান অভিভবের কাল। ভারতবিজেতা আর্য্যগণের আদিম নিবাস ছিল মধ্য বা পশ্চিম এসিয়ায়। সেইস্থান হইতে সকলে ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। এসিয়ার মধ্যেই যাঁহারা নিবদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের কেহ দক্ষিণে ভারতবর্ষে, কেহ উত্তরে তাতার ও মঙ্গোলপ্রদেশে, কেহ পশ্চিমে পারস্য ও তুরস্কে, কেহ পূর্ব্বে চীনসীমান্তে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা চলাচল গতিবিধি ছিল। জম্বুদ্বীপ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও আর ছয়টি দ্বীপ লইয়া তখনকার যে ভূগোলবৃত্তান্ত রচিত ছিল, এবং যে সাতটি দ্বীপবাসী মনুষ্যদের ব্যবহারিক আদানপ্রদান সদাসর্ব্বদা চলিত, সেইকয়টী দ্বীপ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা আধুনিক ভূগোলের সহিত নিম্নলিখিতরূপে সামঞ্জীকৃত হইয়াছে। জম্বুদ্বীপ = India, প্লক্ষদ্বীপ = Media, শাল্মদ্বীপ = Syria, ক্রৌঞ্চদ্বীপ = Asia Minor, কুশদ্বীপ = Chinese Border, শাকদ্বীপ = Scythia, পুষ্কর দ্বীপ = Mongolia হইতে Malay Peninsula পর্য্যন্ত। সুতরাং এই সপ্তদ্বীপ সমস্ত এসিয়াকে আলিঙ্গন করিতেছে।

* অভিভব ও পরাভবে প্রভেদ আছে। সকল অনার্য্যই অভিভূত হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই পরাভূত হয় নাই। দৃষ্টান্ত ভীল, সাঁওতাল, কোল, কুকি প্রভৃতি জাতি, যাহারা আজ পর্য্যন্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। দ্রাবিড়ীয়, অঙ্গবঙ্গ, ও পার্ব্বত্য প্রদেশের অনার্য্যজাতিসমূহ আর্য্যীকৃত হইয়াছেন। কেহ কেহ ক্ষমতাগৌরবে ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। যাঁহারা স্বাতন্ত্র্য রাখিয়াছেন বা আর্য্যীকৃত হইয়াছেন তাঁহাদের পরাভূত বলা যায় না। পরাভূত তাহারাই, যাহারা চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগে চতুর্থ বর্ণ স্বীকার করিয়া আর্য্যদের দাসত্ব করিয়াছে।

উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের সহিত ভারতের বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল। আর আধুনিক ভারতখণ্ডের অপেক্ষা তখনকার ভারতখণ্ডের প্রসারও অনেক অধিক ছিল। সুতরাং পারস্য, তুরস্ক, কাবুল, গজনী, তাতার, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি বহির্ভারতের যে যে প্রদেশ হইতেই মুসলমানপ্রবাহ ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সেই প্রদেশ হইতেই পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যশাখা ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহারা সেই একই শোণিতের লোক, সেই এক আদিম আর্য্যবর্ণান্তর্গত। কেবল প্রভেদ এই, ইহাদের এখন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইতিহাসের প্রারম্ভে মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ার মনুষ্যপরিবারে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, ভারতবিজেতা প্রথম-আর্য্যেরা সেই ধর্ম্মের বীজ সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সেই বৈদিক ধর্ম্মাঙ্কুর বৌদ্ধধর্ম্মে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত মধ্য, পশ্চিম ও পূর্ব্ব এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং বহির্ভারতের ধর্ম্মই পূর্ণবিকশিত অবস্থায় বহির্ভারতে ফিরিয়া গেল। ভারতমধ্যেও সেই আদিম আর্য্যধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ। সুতরাং মোগল, তাতার, পারসিক, তুর্কী, কান্দাহারী, কাবুলী, গজ্‌নবী যতদিন ভিন্ন ধর্ম্মী হয় নাই, ততদিন তাহারাও আর্য্যপরিবারের অন্যান্যতর শাখা, আমাদেরই সগোত্র ও জ্ঞাতি বলিয়া সহজেই পরিজ্ঞেয় ছিল। সেই জ্ঞাতিরা আমাদের স্বোপার্জ্জিত কিম্বা দুইচারি-পুরুষে-লব্ধ সম্পত্তির উপর ভাগ বসাইবার উদ্যম করিলেই, আমরা জ্ঞাতিসুলভ ঈর্ষাবশে প্রথমটা খুব মারামারি কাটাকাটি করিতাম। কিন্তু তাহারা নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইলে, কিছুকাল পরে বিষয়বিভাগ করিয়া লইয়া, সৌভ্রাত্রভাবে বসবাস করিতাম; সামাজিক, বৈবাহিক আদানপ্রদানে সকল একীভূত হইয়া যাইত।

কিন্তু মহম্মদের জন্মের ও তাঁহার আরব্য ধর্ম্মপ্রচারের পর

আমাদের ভারতবহিঃস্থ সগোত্র জ্ঞাতিরা যখন মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন হইতে আমাদের সহিত তাঁহাদের যথার্থ ভেদ ও বৈরিতা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের ন্যায় ভারতের স্বত্বস্বামিত্ব লইয়া স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও হিংসা ত রহিয়াছেই, তার উপর পূর্ব্বে ভাষা, ধর্ম্ম, পরিচ্ছদ ও আচারব্যবহারের প্রায়শঃ সাম্যবশতঃ যে আমিত্বের প্রসার হইতে পারিত এখন তাহাও রুদ্ধ হইল। আরব্যধর্ম্মে দীক্ষিত এসিয়ার আর্য্যগণ, আরব্যধর্ম্মগ্রন্থাদি অনুশীলন করিতে বাধ্য হওয়ায়, তাঁহাদের ভাষা আরব্যশব্দবহুল হইল, আরব্য দীক্ষাগুরুগণের প্রভাবে ও অনুকরণে, নামে, পদবীতে, পোষাকে পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারেও তাঁহারা ক্রমশই অধিকতর বিজাতীয় হইতে লাগিলেন—যেমন ভারতবর্ষের নেটিভ-খৃষ্টানসম্প্রদায় প্রথম প্রথম হইয়াছিলেন। ক্রমে বহির্ভারতের আর্য্যদিগের সহিত ভারতাভ্যন্তরের আর্য্যগণের সাম্যচিহ্ন সকল বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

আবার এই মহম্মদীয় ধর্ম্মে নবদীক্ষিত বহির্ভারতের আর্য্যেরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষলব্ধ দেশবিজীগিষা ও ভারতে প্রভুত্বলিপ্সার সহিত ভারতীয় অর্থাৎ তাঁহাদেরও পিতৃপৈতামহ, কিন্তু অধুনাতন পরিত্যক্ত সনাতন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি যখন দেখাইলেন, তখনই বাস্তবিক মোগল, তাতার, কাবুলী, গান্ধারী ও পারসিক আর্য্য, ভারতীয় আর্য্যের পর হইলেন। তাঁহাদের সহিত শোণিতসম্বন্ধ আর দেখাই গেল না। এতদিন স্বার্থগত দ্বন্দ্ব কেবল চলিয়াছিল, এইবার তাহার উপর আত্মাভিমানে আঘাত পড়িল।

স্বার্থ ও স্বাভিমান এই দুইটি জিনিষ মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে চিরকাল উত্তেজিত করিয়াছে ও করিবে। আমার রাজ্য, সম্পত্তি, ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব, ইহার কোন একটি কেহ অপহরণপ্রয়াসী হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত আমার জিঘাংসার সম্বন্ধ হয়। কিন্তু

ধর্ম্ম জিনিষটা ঐহিক সুখসম্পদযশোমানের মত ভোগ্য বস্তু নহে। বরঞ্চ উহার বিনিময়ে অনেক সময় সুখসম্পদাদি ক্রয় করা যায়; তাই দরিদ্রের পক্ষে ও ভীরুর পক্ষে স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে বা শত্রুর তাড়নায় ধর্ম্মান্তরগ্রহণ নিত্য ব্যাপার। কিন্তু যেখানে সেরূপ কোন প্রয়োজন বা প্রলোভন নাই, কিম্বা কোন কোন স্থলে প্রয়োজন ও প্রলোভন সত্ত্বেও যে মানুষকে স্বধর্ম্মে অটল থাকিতে দেখা যায়, এমন কি তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে দেখা যায়,—তাহার মূলে স্বাভিমান, অহমহমিকা বর্ত্তমান। আমার ধর্ম্ম যা, তা আমার ধর্ম্ম বলিয়াই আমার নিকট সেরা ধর্ম্ম। তার অপমান করা আমারই অপমান করা। সুতরাং মুসলমানীকৃত পারস্য, তুরস্ক, কাবুল, তাতার বা মঙ্গোলিয়ার অধিবাসিগণ যখন ভারতে রাজ্যস্থাপনপ্রয়াসী হইলেন, তখন তত্তৎ স্থান হইতেই আগত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভারতবিজেতৃ-জাতিগণের মনে স্বার্থরক্ষা ও ধর্ম্মাভিমানরক্ষা এই দ্বিবিধ বৈরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তখন আর প্রাচীন আর্য্য অনার্য্যের, বা নবীন মৌর্য্য, তুরস্ক, হূনশক প্রভৃতির ভেদ রহিল না। আবার বহুত্বে একত্ব হইল। আবার বিজিত-বিজেতৃর দ্বন্দ্বে, এতাবৎকাল ভারতে উপনিবিষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত সমস্ত জাতি, বিজেতৃগণের ভাষায় 'হিন্দ্'এর বাসিন্দা বলিয়া ভেদনির্ব্বিশেষে 'হিন্দু' এই ব্যাপক আখ্যায় নিজেদের আখ্যাত করিয়া অভিভবকারী মুসলমানগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কোথায় এখন আর্য্য অনার্য্যের শত্রুতা? আর কে বা বলে, কেবা স্মরণ করে

> অভিদস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু
> জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায়॥ (ঋগ্বেদ ১।১১৭।২১)

হে অশ্বিদ্বয় বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া আর্য্যের প্রতি জ্যোতিঃ প্রকাশ কর।

হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী

দস্যূন্ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ ॥ (ঋগ্বেদ ৩।৩৪।৯)

ইন্দ্র হিরণ্ময় ধনদান করিয়াছেন; দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

জম্ভয়ত মভিতো রায়তঃ শুনোহতং

মৃধো বিদধু স্তান্যশ্বিনা॥ (ঋগ্বেদ ১।১৮২।৪)

হে অশ্বিদ্বয়, যাহারা কুকুরের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আমাদিগকে নিহত করিতে আসিতেছে, তাহাদিগের বধসাধন কর, তাহারা যুদ্ধ করিতে চায়, তাহাদিগকে বিনষ্ট কর।

আর কেই বা আনন্দ প্রকাশ করে যে—"হে ইন্দ্র ও বরুণ, দশজন যজ্ঞরহিত রাজা মিলিত হইয়াও সুদাস রাজাকে প্রহার করিতে সমর্থ হইল না। * * * অসুর ও দ্রুহ্যুর গবাভিলাষী ষষ্টীশত এবং ষট্‌সহস্র ষড়ধিক ষষ্টীসংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্য্যাভিলাষী সুদাসের জন্য শায়িত হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রের বীর্য্যসূচক।"

ঋগ্বেদ ৭।৮৩।৭।; ১৮।১৪।

আর কে-ই বা মনে রাখে পারদ শক ও হূনের বিভেদ ?

ধর্ম্মের নামে যখনই মানুষে মানুষে যুদ্ধঘোষিত হয়, তখনই জানিতে হইবে ধর্ম্ম একটি ধ্বজামাত্র। স্বার্থরক্ষার স্বাভিমানরক্ষার এক প্রচণ্ড সহায়, দুর্জ্জয় সেনাপতি মাত্র। বিধর্ম্মিবিদ্বেষ কথাটাই হিন্দুঋষিগণের বংশধরের মুখে হাস্যোদ্দীপক। যারই যা ধর্ম্ম হোক না, ধর্ম্ম ত বটে! সুতরাং ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ, অদ্বেষণীয়ের প্রতি দ্বেষ, হিন্দুর পক্ষে কিরূপে সম্ভব ; সেইজন্যই হিন্দুদের মধ্যে অন্যকে নিজের ধর্ম্মমতানুবর্ত্তী করিবার প্রয়াস ছিল না। উহাঁরা ধর্ম্মের সারমর্ম্ম এমনই বুঝিয়াছিলেন, উহার এতই পারগামী হইয়াছিলেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মের ভিতরও এমন কিছু নাই যাহাতে শিক্ষা দেয় যে, বিধর্ম্মীকে বিনাশ করিবে। একজন আদর্শ

সুফাফকির ও একজন আদর্শ হিন্দুসন্ন্যাসী উভয়েই ধর্ম্মের সমান পারগামী। যে সকল মুসলমানধর্ম্মীরা ধর্ম্মের নামে বিনাশঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাদের স্বাভাবিক লোভ ও হিংসাবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার সহায়স্বরূপ ধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন মাত্র।

যথার্থ ধার্ম্মিক যে, সেই ঈশ্বরে লীন পুরুষের পক্ষে আত্মীয়পর নাই, স্বার্থ অন্যার্থ নাই, অহঙ্কার অভিমান নাই, হিংসাদ্বেষ নাই। সুতরাং সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, সেই যথার্থ ধার্ম্মিকের পক্ষে, স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য, যুদ্ধ একান্ত অসম্ভব ব্যাপার।

যেমন যথার্থ ধার্ম্মিক একান্ত বিরল, তেমনি ধর্ম্মের কষ্টিপাথরে খাঁটি না হইলেও লোকসাধারণে যাহাকে সচরাচর 'ধার্ম্মিক' বলিয়া অভিহিত করে, অর্থাৎ স্বীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা অভিমান সদাজাগ্রতভাবে যার মনে আধিপত্য করে, এমন লোকও বিরল। পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরল। পুরোহিতেরা জীবনযাত্রানির্ব্বাহার্থে ধর্ম্মব্যবসায়ী বটে, কিন্তু তাহাদেরও সকলে স্বভাবতঃ ধর্ম্মাভিমানী নহে।

সংসারে লক্ষের মধ্যে দশহাজার নয়শত নিরনব্বই জন লোকের মনে ধর্ম্মাভিমানটা সুপ্তভাবে থাকে, তাহাকে আর কেহ অপমান বা আক্রোশের কশাঘাতে জাগ্রত করিয়া না দিলে তার অস্তিত্ব জানান দেয় না। সুতরাং বিধর্ম্মিবিদ্বেষের মূলে বস্তুতঃ আক্রমণকারী শত্রুর ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ নহে, কিন্তু তাহার আক্রমণের প্রতি দ্বেষই প্রভুত্ব করে। বিশেষতঃ যদি সেই আক্রমণকারী জাতি তাহার স্বার্থসিদ্ধির সহায়স্বরূপে প্রথমে ধর্ম্মের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া থাকে, ধর্ম্মাভিমানের নিশিত শর বর্ষণ করিয়া থাকে, তবে আক্রান্ত জাতিকেও আত্মরক্ষার্থ বাধ্য হইয়া সেই একই উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই একই রক্তধ্বজা উড্ডীন করিতে হয়, সেই একই বিষাক্তবাণ নিক্ষেপ করিতে হয়।

চিতোরের প্রতাপসিংহেরও মুসলমান-বিজেতার প্রতি বিদ্বেষ, তার মুসলমানত্বের প্রতি বিদ্বেষ নহে, তার জেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ। তাহাকে কন্যাদানে অসম্মতি, তার অন্তর্নিহিত কোন হীনতা বা অস্পৃশ্যতায় নহে। পরন্তু মুসলমান যে অস্পৃশ্য, মুসলমান যে অনাচরণীয়, এই ভাবটা প্রতাপের নিজের মনে ফেনাইয়া তোলা ও সকলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করার আবশ্যকতা ছিল, উহা হইতে আত্মরক্ষার, স্বার্থরক্ষার, প্রভুত্ব-রক্ষার, আত্মাভিমানরক্ষার একখানি অমোঘ, তীক্ষ্ণ, খরধার খড়্গ গড়িয়া লওয়ার জন্য।

প্রতাপাদিত্য ও শিবাজীর সময়ে 'বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষা' 'গোব্রাহ্মণরক্ষা' প্রভৃতি মন্ত্রও ঐ জাতীয়, অর্থাৎ স্বার্থস্বামিত্বরক্ষামূলক। শিবাজীর পতাকা ছিল গেরুয়াবস্ত্র, অর্থাৎ ত্যাগের চিহ্নজ্ঞাপক। ত্যাগের ধ্বজা তুলিয়া ভোগের সহায়তা আহ্বান করিতেছি, ইহা অপেক্ষা বিপরীত ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। তথাপি আবশ্যকস্থলে ইহাও চাই। জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিপরীত সুপরীত নাই; ছলবল কৌশল, ত্যাগের ধ্বজা, ভোগের ধুয়া,—যখন যেমন আবশ্যক, যখন যাহা ফলদায়ক,—আত্মরক্ষার্থ, প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলের স্বার্থরক্ষার্থ তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে।

মিবাররাজ তখন যে কাজ করিয়াছিলেন সেদিনকার পক্ষে অতি ভাল কাজই করিয়াছিলেন। ভিন্নধর্ম্মী বিজেতার হস্ত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারিলে, তাহা রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের পক্ষেই হইত। কোন রাষ্ট্রে ধর্ম্ম, ভাষা, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিগতভেদ যত অল্পপরিমাণে থাকে, সেই রাষ্ট্রের সকলের সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে তত অনুকূল হয়। বিজেতৃজাতীয় আকবর ইহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য যথার্থই রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের ভাবে প্রণোদিত হইয়া হিন্দুমুসলমানের ভেদ যথাসম্ভব পরিক্ষীণ করিয়া আনিবার

চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজকন্যাগণকে মুসলমান-রাজান্তঃপুরে সম্রাজ্ঞীরূপে সসম্মানে গ্রহণবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া তিনি মহা রাজনৈতিকবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। আর যে সকল রাজপুত রাজারা মোগলসম্রাটকে কন্যা বা ভগ্নী দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া উহা করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় মঙ্গললিপ্সার ব্যাপক উদারভাবে পরিচালিত হন নাই—তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? লৌকিক ধর্ম্ম যখন অভিমানমাত্র, তখন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে অভিমান বর্জ্জন করা তেজোহীনতার পরিচায়ক সুতরাং নিন্দনীয় হইলেও—রাষ্ট্রীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহা বর্জ্জন করাই, ক্ষুদ্র আমিত্বকে সঙ্কোচ করিয়া, বৃহৎ আমিত্বকে প্রসারদান করাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। যদি যশল্মীর, যোধপুর প্রভৃতিরা সেই ভাবেই আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের দোষ দিতে পারি না, তবে তাঁহাদের আচরণে ঘৃণা প্রকাশ করিতে পারি না। বৈষ্ণব শাক্তকে কন্যাদান করিতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যসমাজকে কন্যাদান করিতে পারে, হিন্দু মুসলমানকে কেন কন্যাদান করিতে পারিবে না? বৈষ্ণব-কন্যা শাক্তগৃহে গিয়াও ইচ্ছা করিলে বৈষ্ণবই থাকে, ব্রাহ্মকন্যা আর্য্য-গৃহে যাইয়াও ব্রাহ্মই থাকে,—হিন্দুকন্যা মুসলমানগৃহে গিয়াও হিন্দুই ছিল, তাহার ধর্ম্মে কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই, তাহার ধর্ম্মাভিমানে কেহ আঘাত করে নাই—তবে এক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি যত বিলুপ্ত হয়, পার্থক্য যত হ্রাস হইয়া আসে তাহার চেষ্টা কেন হইবে না?

শুধু যে আদিকালের আর্য্যশোণিতগত ঐক্যই আমাদের আছে তাহা নহে। আমরা লক্ষ্য করিতে ও বিচার করিতে ভুলিয়া যাই যে, মুসলমান অভিভবের কালাবধি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত এবং সিন্ধুনদী হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত কত লক্ষ লক্ষ সম্ভ্রান্ত হিন্দু, মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জাত্যন্তরিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের

চিতোরের প্রতাপসিংহের মুসলমান-বিজেতার প্রতি বিদ্বেষ, তার মুসলমানত্বের প্রতি বিদ্বেষ নহে, তার জেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ। তাহাকে কন্যাদানে অসম্মতি, তার অন্তর্নিহিত কোন হীনতা বা অস্পৃশ্যতায় নহে। পরন্তু মুসলমান যে অস্পৃশ্য, মুসলমান যে অনাচরণীয়, এই ভাবটা প্রতাপের নিজের মনে ফেনাইয়া তোলা ও সকলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করার আবশ্যকতা ছিল, উহা হইতে আত্মরক্ষার, স্বার্থরক্ষার, প্রভুত্ব-রক্ষার, আত্মাভিমানরক্ষার একখানি অমোঘ, তীক্ষ্ণ, খরধার খড়্গ গড়িয়া লওয়ার জন্য।

প্রতাপাদিত্য ও শিবাজীর সময়ে 'বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষা' 'গোব্রাহ্মণরক্ষা' প্রভৃতি মন্ত্রও ঐ জাতীয়, অর্থাৎ স্বার্থস্বামিত্বরক্ষামূলক। শিবাজীর পতাকা ছিল গেরুয়াবস্ত্র, অর্থাৎ ত্যাগের চিহ্নজ্ঞাপক। ত্যাগের ধ্বজা তুলিয়া ভোগের সহায়তা আহ্বান করিতেছি, ইহা অপেক্ষা বিপরীত ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। তথাপি আবশ্যকস্থলে ইহাও চাই। জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিপরীত সুপরীত নাই; ছলবল কৌশল, ত্যাগের ধ্বজা, ভোগের ধুয়া,—যখন যেমন আবশ্যক, যখন যাহা ফলদায়ক,—আত্মরক্ষার্থ, প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলের স্বার্থরক্ষার্থ তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে।

মিবাররাজ তখন যে কাজ করিয়াছিলেন সেদিনকার পক্ষে অতি ভাল কাজই করিয়াছিলেন। ভিন্নধর্ম্মী বিজেতার হস্ত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারিলে, তাহা রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের পক্ষেই হইত। কোন রাষ্ট্রে ধর্ম্ম, ভাষা, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিগতভেদ যত অল্পপরিমাণে থাকে, সেই রাষ্ট্রের সকলের সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে তত অনুকূল হয়। বিজেতৃজাতীয় আকবর ইহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য যথার্থই রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের ভাবে প্রণোদিত হইয়া হিন্দুমুসলমানের ভেদ যথাসম্ভব পরিক্ষীণ করিয়া আনিবার

চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজকন্যাগণকে মুসলমান-রাজান্তঃপুরে সম্রাজ্ঞীরূপে সসম্মানে গ্রহণবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া তিনি মহা রাজনৈতিকবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। আর যে সকল রাজপুত রাজারা মোগলসম্রাটকে কন্যা বা ভগ্নী দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া উহা করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় মঙ্গললিপ্সার ব্যাপক উদারভাবে পরিচালিত হন নাই—তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? লৌকিক ধর্ম্ম যখন অভিমানমাত্র, তখন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে অভিমান বর্জ্জন করা তেজোহীনতার পরিচায়ক সুতরাং নিন্দনীয় হইলেও—রাষ্ট্রীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহা বর্জ্জন করাই, ক্ষুদ্র আমিত্বকে সঙ্কোচ করিয়া, বৃহৎ আমিত্বকে প্রসারদান করাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। যদি যশল্মীর, যোধপুর প্রভৃতিরা সেই ভাবেই আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের দোষ দিতে পারি না, তবে তাঁহাদের আচরণে ঘৃণা প্রকাশ করিতে পারি না। বৈষ্ণব শাক্তকে কন্যাদান করিতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যসমাজকে কন্যাদান করিতে পারে, হিন্দু মুসলমানকে কেন কন্যাদান করিতে পারিবে না? বৈষ্ণব-কন্যা শাক্তগৃহে গিয়াও ইচ্ছা করিলে বৈষ্ণবই থাকে, ব্রাহ্মকন্যা আর্য্যগৃহে যাইয়াও ব্রাহ্মই থাকে,—হিন্দুকন্যা মুসলমানগৃহে গিয়াও হিন্দুই ছিল, তাহার ধর্ম্মে কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই, তাহার ধর্ম্মাভিমানে কেহ আঘাত করে নাই—তবে এক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি যত বিলুপ্ত হয়, পার্থক্য যত হ্রাস হইয়া আসে তাহার চেষ্টা কেন হইবে না?

শুধু যে আদিকালের আর্য্যশোণিতগত ঐক্যই আমাদের আছে তাহা নহে। আমরা লক্ষ্য করিতে ও বিচার করিতে ভুলিয়া যাই যে, মুসলমান অভিভবের কালাবধি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত এবং সিন্ধুনদী হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত কত লক্ষ লক্ষ সম্ভ্রান্ত হিন্দু, মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জাত্যন্তরিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের

পরস্পর বিবাহবন্ধন হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষীয় মুসলমানমাত্রেরই ধমনীতে হিন্দুশোণিত প্রবাহিত হইতেছে একথা বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় মুসলমান ও ভারতবর্ষীয় হিন্দুতে শোণিতগত সাম্য রহিয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সন্তানগণও যেমন হিন্দুর সহিত এক শোণিতাত্মক—মৌলভী মহম্মদ ইয়ুসুফ্ ও তাঁহার সন্তানগণও তদ্রূপ। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পরলোকগত সায়ানী, জষ্টিস্ বদ্রুদ্দীন তায়াবজী প্রভৃতিও তদ্রূপ। ভারতীয় মুসলমানের শোণিতে যেমন আধুনিক মোঙ্গল প্রভৃতির শোণিতের সংমিশ্রণ হইয়াছে, ভারতীয় হিন্দুর শোণিতেও তদ্রূপ হইয়াছে ও হইতেছে। নেপাল, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দুগণ তাহার সাক্ষী। অথচ নেপাল ও ত্রিপুরার রাজারা অধুনা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় (শেষোক্তেরা যযাতিপুত্র দ্রুহ্যুর সন্তান) বলিয়া পরিগণিত। মঙ্গোল তিব্বতরাজ ও আর্য্যীকৃত দ্রাবিড় ত্রিবাঙ্কুর রাজও নেপালকে কন্যাদান করিতেছেন, এবং মধ্যভারতের মহাকুলীন রাজপুতগণও তাঁহাকে কন্যাদান করিতেছেন। সুতরাং ভারতীয় হিন্দুর ভারতবহিঃস্থ জাতির সহিত রক্তের সংমিশ্রণে যখন হিন্দুত্ব লোপ হয় না, তখন ভারতীয় মুসলমানের ভারতবহিঃস্থ জাতির সহিত রক্তের সংমিশ্রণে তাহার হিন্দুর সহিত এক শোণিতত্ব, হিন্দিত্ব, ভারতীয়ত্ব বিলুপ্ত হইতেছে না। অতএব যে দিক দিয়াই দেখি—পুরাতত্ত্বের দিক দিয়াই দেখি, অথবা আধুনিকতত্ত্বের দিক দিয়াই দেখি হিন্দু ও মুসলমানে দুই ভাই, ভারতমাতার দুটী সন্তান। বাইবেলের উপাখ্যান যথার্থই এস্থলে সত্যে পরিণত হইতেছে :—"দূরে পর্ব্বতপার্শ্বে দেখিতে পাইলাম কিম্ভূত কিমাকার একটি জীব বিচরণ করিতেছে; উহা আমার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলে বুঝিলাম সে একজন মানুষ। যখন একেবারে আমার সমীপবর্ত্তী হইল, দেখিলাম সে আমার সহোদর"।

যদি নবযুগের নাটককার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতী ও আকবরের পুত্র সেলিমকে পরস্পরের প্রণয়মুগ্ধ করিয়া চিত্রিত করিয়া থাকেন, তবে কালজ্ঞ বুদ্ধিমান হিন্দুর তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া রচয়িতাকে অভিনন্দন করাই কর্ত্তব্য। যদি নবযুগের নাটককার মনোমোহন গোস্বামী, শিবাজী ও ঔরঙ্গজেবের আত্মীয়া রোসেনারাকে পরস্পরের প্রতি প্রণয়মুগ্ধ করিয়া চিত্রিত করিয়া থাকেন তবে কালজ্ঞ বুদ্ধিমান মুসলমানের তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া রচয়িতাকে অভিনন্দন করাই কর্ত্তব্য। কারণ হিন্দু মুসলমানের পরস্পর ঐক্যবুদ্ধিপরিপোষণের, ভেদজ্ঞানলোপের, বহিঃশত্রুরঅধৃষ্য এক মহাজাতিরূপে আত্মসংগঠনের পক্ষে এই প্রণয়চিত্রগুলি প্রবল সহায়।

প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য যুগ।

যাহাই হউক, এখন ভারতের ইতিহাসে চতুর্থ কালবিভাগ সমাগত। এখন আর আর্য্যও নাই, অনার্য্যও নাই, হূনও নাই, শকও নাই, হিন্দুও নাই, মুসলমানও নাই—আছে কেবল নেটিভ ও সাহেব, কালো ও সাদা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। আবার একদিকে সমস্ত বিজিত, লাঞ্ছিত, স্বার্থ ও প্রভুত্বচ্যুত, এতাবৎকাল ভারতে সম্বর্দ্ধিত, ভারতমাতার বক্ষে পালিত, ভাষা ব্যবহার ও ধর্ম্মের বিভিন্নতানির্ব্বিশেষে সমুদ্রবালুকার ন্যায় অগণিত, সমস্ত মনুজসন্তান; এবং অপর দিকে তাহাদের স্বাধীনতা, স্বার্থ ও স্বামিত্ব অপহারী নবজাতি। এখন আর আমাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান, জৈন পার্সি, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ভেদ নাই—এখন সকলেই এক নামের দ্বারা আখ্যেয় 'নেটিভ' অথবা ইণ্ডিয়ান। দুর্দ্দিনের বন্ধন যেমন বন্ধন, সুদিনের বন্ধন তেমন বন্ধন নয়। সমদুঃখের, সমদুর্দ্দৈবের, সম-অত্যাচারের রসায়নে আমাদের বজ্রদৃঢ় মিলন আপনা আপনি সংঘটিত হইতেছে ও হইবে।

আর এক কথা, এবার শুধু ভারতবর্ষ লইয়া কথা নহে। আমরা শুধু 'ইণ্ডিয়ান' নহি, আমরা 'নেটিভ'। জাপানীও 'নেটিভ,' চৈনিকও 'নেটিভ,' বর্ম্মিজও 'নেটিভ,' সায়ামীজও 'নেটিভ,' মঙ্গোলও 'নেটিভ,' তুর্কও 'নেটিভ,' পারসিকও 'নেটিভ,' কাবুলীও 'নেটিভ'। সুতরাং এবার ভারতবাসী সমগ্র এসিয়-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, সমগ্র এসিয়ার মনুষ্য-সমাজের সহিত তুল্য-অবজ্ঞেয়। এবার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা শুধু ভারত ও ভারত সীমান্তবর্ত্তী পয়োশীতে নহে। এবার দ্বন্দ্ব সমস্ত নেটিভে ও সমস্ত য়ুরোপীয়ে। সমস্ত প্রাচ্যে ও সমস্ত পাশ্চাত্যে। সুতরাং কার্য্যকারণের অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ অনুসারে, সমশত্রুতা ও সমবিরোধজাত নিগূঢ় মিলনাত্মক প্রাকৃতিক নিয়মের ফল এখানেও পরিদৃশ্যমান হইবে। এবার ভারতের বল ঐ বিস্তৃতিতে, শত্রুরোধের সম্ভবপরতাও ঐ বিস্তৃতিতে। এবার শুধু ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় একীভূত হইবে না, সমগ্র এসিয়ার মহা ঐক্য সাধিত হইবে। তাহার লক্ষণ এখনই দেখা যাই-তেছে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র যে প্রবল জাতি য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের অন্যতর বলিয়া গণিত হইয়াছে, সেই বলবীর্য্যসহায়সম্পন্ন জাতির মধ্য হইতেই ঐ মহা গম্ভীর ঐক্যতানের প্রথম রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। দুর্ব্বলের হস্ত হইতে বেদনার প্রথম ক্ষীণ ঝঙ্কার নিঃসৃত হয় নাই।

'প্রাচ্য-আদর্শ' (Ideals of the East) নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার, ওকাকুরা নামধেয় জাপানের একজন বিদ্বদগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিতেছেন :—"আসিয়া এক। হিমাচল দুইটী বিরাট সভ্যতার বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্যই যেন তাহাদের বিভক্ত করিয়াছে ;—ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা ও মঙ্গোলীয় চৈনিক সভ্যতা। কিন্তু আসিয়ার প্রত্যেক জাতিরই চিন্তা-রাজ্যে যাহা সাধারণ পৈত্রিক অধিকার—চরম ও ভূমার প্রতি প্রীতি, তাহার প্রসার ঐ তুষার প্রাচীরের দ্বারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও রুদ্ধ হয় নাই। সেই পূর্ণ ও ভূমার প্রতি প্রীতিবলেই আসিয়া জগতের সমস্ত

সুমহদ্ধর্ম্মের জননী হইয়াছে, জীবনের পরম গতি অন্বেষণে কৃতকার্য্য হইয়াছে। * * * আরব্য শিভাল্‌রি, পারস্য-কাব্য, চৈনিক সমাজ-নীতি ও ভারতীয় চিন্তা এ সকলই একটি অখণ্ড আসিয়-শান্তি-পরায়ণতার কথা কহে, যে শান্তির মধ্যে একটি সাধারণ-জীবন প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাতে দেশভেদে বিভিন্ন পুষ্পোদ্গম হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহার কোনখানেই একটা স্পষ্ট, দৃঢ়, বিভাজক রেখার অবসর ছিল না। ইস্‌লামধর্ম্মকেই অশ্বারূঢ়, দিগ্বিজিগীষু কন্‌ফ্যুসিয়নিজ্‌ম্ বলা যাইতে পারে, কারণ পীত-উপত্যকার বৃদ্ধসমাজনীতির মধ্যেই সেই বীজগুলি আবিষ্কার করিতে পারা যায়, যাহা স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া মুসলমানজাতিরা সম্যক সার্থকতা সাধন করিয়াছিলেন। আবার পশ্চিম এসিয়া হইতে পূর্ব্ব এসিয়ায় ফিরিয়া চাহিলে দেখা যায়, ভাবের মহার্ণব সেই বৌদ্ধধর্ম্ম, যাহাতে পূর্ব্ব আসিয়ার সমস্ত চিন্তানদী আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা শুধুই গঙ্গার শুভ্রজলে রঞ্জিত নহে। কারণ যে সকল তাতার জাতিরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহাদের প্রতিভা উপঢৌকন দিয়াছিলেন—নব নব রূপক, নব গঠনপদ্ধতি ও ভক্তির নবতর বিকাশ অর্ঘ্য আনিয়া তাঁহারা উপাস্যধর্ম্মের রত্নগৃহ সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।”

লেখক আরও বলিতেছেন :—“এই বৈচিত্র্যনিহিত ঐক্যটি ধারণা করিবার মহাসৌভাগ্য জাপানেরই হইয়াছে। এই জাতির ধমনীতে হিন্দু ও তাতার রক্তের সংমিশ্রণ এমন একটি উত্তরাধিকার, যাহার বলে উভয় মূল উৎস হইতেই তাহার গ্রহণক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং জাপান সমস্ত আসিয়-চৈতন্যের দর্পণস্বরূপ।”

অতি সত্য কথা! আসিয়ার মধ্যে প্রবলতম দেশ যে, যাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিয়া চরাচরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই প্রদেশ সমগ্র আসিয়-চৈতন্যের দর্পণস্বরূপ। এই দর্পণে, এই

আদর্শে, আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? কি শিখিতেছি? শিখিতেছি—"আজিকার আসিয়ার কর্ত্তব্য এই দাঁড়াইতেছে—আসিয়-রীতিপদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও তাহাদের সুরক্ষিত করা। কারণ অতীতের অস্পষ্ট ছায়াই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা। বীজে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকে, সেই শক্তি অতিক্রম করিয়া কোন বৃক্ষই অধিক বড় হইতে পারে না। আপনাতে ফিরিয়া ফিরিয়া আওয়ায়—আত্মোপলব্ধিতেই জীবন। কত শত মহাত্মা এই সত্য প্রচার করিয়াছেন। "আপনাকে জান" গ্রীকদিগের এই দৈববাণীটিই রহস্যভূয়িষ্ঠ। কন্‌ফ্যুসিয়াসের ধীর কণ্ঠেও একদিন উচ্চারিত হইয়াছিল "তোমাতেই সব"; এবং যে ভারতীয় কাহিনী শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ঐ বার্ত্তাই বহন করিতেছে তাহা সমধিক চমৎকারজনক। * * * এই আত্মজ্ঞানের এক কণিকা জাপানকে পুনর্গঠিত করিয়াছে, এবং যে ঝটিকায় প্রাচ্যভূখণ্ডের বহু অংশ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, তার প্রকোপ সম্বরণক্ষম করিয়াছে। এবং এই আত্মজ্ঞানেরই নষ্টউদ্ভাস অবশ্য একদিন সমগ্র আসিয়াকে আবার তার প্রাচীন দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। * * * হয় অন্তর্নিহিত বলে বিরাট বিজয়, নয় বহিঃশক্রর কবলে করাল মৃত্যু!"

এই জাতীয় চৈতন্যের দর্পণে আমরা দেখিতেছি যে, ভারত ইতিহাসের এই চতুর্থযুগে—শ্যাম ও সাদা, নেটিভ ও য়ুরোপীয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে আমাদের "অজেয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিকভাবে নহে, কিন্তু গভীরতররূপে—জীবনযাত্রায়, চিন্তায়, শিল্পে—সর্ব্বত্র স্বাধীনপ্রাণতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপে।"

আমরা সতর্কিত হইতেছি যে—"আমাদের সম্মুখীন নবসমস্যাগুলি স্ববশে আনিতে হইলে, আত্মমর্য্যাদার গভীরতরস্তরে অবগাহন করিয়া বলসঞ্চয় করিতে হইবে।"

আসিয়ার এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতকৃতার্থ জাতির নিকট আমরা ভারত-

মাতারই হৃদয়রাগিণীর প্রতিধ্বনি শুনিতেছি এবং শুনিয়া আশ্বস্ত ও ধন্য হইতেছি যে—

"আসিয়ার সরল সহজ জীবনপ্রণালীর, বাষ্প ও তাড়িৎচালিত য়ুরোপের সহিত তুলনায় লজ্জাপ্রাপ্তিভয়ে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। * * * সময়গ্রাসী দ্রুতগতির তীব্র আনন্দ আসিয়া জানে না ইহা সত্য, কিন্তু তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজকের উদারতর পর্য্যটননীতির অনুশীলন তাহার আছে। কারণ ভারতের সাধুসন্ন্যাসী, যিনি গ্রাম্য গৃহিণীদিগের নিকট মুষ্টিভিক্ষা লাভ করেন, বা সন্ধ্যাগমে তরুতল আশ্রয় করিয়া গ্রাম্যকৃষকগণের সহিত ধূমপানে ও কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত থাকেন, তিনিই যথার্থ পর্য্যটক। তাঁহার নিকট দেশবিশেষ কেবল তাহার প্রাকৃতিক লক্ষণেই বিলক্ষণিত নহে। তাহা লৌকিক অভ্যাস, আচার, ব্যবহার, কিম্বদন্তীর—এবং যে অতিথি মুহূর্ত্তেরও জন্য তার সুখদুঃখের ভাগী হইয়াছে তাহার মায়া ও স্নেহশীলতায় অভিষিঞ্চিত, মানবিকতার এক একটি আধার স্বরূপ। এবম্বিধ অভিজ্ঞতাপ্রণালীর দ্বারাই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্যধারণার অনুশীলন হইয়া থাকে,—তাহা জীবনের সাক্ষাৎ স্পর্শ হইতে লব্ধ ও পুষ্ট জ্ঞান এবং অটল অথচ শান্ত মনুষ্যত্বের সামঞ্জসীকৃত চিন্তা ও অনুভূতি। এইরূপ বিনিময় প্রথার দ্বারাই প্রাচ্যধারণানুযায়ী মানব ব্যবহার সম্বর্দ্ধিত হয়, মানসিক উৎকর্ষ লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়—পুঁথিগত তালিকা নহে।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও কিছু অধিক প্রত্যক্ষ গৌরব এসিয়ার আছে। শান্তির যে কম্পন প্রত্যেক হৃদয়ে স্পন্দিত হয়, যে সাম্য সম্রাট ও কৃষাণকে একত্র আনয়ন করে, যে সুমহৎ অদ্বৈতানুভূতির ফলে সকলের সহিত সমবেদনা ও সকলের প্রতি সৌজন্য উপদিষ্ট হয়,—তাহাতেই আসিয়ার গৌরব নিহিত রহিয়াছে। আত্মত্যাগের সেই যে চরম কল্পনা, যাহাতে যতক্ষণ না জগতের শেষ রেণুকণা পর্য্যন্ত নির্ব্বাণপ্রাপ্ত

হইতেছে ততক্ষণ বোধিসত্ত্ব স্বয়ং নির্ব্বাণ লাভে নিবৃত্ত রহিয়াছেন বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন—তাহাতেই এসিয়ার গৌরব নিহিত রহিয়াছে। আসিয়ার গৌরব সেই স্বাধীনতা পূজাতেই বিরাজিত, যাহা দারিদ্র্যের মস্তকে মহত্ত্বের রশ্মিচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়াছে। এই সবই আসিয়ার চিন্তা, বিজ্ঞান, কাব্য ও শিল্পের অন্তর্নিহিত গুপ্ত শক্তি।"

অতএব এবার দেখিতেছি বিজিত-বিজেতৃদ্বন্দে হিন্দু-মুসলমানভেদ-বিলুপ্ত মিলিত-ভারতে, আমাদের এই সর্ব্বগ্রাসী প্রতীচ্য সমশত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার্থ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্যনির্দ্দেশক আলোক-বিন্দুমাত্রকেই প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়া আমাদের অন্ধকার-রণক্ষেত্রের মশাল করিতে হইবে। প্রাকৃতিক জীবন-সংগ্রামে কোন কোন কীটপতঙ্গ যেমন প্রয়োজনগৌরবে আক্রমণকারী শত্রুর বর্ণানুকরণ করিতে বাধ্য হয়, আমাদেরও কোন কোন বিষয়ে তদ্রূপ করিতে হইবে। কিন্তু প্রয়োজনাতীত অনুকরণ প্রশ্রয় দিলেই আমরা সমূলে বিনষ্ট হইব।

ইহা নিশ্চিত জানিয়া, পাশ্চাত্য জাতি হইতে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের, বিশেষত্বের, ভেদজ্ঞানের ধ্বজাগুলি সর্ব্বদা উজ্জ্বল ও উন্নত রাখ। আর নিজেদের, হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর ভেদগুলি বিলোপ কর। বিরোধ-কারণসকল নির্ম্মূল কর। এক শোণিতাত্মক, এক বর্ণাত্মক জাতি একত্রে সঙ্ঘব ও সাম্যের উপকূলে বাহিয়া চল। সৌভ্রাত্র ও ঐক্যের বাঁধ বাঁধ। আমরা এখন হিন্দুই হই বা মুসলমানই হই, সকলেই "হিন্দি," অর্থাৎ হিন্দ্ নিবাসী,—"Indian"। এই নবযুগে ঐ নব আখ্যায় নিজেদের আখ্যাত করিয়া, তদনুরূপ কার্য্য করিলেই আমাদের মোক্ষ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

চিত্র দর্শনে।*

শুভ্রবাস বর-অঙ্গে, হস্তে ল'য়ে কুসুম-মালিকা,
কোথা তুমি চ'লেছ বালিকা?
তোমার অলক্তক সুকুমার চরণ-পরশে,
সুন্দর নবীন সাজে বন-বীথি সাজিছে হরষে!
সহসা জাগিয়া উঠি, শুনি তব নূপুর-সিঞ্জিনী,
গাহিছে প্রভাতী গান কল কণ্ঠে বন-বিহঙ্গিনী,
অপূর্ব্ব পুলকে।
আলেখ্য লিখিত কোন্ স্বপ্ন বালা তুমি,
হে মনোহারিকে?

শ্রীবিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়

আমাদের শিল্পশিক্ষা।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ মিষ্টর ই, বি হাভেল "ভারতী"র পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহার উন্নতিকল্পে তিনি কার্য্যতঃ বিশেষ যত্নবান এবং তাহার বর্ত্তমান অবনতির বিষয় আলোচনায় তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। গত ১৩০৭ সনের আষাঢ় মাসের "ভারতী"তে তাঁহার "ভারতে শিল্পশিক্ষা" নামক পুস্তিকার সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছিল। সে সময়ে মিষ্টার হাভেল্ মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া

---

* রবিবর্ম্মার অঙ্কিত।

বঙ্গদেশে নূতন আসিয়াছিলেন। সুখের বিষয় গত তিন বৎসরে বাঙ্গালার জল-হাওয়ায় তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সম্প্রতি বিলাতের "নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রে তিনি "ব্রিটিস বর্ব্বরতা এবং ভারতীয় শিল্প" শীর্ষক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজ আমরা সেই প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা করিব।

মিষ্টার হাভেল সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষাপদ্ধতিতে শিল্পের স্থান সম্বন্ধে গ্রীক মহাপুরুষ প্লেটোর অভিমত উদ্ধার করিয়াছেন। শিল্পের উপযোগীতা সম্বন্ধে প্লেটো বলেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য্যের অনুশীলনকে সোপানস্থানে উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করা শিল্পশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রথমে এক হইতে দুই বিষয়ের, দুই হইতে সমগ্র প্রকৃত আকৃতির, আকৃতি হইতে প্রকৃত কর্ম্মের, কর্ম্ম হইতে প্রকৃত অনুধাবনার, অনুধাবনা হইতে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের এবং সর্ব্বশেষে সার সৌন্দর্য্যের জ্ঞান লাভ হইবে।

শিল্পের এই সংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া মিষ্টার হাভেল বলেন, প্রকৃতির উপাসক প্রাচীন গ্রীকগণ প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃত উপযোগীতার মধ্যে যে নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং যে মহত্ত্বের গুণে মানুষ পশু অপেক্ষা উচ্চে, সৌন্দর্য্যানুশীলনকে তাহার এক অংশ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতেন। শিল্প, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যজ্ঞান, তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় ধর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল এবং তাঁহাদের চিন্তাশীল মনের পক্ষে একান্ত উপভোগ্য ছিল। শিল্পের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, জাতীয় এবং ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কারণ শিল্প হইতে নৈতিকজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইহা হইতে সত্ততা এবং ধৈর্য্যশিক্ষা হয়, কারণ তদ্ব্যতীত প্রকৃত শিল্পকার্য্য অসম্ভব। শিল্প হইতে ভক্তিশিক্ষা হয়, কারণ সৌন্দর্য্যের প্রতি ভক্তিই শিল্পের মূল; ইহা নিঃস্বার্থপরতা

শিক্ষা দেয়, কারণ অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহা হইতে আনন্দলাভ করা যায় না, বরং অন্যে ইহা হইতে আনন্দলাভ করিতে পারে। ইহা মনকে উন্নত করিয়া দেয় এবং নীচ, অপরিষ্কার এবং বিশ্রীর প্রতি বীতরাগ উৎপন্ন করে।

মিষ্টার হাভেল বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী উচ্চশিক্ষা গ্রীকদিগের ছাঁচে ঢালা। কিন্তু জাতীয় জীবনের উপর ইহার প্রভাবের বিচার করিতে গেলে কথা ও কার্য্যের পার্থক্য সহজেই অনুমিত হয়। উদাহরণ, যথা—সেক্সপীয়র অথবা মিল্টনের পুস্তকের প্রত্যেক কথা ও তাহার অর্থ একজন ভারতীয় ছাত্র সম্পূর্ণ মুখস্থ বলিতে পারিলেও তাহার পক্ষে কবির কাব্যোচ্ছ্বাসের উৎসানুসন্ধান-চেষ্টা যেরূপ বিফল, একজন ইংরাজ ছাত্র তাহার গ্রীক পুস্তকের বাক্যবিন্যাস, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইলেও, যে চিন্তা এবং ইচ্ছার বলে গ্রীকজাতি একদিন জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে, তদ্রূপ সম্পূর্ণ অক্ষম। বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা-প্রণালীতে প্রাচীন সাহিত্যানুশীলন একটু বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, প্রাচীন সাহিত্য প্রাচীনগণের যে চিন্তা, ইচ্ছা, ভাব শিল্পাদির পরিচয় দিতেছে, অধুনা সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ প্রদান না করিয়া মাত্র প্রাচীন ভাষা, তাহার ব্যাকরণ ও অর্থ আয়ত্ব করিতে সকল শক্তি প্রয়োগ করা হয়। যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া গ্রীকগণ তাঁহাদের সাহিত্য ও শিল্পরচনা করিয়া গিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সে ভাব ইউরোপে বহুপরিমাণে অনুভূত হইয়াছিল, এবং তাহার স্রোত ভারত, পারস্য, চীন ও জাপান প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। সে সময়ে লোকেরা গ্রীক-মনের আভাস পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে প্রাচীন সাহিত্যানুশীলন কেবল ছাত্রগণের লিখিবার ভঙ্গীর (style) সহায় হইবে বলিয়া বিদ্যালয়ের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। শিল্প বলিতে

প্রায় প্রত্যেক ইংরাজ, জলের রঙে অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিষয় বুঝিয়া থাকেন, এবং উক্ত বিষয়ে অল্পাধিক জ্ঞান লইয়া যে কোন শিল্প-বিষয়ে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না! তরুণ বয়সে ছাত্রগণ কেবল মাত্র বাহ্য-আকৃতির অনুশীলন করে, ভাব এবং উদ্দেশ্যের বিষয় চিন্তা করিতে শিখে না, পরিণত বয়সে তাহাদের একদেশদর্শীজ্ঞানের সাহায্যে গতানুগতিকত্বের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না। তাই আধুনিক শিল্পী এবং স্থপতি কেবল নকল করিয়াই ক্ষান্ত। গ্রীকগণের জীবন্ত শিল্প তাঁহাদের কর্ম্ম-জীবনে নিয়ম, সামঞ্জস্য, কৌশল এবং উপযোগীতার পূর্ণায়ত ভাব আনয়ন করিয়াছিল। প্রকৃতির রম্য ভবনেও তাহাই দৃষ্ট হয়। গ্রীকগণ শিল্পী ছিলেন, কারণ নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য তাঁহাদের নিকট নিরবচ্ছিন্ন সম্পূর্ণত্বরূপে গৃহীত হইত। বর্ত্তমানে মানুষের প্রকৃত কর্ম্মজীবনের অন্তর্ভুক্ত শিল্পের নিকৃষ্টতা এবং অসারতা সম্বন্ধে মিষ্টার হাভেল অতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অধুনা শিল্পশিক্ষা এবং শিল্পকার্য্যে আন্তরিকতা কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই উন্নতির প্রয়াসে মিষ্টার হাভেল বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে এই শিক্ষালাভ হইয়াছে যে, প্রাচীন গ্রীক অথবা রোমানগণ শিল্প সম্বন্ধে সমগ্র কর্ত্তব্য শেষ করিয়া যান নাই, সমগ্র পথে ভ্রমণ করিয়া যান নাই। শিল্প, সময় এবং মানবমনের নবাভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতনভাবে বিকশিত হইবে।

মিষ্টার হাভেল বলেন, ভারতবর্ষ কথা ও কাজের অনৈক্যের আর এক উদাহরণ স্থল। কারণ, ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার মূলমন্ত্র—গ্রীক আদর্শ—ভারতীয় জীবনে প্রয়োগ করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে এখনও সৌন্দর্য্যজ্ঞান মানুষের দৈনিক জীবনের পরিচালক। বিলাতী বিজাতীয়ত্বের বিপুল বন্যায় এখনও তাহা ধৌত

হইয়া যায় নাই। বোম্বাই এবং কলিকাতার রাজকীয় প্রাসাদমালা নেটীভের চক্ষের সম্মুখে প্রতিদিন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিলাতী কুদৃশ্যের স্তম্ভ-স্বরূপ দণ্ডায়মান। সহরের গলিপথে গিয়া দেখ, হয়ত একটি হিন্দুমন্দির অথবা মুসলমান মস্‌জিদ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। দেখিতে পাইবে হিন্দু অথবা মুসলমান শিল্পী প্রাচীন গথিক্ প্রণালী হইতে বহুবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে দেখিতে পাইবে, সে তাহার নিজশক্তি বহুপরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছে; সে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞানদ্বারা যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা "গথিক্" স্থাপত্যের সহিত যুক্ত হইয়া লোচন-লোভন আকার ধারণ করিয়াছে। সকল প্রকার জীবন্ত শিল্পের যাহা সার, সেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বিকাশ তাহার সৃষ্ট স্থাপত্যে দেখিতে পাইবে। সহর হইতে দূরে, বিদেশী শিল্পের কঠিন সীমার বাহিরে, গ্রাম্য শিল্পীর বংশানুক্রমিকতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রণীত এখনও যাহা দেখিতে পাইবে, তাহা বর্ত্তমান যুগের অসার কৃত্রিমতাকে নির্ব্বাক ধিক্কার প্রদান করিতেছে।

মিষ্টার হাভেলের মতে বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রদিগের কল্পনাবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন-বিষয়ে আদপেই মনোযোগ প্রদান করা হয় না। বিলাতী প্রণালী অনুসারে ছাত্রদিগকে পশুবৎ বিবেচনা করিয়া তাহাদের কল্পনাবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমনে রাখা হয়। অপরিষ্কার, বহুজনপূর্ণ সহরে ব্যারাক্ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কতকগুলি ছাত্র পুরিয়া দিলে কলেজ হইল! ছাত্রেরা তাহাদের নিজের মনের ভাব চলনসই ইংরাজীতে ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই, সেক্সপীয়ার এবং মিল্টনের কাব্যদ্বারা তাহাদের মস্তিষ্ক পূর্ণ করিলে, তাঁহাকে বলিতে হইবে শিক্ষা! পক্ষান্তরে ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ে লিপ্ত কতিপয় ব্যক্তি ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতির উপায়স্বরূপ একখানি উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, সে অনুসন্ধান আজও

শেষ হয় নাই, অথচ ভারতের নৈতিক আদর্শের আলোক জগৎকে বহুদিন আলোকিত রাখিয়াছে। প্লেটো ইহা ২৩ শতাব্দী পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন, পূর্ব্বপুরুষেরা ইহার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন এই জ্ঞানের আলোকেই বাহ্য-জগতের দ্বারা অনুশাসিত প্রাণিগণের অভ্যুদয় বিষয়ক সত্য দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন।

মিষ্টার হাভেল বলেন, "বিলাতে আমাদের ছাত্রদিগকে যেরূপে গ্রীক শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতেও ছাত্রদিগকে সেইরূপ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়।" কিন্তু ভারতে ও বিলাতে ইহার পৃথক ফল দৃষ্ট হয়। স্কুলে অথবা স্কুলপরিত্যাগের পরে বিলাতী ছাত্রের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য বহু উপায় আছে। ভারতীয় ছাত্রের কথা অন্যরূপ। স্কুল পরিত্যাগের পর কলেজে প্রবেশ করিয়াই সে এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে তাহার শিক্ষকও সময়ে সময়ে তাহাকে পরিচালন করিতে অক্ষম। অবশ্য এমন ছাত্র আছে যাহার পারিবারিক জীবন অনেকটা বিলাতী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সেরূপ ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ ছাত্রই স্কুল-গৃহের বাহিরে ইংরাজীর সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্নাবস্থায় বাস করে। তারপর বিলাতী ছাত্রের ন্যায় তাহারা কার্য্যকুশল এবং তৎপর নহে;* সুতরাং, তাহারা অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সম্যক পরিচালনা না করিয়া, আশুফলপ্রদ স্মৃতিশক্তির দ্বারস্থ হইয়াই ক্ষান্ত থাকে। আবর্জ্জনাপূর্ণ স্কুলগৃহে এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বাসায় বাস করিয়া এবং শিক্ষকের সহানুভূতিহীন পাঠনায় তাহারা একরূপ স্পন্দহীন জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; উচ্চ আশা এবং আকাঙ্ক্ষা, কোন গভর্ণমেণ্ট অথবা কোম্পানীর আফিসে কলের মত কলমচালনা পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখে মাত্র।

* এই সিদ্ধান্তে মিষ্টার হাভেল কিরূপে উপনীত হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক

শিক্ষাপ্রণালীতে যত দোষই থাকুক না কেন, বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করিয়া উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে যে অশেষ অন্তরায় আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব,—তবে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের বিস্তৃত আলোচনা করিলে তাহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। দোষের মধ্যে বলা যাইতে পারে যে, যে নীতি একবার অনুসৃত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার আর পরিবর্ত্তন নাই। ইহার কর্ম্মচারিগণের শিক্ষা এবং সক্ষমতাসম্বন্ধে মনোযোগ প্রদান করা হয় না। কিন্তু শিল্পশিক্ষার বিষয়ে ভবিষ্যতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই সকল আলোচনা হইবে না। আমরা একদিকে মহা সুযোগ হারাইতেছি, অন্যদিকে তাহার স্থলে নিতান্ত বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিতেছি। গথ্ এবং ভাণ্ডালগণ তদানীন্তন ইউরোপীয় শিল্প নষ্ট করিয়াছিল, *কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুনঃপ্রণয়ন করিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছিল।* কিন্তু বহুকালব্যাপী দাম্ভিকতা এবং অসার শিক্ষায় বিনষ্ট সৌন্দর্য্যজ্ঞানের ফলে, ইংরাজজাতি ভারতের আত্মোৎভূত শক্তি অতি নির্দ্দয়ভাবে বিনাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট শিল্পের প্রতি যে মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বহুকালের অনুষ্ঠিত অপকর্ম্মের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!

ভারতে চারিটি আর্টস্কুল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা আপন পথেই চলিয়াছে, এমন কি দুইটিতে ভারতীয় শিল্পের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও স্বীকৃত হয় না। একটি স্কুলে কয়েক বৎসর ধরিয়া কেবল আলুমিনিয়মের তৈজসপত্রই প্রস্তুত হইতেছে, এবং বিজ্ঞেরা মনোযোগের সহিত অনুসন্ধানও করিতেছেন যে, ব্যোমবিচরণ-যন্ত্রের পরীক্ষা ইত্যাদি আর্টস্কুলের কার্য্যের অন্তর্গত কি না? শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করা হয় বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত লক্ষ্যহীনভাবে বিতরিত হওয়ায় প্রকৃত শিল্পের উন্নতি না হইয়া আমেরিকা ও বিলাতী বাজারে বিক্রয়োপযোগী অপকৃষ্ট দ্রব্যের প্রণয়নে

উৎসাহ প্রদান করে। বহুঅর্থব্যয়ে যাদুঘরের জন্য বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পোষণের জন্য বহুঅর্থব্যয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতে উপযুক্ত দ্রব্য সঞ্চয়ের জন্য অনুরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে শিল্পজ্ঞানসম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর দরিদ্রতা প্রকাশিত হইতেছে। চারিটি আর্টস্কুল, অর্দ্ধডজন যাদুঘর এবং সাময়িক প্রদর্শনী-দ্বারা ত্রিশকোটী ভারতবাসীর রুচি কিরূপে শিক্ষিত হইবে? কর্ত্তৃপক্ষ যদি ভারতীয় শিল্পের প্রতি সম্যকরূপে মনোযোগ প্রদান করিতেন তবে বিলাতী ধরণে, এদেশে কৃত্রিম উপায়ে শিল্পে রুচি জন্মাইবার আবশ্যক হইত না। কারণ একথা যথার্থ যে, ইংরাজী ভাবাপন্ন সমাজের বাহিরে, ভারতবাসীর জীবনে, প্রাচীন গ্রীকদিগের ন্যায়, শিল্পজ্ঞান নিত্যভাবে অবস্থান করিতেছে। বিলাতে শিল্প একটী ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। আমোদ প্রদান করিবার নিমিত্ত অর্থশালী ব্যক্তিগণ শিল্পীকে আহ্বান করেন, সাংসারিক লোকেরা শিল্প হইতে দূরে থাকেন। ভারতবাসীর জীবনের সহিত শিল্প চিরসম্বদ্ধ,—তাহাদের স্কুল নাই, যাদুঘর নাই, রাজা ও প্রজার অন্তরে ইহা সমভাবে বিরাজিত। গ্রামের কুম্ভকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, তন্তুবায় ইহারা প্রত্যেকেই শিল্পী। তাহাদের ব্যবসায় তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। ইউরোপে যাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, ভারতে সেই শিল্পজ্ঞান জনসাধারণের মনে এখনও বিদ্যমান—শিক্ষা দিতে হইলে এই তাহার স্থান।

শিক্ষা-প্রণালীতে প্রাচীন আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য এই সুযোগের কি ব্যবহার করা হইয়াছে? উত্তরে লজ্জাবনত বদন হইয়া থাকিতে হইবে।

মিষ্টার হাভেল বলেন, শিল্পসম্বন্ধে স্থাপত্যই জাতীয় শিক্ষার মূল—ভারতে শাসনকর্ত্তারা তাহা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। গত পঞ্চাশ বৎসরে ইচ্ছা করিলে গভর্ণমেণ্ট, আর্টস্কুল, যাদুঘর ইত্যাদির

সৃষ্টি না করিয়া অনায়াসে ভারতীয় জাতীয় জীবনে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারিতেন এবং তৎসঙ্গে শিল্পেরও উন্নতি হইত। কিন্তু সুযোগ স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করা হইয়াছে। এ বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করা যাক্। গত কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপে স্থাপত্য এবং গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের মধ্যে একটা মিথ্যা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে; ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, স্থপতি গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে এবং গৃহ-নির্ম্মাতা স্থাপত্যে অপটু হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গৃহনির্ম্মাতা স্থপতির আদেশ-পালক মাত্র হইয়াছেন।

স্থপতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন কেবল গৃহনির্ম্মাণের কুৎসিতাংশ লুক্কায়িত রাখিতে অথবা নির্ম্মাণকার্য্যকে কোন অর্থহীন কল্পনাপ্রসূত ছাঁচে ঢালিতে। ক্রমে সৌন্দর্য্য প্রকাশের ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর স্থাপত্য প্রাচীন স্থাপত্যের অসরল অনুসরণের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান। ভারতে স্থাপত্য আজও জীবন্ত শিল্পরূপে অবস্থান করিতেছে, কারণ, এদেশে স্থাপত্যে এবং গৃহনির্ম্মাণে পার্থক্য নাই। ইউরোপের মধ্যযুগের ন্যায় এদেশে স্থপতি এবং প্রধান মিস্ত্রী একই ব্যক্তি। আকবর, জাহাঙ্গীর, সাহজাহানের সময়ের শিল্পিগণের বংশধরগণ আজও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসায় চালাইতেছে। তাহারা যদি সেকালের মত কিছু করিতে না পারে তবে সে দোষ ইংরাজের অদূরদর্শী নীতির। গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া বৃত্তির দ্বারা এই সকল শিল্পী দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইংরাজ তাহাদিগকে শিল্প-শিক্ষা দিতে চাহেন, যাহারা তাঁহাদিগকেই শিক্ষা দিতে পারে। তাহাদের শিল্প নষ্ট করিয়া তাহার স্থানে ইংরাজ বহুবিধ কুৎসিত বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ফারগুসন্ বলিয়াছেন, "স্থাপত্য ভারতে জীবন্ত শিল্প। ইউরোপে দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে প্রণালীতে

স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, ভারতে আজও সেইরূপই হইতেছে। এস্থানে শিল্প-শিক্ষার্থী কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিতে পায়। ইউরোপে বর্ত্তমান সময়ে সব বিগড়াইয়া গিয়াছে। সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া শিল্প-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহাতেই মাত্র সুফল ফলিবার আশা করা যায়, এ ধারণা অনেকেরই নাই।”

মিষ্টার হাভেল বলেন, বোম্বাই এবং কলিকাতায় যখন কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া হর্ম্ম্যমালা প্রস্তুত হইয়াছে, তখন দেশীয় শিল্পিগণকে যে কি পরিমাণে উৎসাহিত করা যাইতে পারিত তাহা ধারণারও অতীত! এই সকল নগরের সৌন্দর্য্য হইতে কি শিক্ষাই না লাভ হইত। ইংরাজী প্রথায় গৃহনির্ম্মাণে কি ভারতীয় সৌন্দর্য্যের স্থান নাই? জীবন্ত এবং মৃতশিল্পের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিবার মত শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা উহা অসম্ভব বিবেচনা করিবেন না। সজ্ঞানেই হউক অথবা অজ্ঞানেই হউক, নক্সা করিবার সময় আধুনিক ইউরোপীয় স্থপতি একটা প্রাচীন হর্ম্ম্যের আকৃতি তাঁহার মনের সম্মুখে সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখেন। সুতরাং, ফলে আমরা থিয়েটার-গৃহ গ্রীক-মন্দিরের মত, হাঁসপাতালের গৃহ গির্জ্জাঘরের মত, বাগানবাড়ী মধ্যযুগের দুর্গের মত দেখিতে পাই। কিন্তু সেকালের মিস্ত্রীগণ গৃহনির্ম্মাণকার্য্য শিক্ষা করিয়া যখন সেই সকল গৃহ নির্ম্মাণ করে, তখন তাহারা যে কার্য্যে যে গৃহ ব্যবহৃত হইবে, তাহারই উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল; তাহাদেরও অপেক্ষা প্রাচীন শিল্পিগণের কার্য্যের অনুসরণ করিতে বসে নাই। বর্ত্তমানে ভারতীয় স্থপতির প্রতিও ঠিক এই কথাই প্রযুজ্য। যে শিল্পিগণ মোগলরাজ্যের প্রাসাদ ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা যে আধুনিক জীবনের আবশ্যকীয় হাঁসপাতাল, পুলিসের থানা ও রেলের ষ্টেসন প্রস্তুত করিতে পারিত না, এরূপ

ধারণা করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অথবা, ইংরাজ যদি তাহাদিগকে শিক্ষা এবং উৎসাহ প্রদান করিতেন তবে তাহাদের বংশধরগণ যে আমাদের প্রয়োজন বুঝিতে পারিত না, এ কথারও কোন মূল্য নাই। কিন্তু পূর্ত্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থপতি নহেন। দেশী শিল্পীকে তাঁহারা মন্দির ও মস্‌জিদ নির্ম্মাতা বলিয়া তুচ্ছ করেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মোগল এবং অন্যান্য স্থপতির কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি ইংরাজই নষ্ট করিয়াছেন, অথবা নষ্ট হইতে দিয়াছেন।

কিন্তু স্থাপত্যের বিষয় সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীতে কোন্ স্থান অধিকার করে? মিষ্টার হাভেলের মতে, যতদিন না শিল্পশিক্ষার উন্নতি হয়, এবং যতদিন গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ ভারতীয় স্থাপত্যের বিনাশ-সাধনে তৎপর থাকিবেন, ততদিন সাধারণ শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি হইবে না। কারণ ভারতাভিজ্ঞ প্রত্যেকেই জ্ঞাত আছেন যে, গভর্ণমেণ্ট সাধারণের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেন। আজ বিলাতে যদি প্রাচীন মিশর অথবা বাবিলোনিয়ান স্থাপত্যের প্রতি গভর্ণমেণ্টের প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখা যাইত, তবে "রয়েল ইনিষ্টিটিউট্ অফ ব্রিটিস আরকিটেক্ট্‌স্" (Royal Institute of British Architects) তাঁহার সভ্যগণকে উক্ত বিষয়ে পারদর্শী করিতে, অথবা জনসাধারণে গভর্ণমেণ্টের অনুসরণ করিতে সম্মত হইতেন কি না সন্দেহ। ভারতে গভর্ণমেণ্টই নেতা। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে কুপার্সহিল কলেজের অনুসরণে বিলাতী স্থাপত্যই শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সকল বে-সরকারী স্থপতি আছেন, বাধ্য হইয়া তাঁহাদিকেও একই পথের পথিক হইতে হয়। সুতরাং স্থাপত্যের সহিত সম্বদ্ধ শিল্পিগণ তাহাদের স্বীয় ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত হয়। ক্ষোভের সহিত মিষ্টার হাভেল বলিতেছেন "এইরূপে আমরা ইউরোপীয় শিক্ষা এবং সভ্যতার নামে ভারতীয় জাতিগণের সৌন্দর্য্যজ্ঞান চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছি।"

শিল্পশিক্ষাবিষয়ে ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীকে উন্নতি করিতে কিসের আবশ্যক? গ্রীকমতবাদে বিশ্বাস করিলে, যে শিক্ষায় কল্পনাশক্তির বিকাশ নাই, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। প্রথমেই স্বীকার করিতে হইবে আমাদের চারিদিকে যাহা ঘিরিয়া রহিয়াছে, আমাদের মন এবং চরিত্রের উপর তাহা প্রভাব বিস্তার করে। মানবজীবনের মহত্ত্ব ও নীচত্ব তাহাদিগের স্বকীয় আচ্ছাদন হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় ছাত্রকে নিকৃষ্ট এবং কুৎসিত প্রভাবের মধ্যে রাখিয়া তাহাদিগের কাছে মহত্ত্বের আশা করা বৃথা। তাহারা পরের প্রতি এবং নিজের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিবে কিরূপে? ইটন স্কুলের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিয়া তথাকার ছাত্রদিগের যে বিপুল মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? ইটন, ইংলণ্ডের বহুস্কুলের মধ্যে একটি মাত্র। ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক স্কুলই স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইংরাজ যদি এই সকল বিবেচনা করিয়া কাজ করিতেন, তবে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মৃত্তিকায় প্রোথিত শিক্ষাঙ্কুর হইতে বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারিত। ভারতের স্কুল কলেজে সৌন্দর্য্য দূরে থাক, একটা চলনসই স্বাচ্ছন্দ্যও নাই! মিষ্টার হাভেল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলারের একটা বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি বলেন, স্কুলগুলিতে আলোর অভাব, যন্ত্রাদির অভাব, গৃহে প্রবেশ করিলে একটা হতাশভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মিষ্টার হাভেল বলেন, যে উক্ত ভাইসচেন্সেলারের মতের সহিত ঐক্যমত হইয়া তিনিও বলিতে চাহেন যে, ভারতীয় উচ্চ বিদ্যালয় বটবৃক্ষমূলেই স্থাপিত হওয়া উচিত। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান বটবৃক্ষমূলেই প্রচারিত হইত। ভারতের কোন প্রদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে স্কুল কলেজের বাহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আদপেই মনোযোগ নাই।

স্কুল কলেজের বাড়ীগুলির বিষয় আলোচনার যোগ্য। শিল্পকে ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা বিবেচনা করা হয়,—ইংরাজই তাঁহার বুদ্ধির দোষে এরূপ করিয়াছেন। ভারতে শিল্প, মহারাজা এবং ক্ষুদ্র প্রজার সমান আদরের ও সমান আবশ্যকীয়। ভারতীয় ছাত্রের চারিদিকে ইংরাজ বিলাতী শিল্পের নিতান্ত অপকৃষ্ট নমুনা রাখিয়া অতি অসঙ্গত কাজ করিতেছেন। ভারত-গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময় সময় ভারতীয় শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট চিত্রাবলী প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা কেবল গভর্ণমেণ্ট আফিসের আলমারী বোঝাই করিবার নিমিত্ত। সৌন্দর্য্যদর্শনে চক্ষুকে শিক্ষিত করিবার জন্য ঐ সকল চিত্রদ্বারা স্কুল ও কলেজ গৃহগুলি সজ্জিত করা উচিত। বিলাতী শিক্ষায় ভারতীয় ছাত্রের চক্ষু-কর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

সুসঙ্গতরূপে অঙ্কনকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য মিষ্টার হাভেল পরামর্শ দিতেছেন। উহাদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ এবং আকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দিবে। বিলাতে যে অর্থে শিল্পশিক্ষা গৃহীত হয়, অর্থাৎ অব্যবসায়ীর চিত্রবিদ্যা, সে অর্থ হইতে ভারতবাসীকে শত হস্ত দূরে থাকিতে হইবে। সাহিত্যে নভেল লেখা যেরূপ, শিল্পে চিত্রকার্য্যও সেইরূপ। যখন অঙ্কন বিষয়ে শিক্ষার্থীর হাত পাকিয়া আসিবে, তখন সে সামান্য নক্সা (design) আঁকিতে আরম্ভ করিবে। ভারতীয় ছাত্রের বিচিত্র নক্সা (ornamental design) অঙ্কনের একটা নিজস্ব শক্তি আছে। মিষ্টার হাভেল মাদ্রাজে এবং কলিকাতায় দেশীয় অঙ্কন-শিক্ষকগণকে সাধারণ নক্সা (elementary design) অঙ্কন করিতে শিখাইয়া অতি উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিষ্টার হাভেল বলেন যে, ভবিষ্যৎ-জীবনে ছাপার ফারম পূরণ করা অথবা প্রতিবাদ-বর্ণনা লিখিয়া দিন কাটাইতে হইলেও এ শিক্ষার উপকার যথেষ্ট আছে।

পরিশেষে মিষ্টার হাভেল বলিতেছেন, সৌন্দর্য্য কি তাহা জানা,

উপভোগ করা এবং তাহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা নিতান্ত ছেলেখেলা নহে। মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় সৌন্দর্য্য কি তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক জাতি বংশপরম্পরাক্রমে চেষ্টা করিয়াছে। এ চেষ্টা আমাদের জীবনকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার জন্য; যে নিয়ম সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণত্বের অভিব্যক্তিস্বরূপ মানবজীবনের সকল আশার আধার, যাহার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, এ চেষ্টা ইহজীবনে তাহারই অণুমাত্র জ্ঞানলাভের জন্য।

এরূপ নির্ভীকভাবে সত্যপ্রচারের জন্য কয়জন ইংরাজের সাহস আছে?

শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসু।

অদৃষ্ট।

(১)

প্রত্যূষ হ'তে সন্ধ্যা অবধি,—
শৈশব হ'তে মরণে,
তব বিচিত্র বিধানে বিশ্ব
লুণ্ঠিত তব চরণে!
বিশ্ববাসীরে বক্ষে তুলিয়া,
অদ্ভুতরূপে অট্ট হাসিয়া,
কভু স্নেহে প্রেমে শান্তি ভরিয়া
দিতেছে তা'দের জীবনে;
কভু নিরাশায় ডুবাইছ হায়,
নির্দ্দয় পাদ-পীড়নে!

(২)

একি অপূর্ব্ব উৎসাহ তব
ওগো দুর্দ্দম প্রণয়ি!
জগতের সনে একি খেলা তব
হে দুর্দ্দান্ত বিষয়ি!
তব অনন্ত ইচ্ছার সনে
বাঁধিয়া সবারে মায়া-বন্ধনে
তুচ্ছ করিছ হাসি-ক্রন্দনে—
তুমি অদম্য বিজয়ী!
ত্রিলোকে নিত্য অপ্রতিহত
তুমি দুর্দ্দম প্রণয়ী!

(৩)

কি মহান্ তব রুদ্র পিপাসা
অম্বরতল আবরি'
নিখিলের প্রতি গুহা কন্দরে
উঠিছে নিত্য শিহরি'!
ক্লান্ত জগৎ চরণে তোমার
বশ্যতা মানি' নুয়ে বার বার,—
শুষ্ক জীর্ণ হৃদয় তাহার
মরি'ছে গুমরি' গুমরি';
তবু তুমি তারে মুক্তি দিবে না,
চিত্তে রেখেছ আবরি'।

(৪)

মহা রহস্যে মগ্ন রহিয়া,
অজ্ঞাত তব করেতে
মৌন মহিমা রেখেছ ব্যাপিয়া,—
কি শুভ সিদ্ধি তরেতে?
আদি কি অন্ত তোমার কোথায়
কল্পনা তাহা খুঁজিয়া না পায়;
শুধু প্রাণ মোর—স্বপ্নের প্রায়—
বুঝেছে,-তোমারি বরেতে,—
অতীতের মাঝে আবদ্ধ সে যে
তব অজ্ঞাত করেতে!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

ভিল্‌সা বা বিদিশা।

গোয়ালিয়র রাজ্যে বেতয়া নদীর পূর্ব্বতটে ভিল্‌সা নগরী অবস্থিত। এই নগরী পূর্ব্বে উজ্জয়িনী হইতে ১৩০ মাইল এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র হইতে ১৯০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং ২৩ ডিগ্রি ৩০ মিনিট অক্ষাংশে এবং ৭৭ ডিগ্রি ৫০ মিনিট দ্রাঘিমার মধ্যে।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা পার হইলেই ভিল্‌সা। রামগিরি হইতে সহজ পথে কৈলাসে যাইতে হইলে বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা পার হইতে হইবে। বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা নদীর মধ্যে মেঘদূতে দশার্ণ জনপদ দৃষ্ট হয়।

রামায়ণে সীতান্বেষণ-প্রসঙ্গে দক্ষিণবর্ত্তী স্থানাদির বিবরণ মধ্যে এই দশার্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

সহস্র শিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতা যুতম্।
নর্ম্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরস নিষেবিতম্॥
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণ বেণীং মহানদীম্।
মেখলালুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণ নগরাণ্যপি॥

[রামায়ণ। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড
৪১ সর্গ ৮] ৯।

'ভিলসা' জন্মিবার বহুপূর্ব্বে রামায়ণের যুগে দশার্ণ নগরীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। দশার্ণের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্ব বড় জটিল, এই জটিলতা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া লওয়া অতীব দুষ্কর। টলেমী, "দশরেণ" নামে একটী স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, আর একজন প্রসিদ্ধ বিদেশীয় সাহেবের মতে "দশরেণ" ও "দশার্ণ" একই অভিন্ন স্থান। তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের মধ্যে দশার্ণের বা দশরেণের অবস্থিতি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পুরাণ মধ্যে 'দশার্ণ' নামে একটী নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এই নদী ভূপাল হইতে প্রবাহিত হইয়া বেতয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই নদীর বর্ত্তমান নাম 'দশান'।

দশ (দশসংখ্যক)+ঋণ (দুর্গ)=দশার্ণ, এই বুৎপত্তি ধরিয়া অধ্যাপক উইল্‌সন্ প্রভৃতি দশার্ণ-জনপদ ছত্রিশগড় বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন। ডাক্তার হল সাহেবের মতে দশার্ণ চান্দেরীর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। বস্তুতঃ, চান্দেরীর পূর্ব্বদিকে বেতয়া নদীর ও ভিল্‌সার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগই দশার্ণ নামে আখ্যাত করা অসঙ্গত নয়। এই দশার্ণ জনপদের রাজধানী 'বিদিশা', এবং সেই বিদিশাই বর্ত্তমান 'ভিলসা'। প্রাগুক্ত ঐতিহাসিকদিগের বহুপরিশ্রম ও যত্নপ্রসূত অনুসন্ধানে এইরূপ স্থির হইয়াছে।

বেতয়া বা বেত্রাবতীর তীরে 'ভিলসা' অবস্থিত। মেঘদূতোক্ত

'বিদিশা' বর্ণনকালে কালিদাস বেতয়া নদীকে তাৎকালিক বেত্রবতী বলিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সুতরাং বেত্রবতীর প্রাচীনত্বে সন্দিহান হইবার আশঙ্কা না থাকিতে পারে, তথাপি বেতয়া নদীর কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠকবর্গকে প্রদান করাও অন্যায় হইবে না, বরঞ্চ 'ভিলসা' ইতিহাসের উদ্ধারে সাতিশয় অনুকূল হইবে।

বরাহ পুরাণে লিখিত আছে,—

তত: কালেন মহতানদী বেত্রাবতীসুতা॥
মানুষং রূপমাস্থায় সালঙ্কারা মনোরমম্।
আজগামযতো রাজা তেপে পরমকং তপঃ॥

উক্ত পুরাণে আছে বেত্রাসুর মানুষরূপিণী বেত্রাবতীর উদরে জন্ম গ্রহণ করেন।

এই নদীর উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২৩° ১৪" দ্রাঘিমা ৭৭°. ২২" ভূপাল রাজ্যের মধ্য হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদী ভূপাল হইতে হোসঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ও সমান্তরাল ভাবে ২০ মাইল দক্ষিণে পূর্ব্ব দিকে বাহিত হইয়া সুজাপুরে উপনীত হইয়াছে। সেই স্থান উত্তরপূর্ব্বে প্রায় ত্রিংশাধিক মাইল যাইয়া গোয়ালিয়র রাজ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভিল্‌সা কূলে রাখিয়া ১১৫ মাইল চলিয়া গিয়া বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। বুন্দেলখণ্ডের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক পার্ব্বত্য রাজ্যে অপূর্ব্ব মোহিনী সুষমা বিকাশ করিয়া ১৯০ মাইল বহিয়া যাইয়া যমুনার সুনীল প্রবাহে আপনার প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া অবিরাম গতি হইতে বিশ্রাম লইয়াছে। বুন্দেলখণ্ডে নিসর্গপটস্থ সুদৃশ্য আলেখ্যবৎ বেত্রাবতী রমণীয়তায় পরিশোভিত। বর্ষার-প্লাবন প্লাবিত নদীর অপূর্ব্ব দৃশ্যে দর্শক মাত্রকেই চিত্তবিহ্বল হইয়া মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী তরঙ্গিনীর পূর্ব্বতটে প্রকৃতির মোহিনী

তুলিকা-বিনিঃসৃত জীবন্ত আলেখ্যবৎ ভিলসা নগরী আপন সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ রহিয়াছে।

'ভিলসা' ভারত ইতিহাসের অতীত-কীর্ত্তিস্থলীগুলির মধ্যে একটী—বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা-বিজড়িত হিন্দু মুসলমানের রণক্লান্ত অভিনয়ের একটী বিশিষ্ট স্থল। ভারতের পাঠানশাসন হইতে আকবরের সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনার সহিত এই নগরী অপূর্ব্বভাবে বিজড়িত। হিন্দুরাজলক্ষ্মীর সুপবিত্র কমলাসন এইখানে স্থাপিত হইয়াছিল—মোগল লক্ষ্মীর অসীম মণিরত্নখচিত আসন এখানে বিস্তৃত হইয়াছিল। আবার হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দুতে মুসলমানে, মুসলমানে মুসলমানে, মোগল পাঠানে এখানে রণকুরুক্ষেত্রের প্রবলানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। 'ভিলসা' পরম রমণীয় দশার্ণের রাজধানী, উজ্জয়িনীর রত্ন ভারতের কবির অনন্ত প্রসারিণী কল্পনা এখানে মন্দীভূত হইয়াছিল। অতীত গৌরবের চিহ্নমাত্র ব্যতীত এখন আর কিছু নাই—সে সুদূর-প্রসারিণী কল্পনাও নাই—সে বীরত্বহুঙ্কার নাই—হিন্দু-মুসলমানের বিবাদোদ্ভূত সে রণবহ্নি এখন নির্ব্বাপিত!

এই স্থানে এখনও একটী সুবিশাল দুর্গ আছে—দুর্গ অতি প্রাচীন কালে বিনির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয় না—মোগলশাসনের শেষভাগে কিংবা তৎপরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত। দুর্গটী প্রস্তরে বিনির্ম্মিত; চারি পার্শ্বে ঘেরিয়া একটী সুবিশাল প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর রহিয়াছে। প্রাচীরের স্থানে স্থানে চতুষ্কোণাকার অনেকগুলি গুম্বজ দৃষ্ট হয়। দুর্গের মধ্যভাগ সুবিস্তৃত, নানাবিধ কারুকার্য্যের ভগ্নাবশেষমালায় এখনও পরিশোভিত। এরূপ প্রবাদ আছে এই দুর্গটী অতি প্রাচীন কালে বাচস্পতিরাজকর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত। প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, পূর্ব্বে এই স্থানে একটী দুর্গ ছিল, কালক্রমে বহু আক্রমণ ও যুদ্ধের পর দুর্গটী ধ্বংসাবস্থায় উপস্থিত

হইলে মুসলমান রাজা ইহার পুনঃসংস্কার করাইয়া দেন। এইরূপ অনুমান ভিত্তিহীন নহে, কারণ উক্ত দুর্গটী দেখিলে আধুনিক কালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। দুর্গের বেষ্টনীস্বরূপ একটী প্রশস্ত খাত চারিদিক ঘেরিয়া রহিয়াছে।

ডাক্তার এফ, ই, হল ভিল্‌সার দুর্গে একখানি প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হন। এই প্রস্তরফলকাঙ্কিত কবিতাগুলির অর্দ্ধাংশ বিখণ্ডিত; হল সাহেব কবিতার কিয়দংশের এইরূপ সাবোদ্ধার করিয়াছেন

"+ + + শ্রিয়মপ্যপি নন্বাশ্রিতা নাহশ্রিতাহস্য
গেহং মে বেত্রবত্যা নিয়মিত জনতা ক্ষোভ মৎস্যাপজ্যস্রম।
তেজোমযাত্র চোচ্চৈর্বিততমিতি বিদিত্বাহদরেণাত্মতুল্যং
ভাইল্ল স্বামিনামা রবিরবতু ভুবঃ স্বামিনং কৃষ্ণরাজম্॥
চেদীশং সমরে বিজিত্য শবরং সংহৃত্য সিংহাহ্বয়ং
রাণামণ্ডল রোদপাস্থ বলিপো ভূম্যাং প্রতিষ্ঠাপ্যচ।
দেবং দ্রষ্টুমিহা গতো রচিত বাং স্তোত্রং পবিত্রং পরং
শ্রীমৎকৃষ্ণনৃপৈক মন্ত্রিপদভাক্ কৌণ্ডিল্য বাচস্পতিঃ॥"

*　　*　　*

ইহার ভাবার্থ এই—

"কৌণ্ডিল্য বাচস্পতি নামক জনৈক ব্যক্তি রাজা কৃষ্ণের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বেত্রবতী নদীতটে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি এক সময়ে চেদীশ্বরকে সমরে পরাভূত করিয়া ও তদীয় জনৈক সেনাপতিকে নিহত করিয়া রাণা ও রোদপাদি জনপদ অধিকারভুক্ত করেন। ইহার পর কৌণ্ডিল্য বাচস্পতি রাজা কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তিনি এই স্থানে আসিয়া স্বীয় প্রভু কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য ভাইল্ল স্বামীর স্তব করিয়াছিলেন।"

ভাইল্ল স্বামী, অর্থাৎ সূর্য্যদেব।

হল সাহেবের মতে ভা=দীপ্তি, ইল্ল=নিক্ষেপ করা, এই হইতে ভাইল্লপদ নিষ্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং যিনি দীপ্তি অর্থাৎ কিরণ নিক্ষেপ করেন তিনি সূর্য্য। এই ভাইল্ল শব্দ হইতে বিদিশা, ভিল্‌সা নামে রূপান্তরিত হইয়াছেন। এফ, ই, হল সাহেব বলেন, "এক সময়ে এই স্থানের লোক সূর্য্যপূজা করিত—সূর্য্যকে সৃষ্টিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া উপাসনা করিত। স্থানীয় নির্দ্দেশানুসারে সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ছিল 'ভাইল্ল'। এই ভাইল্ল শব্দের উত্তর স্বাম্যর্থসংজ্ঞা-জ্ঞাপক 'ঈশ' শব্দ যোগে "ভাইল্লেশ" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'ভাইল্লেশ' কালক্রমে 'ভিল্‌সা' নামে রূপান্তরিত হইয়াছে।"

প্রাচীনকালে ভিলসা যে একটী বৃহদায়তন ও পরাক্রমশালী রাজ্য ছিল ইতিহাসে ইহার ভূরি নিদর্শন নির্দ্দিষ্ট আছে। 'ভিল্‌সা'-রাজের বলবিক্রমের অনেক কথা শুনা যায়। ভিলসার অতীত গৌরবসূচক বহুকিম্বদন্তী আজিও বর্ত্তমান আছে। সেই সকল ঐতিহ্য ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে ভিলসার ইতিহাস-প্রসিদ্ধি-সম্বন্ধে এইরূপ জানিতে পারা যায়।

১১৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ অজয় পাল ভিলসার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সোমেশ্বর, রাজ্যের উন্নতিকল্পে ভিল্‌সা রাজ্যকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করেন। এতদসম্বন্ধে হল সাহেবের অনুসন্ধানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। তাঁহার আবিষ্কৃত এক ফলক লিপিতে লিখিত আছে,—"সংবৎ ১২২৯ বর্ষে বৈশাখ সুদি ৩ সোমে। অদ্যেহ শ্রীমদণ হিল পদাঙ্ক সমস্ত রাজাবলিবিরাজিত মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম মাহেশ্বর শ্রীঅজয়পাল দেব কল্যান বিজয় রাজ্যে তৎপাদ পদ্মোপজীবী মহামাত্য শ্রীসোমেশ্বরে। শ্রীশ্রী করণাদৌ সমস্ত মুদ্রা ব্যাপরন পরিপন্থয়তীত্যেবং কালে নিজ প্রতাপোপার্জ্জিত শ্রীভাইল্ল স্বামী মহা দ্বাদশক মণ্ডল প্রভুজ্য মানে।"

যাহা হউক ১২৩০ অব্দ পর্য্যন্ত ভিলসা হিন্দুরাজ-শাসনাধীনে সুখে ছিল। প্রাচীনকাল হইতে উক্ত অব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন রণযজ্ঞের আহুতি ভিলসা দর্শন করে নাই। তৎপরে ১২৩০ খৃষ্টাব্দে দিল্লিতে মুসলমান সম্রাট সামসুদ্দিন আলতামাস এই নগরীর খ্যাতিবাদ শ্রবণ করিয়া বিজয়ার্থ সমুৎসুক হয়েন। হিন্দু-মুসলমানে সেই খৃষ্টাব্দে ভীষণ যুদ্ধ হয়। আলতামাস ভিল্‌সা আপন রাজ্যান্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। কালক্রমে পাঠানের তেজোগর্ব্ব বিমলিন হইয়া আসিল। সম্রাট জেলালুদ্দিন ফিরোজের জনৈক সেনাপতি দিল্লির শাসনশৃঙ্খল হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া এইখানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ভিলসা আবার হিন্দুশাসনাধীন হয়। হিন্দুগণ তৎপরে ইহাকে মুসলমানকর হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। হিন্দুগণ ভারতে মোগলসাম্রাজ্য-সংস্থাপয়িতা বাবরের রাজত্ব-কালের শেষাংশ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৫২৮ খৃঃ অব্দের পর বাবরের পুত্র হুমায়ুনকর্ত্তৃক ভিলসা আবার মোগলকরকবলিত হয়। হুমায়ুন এইস্থান মোগলশাসন-বিভাগের অন্তর্গত করেন। অতঃপর শেরশাহকর্ত্তৃক হুমায়ুনের ভীষণ পরাজয়ের পর শেরশাহ এইস্থান আক্রমণ ও অধিকার করেন। তৎপরে হুমায়ুনের পুনঃ দিল্লিসাম্রাজ্যের ভারগ্রহণকালে ভিলসা পুনঃ মোগলঅধিকার ভুক্ত হয়।

এইপ্রকার সহস্র বিপৎপাতের পর নানাবিধ পরিবর্ত্তন ও অনুবর্ত্তনের পর ভিলসার ভাগ্যসূর্য্য দিল্লিপতি আকবর শাহের করতল গত হয়েন।

এই নগরের মধ্যে একটী সুবৃহৎ পিত্তলনির্ম্মিত কামান দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ যে, সম্রাট জাঁহাগীরের সময়ে উহা নির্ম্মিত হয়। এই কামান অতি সুগঠিত ও কারুকার্য্যে শোভিত।

আমাদের দেশে ভ্যালসা নামে যে তামাকের প্রচলন আছে তাহা এই ভিল্‌সা নগরীতে উৎপন্ন হয়। ভিল্‌সা হইতে ভ্যালসা হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

ব্রহ্মাবর্ত্তে।

আর্য্যের জীবনানন্দ পুণ্য স্রোতস্বতী!
শুভ্রধারে ব্রহ্মাবর্ত্ত-পথপ্রবাহিনী!
জ্ঞানময়ি, বেদধাত্রি! কহ সরস্বতি!
এ বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্রে কোথা একাকিনী
পুঞ্জীভূত বালুকার সুগভীর স্তরে
চির নিমজ্জিতা তুমি বিষণ্ণ অন্তরে?

তোমার শ্যামল তীরে প্রথম প্রভাতে
বিহঙ্গ কাকলি সহ ঋষি কণ্ঠধ্বনি
দেব সম্মোহনী বাণী সৃজিল ভারতে;
তুমিও গাহিলে গাথা, হে দেবনন্দিনি,
ছন্দে ছন্দে মহানন্দে তরঙ্গে উচ্ছসি।
গীতিভরা সেই ধারা কোথা গেল ভাসি?

তেজি সুরা (রৈবতীর প্রেমদিঠি মাখা),
সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে মরি স্বজন নিধনে,
বিরাগে তোমার নীরে প্রবেশিয়া একা,
সুনির্ম্মল, পূত, স্নিগ্ধ তব বারি পানে,
লভিলা অপার শান্তি দেব হলধর;
কোথা সে পবিত্র বারি শুভ্র মনোহর?

নিষ্ঠুর ঘোরীর সৈন্য আসিল যখন,
রোধিলে তাহার গতি খর স্রোত ধারে।
তোমারি কৃপায় দেবী বিজিত যবন
হইল ত না জানি। সহসা কোথারে
লুকাইলে তার পর সৌভাগ্যসঙ্গিনী,
উদিল ভারতে যবে আঁধার রজনী?

জ্ঞান শান্তি স্বাধীনতা সৌভাগ্য দায়িনী!
মরুভূমি এ ভারত তব তিরোধানে।
ঢাল গো আবার ঢাল মৃত সঞ্জীবনী—
তোমার অমৃত ধারা ভারত ভুবনে।
পুণ্যনীরে মরুক্ষেত্র করিয়া মন্থন
জাগাও ভারত প্রাণে নবীন জীবন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ভাগবতের গ্রন্থকার।

ভক্তিরস-প্রধান শ্রীমৎভাগবত ভক্ত-হিন্দুর প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ, বৈষ্ণবের পক্ষে ইহা ভক্তি ও বৈরাগ্যের পরমধন এবং তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণাধ্যাপকের পক্ষে ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতি পবিত্র ও প্রাচীন মহাপুরাণ। ভাষার লালিত্য, ভাবের গাঢ়তা, শব্দ-বিন্যাসের কারুকার্য্য, বর্ণনার মধুরতা, ষড়রসের প্রচুরতা, পারমার্থিক উপদেশের বহুলতা এবং আত্যন্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ের পরিপূর্ণতায়, শ্রীমৎভাগবত পৃথিবীর অতীব উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া সুপরিচিত।

"সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারংসারং সমুদ্ধৃতং
সর্ব্ববেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবত মিষ্যতে।
তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥"

সংস্কৃত হইতে প্রায় বত্রিশটি ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে, এবং জয়দেব, শ্রীগৌরাঙ্গ, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবকুলধুরন্ধরগণ এই মহাগ্রন্থের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি ভাবোদ্দীপক কবিতামালায় অনুপ্রাণিত হইয়া, অসংখ্যাসংখ্য শ্রুতি-সুখকরী গীতি [illegible] ইহা অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক বলিয়া প্র

"গ্রন্থোষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।"

(গরুড় পুরাণ।)

"অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মকং ভাগবতং"।

(বামন পুরাণ।)

এখনও শ্রীমৎভাগবতে আঠার হাজার শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সুখের বিষয় ধর্ম্ম-বিপ্লব এবং শাস্ত্র-বিপ্লবের ভীষণ উপদ্রবেও ইহার

ন্যূনাধিক্য ঘটে নাই, এবং কোথাও একটিও প্রক্ষিপ্ত বাক্য অদ্য পর্য্যন্ত ইহাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এতদুভয় দেশের পণ্ডিতবর্গের ইহাই একাভিমত। ফলতঃ, ভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, পুরাণ সংহিতা বা উপপুরাণ মধ্যে নাই, এইজন্য ইহা মহাপুরাণ বলিয়া প্রখ্যাত। পণ্ডিতেরা বলেন "বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা"—অর্থাৎ, ভাগবতের দ্বারা বিদ্বানের বিদ্যাবত্তার পরীক্ষা হয়।

এই মহাপ্রখ্যাত মহাপুরাণ কোন্ দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের অমর লেখনী হইতে বিনিঃসৃত, তৎসম্বন্ধে নানা সময়ে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। অতি পুরাকাল হইতে শুনা যাইতেছে, "শ্রীমৎভাগবত ব্যাসদেবের প্রণীত", কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে ২৯ জন ব্যাসের নাম পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রকৃত কোষমতে পঞ্চজন, শব্দরত্নাবলী মতে চারিজন, লীপাদ্রিভরত মতে দুইজন এবং সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ মতে ৬১ জন ব্যাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাতে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারা যায়, ব্যাস কাহারও নাম নহে, ইহা একটি উপাধি মাত্র। বি+অস=ব্যাস; যাঁহারা কোনও শাস্ত্রকে বিভক্ত করেন, তাঁহারাই ব্যাস; যিনি বেদকে বিভাগ করিয়াছেন, তিনি বেদব্যাস। ব্যাসশব্দের ইহাই সমীচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়, অনেক স্থানে এইরূপই অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সকল ব্যাসোপাধিক শাস্ত্রকারের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নই সর্ব্ববাদী-সম্মতবাক্যে শ্রীমৎভাগবতের গ্রন্থকার বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীনাথভট্ট নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমৎভাগবতকে ঋষি-প্রণীত নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে "দুর্জ্জনমুখমহাচপেটিকা" নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, কাশীনাথভট্টকৃত এই পুস্তক লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

গ্রন্থালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। তিনি আরও বলেন "একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং নাটোরের রাণীভবানীর পণ্ডিত-সভায় এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল।" তাহাতে রাণী ভবানীর পণ্ডিতেরা প্রথমতঃ ভাগবত বোপদেব প্রণীত বলিয়া মত প্রকাশ করেন, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা আলোচনায় স্ব স্ব ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভাষ্যপত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বেদব্যাস ঋষি প্রণীত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

তাহার পরে ইয়ুরোপে ধুয়া উঠিল, "শ্রীমদ্‌ভাগবত বোপদেব নামক এক ব্যক্তির দ্বারা বিরচিত হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস ঋষির প্রণীত নহে"। এই অপ্রামাণিক ও অর্থশূন্য অভিমত আজি পর্য্যন্তও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, সুতরাং ইহার একটা মীমাংসা হওয়া উচিত।

যাঁহারা বলেন, "শ্রীমদ্‌ভাগবত আধুনিক গ্রন্থ," তাঁহারা কেবল দুইটি মাত্র যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা এই—

১ম। পুরাণসমূহ অতি সরলভাবে রচিত হইয়াছে, কিন্তু ভাগবতের রচনা অতি প্রগাঢ়। সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে অর্থবোধ হওয়া দুষ্কর, সুতরাং ইহা আধুনিক।

২য়। অন্যান্য প্রাচীন পুরাণনিচয়ের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য খুব কম, সুতরাং ইহা আধুনিক।

যাহারা বলিয়া থাকেন, "শ্রীমৎভাগবত বোপদেব প্রণীত", তাঁহাদের নিকট হইতেও কেবল দুইটি মাত্র যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্যথা—

১। ভাগবতে বৈয়াকরণিক পারিপাট্যের প্রচুরতায় বুঝা যায়, ইহা কোনও বৈয়াকরণের প্রণীত।

২য়। বোপদেবের ব্যাকরণের ভাষার সহিত শ্রীমৎভাগবতের অনেক স্থলের ভাষার সাদৃশ্য থাকাতে, ইহাকে (শ্রীমদ্ভাগবতকে)

বোপদেব প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। পরন্তু তাহা বেদব্যাস ঋষি বিরচিত, তাহার কতকগুলি প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১। পরমবৈষ্ণব শ্রীমৎ স্বামী গৌড়পদ মোহান্ত তাঁহার বিরচিত "পরমার্থ বিবেকাবলী" নামক সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বহুস্থানে ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অন্যূন সার্দ্ধপঞ্চশত শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরমার্থ বিবেকাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আচার্য্য উইলসন, আচার্য্য ওয়েবর, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার প্রভৃতির মতে গৌড়পদস্বামী, শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং শঙ্করের মৃত্যুর প্রায় দুইশত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে গৌড়পদের জন্ম হইয়াছিল, তাহার আরও একটি প্রমাণ আছে। বৈদান্তিকেরা শাস্ত্রপাঠারম্ভকালে অদ্যাপি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের নামোল্লেখ করতঃ নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন। ঐ শ্লোকে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পরবর্ত্তী আচার্য্যদিগের নাম সমাযুক্ত আছে, তদ্যথা—

"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ ব্যাসং শুকং গৌড়পদমোহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্যশিষ্যং। শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য শিষ্যম্"। ইত্যাদি।

যখন গৌড়পদের গ্রন্থে ভাগবতের উল্লেখ আছে, তখন "শ্রীমৎভাগবত বোপদেব প্রণীত" কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

২। শঙ্করাচার্য্য বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত; শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ "বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য" এবং "চতুর্দ্দশমতবিবেক" গ্রন্থদ্বয়ে ভাগবত মহাপুরাণের উল্লেখ আছে, সুতরাং বোপদেবকে ভাগবতের গ্রন্থকার বলা নিতান্ত ভ্রান্ত মত।

৩। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অনেক পূর্ব্বে হনুমৎ আচার্য্য ও চিৎসুখ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা ভাগবতের টীকা করিয়া গিয়াছেন। "সিদ্ধান্ত দর্শন"কার লিখিয়াছেন—

বোপদেব কৃতত্বে চ বোপদেব পুরাভবৈঃ।
কথং টীকা কৃতা বৈ সুধীর্হনুমচ্চিৎসুখাদিভিঃ॥

অর্থাৎ—"যদি ভাগবত বোপদেবের কৃত হয়; তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা কি প্রকারে তাহার টীকা করিতে সমর্থ হইলেন?"

৪। ডাক্তার রামদাস সেন বলেন, "শ্রীমৎ রামানুজ আচার্য্যের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী"। সংস্কৃত "স্মৃতিকাল তরঙ্গ" গ্রন্থের মতেও রামানুজ বোপদেবের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। "ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশক" নামক সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরেতিহাস রাজা ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত। 'ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ,' 'রাজতরঙ্গিণী' হইতেও প্রাচীনতর, কারণ শেষোক্ত গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ উদ্ধৃত হইয়াছে; এই সকল গ্রন্থ বোপদেবের প্রাদুর্ভাবের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, এবং এই সকল গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৬। আমরা বোপদেব নামে তিন ব্যক্তির পরিচয় পাই। ইহাঁদের একজন ভিষক (বৈদ্য), একজন কবি এবং আর একজন বৈয়াকরণ। ইহাঁদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিকেই প্রতিবাদকারিগণ ভাগবতের গ্রন্থকার বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; সুতরাং, প্রথম দুই বোপের সহিত এই প্রবন্ধের সম্পর্ক নাই, তথাপি উহাঁদের মধ্যে একজন বৈদ্য এবং অপর জন যে কবি ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত প্রমাণ দিয়া পাঠককে পূর্ব্ব হইতেই নিঃসন্দিগ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। কারণ, বৈয়াকরণ বোপদেব পরাজিত হইয়া গেলে, প্রতিবাদকারীরা বলিতে পারেন, "তবে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত দুইজন বোপের মধ্যে আর কেহ ভাগবতের গ্রন্থকার"! বৈদ্য বোপদেব নিজে বলিয়াছেন, "আমি

ধনেশ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণ গুরুর শিষ্য এবং ভিষক (বৈদ্য) কেশবের পুত্র।" 'ধনেশ মিশ্র-শিষ্যেণ ভিষক কেশব-সূনুনা।'

কবি বোপদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে—"কাব্যকার বোপদেব-শ্চকারেদং বেদপদাস্পদম্।" আচার্য্য ওয়েবর, আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকর, প্রফেসর কোল্‌ব্রুক, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ডাক্তার রামদাস সেন, প্রোফেসর উইলসন প্রভৃতি বোপদেব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; ইহাঁদের কেহ কেহ বোপদেবকে ভাগবত-গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের অলোচ্য বোপদেব সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের নানাস্থানে প্রশংসা আছে, কিন্তু তিনি বৈয়াকরণ ও পণ্ডিত বলিয়াই সমধিক প্রখ্যাত ও প্রশংসিত।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় বোপদেবের বিচার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"হেমাদ্রিরপি স্বয়ং নৃপতিঃ যস্য সভাপণ্ডিতো মহামহোপাধ্যায়ঃ শ্রীবোপদেব আসীৎ, অনুমীয়তে পক্ষ বসুধরেন্দুমিতি শক সম্বৎসরে দ্বিত্রাদি বৎসর নূনাধিক্যেন সমজনিষ্ট।" শিরোমণি মহাশয়ের মতে বোপদেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং তিনি হেমাদ্রি নামক রাজার সভাসদ ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হেমাদ্রি নিজে রাজা বলিয়া কোথাও আত্মপরিচয় দেন নাই এবং তাঁহার প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "চতুর্বর্গ দানখণ্ড" গ্রন্থে তিনি বোপদেবের আদৌ উল্লেখ করেন নাই, এবং আপনাকে রাজা বলিয়াও পরিচয় দেন নাই। সংস্কৃতসাহিত্যের কোথাও হেমাদ্রি নামক নরপতির উল্লেখ নাই, কিন্তু হেমাদ্রি নামক "বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী রাজমন্ত্রী"র উল্লেখ আছে। হেমাদ্রি ও বোপদেব সমসাময়িক ও পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। বোপদেবকৃত "মুক্তাফল" গ্রন্থের টীকায় মন্ত্রিবর হেমাদ্রি, বোপদেবের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

যস্য ব্যাকরণে বরেণ্য ঘটনাঃ স্ফীতা প্রবন্ধ দশ,

প্রখ্যাতা নববৈদ্যকেথ তিথিনির্ধারার্থ মোকোদ্ভূতঃ।

অর্থাৎ "বোপদেবের ব্যাকরণের কীর্ত্তি অদ্ভুত, ব্যাকরণ বিষয়ে তিনি দশটি প্রবন্ধ (অধ্যায়) লিখিয়াছেন, বৈদ্যকগ্রন্থের উপর নয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং তিথিনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্রের রচনা করিয়াছেন *।"

৭। হেমাদ্রিদেব, "মুক্তাফল" গ্রন্থের টীকায় আরও লিখিয়াছেন—

"মহাপুরাণ বিষয়ে ত্রয় এব যস্য প্রবন্ধা,

বাণি শিরোমণেরিহগুণঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ।"

উপটীকাকার মহাশয় ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, "শ্রীমৎভাগবতরূপ মহাপুরাণ সম্বন্ধে যিনি তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই অন্তর্বাণি মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ কোন্ গুণ না অলৌকিক"? ইহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বোপদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ সম্বন্ধে তিনটি মাত্র প্রস্তাব (টীকা) লিখিয়াছিলেন, তিনি ভাগবত রচনা করেন নাই।

বোপদেব গোস্বামী স্বয়ং পণ্ডিতসমাজে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, "আমি ভাগবতের প্রণেতা নহি, আমি কেবল ভাগবতের টীকাকার বা ব্যাখ্যাকর্ত্তা মাত্র"। ভাগবতের সামান্য অংশের মাত্র টীকা করিয়া বোপদেব "হরিলীলাটীকা" নামক পুস্তিকা রচনা করেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

---

* এই শ্লোকে একই বোপদেব বৈয়াকরণ, বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা ও কবি বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। পূর্ব্বে তিনজন বোপদেবের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহারা তিনজন এই একের ত্রিধা মূর্ত্তি নহেন ত? আরো, আজ পর্য্যন্ত ভিষকগণ "কবিরাজ" নামেই পরিচিত হইতেছেন। অতএব কবি বোপদেব ভিষক্ ও বৈয়াকরণ যে হইতে পারেন তাহার বিপক্ষ প্রমাণ কিছু দেখা যায় না। ভাঃ সং।

"শ্রীমৎ ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রি-হেমাদ্রি তুষ্টয়ে॥"

অর্থাৎ "কেবল মন্ত্রিবর হেমাদ্রির পরিতুষ্টির জন্য আমি (পণ্ডিত) বোপদেব, শ্রীমৎভাগবতের কতকগুলি কঠিন স্কন্ধের অর্থাদি নিরূপণ জন্য "হরিলীলাটীকা" রচনা করিলাম।" কিন্তু বেদব্যাস নিজে শতাধিক স্থানে 'ভাগবতকার' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। আরও, ভাগবতের আদ্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসংশয়িতভাবে বুঝা যাইবে যে, উহা সংসারী পুরুষের (হেমাদ্রির বেতনভোগী বোপদেব) প্রণীত নহে, উহা যোগীন্দ্র ঋষির বিরচিত।

৮। বোপদেব প্রণীত মুগ্ধবোধের উনিশখানি টীকা-গ্রন্থ আছে। ইহাঁরা কেহই বোপদেবের জীবনচরিতে অথবা পাণ্ডিত্যের বিচারে বোপদেবকে ভাগবতকার বলেন নাই। আচার্য্য উইলসন্ ভাগবতের ৩১ খানি টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল প্রাচীন টীকার সর্ব্বত্র বেদব্যাস ভাগবতকার বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

৯। সমস্ত পুরাণ, উপপুরাণ এবং মনুর পরবর্ত্তী সংহিতাশাস্ত্রকারগণ বেদব্যাসকে ভাগবতকার বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মিতাক্ষরার টীকাকার এবং পুরুষোত্তম দেব, পুরাণ শব্দের আলোচনায় ভাগবতকে ঋষি প্রণীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

১০। ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ৫৪ খানি অতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং বর্ণুফ দেখাইয়াছেন যে, ৬৭ খানি প্রাচীন পুস্তকে ভাগবতের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-গ্রন্থকারগণ ভাগবতের উল্লেখ করিবার সময় ইহার বিরচক বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়াছেন, বোপদেবকে করেন নাই।

১১। যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ, বিষ্ণুপুরাণপ্রভৃতি সম্পূর্ণ কঠিন এবং

গম্ভীরার্থ, পদলালিত্য ও বিন্যাসপারিপাট্যসমাযুক্ত হইয়াও আর্ষ হয়, তাহা হইলে ভাগবত আর্ষ না হইবে কেন ? ভাগবত অনেক পুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং পরবর্ত্তী পুরাণগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য না থাকাই সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈয়াকরণিক পারিপাট্যের প্রচুরতা আছে বলিয়া ইহা বোপদেবের লেখনীপ্রসূত এরূপ সন্দেহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান বেদব্যাস যে, ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, তাহা কে বলিল ? আরও বোপদেবের ব্যাকরণের ও ভাগবতের ভাষা তুল্যরূপী বলা হইয়াছে, কিন্তু আমার মতে উহাদের ভাষায় কুত্রাপি সমত্ব লক্ষিত হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেব ও গরুড়পুরাণকার শ্রীমদ্ভাগবতকে "অপৌরুষেয়" বলিয়াছেন।

১২। আকবর বাদসাহের পণ্ডিতসভার প্রধান সভাসদ মৌলবী ফৈজী সাহেব সংস্কৃতভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি পারস্যভাষায় ভগবৎগীতা এবং রামায়ণের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। মৌলবী ফৈজী একজন 'পাকা' প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন, ইহাঁর অনেক অভিমত ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অভিমত হইতে সারগর্ভ ও মূল্যবান। ইনি ভাগবতসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুর এই শ্রীমৎভাগবত অতীব প্রাচীন পুস্তক, ইহা ঋষির প্রণীত। এই মহাপুরাণের ভাষা, ভাব ইত্যাদি ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ। ইহা ঋষি প্রণীত বলিয়া আমার বিশ্বাস। অনেক গ্রন্থানুসন্ধানেও ইহা জানিয়াছি।"

১৩। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত শ্রীমৎভাগবতের যতগুলি টীকা বা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে "ষট্‌সন্দর্ভ" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও নানা গুণে শ্রেষ্ঠতম। এরূপ মহাপ্রকাণ্ড এবং মহা অপূর্ব্ব গ্রন্থ পৃথিবীতে খুব কম আছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এরূপ টীকা-গ্রন্থ জগতের সাহিত্যে আর নাই, ইহা নিশ্চয়। এই মহা প্রকাণ্ড

গ্রন্থে পরমবৈষ্ণব শ্রীজীব গোস্বামী আচার্য্য মহোদয় যখনই ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই বেদব্যাসকে গ্রন্থকার বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ষট্‌সন্দর্ভকার লিখিয়াছেন, "আমি বিদ্যাবলে, জ্ঞানবলে, যোগবলে, গুরুকৃপাবলে, প্রত্যাদেশবলে, এবং ভগবানের অনুগ্রহে সুস্পষ্টভাবে জানিয়াছি, ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃকই এই সুমধুর মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বিরচিত হইয়াছে।" ইহার উপর আর তর্ক চলে না; আর একটি কথা কহিতে সাহস হয় না। "প্রবাদো বোপদেবীয়ো বন্ধ্যা পুত্রায় তেতরাং"—অর্থাৎ, ভাগবতকে বোপদেব প্রণীত বলা আর বন্ধ্যার পুত্র আছে বলা একই কথা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

রমাসুন্দরী।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

দুই পার্শ্বে বনজঙ্গল রাখিয়া নবগোপালের নৌকা শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন বর্ষার শেষ, নদীতে জল অধিক, নৌকা বেশ দ্রুতগতিই চলিতে লাগিল।

নৌকার পশ্চাৎভাগে, নৌকার অধিকারী আসানুল্লার কুটীর। তাহার স্ত্রী ও কন্যা সেই স্থানেই বাস করে। তাহা ছাড়া একটি ভাই ও দুইটি ভাইপোও আছে। সকলেই নৌচালন-বিদ্যায় পরিপক্ক—স্ত্রী ও কন্যাটি পর্য্যন্ত। কন্যাটির নাম ভোরা, তাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ, তাহার লগী ঠেলার কসরৎ দেখিয়া রমা একবারে বিমোহিত। সে নিজে লগী ঠেলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু লছমী কিছুতেই সম্মতি দিল না।

"লছমী, ভোরার হাত থেকে নগী নিয়ে আমি একটু ঠেলব ?"

"তুই কি নগী ঠেলতে জানিস ? এখুনি ঝুপ করে জলে পড়ে যাবি।"

"না লছমী, আমি কখ্‌খনো জলে পড়ব না। ঐ টুকু মেয়ে ও জলে পড়ছে না আর আমি জলে পড়ে যাব ?"

"ও জন্মে অবধি ঐ কায করছে।"

"তা হোক্, আমি একটু ঠেলি।"

"না খবরদার। দাদা বাবু রাগ করবেন।"

রমা নবগোপালের দিকে চাহিয়া বলিল—"হাঁগা,—রাগ করবে তুমি ?"

নবগোপাল হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ। এই দিকে এস,—আমি তোমাকে একটা জিনিষ দেখাই।"

রমা তখন ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর সহিত নৌকার অগ্রভাগে গমন করিল। ভোরা নগী ঠেলিতে ঠেলিতে এই ব্যাপার দেখিতেছিল। যদিও সে বাঙ্গালা বুঝে নাই, তথাপি ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। রমার অভিভাবকগণ রমাকে প্রার্থিত কর্ম্মে সুযোগ্য বিবেচনা করিলেন না দেখিয়া ভোরার মনে আত্মগরিমা উছলিয়া উঠিল ;—সে জোরে জোরে, দেহখানি অধিক নমিত করিয়া নগী ঠেলিতে লাগিল।

ধূলিপূর্ণ, কঙ্করময় পথে, অস্থিভগ্নকর টোঙ্গার গতির সহিত, অন্ধকার এ সুমসৃণ গতির কত প্রভেদ। নৌকার সম্মুখভাগে নবগোপাল ও রমা দুইজনে বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিতেছে। ভিতরে লছমী সুরাসারের চুল্লী জ্বালাইয়া চা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। ক্রমে রৌদ্র উঠিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ হইল বরামুলা গ্রামের শেষ কুটীর খানি পশ্চাতে

পড়িয়াছে। নদীর উভয় তীর অত্যন্ত নীচু। জলের অব্যবহিত পরেই একটু পথ ; এই পথ দিয়া মাল্লাগণ গুণ টানিয়া যায়। তাহার পর, কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন,—আগাছার জঙ্গল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র। ধান্য ও গোধূম বহুদূর অবধি সবুজবর্ণ বিস্তার করিয়াছে। গোধূমের ক্ষেত্র হইতে মাঝে মাঝে এক আধটা অহিফেণপুষ্প উঁকি দিয়া উঠিতেছে। তীরপথ কোথাও বা মৃদ্ভূমি, কোথাও বা প্রস্তরপূর্ণ। এক এক স্থানে একটু অল্প পাহাড়ের মত উঠিয়াছে। প্রস্তরের ফাটলে পাহাড়ী গোলাপের গাছ জন্মিয়াছে। গাছে দুই চারিটা নূতন ফুল,—বাসি ফুলগুলির অধিকাংশ পাপড়ি ঝরিয়া গিয়াছে,—বাতাসে একটা আধটা নৌকার কাছে উড়িয়া আসিতে লাগিল।

চা পান শেষ হইবার পরে, নৌকা জেরিমঞ্জে আসিয়া পৌঁছিল। এ স্থানটিতে নদীর জল অত্যন্ত পরিষ্কার,—স্ফটিকবৎ। তীরে ক্ষুদ্র পর্ব্বত। জলের নিম্নে নুড়িগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শব্দ করিয়া করিয়া তীরের নিকট যাইতেছে—আবার ফিরিয়া আসিতেছে। স্বচ্ছ জলতলে ঝাঁকে ঝাঁক মৎস্য সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সন্নিহিত একটি প্রস্তরচূড়ায় একটি মাছরাঙ্গা বসিয়াছিল, সে হঠাৎ জলে ছোঁ মারিয়া একটি মৎস্যকে ধরিয়া লইয়া গেল। সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে, নদীর জল কৃষ্ণবর্ণ; বহুসংখ্যক পক্ষী চরিতেছে। মাল্লাগণ বলিল উহার নাম টীল পক্ষী। বন্দুকে শিকার করা এক প্রকার অসম্ভব।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় নৌকা উলর হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঝীলম নদী উপর পাহাড় হইতে নামিয়া পূর্ব্বদিক হইতে এই হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে, আবার দক্ষিণ দিকে উলর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। উলরের বক্ষে স্থানে স্থানে ভাসমান বাগান দেখা গেল। এক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত, অথচ তাহা ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

তাহাতে তরমুজ, দেশী ও বিলাতী বেগুন ও অন্যান্য তরকারি ফলিয়াছে। এইরূপ একটি বৃহৎ বাগানে, বাগানীরা ডোঙ্গা করিয়া তরকারি তুলিতে আসিয়াছিল। রমা তাহাদের নিকট হইতে কিছু তরকারি কিনিয়া লইল। লছমী তখন মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করিতে ব্যস্ত ছিল। রমা বেগুন গুলি কুটিয়া দিল,—দেখিতে দেখিতে তাহা ভাজা হইয়া গেল।

যখন অপরাহ্ন কাল, নৌকা তখন উলর হইতে বাহির হইয়া আবার ঝীলম নদীর বক্ষে ভাসমান হইল। উপরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নদীর জল যেন নীল রঙের ছিল, এখন সে জল যে কাফিরঙ ধারণ করিল।

বিচিত্র শোভাশালী কাশ্মীরের উপত্যকাভূমি। দূরে দূরে তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতমালা। নিকটে শস্যক্ষেত্র, কিন্তু তাহা অসমতল ভূমি। এক এক স্থানে, তীরের অনতিদূরে, বহুসংখ্যক চেনার বৃক্ষ। বৃক্ষপত্রের অন্তরালে কোথাও বা একটি হিন্দুমন্দিরের চূড়া, কোথাও বা একটি মশজিদের উন্নতভাগ দেখা যায়। পাহাড়ী গোলাপের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। বুলবুল পক্ষীর গানও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। একটি নূতন রকমের মাছরাঙ্গা পাখী দেখা গেল, ইহা সাধারণ অপেক্ষা অনেক বড়, তাহার পক্ষ দুইটি নীল, বক্ষটি নেবু রঙ্গের। বুলবুলগণ উড়িয়া ছাদের নিকট বেড়াইতে লাগিল। নৌকার সম্মুখভাগে খাদ্যের ক্ষুদ্রাংশগুলি খুঁটিয়া খুটিয়া খাইতে লাগিল। ভোরা বলিল,—"একটি তামাসা দেখিবে? আমার হাতে কিছু খাবার দাও।"—হাতে খাবার লইয়া, ভোরা একটু দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইল; বুলবুলগণ আসিয়া তাহার গাত্রে বসিয়া তাহার হাত হইতে খাবার খাইতে লাগিল।

নানাস্থানে প্রাকৃতিক ফোয়ারা দেখা যায়। সন্ধ্যার সময় যেখানে নৌকা থামিল, সেখানে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারা আছে, তাহার নাম

বর্ণাগ। সান্ধ্যভোজন সমাপন করিবার নিমিত্ত এইখানে নৌকা লাগাইয়া নবগোপাল প্রভৃতি তীরে অবতরণ করিল। ফোয়ারা হইতে জল উঠিয়া যেখানে জমিবে, মোগল বাদশাহ তাহার চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব মর্ম্মর প্রস্তরের আধার গাঁথিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যার আলোকপাতে আধার-বেষ্টিত নির্ম্মল জলরাশি, বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গভীরতার তারতম্য অনুসারে, বর্ণ কোথাও উজ্জ্বল নীল, কোথাও বা চিক্কণ সবুজ।

ফোয়ারার অনতিদূরে অনেকগুলি ঝোপে পীতবর্ণ স্থলপদ্ম ফুটিয়াছে। রমা কয়েকটি পদ্ম উঠাইয়া সঙ্গে করিয়া নৌকায় লইয়া গেল। সারা রাত্রি নৌকা সেই স্থানে বাঁধা রহিল, পরদিন প্রত্যূষে আবার নৌকা ছাড়িল।

সমস্তদিন কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ দর্শন করিয়া কাটিল। সূর্য্য যখন অস্তগমনোন্মুখ, তখন নৌকা শ্রীনগরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে।

এখন নদীর উভয়তীরে আর আগাছার জঙ্গল নাই। তাহার স্থানে এখন বড় বড় ঘাস। ডোঙ্গায় করিয়া গ্রামবাসিনী কৃষকবধূরা ফলমূল প্রভৃতি লইয়া বিক্রয়ার্থ শ্রীনগর অভিমুখে চলিয়াছে।

শ্রীনগর আর অধিক দূরে নহে; প্রথমে পর্ব্বতোপরি একটি মন্দির-চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। ক্রমে অন্যান্য গৃহচূড়াও দেখা যাইতে লাগিল। সম্মুখে—নদীবক্ষে ছোট বড় বিস্তর নৌকা যাতায়াত করিতেছে। সেই নৌকাগুলির নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, কয়েকখানি দোকানী-নৌকা নবগোপালের নৌকার উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিল। নদীটি শ্রীনগরের প্রধান রাজপথ। প্রধান প্রধান দোকান পশারগুলি ঘাটের উপর উপর নির্ম্মিত। অনেকগুলি দোকান, নৌকাবাসী। এই দোকানগুলি বারমাস নৌকাতেই অবস্থিতি করে।—স্বস্ব নৌকা হইতে হিন্দু ও মুসলমান দোকানীগণ, একটি একটি পণ্যদ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়া,

যুগপৎ নবগোপালের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য চীৎকার করিল। অধিকাংশ দ্রব্যই কাশ্মীরি। রৌপ্য ও তাম্রনির্ম্মিত, সূক্ষ্ম কায করা বহুবিধ গৃহস্থালী পাত্র, হস্তিদন্তনির্ম্মিত অনেক সখের সামগ্রী, খদির কাষ্ঠখোদিত ছোট বড় গৃহসজ্জা—আরও অনেক দ্রব্য। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিলাতী দ্রব্যও আছে। তাহাদের সমস্বর বক্তৃতায় নবগোপাল প্রথমটা অপরিমেয় আমোদ অনুভব করিল। সকলকারই ধুয়া এক। সহরের ভিতর প্রবেশ করিলে যথার্থ ভাল দ্রব্য পাওয়া কিরূপ দুষ্কর হইবে, সহরের দোকানদারগণ কিরূপ প্রবঞ্চক, চোর ও ঠগ তাহাই সকলে তারস্বরে জ্ঞাপন করিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে নবগোপাল ব্যতিব্যস্ত হইয়া নৌকার অভ্যন্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাবু কিরূপ অদূরদর্শিতার কার্য্য করিলেন,—সহরে যখন ঐ সকল জিনিষ খরিদ করিবেন, তখন ধূর্ত্ত দোকানদারগণ তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে ঠকাইয়া লইবে, ইহাই কিয়ৎক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করিয়া একে একে তাহারা শিকারের উদ্দেশে গমন করিল।

ক্রমে নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক নৌকা চাউল, কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী ভরা। ক্ষুদ্র ডোঙ্গায় করিয়া নগরবাসীরা তাহা কিনিতে আসিয়াছে। তীরে ফল ও তরকারির দোকান। সেখানেও জনতা অত্যন্ত। কোথাও বা রক্তবস্ত্রপরিহিত স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ গৌরবর্ণ শিশুগুলিকে ধাবনতৎপর। মাঝে মাঝে এক একখানা ক্ষুদ্র নৌকা সবেগে ছুটিয়া আসে, তাহার মল্লাগণ দৃপ্তস্বরে চীৎকার করে "সাহিব কো"—অর্থাৎ ইহা সাহেবের নৌকা,—আর অমনি কালা আদমিগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়।

অবশেষে নবগোপালের নৌকা যখন সদরঘাটে পৌঁছিল তখন

সন্ধ্যা উপস্থিত। অগু রাত্রি নৌকাতেই যাপন করিতে হইবে। রমা সন্ধ্যার আলোকে সহর দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া, রমাকে লইয়া নবগোপাল তীরে অবতরণ করিল।

চতুর্স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

শ্রীনগর সহরটি তেমন জমকালো নহে,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও নহে, তথাপি দেখিতে সুন্দর। ভারতবর্ষের অপরাপর নগরীতে যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবের বিকাশ দেখা যায়, শ্রীনগরে সেরূপ নহে। শ্রীনগর দেখিতে যথার্থ "সেকেলে" তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি ভাল রাজপথের অভাব। বৃহৎ, অট্টালিকার সংখ্যাও অতি অল্প। গৃহগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাহার বহির্ভিত্তি চিত্রাঙ্কিত, জানালাগুলি কাঠের খোদাই করা কারুকার্য্যে মণ্ডিত।

অধিকাংশ গৃহই মোগলগণের আমলে নির্ম্মিত, অন্ততঃ সেইরূপ দেখায়। হিন্দুমন্দিরগুলি কাশীর মন্দিরেরই অনুকরণ, দুই একটি রৌপ্যপত্রে মণ্ডিত, দিবাসময়ে সূর্য্যালোকে ঝলমলায়মান। হিন্দুমন্দির অপেক্ষা মুসলমান-মশজিদের সংখ্যা অনেক অধিক। শ্রীনগর যদিও একটি হিন্দুরাজধানী, তথাপি অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অনেক অধিক। ইহা রাজপথে লোকসমাগমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। মশজিদের মধ্যে প্রধান শাহ হাম্মাদান। ইহা শ্রীনগরের একটি দ্রষ্টব্য পদার্থ। সমস্তটাই কাষ্ঠে নির্ম্মিত :—ভূমি হইতে সমচতুষ্কোণ হইয়া উঠিয়াছে, ক্রমে গোলাকৃতি, উচ্চে, চূড়ায় পর্য্যবষিত। ইহার কাষ্ঠের খোদাইকার্য্য বিদেশীর চক্ষুকে বিমোহিত করে। ইয়োরোপের অনেক মিউজিয়মে ইহার 'মডেল' রক্ষিত আছে।

কাষ্ঠখোদাই গৃহ, দুয়ার, জানালা শ্রীনগরের সর্ব্বত্র দেখা যায়। দেখিতে এই কাষ্ঠগৃহগুলি নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর। মনে হয় একটা

ঝাপটা বাতাস জোরে বহিলেই উল্টিয়া যাইবে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় ভূমিকম্পে অনেক প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, কিন্তু একখানিও কাষ্ঠগৃহ স্থানভ্রষ্ট হয় নাই।

শুধু নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানেই গৃহগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ। একটু দূরে বেশ ব্যবধানযুক্ত। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর মধ্যেই খানিকটা বাগান আছে। তাহাতে ফল, মূল, শাকপাতা যে যেখানে পাইয়াছে, সে সেইখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে—কিছুমাত্র শৃঙ্খলা নাই। আঙ্গুরের গুল্মগুলি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্বিত।

ইহাই শ্রীনগরের ছবি। ছবিখানি যেমনই হউক, ফ্রেমখানি অতুলনীয়। তাহা প্রকৃতির স্বহস্তের রচনা। চারি পার্শ্বের গিরিমালা অপূর্ব্ব বর্ণসম্পদে ভূষিত। দূরস্থিত গিরিগুলি তুষারাবৃত। উপত্যকা-ভূমি বন উপবনে আকীর্ণ; তাহার পার্শ্ব দিয়া, বক্ষ দিয়া, ক্ষুদ্র বৃহৎ গিরিনদী ছুটিয়া যাইতেছে।

নৌকায় রাত্রিযাপনের পর, প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিয়া একটু বেলা হইলে, নবগোপাল রাজবাটী অভিমুখে রওনা হইল। শ্রীনগরের জনাকীর্ণ রাজপথের পর রাজপথ অতিক্রম করিয়া, শেষে তাহার গাড়ী রাজবাটীর সদর ফটকে উপস্থিত হইল। সেখানে জানাইল সে ছোট দেওয়ান কুমার ধনঞ্জয় সিংহের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী। আর্দ্দালি তাহাকে লইয়া একটি সুসজ্জিত প্রতীক্ষাশালায় বসাইয়া কুমারজীকে সংবাদ দিতে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া, নবগোপালকে লইয়া প্রকোষ্ঠান্তরে উপস্থিত হইল। বলিল কুমারজী এখনি আসিবেন।

কয়েক মিনিট পরে কুমার ধনঞ্জয় সিংহ প্রবেশ করিয়া নবগোপালকে ইংরাজি ভাষায় শুভপ্রভাত জ্ঞাপন করিলেন। কুমারজী বলিষ্ঠ রাজপুত যুবা, চক্ষু হাস্যোজ্জ্বল। নবগোপালের নিকট উপবেশন করিয়া, উত্তম ইংরাজিতে তাহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

পথে কোনও কষ্ট হইয়াছে কিনা, শ্রীনগর কেমন লাগিতেছে প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া দেওয়ানজি বলিলেন—"কোথায় আছেন ?"

"এখন ত নৌকাতেই আছি।"

"হাউস্ বোট্ ?"

"না—ছোট নৌকা।"

"কোথায় আপনার থাকিবার ইচ্ছা ? এখানে অনেকে হাউস্ বোটে নদীর উপর বাস করেন। হাউস্ বোটে দুই তিনটি শয়নের কুঠারি থাকে,—কোন কোনটিতে ড্রয়িং রুম, লাইব্রেরি পর্য্যন্ত থাকে। রাজসরকার হইতে আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। যদি হাউস্ বোটে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সরকারী একখানি ভাল হাউস্ বোট্ আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারি। যদি উপরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একটা সরকারী বাঙ্গলাও ঠিক করিয়া দিতে পারি। আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় বলুন।"

নবগোপাল দেওয়ানজিকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল,—নদীতে অত্যন্ত গোলমাল, যদি একটু নিরিবিলিতে একটা বাঙ্গলা পায় তাহা হইলে তাহাই তাহার অধিক পছন্দ হইবে।

দেওয়ানজি এক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া আর্দ্দালির জন্য ঘণ্টা বাজাইলেন। আর্দ্দালি আসিলে, একজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

কর্ম্মচারী আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুন্সীবাগের বাঙ্গালাখালি আছে ?"

"আছে।"

"ভাল মেরামতে আছে ?"

"সম্প্রতি রেসিডেণ্ট্ সাহেবের বন্ধু তাহাতে এক সপ্তাহ বাস করিয়াছেন। ভাল মেরামতেই আছে।"

"উত্তম। তবে বাঙ্গলা মাষ্টার সাহেবের জন্য প্রস্তুত কর। ইহাঁর নৌকা সদরঘাটে আছে—ইহাঁর সঙ্গে যাইয়া সে নৌকা মুন্সীবাগের ঘাটে লইয়া, জিনিষ পত্র স্থানান্তরিত করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া কর্ম্মচারী প্রস্থান করিল।

তাহার পর দেওয়ানজি বালকটির কথা পাড়িলেন—যে বালকের শিক্ষার জন্য নবগোপাল নিযুক্ত হইয়াছে। বলিলেন, বালকটি মহারাজা সাহেবের ভাগিনেয়। তাহার মাতা বিধবা। পিতা বিস্তর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আপাততঃ মহারাজার তত্ত্বাবধানে আছে, সাবালক হইলে বালক তাহা প্রাপ্ত হইবে। বালকের নাম বলবন্ত সিংহ, বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। মৃগয়ার সখ তাহার অত্যন্ত প্রবল। এই বয়সেই সে অশ্বচালনা-বিদ্যায় পটুত্বলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার জন্য একটী ইংরাজ মাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আজিকালিকার দিনে ইংরাজিভাষা শিক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইংরাজ মাষ্টারের সহিত অধিক সংসর্গে বালক অত্যন্ত ইংরাজিভাবাপন্ন হইয়া উঠে, দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়,—সেই কারণে বালকের বিধবা মাতার অভিপ্রায় অনুসারে সুশিক্ষিত হিন্দু শিক্ষক নিযুক্ত করার পরামর্শ হইয়াছে। আরও বলিলেন—বালককে প্রভাতে দুই ঘণ্টা এবং অপরাহ্ণে এক ঘণ্টা পড়াইতে হইবে। ইংরাজি বহি ইতিমধ্যেই সে অনেকগুলি পড়িয়াছে। কিন্তু ইংরাজি বহি পড়ান অপেক্ষা ইংরাজিতে বাক্যালাপ করা এবং ইংরাজি আদব কায়দা শিখানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বালক, মৌলবীর নিকট পারস্যভাষা এবং পলোয়ানের নিকট ব্যায়ামবিদ্যাও শিক্ষা করিয়া থাকে। সপ্তাহে যে যে ঘণ্টা এই শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বাঁচাইয়া নবগোপাল যেন বালকের সহিত একযোগে তাহার সময়তালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া

লয়। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার অশ্বারোহণ অভ্যাস আছে কি?"

নবগোপাল বলিল—"আছে।"

"তবে অপরাহ্নের ঘণ্টা পুস্তকপাঠেই সর্ব্বদা ব্যয় না করিয়া, ইচ্ছামত মাঝে মাঝে বালককে অশ্বারোহণে লইয়া গেলে আমাদের অভিপ্রেত শিক্ষাপ্রণালীর অধিক সার্থকতা হইবার সম্ভাবনা।"

নবগোপাল আহ্লাদের সহিত ইহাতে সম্মতি জানাইয়া, বালককে দেখিতে চাহিল। দেওয়ানজি তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া পাঠগৃহে গমন করিলেন। সেখানে উপবেশন করিয়া, ভৃত্যদ্বারা বালককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বালক আসিল। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র হইলেও, দেখিতে দুই তিন বৎসরের বড়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ বলিষ্ঠ। দেশীয় মহার্ঘ পরিচ্ছেদে ভূষিত। কটিদেশে তরবারি লম্বমান। দেওয়ানজি বলিলেন—"বলবন্ত,—এই তোমার মাষ্টার সাহেব আসিয়াছেন।"

বলবন্ত আসিয়া সহাস্যমুখে নবগোপালের সহিত করমর্দ্দন করিল।

দেওয়ানজি বলিলেন—"ইহাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার পাঠের সময় স্থির করিয়া লও।" বলিয়া, উঠিয়া, তিনি নবগোপালের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, যাইবার সময় নবগোপাল যেন সেই কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া যায়, সে বাসস্থানের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

অপরাহ্নকালে নবগোপাল, রমা ও লক্ষ্মীকে লইয়া তাহার নূতন গৃহে প্রবেশ করিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কবি-প্রিয়া।

নহি আমি সুধামুখী নন্দন বিলাসী
অনিন্দ্য পূর্ণেন্দুপ্রভা সুন্দরী কল্পনা,
কিম্বা কবি, ক্লান্তিহরা চির শান্তিময়ী
তোমার কবিতা-সখী অনন্ত যৌবনা,
কেমনে কহিলে তবে জগতের মাঝে—
আমার রূপেতে হাসে শারদ শর্ব্বরী,
দশনে কলিকা কুন্দ, অধরে গোলাপ,
কপোলে তরুণ উষা দিবা বিভাবরী?
কি লজ্জা! জগতে তুমি করেছ প্রচার—
শুনিলে আমার কথা কুহরে কোকিল,
চরণ চুম্বিত নাকি আকুল অশোক,
হায় কি ভ্রান্তিতে তুমি ভরেছ অখিল!
হে কবি, কেমনে মুখ দেখাব ধরায়,
রাখ আবরিয়া তব মর্ম্মের ছায়ায়!

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ

———

আজিকার ভারতবর্ষ।

শেষ কথা।

ভারত-পর্য্যটক মেতঁ্যা স্বীয় গ্রন্থের উপসংহারে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

প্রাচীন গ্রীক্-রোমকদিগের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত, হিন্দু-জীবনের অনেকটা সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। উভয়েরই কার্য্যকলাপ ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট। পুরাকালে, গ্রীস্-রোম দেশে, লোক-সমাগম, বিচারাধিবেশন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, নগরাবরোধ, নাট্য-প্রয়োগ, পারিবারিক উৎসব—এমন কি, জীবনের যাহা কিছু গুরুতর কার্য্য (কি নিজের, কি সার্ব্বজনিক) সমস্তই কোন না কোন দেবতা কিম্বা মহাপুরুষের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইত। হিন্দু-জীবন ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, Schœmann-কৃত "গ্রীসীয় পুরাতত্ত্ব" অথবা Fustel-de-Coulanges-কৃত "প্রাচীন নগর" পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া দেখিতে হয়; কেননা, ঐ গ্রন্থদ্বয়ে অতীতের যে বর্ণনা আছে, তাহারই অনুরূপ বর্ত্তমান যেন আমরা ভারতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আবার সেই পুরাকালীন অবস্থার সঙ্গেসঙ্গে মহম্মদীয় ধর্ম্ম, রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাও, পৌর-সমাজ, কারিগর-শ্রেণীর কার্য্য-পদ্ধতি—এই সমস্ত ব্যাপার ও দৃশ্যে য়ুরোপীয় মধ্যযুগেরও কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মনে হয়, ২৮ কোটি মানবাত্মার নিবাসভূমি এই যে ভারতভূমি এখানে "হিরোডোটাসের" যুগ এবং Saint Louisর শতাব্দী যেন এক সঙ্গে একই সময়ে আবির্ভূত! এই মহাগোলযোগ ও একাকারের মধ্যে, ভারতের নিজস্ব ব্যবস্থাগুলি—বিশেষত বর্ণভেদ-পদ্ধতি—এবং আধুনিক য়ুরোপ হইতে আনীত আচার অনুষ্ঠানাদি একত্র সংমিশ্রিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারত-চিত্র যদি দেখ, তাহা হইলে দেখিবে, প্রবল কর্তৃপক্ষ ইংরেজ সর্ব্বোপরি অবস্থিত;—কিন্তু সংখ্যায় এত অল্প যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যেন উহারা "পিরামিড্"-এর চূড়ান্ত বিন্দুমাত্র, আর পিরামিডের তলদেশে ভারতবাসীরা অবস্থিত। ইংরেজই এই ভারতরূপ রাষ্ট্রিক দেহের উত্তমাঙ্গ। যে বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই বিরাট দেহটি পরিচালিত হইতেছে, উহা সেই উত্তমাঙ্গেই অবস্থিত।

ভারতে যাহা কিছু নব-প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সংস্কারের যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসমস্তই য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে সমাগত। "ব্রিটেনিকী-শান্তি"-স্থাপন, সুনীতি-বিরুদ্ধ নিষ্ঠুর আচার ব্যবহারাদি রহিত-করণ, স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসন, কৃষি-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, কল-চালিত শ্রমশিল্প, মুদ্রাযন্ত্র, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, দেশীয় লোকের রাজনৈতিক প্রতিবাদিতা,—এ সমস্তই য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত। ইংরাজ-শাসনের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য যে সকল পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য পরিবর্ত্তনগুলি নিতান্ত ক্ষীণভাবাপন্ন ও তেমন গভীর নহে। ভারতবর্ষ এখনও পর্য্যন্ত—এমন কি, উহার বহিস্তল টুকুও—সম্পূর্ণরূপে আধুনিকীকৃত হয় নাই; এতদিন পর্য্যন্ত, উহার গতি এমন একটী দিক্ লইয়াছিল, যে দিক্ দিয়া গেলে প্রাচীন ও মধ্যকাল যেন বর্ত্তমান কালে আসিয়া উদয় হয়। আর ভারত যে এখন বর্ত্তমানকে একটু-আধটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, আপনার বলিয়া বরণ করিতে শিখিয়াছে, সেও কিয়ৎ বৎসরাবধি মাত্র।

যাহা হউক, সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে, ভারত সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই সিপাহী-বিদ্রোহ, প্রাচীন রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার শেষ সমবেত চেষ্টা। এক্ষণে ভারত-শরীরে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য-প্রভাব অবাধে প্রবেশ করিতেছে; উহা একদিন তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ইহা যে ঘটিবে,

তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তবে, কি প্রকারে এই পুনর্গঠনের কার্য্য সংসাধিত হইবে, তাহাই এখন জিজ্ঞাস্য। এ সম্বন্ধে, আমাদের মধ্যে অনেকেই একটী ভ্রমে পতিত হয়েন;—সে ভ্রমটি ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থারূপ মরীচিকা হইতে উৎপন্ন। আমরা কল্পনা করিয়া থাকি, সেই পুনর্গঠনের বিরাট পরিবর্ত্তন পাশ্চাত্য-য়ুরোপের ন্যায় ভারতেও যেন দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। আর, এই মতটি আমাদের মনে আরও বদ্ধমূল হয় যখন মনে করি, ভারতের একদিকে যেমন শ্রম-শিল্পের প্রাচুর্য্য, মজুরীও অপেক্ষাকৃত কম, তেমনি আবার তাহার সেই তৈল সম্বল আছে, যাহা যন্ত্রাদির অন্ন, এবং সেই তুলার সংস্থান আছে, যাহা কল-জাত শ্রমশিল্পের প্রধান খাদ্য। এই মূল তথ্যটি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া আমরা এইরূপ অনুমান করি যে, নূতন নূতন শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লোকপুঞ্জ দুইটি বৃহৎ দলে বিভক্ত হইবে;—একদল বেতনভুক্; আর একদল, মূলধনী। আমাদের দেশে যেরূপ দেখা যায়, এই দুই দলের মধ্যে, কালক্রমে, বিরোধ উপস্থিত হইবেই হইবে। তখন, সমাজ-সমস্যা উপস্থিত হইতে আর বড় বিলম্ব হইবে না; ইহার পরেই, ভারতের আত্ম-চেতনা ক্রমশঃ উদ্বোধিত হইয়া, ভারতবাসী এত ঊর্দ্ধে উন্নীত হইবে যে, তখন পাশ্চাত্য আধুনিক মত ও সঙ্কল্প-সকল তাহাদের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিবে। মানববুদ্ধিক্ষেত্রে যুক্তির কখনই অভাব হয় না; আর, সুদূর ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোন প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করিলে, তাহা খণ্ডন করা সহজ নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে ভ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, কার্য্য-কারণের পারম্পর্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করায় সে ভ্রমটি উৎপন্ন হয় নাই; পরন্তু, সেই কার্য্য-কারণের ক্রিয়া সহসা থামিয়া যাইবে, এই যে বিশ্বাস ইহাই ভ্রমাত্মক। ফলতঃ, কারখানাদি সংস্থাপনের দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থার যে রূপান্তর সাধিত

হয়, যে রূপান্তরীকরণ-প্রক্রিয়ায় একটী কৃতবিদ্য নিম্নশ্রেণী সংগঠিত হয়, সেই প্রক্রিয়াটি ভারতে সবেমাত্র দেখা দিয়াছে ; এবং যে বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশ হইতে সামাজিক অধিকার সমর্থনের একটী সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রকরণী প্রসূত হয়, তাহার এখনও আরম্ভ হয় নাই।

বহুকাল হইতে ভারতবাসিগণ দুইটি অসমান বর্গে বিভক্ত। একদিকে রাজা-মহারাজা, বহুমূল্য-বস্ত্রাচ্ছাদিত হীরককাঞ্চন-ভূষিত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ; অপর দিকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, ক্ষুধিত ইতর লোক। এই বিভাগটি এত সুস্পষ্ট যে, কেবল উর্দ্ধভাগে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, ভারতবর্ষ কেবল বুঝি লক্ষ্মীরই বিলাস-ভূমি, আবার তলদেশে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, ভারতবর্ষ বুঝি ভীষণ দারিদ্র্যেরই লীলা-ক্ষেত্র। তথাপি, এই অবস্থার দরুন কোন বিদ্রোহাত্মক জন-সমুত্থান ঘটে নাই। তবে একথাও সত্য, যদি দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজাপুঞ্জের তীব্র অনুভূতি ও চেতনাশক্তি না থাকে, তাহা হইলে কেবল দুঃখ কষ্টের আতিশয্য হইতে বিপ্লবানল উদ্দীপিত হয় না। ভারতে অজ্ঞতার প্রাচীর, অদৃষ্ট-নির্ভরতার প্রাচীর চিরন্তন প্রথা ও বিশ্বাসের প্রাচীর এত দৃঢ় যে, পাশ্চাত্য দেশের সাম্যনীতি তাহাতে ঠেকিয়া প্রতিহত হয়।

ভারতে, সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, কৃতবিদ্য নিম্নতর শ্রেণীর উদ্যোগে,—স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, দেশীয় ভাষায় চালিত সম্বাদপত্রের সম্পাদক, প্রাদেশিক সভা ও রাষ্ট্রীয় মহাসভার বক্তা—ইহাদেরই উদ্যোগে, একটী রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই দলের উচ্চ স্পৃহা আছে, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রকরণী তেমন কিছুই নাই ; ইহারা কতকগুলি অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন উপায় উহাদের হস্তে নাই। কি স্বদেশীয় নিরক্ষর ইতর সাধারণের সহযোগিতা, কি

ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সদয় মনোযোগ—কার্য্যসিদ্ধির জন্য, এ-দুয়ের কোনটারই উপর উহারা নির্ভর করিতে পারে না।

কিন্তু কেন উহারা হতাশ হইতেছে? প্রভূত প্রযত্নে, দূর হইতে দূরতর প্রদেশে উত্তরোত্তর শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে উহা যেরূপ প্রবেশলাভ করিতেছে, তাহাতে নৈরাশ্যের কোন কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, সমস্ত ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে, রাক্ষণিকতা ও সাম্রাজ্যিকতার ভাব আপাততঃ জয়লাভ করিলেও উহা অনন্তকালস্থায়ী নহে।

বর্ত্তমান দেশীয় আন্দোলন যদি অকৃতকার্য্যও হয়, কংগ্রেস্ মহাসভা যদি বিলুপ্ত হয়, আন্দোলনের বর্ত্তমান আকারটীও যদি বিনষ্ট হয়—তাহাতেই বা কি? উহা শীঘ্রই আবার নূতন আকারে জন্মগ্রহণ করিবে। ভারতে, প্রতিবাদকারীর দল যেরূপ অধিকার প্রার্থনা করে, তাহার সহিত আমাদের অষ্টাবিংশ শতাব্দীর সাধারণ পৌর-বর্গের প্রার্থনার সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

বর্ত্তমান ভারতের মহাগোলযোগ ও একাকারের মধ্যে, এইরূপ* অতীতের ছায়া মধ্যে মধ্যে আসিয়া পড়ে।

* এই তুলনাটি আরও একটু অনুসরণ করিয়া, আধুনিক ভারতের ইংরেজ রাজপুরুষ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যারিসীয় রাজপুরুষ—এই উভয়ের মধ্যে নৈকট্য প্রদর্শিত হইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটানি, আল্সাস্, কর্সিকা প্রভৃতির অধিবাসিগণের মধ্যে প্যারিসীয় রাজপুরুষগণ, তাঁবু গাড়িয়া বাস করিতেন, এবং অধিবাসীবর্গকে অর্দ্ধ-বিদেশী ও সর্ব্বাংশেই আপনাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। এক সময়ে যখন ঐ সকল প্রজাবর্গ, স্বীয় অভিলাষাদি জানাইবার জন্য ও প্রচলিত শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করাইবার জন্য, রাজধানীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করে—সেই সময়ে প্যারিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ মনে করিয়াছিলেন, উহা সভ্যতার বিরুদ্ধে বর্ব্বরতার আক্রমণ। শ্রীযুক্ত টেনের কথা প্রমাণে, এই মতটি এখনও পর্য্যন্ত জগতে টিঁকিয়া আছে, বিশেষতঃ ফরাসী দেশের বাহিরে। দেখা যায়, ইংরাজ "সিভিলিয়ান" সম্প্রদায় এই মতের প্রতিপোষক। তাঁহাদেরই একজন—Sir Alfred Lyall, তাঁহার গ্রন্থে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সহিত এইরূপ সাদৃশ্য সূচনা করিয়াছেন। (২১৪ পৃষ্ঠা দেখ)—শ্রীমেষ্ঠ্যা।

ইতঃপূর্ব্বে যে প্রাচীন যুগ ও মধ্য যুগের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা ইংরাজেরা ভারতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ভারতবাসীর যে সকল আচার-ব্যবহারে, তাহাদের শাসনকার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না, তৎপ্রতি তাহারা উদাসীন; কিন্তু, দেশীয় সমাজের সামাজিক কর্ত্তৃত্ব যাহাতে বজায় থাকে, সে পক্ষে তাহাদের বিশেষ চিন্তা; কেননা, ভারতের সমাজপতিদের উপর অনেকাংশেই তাহাদের নির্ভর করিতে হয়; এবং বিপ্লবকারী ঔপনিবেশিকদিগকে যে সকল ভ্রমে ও "হাতড়ানোর" (Tâtonnements) দায়ে সচরাচর পতিত হইতে হয়, সে-সমস্ত ইংরাজকর্ত্তৃপক্ষ এই উপায়ে এড়াইয়া থাকেন।

এস্থলে দেশীয়েরাই উক্ত বিপ্লবের মুখপাত্র। তাঁহাদের ইচ্ছা, ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে, সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা, ভারতবর্ষে সমানীত হয়; রাজনৈতিক সমতা ও স্বাধীনতার নীতি, কার্য্যে পরিণত হয়; এবং যে পরীক্ষা সকলের পক্ষেই সমান, এইরূপ কোনও পরীক্ষা দিবার পর, জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই সরকারী কাজকর্ম্মের অধিকারী হয়।

অধিকার সমর্থনের এই প্রার্থনাগুলি, এত স্পষ্টরূপে য়ুরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত যে, যদি জাতিগত পার্থক্য ও বিদ্বেষবুদ্ধি মধ্যে আসিয়া সমস্ত সমস্যাটীকে আরও জটিল করিয়া না তুলিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের উদার সম্প্রদায়ের লোক ঐ প্রার্থনাগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিত সন্দেহ নাই।

এস্থলে মানবজাতির ভেদাভেদ লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, এইখানে শুধু একটি কথার উল্লেখ করিব: য়ুরোপের সকল দেশেই, একদল লোক আছে (যাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে) তাঁহাদের মতে, জাতিভেদে ও বর্ণভেদে বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কথা ধরিতে গেলে, ধীশক্তি-সম্বন্ধে ভারতবাসীরা কোন অংশেই য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা কম নহে; যদি তাহাদের চারিত্র্য-বল

অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া মনে হয়, সে হীনতাও বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর চাপেই ঘটিয়াছে। দেশের জলবায়ু-জনিত দুর্ব্বলতার কথা যদি ধর, জলবায়ুর ফল, কি দেশীয়, কি বিদেশীয়—উভয়েরই পক্ষে সমান অবসাদজনক।

এই রাজনৈতিক প্রতিবাদকার্য্য, শ্যামাঙ্গদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে,—এই কথা বলিয়া, কৃতবিদ্যদিগের প্রতিবাদকে বিধ্বস্ত করা যায় না; আবার, নিম্ন-শ্রেণীর লোকের দ্বারা ইহার অনুষ্ঠান হইতেছে, এ কথা বলিয়াও কেহ উহার গৌরব হ্রাস করিতে পারিবে না। আমাদের দেশেও নব্য-সংস্কারকদিগের বিরুদ্ধে এই সব কথাই পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

য়ুরোপীয় অধিকৃত দেশগুলির মধ্যে, দেশীয়দিগের প্রতিবাদ-বুদ্ধি জাগরিত হওয়াটা ইষ্টজনক না অনিষ্টজনক? যে যেরূপ মতের লোক, এ সম্বন্ধে তাহার নিকট হইতে সেই রূপই উত্তর পাওয়া যায়। রাক্ষণিক দলের লোকেরা ইহার একরূপ উত্তর দিবেন, লোকতন্ত্র-পক্ষপাতীরা ইহার আর এক উত্তর দিবেন। এক দলের বিশ্বাস, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দুইটি স্বতন্ত্র মূলসূত্র আছে; তন্মধ্যে একটি কর্ত্তৃজাতির সম্পর্কে প্রযুজ্য, অপরটী অধীনজাতির সম্পর্কে প্রযুজ্য। অতএব, এই মতের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ হইতে, উক্ত প্রশ্ন-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার উত্তর আসাই সম্ভব। এই সমস্যাটি রাজনৈতিক দর্শন-শাস্ত্রের অধিকার-ভুক্ত বিষয়; তাই, ইহার সবিস্তার ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিলাম। কেননা, আপাততঃ একটি সমাজের চিত্র প্রদর্শন করাই আমার মুখ্য অভিপ্রায়।

এস্থলে শুধু এইটুকুমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইব;—ভাল হউক, মন্দ হউক, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, দেশীয়দিগের রাজনৈতিক

প্রতিকূলতা, একসময় না একসময়ে প্রকটিত হইবেই—উহা অনিবার্য্য। প্রাচ্যদেশে পাশ্চাত্যশাসন, আর তদ্দেশীয় লোকের প্রতিকূলতাচরণ— এই উভয়ের মধ্যে, "এ-পীঠ ও-পীঠের" অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। এই প্রতিকূলতা-সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ সমীচীন, তাহা নির্দ্ধারণ করা, শুধু ইংলণ্ড ও ভারতের স্বার্থ নহে, এই সমস্যাটি সকল জাতিরই সম্মুখে, পরীক্ষার জন্য স্বতঃই উপস্থিত। ইহা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। মনে করা যাউক, আমাদের সমস্ত উপনিবেশের অর্থনৈতিক অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া একটা মহা সামাজিক আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়াছে; তখন এই রাজনৈতিক প্রতিবাদিতার দল, একটা অবলম্বন পাইয়া আরও প্রবল হইয়া উঠিবে। তাতে আবার, য়ুরোপীয় দল-বিশেষের অভিমত, এই আন্দোলনের অনুকূলে পরিব্যক্ত হইলে, য়ুরোপীয় কর্ত্তৃগণের পক্ষে তাহার প্রতিকার করা আরও দুরূহ হইয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষ এখনও সে চরম অবস্থায় উপনীত হয় নাই। এখন ভারতবাসীরা সবেমাত্র ইংরাজ-শাসনসম্বন্ধে একটা মতামত নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বর্ণমালার ইতিহাস।

(২)

দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বর্ণমালার ইতিহাস রচনা করিবার কল্পনা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ১৬৮৭-১৬৮৮ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইস্, শ্যামের রাজার নিকট ল্যালুবার নামক এক দূত প্রেরণ করেন। উক্ত দূত স্বদেশে প্রতিগমনকালে কাম্বোডিয় অক্ষরে লিখিত কতিপয় পালিগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। তদবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা ও অক্ষরের যথাযথ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমুৎসুক হন। তাহার পর পৃথিবীর নানা যুগের নানা বর্ণমালা আবিষ্কৃত হওয়ায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী উহাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে কতিপয় প্রধান লিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল :—

ফিনিসিয় উৎকীর্ণ লিপি।

(খৃঃ পূঃ ১০০০)।

মোয়াবাইট্ প্রস্তর—১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মরুসাগরের পূর্ব্বাংশে এই প্রস্তরের আবিষ্কার হয়। ইহাতে মোয়াবের রাজা মেষার উক্তি সমূহ ফিনিসিয় অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে। এই উৎকীর্ণ লিপি আন্দাজ খৃঃ পূঃ ৮৯০ অব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার সারমর্ম্ম এই :—

"আমি (মেষা) কেমোষ দেবের পূজার নিমিত্ত এই বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছি। কেমোষ আমাকে সর্ব্ব আপদ্ হইতে উদ্ধার

করিয়াছেন। ইজ্রেলের রাজা ওম্রি বহুকাল মোয়াব রাজ্য উৎপীড়িত করেন। তাঁহার পুত্রও মোয়াবে নানা উপদ্রব সংঘটন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হন। কেমোষ দেবের কোপই এই সকল উপদ্রবের কারণ। তিনিই পুনঃ সুপ্রসন্ন হইয়া এই সকল উপদ্রব দূরীভূত করিয়াছেন।

বেয়াল্ লিবানঁ—১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সাইপ্রস্ দ্বীপের কোন বণিকের নিকট একটী পীতল পাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ পাত্র কার্থেজ নিবাসী সিডোনীয় রাজ হিরামের কোন ভৃত্য বেয়াল্ লিবানঁ দেবকে অর্পণ করিয়াছিলেন। হিরাম সলোমনের সমসাময়িক অতএব খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক। সুতরাং এই বেয়াল লিবানঁ পাত্রের লিপি খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

নিম্রুডের সিংহ-মান—প্রাচীন আসীরিয় সাম্রাজ্যের নিম্রুড্ নামক স্থানে যে সিংহাকৃতি পরিমাপক যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, উহার উপরিভাগে কীলকিত ও ফিনিসিয় অক্ষরে লিখিত দুই প্রকার লিপি দৃষ্ট হয়। এই লিপি খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

সিলোম্ লিপি—এই লিপি ১৮৮০ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত হয়। কুমারী হ্রদ হইতে সিলোম্ হ্রদে জল আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রাচীন কালে ভূমধ্যে যে পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই লিপিতে দৃষ্ট হয়। এই লিপি খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা হিব্রু ভাষা ও ফিনিসিয় অক্ষরে লিখিত।

সিডোন্ লিপি—১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এই লিপি আবিষ্কৃত হয়। সিডোনের রাজা এষ্মুনেজার ও তদীয় জননীর

উদ্যোগে বেয়াল্-সিডোন্, অষ্টারোথ্ ও এষ্মুন্ দেবের উদ্দেশ্যে যে তিনটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এই লিপিতে বর্ণিত আছে। এষ্মুনেজার উক্ত তিনটী দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, ডোরা, জোপ্পা ও সারোন্ এই তিনটী দেশ যেন চিরকাল সিডোন্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। তিনি স্বনির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভে লিখিয়াছেন ঃ—"আমি চির-বিশ্রামের জন্য এই স্থানে শয়ন করিলাম। কোন রাজকীয় জাতি বা রাজপুরুষ যেন আমার এই স্তম্ভে কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত না করেন। আমি এই স্তম্ভের অভ্যন্তরে রত্নরাশি প্রোথিত করিয়া রাখি নাই। আমার দেহ যেন এই সমাধি-স্তম্ভ হইতে স্থানান্তরিত না হয়। আর এই স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপি যেন কেহ নষ্ট না করেন।"

আমি এস্থলে ফিনিসিয় ফলক-লিপি (বা উৎকীর্ণ লিপি) সমূহের কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিলাম। পশ্চিম এসিয়ায় এইরূপ আরও অনেক লিপির উদ্ধার হইয়াছে।

গ্রীক উৎকীর্ণ লিপি।

(খৃঃ পূঃ ৯০০)।

আবুসিম্বেল মূর্ত্তি—মীসরের আবুসিম্বেল নামক স্থানে একটী সুবৃহৎ গহ্বর-মন্দির বিদ্যমান আছে। সন্নিহিত পর্ব্বত কাটিয়া এই মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মন্দিরটী একটী বিজন অরণ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের পুরোভাগে মীসর-রাজ দ্বিতীয় রামিসেসের চারিটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আসীন আছে। ঐ মন্দিরের প্রাচীরে রামিসেস্ স্বীয় দিগ্বিজয় ও রাজত্বের প্রধান ঘটনাবলী লিখিয়া রাখিয়াছেন। আর এই চারিটী

মূর্ত্তির উপর জগতের বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিব্রাজক নানাবিধ অক্ষরে নানা স্মারক-চিহ্ন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীন স্মারক-চিহ্ন সমূহের মধ্যে ৬টী ফিনিসিয় অক্ষরে, ১৯টী গ্রীক অক্ষরে এবং ৩টী (সম্ভবতঃ) কেরিয় অক্ষরে লিখিত। এই মন্দির ও মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রাচীন মীসরীয় শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত এই চারিটী গগনস্পর্শিনী মূর্ত্তি অবলোকনপূর্ব্বক পরিব্রাজকগণ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া ঐ মূর্ত্তির উপর তাঁহাদের স্ব স্ব মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন:—"এ পর্য্যন্ত মানবকল্পনা ইহার অপেক্ষা মহত্তর ব্যাপারে প্রবেশলাভ করে নাই।" অপর কেহ লিখিয়াছেন:—"নায়েগেরা, নেপ্‌ল্‌স ও কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় এই দৃশ্য কখনই বিস্মৃত হইব না।" অন্যেরা লিখিয়াছেন:— "ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবেই বোধ হয় এই অপরিমেয় ও অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহা মানবশিল্পীর অসাধ্য; দেবগণই বোধ হয় দুর্ভেদ্য শৈলরাজিকে এই প্রকার সজীব শিল্পে পরিণত করিয়াছেন।" পরিব্রাজকগণ স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য এইরূপ নানা প্রশংসাবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের উপর প্রাচীন গ্রীক অক্ষরে লিখিত যে সকল মন্তব্য উৎকীর্ণ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটী সমধিক উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন গ্রীক সাম্মেতিকস্ নামক মীসর রাজের অধীনে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা স্বীয় আগমনবৃত্তান্ত তথায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের এই বৃত্তান্ত খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে পূর্ব্বোক্ত সাম্মেতিকসের রাজত্বকালে যবন গ্রীক অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তির উপর

আর আটটী গ্রীক মন্তব্য দৃষ্ট হয়, তাহাও বোধ হয় ঐ সাম্মেতিকসের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অবশিষ্ট দশটী গ্রীক মন্তব্য পরবর্ত্তী কোন সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

মাইলেটাসের সন্নিধানে কয়েক প্রকার উৎকীর্ণ গ্রীকলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী মাইলেটাসের দুরন্ত শাসনকর্ত্তা হিষ্টিয়াসের সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। যখন পারস্যরাজ দরায়ুস্ শকজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, হিষ্টিয়াস্ সেই সময়ে মাইলেটাসে রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব এই লিপিটী আন্দাজ খৃঃ পূঃ ৫২০ অব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল।

মাইটিলিনি নগরে প্রাপ্ত গ্রীক লিপি খৃঃ পূঃ ৪৭৯ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্লেটিয়ার যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া যখন গ্রীকগণ দেখিলেন পারসীক জাতি গ্রীসের অধীশ্বর হইতে পারিবে না, তখন তাঁহারা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ডেল্‌ফির আপোল্লো দেবকে যে অর্ঘ্য উপহার দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত এই মাইটিলিনি লিপিতে উৎকীর্ণ আছে।

সাইরাকিউজের রাজা প্রথম হিয়ারো কিউমি নামক স্থানে যে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক বিবরণ ওলিম্পিক লিপিতে খৃঃ পূঃ ৪৭৪ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

এইরূপ অনেক প্রাচীন গ্রীক লিপির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। নানা প্রমাণ দ্বারা এই সকল লিপির প্রকৃত বয়ঃক্রম নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর কয়েক প্রকার গ্রীক লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাদের সময় নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। থেরা (বর্ত্তমান সন্তোরিণ) দ্বীপে দুইটী প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র আছে। তাহাতে অন্যূন ২০ প্রকার প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে। উহাতে যে পাঁচটী গ্রীক লিপি ফিনিসিয় রীতিতে বামাবর্ত্তক্রমে লিখিত হইয়াছে, তাহাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। ঐ সকল লিপি আন্দাজ খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীতে প্রস্তুত

হইয়াছিল। এইরূপ মেলোস্, কোরিন্থ, আত্তিকা ইত্যাদি স্থানে নানা প্রকার প্রাচীন গ্রীক লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতীয় উৎকীর্ণ লিপি

(খৃঃ পূঃ ৩০০)।

পণ্ডিতগণের মতে ভারতে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার উৎকীর্ণ লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে অশোক-শাসন সমূহই সর্ব্বপ্রাচীন। অশোক অক্ষরে লিখিত ১৫টী প্রস্তর-শাসন, ১৭টী গহ্বর-শাসন ও ৮টী স্তম্ভ-শাসন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রস্তর-শাসন সমূহ নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত :—

(১) সাহাবাজগড়ী—পেশোয়ারের ৪০ মাইল পূর্ব্ব উত্তর পূর্ব্বে।
(২) খাল্‌সী—যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে।
(৩) গিরনার—কাথিওয়ারে জুনাগড়ের সন্নিধানে।
(৪) ধৌলি—কটকের ২০ মাইল দক্ষিণে।
(৫) জৌগদ—গঞ্জামের ১৮ মাইল পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে।
(৬) ধৌলি—(ইহার অপর নাম তোষলী-শাসন)।
(৭) জৌগদ—(ইহার অপর নাম সমাপা-শাসন)।
(৮) সহসরাম্—বারাণসীর ৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে।
(৯) রূপনাথ—জব্বলপুরের ৩৫ মাইল উত্তরে।
(১০) বৈরাট—জয়পুরের ৪৮ মাইল উত্তরে।
(১১) ঐ ঐ ঐ
(১২) খণ্ডগিরি—কটক জেলায়।
(১৩) দেওটেক—নাগপুরের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে।
(১৪) ম্যান্‌সেরা—পঞ্জাবের হাজারা জেলায়।

গহ্বর-শাসন সমূহ নিম্নলিখিত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

(১), (২), (৩) বরাবর—গয়ার ৫০ মাইল উত্তরে।

(৪), (৫), (৬) নাগার্জ্জুনী—গয়া হইতে ৫০ মাইল দূরে।

(৭—১৫) খণ্ডগিরি—কটক জেলায়।

(১৬—১৭) রামগড়—সিরগুজা রাজ্যে।

অশোক অক্ষরে লিখিত ১০টী স্তম্ভ-শাসন নিম্নলিখিত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) দীল্লি—ইহা শিবালিক প্রদেশ হইতে দীল্লিতে আনীত হইয়াছিল বলিয়া সচরাচর ইহাকে দীল্লি-শিবালিক-স্তম্ভ বলে।

(২) দীল্লি—ইহা ফিরোজ সাহ কর্ত্তৃক মিরাট হইতে দীল্লিতে আনীত হইয়াছিল বলিয়া দীল্লি-মিরাট-স্তম্ভ বলে। আজকাল ইহার নাম ফিরোজ সাহের লাট।

(৩) আলাহাবাদ।

(৪) লৌরিয়—ইহা পাটনার ৭০ মাইল উত্তরে। ইহার সন্নিকটে অররাজ মহাদেবের মন্দির অবস্থিত বলিয়া ইহাকে লৌরিয়-অররাজ স্তম্ভ বলে।

(৫) লৌরিয়—ইহা বেতিয়ার ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে নবন্দগড় দুর্গ অবস্থিত। এই হেতু ইহাকে লৌরিয়-নবন্দগড় স্তম্ভ বলে।

(৬-৭) দীল্লি।

(৮) আলাহাবাদ।

(৯) আলাহাবাদ—ইহাকে কৌশাম্বী স্তম্ভও বলা যায়, কারণ এই শাসন কৌশাম্বী রাজের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল।

(১০) শাঞ্চী—ভিল্‌সার সন্নিহিত।

উল্লিখিত শাসন সমূহ অবশ্য একই বৎসরে প্রস্তুত হয় নাই। প্রাচীনতম প্রস্তর-শাসন খৃঃ পূঃ ২৫১ অব্দে, গহ্বর-শাসন

খৃঃ পূঃ ২৪২ অব্দে এবং স্তম্ভ-শাসন খৃঃ পূঃ ২৩৪ অব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। খাল্সী, দেওটেক প্রভৃতি প্রস্তর-শাসন সমূহে অশোক যবনরাজ অন্তিয়োক, এবং তুরময়, অন্তিকিনি, মক ও অলীকসন্দর এই পাঁচজন তদীয় সমসাময়িক নরপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানে জানা যায় সীরিয়ার রাজা দ্বিতীয় অন্তিওকস্ খৃঃ পূঃ ২৬৩-২৪৬, মীসর-রাজ টলেমি খৃঃ পূঃ ২৮৫-২৪৬, মাসিদনের রাজা অন্তিগোণস্ খৃঃ পূঃ ২৭৬-২৪৩, সাইরেণী রাজা মগস্ খৃঃ পূঃ ২৫৮ এবং এপিরসের রাজা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ২৫৮-২৫৩ অব্দে রাজত্ব করিতেন। অতএব ইহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যায় অশোক-শাসনে উল্লিখিত অন্তিয়োক, তুরময়, অন্তিকিনি, মক ও অলীকসন্দর এই পাঁচ জন নৃপতি ও অন্তিওকস্, টলেমি, অন্তিগোণস্, মগস্ ও আলেকজাণ্ডার এই পাঁচ রাজা যথাক্রমে পরস্পর অভিন্ন। অশোক স্বয়ং সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২৬০-২২৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে অধিরূঢ় ছিলেন।

অশোকের সময়ের পূর্ব্বের কোন প্রস্তর বা তাম্র-ফলক ভারতের কোন স্থানে ভূমধ্যে নিহিত আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের রয়েল্ এসিয়াটিক সোসাইটী India Exploration Society নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও জগতের সকল সভ্য জাতি ও নৃপতিবৃন্দের সহকারিতায় সংপ্রতি তক্ষশিলা, কুরুক্ষেত্র, গিরিব্রজ, কপিলবস্তু প্রভৃতি স্থান সকল খনন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

উপরে যে সকল উৎকীর্ণ লিপির পরিচয় প্রদান করা হইল, তাহা ব্যতীত ও অনেক ভিন্নাকৃতি লিপি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। ঐ সকল লিপির মধ্য হইতে কয়েকটীর কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মীসরের মৌর্ত্তিক অক্ষর।

(খৃঃ পূঃ ৪৭০০)।

মৌর্ত্তিক অক্ষর সমূহ আমাদের বর্ত্তমান অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহা বস্তু-বিশেষের আকৃতি সাদৃশ্যে প্রস্তুত হইত। মীসরের পুরাতন স্তম্ভসমূহ দেখিয়া উহাতে অক্ষর লিখিত আছে কিংবা পশুপক্ষীর প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে, তাহা আপাততঃ বুঝিতে পারা যায় না। এই মৌর্ত্তিক অক্ষরসমূহ অতিপ্রাচীন। খৃঃ পূঃ ১৬০০ অব্দে ১৯শ বংশের রাজত্ব কালে মীসরে এই প্রকার লিপি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতে ঐ অক্ষর মীসরে প্রচলিত ছিল। আমরা যদি ঐ সময় হইতে ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করি তাহা হইলেও দেখিতে পাই ৪র্থ বংশের রাজত্ব কালে খৃঃ পূঃ ৪২০০ অব্দেও পীরামিড সমূহের উপর মৌর্ত্তিক অক্ষর উৎকীর্ণ হইত। আমরা যদি তাহা হইতে আরও ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস অন্বেষণ করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই, সেই প্রাচীন যুগেও (খৃঃ পূঃ ৪৭০০ অব্দে) মীসরীয় স্তম্ভসমূহ মৌর্ত্তিক অক্ষরে সমুৎকীর্ণ। এই যুগের মৌর্ত্তিক অক্ষর আজ পর্য্যন্তও বিদ্যমান আছে। মীসরের দ্বিতীয় বংশীয় রাজা সেন্ত, তাঁহার প্রপৌত্র শেরের স্মরণার্থে, খৃঃ পূঃ ৪৭০০ অব্দে যে মৌর্ত্তিক অক্ষরসমূহ স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন ইংলণ্ডের অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আস্‌মোলিয়ান্ মিউজিয়মে আনীত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত লিপি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এইটী প্রাচীনতম। Egypt Exploration Society নামক সমিতির অধ্যবসায়ে অধুনা ইহা অপেক্ষাও দুই একটী প্রাচীনতর লিপি আবিষ্কৃত হইতেছে

ব্যাবিলনের কীলকিতাক্ষর।

(খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ)।

এক্কেডিয় নামক ক্যাল্‌ডিয়ার প্রাচীন তুরাণীয় অধিবাসিগণ কীলকিতাক্ষরের প্রথম স্রষ্টা। তাঁহাদের নিকট হইতে ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার সেমিটীক জাতিসমূহ এই অক্ষর শিক্ষা করে। ক্রমে এই সেমিটীক কীলকিতাক্ষরকেই মিডীয় ও পারসীক জাতিগণ রৈখিক অক্ষরে পরিণত করিয়াছিলেন। মুঘীর, বর্ক, সেনকেরে প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক প্রাচীন ব্যাবিলোনিয় কীলকিতাক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অক্ষর কোমল ও গাঢ় কর্দ্দমের উপর প্রথমতঃ অঙ্কিত হইত। উহাদের আকৃতি নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুবিশেষের আকারের ন্যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অক্ষর গুলি বাণ বা দণ্ডায়মান রেখার ন্যায় দৃষ্ট হয়। উর রাজ্যের রাজা লিগ্‌বগসের বাক্যাবলী অনুমান খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

চীনের চিত্রিতাক্ষর।

(খৃঃ পূঃ ২৭০০)।

চীনলিপি সমূহ এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষরের আকার ধারণ করে নাই। উহা কতকগুলি বস্তুর প্রতিকৃতি মাত্র। সাঙ্‌ বংশের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ কতিপয় লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার অনেক পূর্ব্বেও কয়েক শ্রেণীর উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। প্রাচীন ও আধুনিক অক্ষরসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় উহারা সর্ব্বপ্রথমে বস্তুচিত্র হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে চীনলিপির নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়ায়, কোন্‌ বস্তুর সাদৃশ্যে কোন্‌ অক্ষর সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু মূলতঃ উহারা এক একটী বস্তুর প্রতিকৃতি মাত্র ছিল, আর চীন ভাষায় অক্ষর

ও শব্দে কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যেক অক্ষরই এক একটী শব্দ। শব্দগুলি আর কিছুই নহে, কেবল বস্তুবিশেষের নামমাত্র। সুতরাং অক্ষরসমূহ পরম্পরাক্রমে বস্তুর নামমাত্র। উহাদের আকার ঐ সকল বস্তুর আকৃতি সাদৃশ্যে কল্পিত হইয়াছিল।

ভারতের বৈজ্ঞানিক অক্ষর।

(খৃঃ পূঃ ৯০০)।

—ভারতে লিপিকৌশল কোন্ সময়ে সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে উহার ঊর্দ্ধসীমা খৃঃ পূঃ ৯০০। কেহ কেহ বলেন ভারতীয় অক্ষর ভারতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন উহা দ্রাবিড় প্রদেশীয় আদিম জাতির উদ্ভাবিত। কানিংহাম বলেন ভারতীয় আর্য্যগণ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অন্যান্য বস্তুর সাদৃশ্যে ভারতীয় অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অক্ষরের ব্যবহার বিষয়ে তাঁহারা কোন জাতির নিকট ঋণী নহেন। কিন্তু সুনিপুণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মতের সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন, বিদেশীয় অক্ষরের অনুকরণে ভারতে অক্ষরের প্রচলন হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে প্রধান যুক্তিগুলি নিয়ে লিখিত হইল:—

১। জগতের প্রাচীন অক্ষরসমূহের সৃষ্টিপ্রণালী অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, উহারা অনুভূয়মান বস্তুবিশেষের প্রতিকৃতি সাদৃশ্যে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। সেই বস্তুচিত্রসমূহ শত শত বৎসর ব্যাপিয়া নানা পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়া অবশেষে অক্ষরের আকার ধারণ করিয়াছিল। ভারতেও যদি এই প্রণালীতে অক্ষর সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে প্রাচীন বস্তুচিত্রের নিদর্শন ভারতে অবশ্যই কোন না কোন ভাবে থাকিয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে সেই নিদর্শন কিঞ্চিন্মাত্রও

বিদ্যমান নাই। অথচ মীসর, ব্যাবিলন্, চীন প্রভৃতি দেশে তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের অনেক চিহ্ন এখনও বিরাজমান আছে। পঞ্জাবে যে হরপ-মোহর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে ভাবিতে পারেন, উহা বস্তুচিত্র বা প্রাগশোক অক্ষরের নিদর্শন। কিন্তু সেই শীলমোহর কোন্ সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন উহা ভারতীয় শিল্পীর নির্ম্মিত নহে। তাঁহাদের মতে উহাতে যে ছয়টী অজ্ঞাত-অক্ষর-চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহা প্রাচীন চীন অক্ষর।

২। ভারতীয় অক্ষরের নাম শুনিয়া উহা কোন্ বস্তুর সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। ক, খ, গ ইত্যাদি অক্ষরের নামের সহিত কোন প্রত্যক্ষ বস্তুর সংস্রব নাই। সুতরাং উহারা যে কোন বস্তুর সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। আজ-কাল কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে বর্ণ-পরিচয় লিখিতে যাইয়া অনেকেই ক'তে কাক, খ'তে খরগোস, গ'তে গাধা ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন। কিন্তু কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই প্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল না। সুতরাং ভারতীয় ক, খ, গ ইত্যাদি অক্ষর কাক, খরগোস, গাধা ইত্যাদি জন্তুর সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ কল্পনা ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে আমরা সেমিটিক বর্ণমালায় দেখিতে পাই অ, ব, গ ইত্যাদি অক্ষর আলেফ্, বেথ্, গিমেল্ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। এই সকল প্রাচীন নাম শুনিয়া বোধ হয়, অ আলেফ অর্থাৎ বৃষ, ব বেথ্ অর্থাৎ গৃহ, গ গিমেল অর্থাৎ উষ্ট্র ইত্যাদি জন্তু বা দ্রব্যের আকৃতি সাম্যে সমুদ্ভূত হইয়াছিল।

৩। যদি ভারতের অক্ষর অতি প্রাচীন হইত, তাহা হইলে অশোকের সময়ে আমরা সমগ্র ভারতে একই প্রকার অক্ষর দেখিতে পাইতাম না। ভারতের প্রাচীনতম অক্ষর কাল ও দেশের ভেদ অনুসারে অশোকের রাজত্বকালে নানা আকার ধারণ করিত। কিন্তু

অশোক-শাসনসমূহ হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে একই প্রকার অক্ষরে লিখিত। ইহাদ্বারা বোধ হয় ভারতীয় অক্ষর সবিশেষ প্রাচীন নহে।

৪। যদি ভারতে প্রাচীনতম কাল হইতে লেখার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্রকারেরা মসীজীবীর নিন্দা করিতেন না। আর মহাভারতে দৃষ্ট হয় বেদবিক্রয়ী, 'বেদলেখক ও বেদদূষক ইহারা সকলেই নিরয়ে গমন করিবে। বোধ হয় ভারতে লেখার প্রথা প্রবৃর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে বেদ রচিত হইয়াছিল। এই হেতু লেখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেও, বহুদিন বেদ মুখে মুখে অভ্যাস করা হইত। এই জন্যই বেদকে শ্রুতি বলে। লেখন প্রণালী অদ্যাপি এদেশে যথোপযুক্তভাবে সমাদর লাভ করে নাই। কোন বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে যে পুরোহিত মুখে মুখে মন্ত্র পড়াইতে পারেন তিনি সর্ব্বাধিক গৌরবভাজন হন। আর যদি তিনি লিখিত গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্র পড়ান, তাহা হইলে তাঁহার গৌরবের কতক পরিমাণে হ্রাস হয়। যিনি মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া মন্ত্র পড়ান—তিনি পুরোহিতের মধ্যে অধম।

৫। ভারতীয় বর্ণমালা অতীব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিন্যস্ত। কোন জাতি এরূপ সুন্দর প্রণালী এক উদ্যমে আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহেন। ইহাদ্বারা বোধ হয় ভারতবাসিগণ কোন বিদেশীয় জাতির নিকট হইতে বর্ণমালার প্রথম আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর উঁহারা ঐ বর্ণসমূহকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করতঃ উহাদিগকে বহু কৌশলে গ্রথিত করিয়া এক আদর্শ বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভারতে সেমিটিক অক্ষরের প্রবর্ত্তন।

(খৃঃ পূঃ ৯০০

উল্লিখিত যুক্তি সমূহ দ্বারা পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, লেখন প্রণালী ভারতে বিদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিল। কোন্ দেশ হইতে

কোন্ সময়ে ভারতে অক্ষরের প্রথম প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। (১) কেহ বলেন ভারতীয় অক্ষর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফিনিসিয় জাতির নিকট হইতে আগমন করিয়াছিল। সলোমনের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে ফিনিসিয়ান্‌গণ বাণিজ্যসূত্রে ভারতে যাতায়াত করিত। খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দে ভারতের সহ ফিনিসিয়ান্* জাতির সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। বোধ হয় এই ফিনিসিয়ান্ সমাগম অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০০০-৮০০ কাল মধ্যে ফিনিসিয় অক্ষর ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। (২) কাহারও মতে ব্যাবিলন বা পারসীক অক্ষরই ভারতীয় অক্ষরের বীজ। সাহাবাজগড়ী ও ম্যন্‌সেরা নামক স্থানে প্রাপ্ত অশোক লিপি যে পারসিক অক্ষর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। অন্যান্য অশোক লিপিও সম্ভবতঃ পারসীক অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। হেরোডোটাস্ লিখিয়াছেন খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ দরায়ুস্ ভারত (পঞ্জাব) অধিকার করেন। আসীরিয় সাম্রাজ্যের পারসি পোলিস্ নগর হইতে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ স্তম্ভে দৃষ্ট হয়, ভারত (পঞ্জাব) পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতের সহিত পারস্যের এই রাজনৈতিক সম্বন্ধ দেখিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারসীক অক্ষর হইতে অশোক অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল। (৩) অপর কাহারও মতে প্রাচীন য়িমেন অর্থাৎ আরব দেশ হইতে ভারতে অক্ষরের প্রথম সমাগম হইয়াছিল। প্রাচীন কালে

---

* ঋগ্বেদে যে পণি শব্দের উল্লেখ আছে সায়ণের মতে উহার অর্থ বণিক্। পাণিনির মূল সূত্র অনুসারে বণিজ শব্দ সিদ্ধ হয় না। ঔণাদিক প্রত্যয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া "পণ" ধাতুর উত্তর "ইজ্" প্রত্যয়ে বণিজ্ শব্দ সিদ্ধ হয়। ইহা দেখিয়া বোধ হয় ফিনিসিয়ান্‌গণই বেদে পণি নামে উক্ত হইয়াছেন। এতদনুসারে পণি, পণিজ্ বা বণিজ্ শব্দটী বিদেশীয়। যদি বেদোক্ত পণিকে ফিনিসিয়ান্ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে বেদের পণি বিষয়ক সূক্ত সমূহের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে আসিয়া পড়ে। বেদের কোন কোন অংশ কি এত আধুনিক? ঋগ্বেদ মণ্ডল ৬, সূক্ত ৫৩, ঋক্ ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। পাণিনীয় ঔণাদিক প্রকরণে আছে:—পণে রিজ্যাদেশ্চ বঃ। বণিক্।

মীসর, সীরিয়া, ফিনিসিয়া ও ভারত এই চারি দেশের সহিত য়িমেনের বাণিজ্য চলিত। খৃঃ পূঃ ২৩০০ অব্দে মীসরের সহিত ও খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে ভারতের সহ উহার বাণিজ্য আরব্ধ হয়। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ১০০০—খৃঃ পূঃ ৩০০ মধ্যে য়িমেন অর্থাৎ প্রাচীন আরব হইতে লিপিকৌশল ভারতে প্রবেশলাভ করে। অনেকের বিশ্বাস আরব দেশ আধুনিক, কিন্তু এ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। সেমিটিক্ জাতির আদিম নিবাস আরবদেশ। তথা হইতে উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়—ব্যাবিলন, আরামীয়, ক্যানানাইট্, আসীরিয় প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

ভারতীয় অক্ষরের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ।

নিম্নে ভারতীয় বর্ণমালায় অক্ষর বিন্যাসের একটী প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল। উল্লিখিত প্রতিকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় সংস্কৃত বর্ণমালা কিরূপ কৌশলে বিন্যস্ত। যে বর্ণ যে স্থানে বিন্যস্ত আছে তাহাই তাহার যোগ্যতম স্থান। কোন বর্ণকে একটু স্থানান্তর করিলেই সমস্ত শ্রেণীবিভাগ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। উল্লিখিত প্রতিকৃতি অনুসারে ব্যঞ্জন বর্ণের সন্নিবেশ, যথা—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব। হ, শ, ষ, স। ক্ষ।

স্বরবর্ণের বিন্যাস, যথা—

অ, আ। ই, ঈ। ঋ, ৠ। ঌ, ৡ। উ, ঊ। এ, ঐ। ও, ঔ। অং, অঃ।

ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে হকার শ, ষ, স এই তিনের পূর্ব্বে বসিয়াছে। কিন্তু ব্যবহারতঃ বহুশত বৎসর হইতে উহা শ, ষ, স এই তিনের পরে পঠিত হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই হকার

ব্যঞ্জন বর্ণ।								স্বরবর্ণ।			
স্পর্শবর্ণ।					অন্তঃস্থবর্ণ	উষ্মবর্ণ		হ্রস্বস্বর	দীর্ঘস্বর		
অঘোষ		ঘোষ			ঘোষ	অঘোষ					
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অনুনাসিক অল্পপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ					
ক	খ	গ	ঘ	ঙ		হ*		অ	আ		কণ্ঠ্যবর্ণ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	য	শ		ই	ঈ		তালব্যবর্ণ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	র	ষ		ঋ	ৠ		মূর্দ্ধন্যবর্ণ
ত	থ	দ	ধ	ন	ল	স		ঌ	ৡ		দন্ত্যবর্ণ
প	ফ	ব	ভ	ম				উ	ঊ		ওষ্ঠ্যবর্ণ
									এ ঐ		কণ্ঠতালব্য
							ক্ষ				কণ্ঠমূর্দ্ধন্য
									ও ঔ		কণ্ঠৌষ্ঠ্য
					ব						দন্তৌষ্ঠ্য
										অং অঃ	অযোগ-বাহবর্ণ

* হ ঘোষ বর্ণ।

অশোক-শাসনসমূহ হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে একই প্রকার অক্ষরে লিখিত। ইহাদ্বারা বোধ হয় ভারতীয় অক্ষর সবিশেষ প্রাচীন নহে।

৪। যদি ভারতে প্রাচীনতম কাল হইতে লেখার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্রকারেরা মসীজীবীর নিন্দা করিতেন না। আর মহাভারতে দৃষ্ট হয় বেদবিক্রয়ী, 'বেদলেখক ও বেদদূষক ইহারা সকলেই নিরয়ে গমন করিবে। বোধ হয় ভারতে লেখার প্রথা প্রবুর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে বেদ রচিত হইয়াছিল। এই হেতু লেখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেও, বহুদিন বেদ মুখে মুখে অভ্যাস করা হইত। এই জন্যই বেদকে শ্রুতি বলে। লেখন প্রণালী অদ্যাপি এদেশে যথোপযুক্তভাবে সমাদর লাভ করে নাই। কোন বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে যে পুরোহিত মুখে মুখে মন্ত্র পড়াইতে পারেন তিনি সমধিক গৌরবভাজন হন। আর যদি তিনি লিখিত গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্র পড়ান, তাহা হইলে তাঁহার গৌরবের কতক পরিমাণে হানি হয়। যিনি মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া মন্ত্র পড়ান—তিনি পুরোহিতের মধ্যে অধম।

৫। ভারতীয় বর্ণমালা অতীব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিন্যস্ত। কোন জাতি এরূপ সুন্দর প্রণালী এক উদ্যমে আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহেন। ইহাদ্বারা বোধ হয় ভারতবাসিগণ কোন বিদেশীয় জাতির নিকট হইতে বর্ণমালার প্রথম আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর উঁহারা ঐ বর্ণসমূহকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করতঃ উহাদিগকে বহু কৌশলে গ্রথিত করিয়া এক আদর্শ বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভারতে সেমিটিক অক্ষরের প্রবর্ত্তন।

(খৃঃ পূঃ ৯০০)।

উল্লিখিত যুক্তি সমূহ দ্বারা পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, লেখন প্রণালী ভারতে বিদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিল। কোন্ দেশ হইতে

কোন্ সময়ে ভারতে অক্ষরের প্রথম প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় না। (১) কেহ বলেন ভারতীয় অক্ষর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফিনিসিয় জাতির নিকট হইতে আগমন করিয়াছিল। সলোমনের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে ফিনিসিয়ান্গণ বাণিজ্যসূত্রে ভারতে যাতায়াত করিত। খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দে ভারতের সহ ফিনিসিয়ান্* জাতির সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। বোধ হয় এই ফিনিসিয়ান্ সমাগম অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০০০-৮০০ কাল মধ্যে ফিনিসিয় অক্ষর ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। (২) কাহারও মতে ব্যাবিলন বা পারসীক অক্ষরই ভারতীয় অক্ষরের বীজ। সাহাবাজগড়ী ও ম্যন্সেরা নামক স্থানে প্রাপ্ত অশোক লিপি যে পারসিক অক্ষর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। অন্যান্য অশোক লিপিও সম্ভবতঃ পারসীক অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। হেরোডোটাস্ লিখিয়াছেন খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ দরায়ুস্ ভারত (পঞ্জাব) অধিকার করেন। আসীরিয় সাম্রাজ্যের পারসি পোলিস্ নগর হইতে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ স্তম্ভে দৃষ্ট হয়, ভারত (পঞ্জাব) পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতের সহিত পারস্যের এই রাজনৈতিক সম্বন্ধ দেখিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারসীক অক্ষর হইতে অশোক অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল। (৩) অপর কাহারও মতে প্রাচীন য়িমেন অর্থাৎ আরব দেশ হইতে ভারতে অক্ষরের প্রথম সমাগম হইয়াছিল। প্রাচীন কালে

* ঋগ্বেদে যে পণি শব্দের উল্লেখ আছে সায়ণের মতে উহার অর্থ বণিক্। পাণিনির মূল সূত্র অনুসারে বণিজ শব্দ সিদ্ধ হয় না। ঔণাদিক প্রত্যয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া "পণ" ধাতুর উত্তর "ইজ্" প্রত্যয়ে বণিজ্ শব্দ সিদ্ধ হয়। ইহা দেখিয়া বোধ হয় ফিনিসিয়ান্গণই বেদে পণি নামে উক্ত হইয়াছেন। এতদনুসারে পণি, পণিজ্ বা বণিজ্ শব্দটী বিদেশীয়। যদি বেদোক্ত পণিকে ফিনিসিয়ান্ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে বেদের পণি বিষয়ক সূক্ত সমূহের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে আসিয়া পড়ে। বেদের কোন কোন অংশ কি এত আধুনিক ? ঋগ্বেদ মণ্ডল ৬, সূক্ত ৫৩, ঋক্ ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। পাণিনীয় ঔণাদিক প্রকরণে আছে :—পণে রিজ্যাদেশ্চ বঃ। বণিক্।

যথার্থতঃ শ, ষ, স এই তিনের পরে, কি পূর্ব্বে বসিবে? উচ্চারণ স্থান বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় হকারকে প্রকৃত প্রস্তাবে শ, ষ, স এই তিনের পরে বসান উচিত। এক ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় হকার উষ্মবর্ণ, সুতরাং উহা শ, ষ, স এই তিনের সমান স্থান পাইবে। অন্যভাবে বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে হকার ঘোষবর্ণ, সুতরাং উহার সহ শ, ষ, স এই তিন বর্ণের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। উহাকে বরঞ্চ, য, র, ল, ব এই সকল বর্ণের সহিত একত্র বসান উচিত। অন্যভাবে বিচারে দেখা যায় হকার নাদবর্ণ, সুতরাং উহা ঝ, ভ, ঘ, ঢ, ধ ইত্যাদির সহ বসিবে। কোন স্থলে হকার কণ্ঠ্যবর্ণের কার্য্য করে, কিন্তু উহার সহ ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদির পার্থক্য আছে। এইহেতু কেহ কেহ ক, খ, গ, ঘ, ঙ কে জিহ্বামূলীয় বর্ণ বলিয়াছেন এবং জিহ্বামূলীয়ের তালিকা হইতে হকারকে বিদূরিত করিয়াছেন। এই সকল বিরোধ সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত বর্ণমালায় হকারকে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসান হইয়াছে। বস্তুতঃ হকারের সহ ব্যঞ্জনের অপেক্ষা স্বরের অধিকতর নিকট সম্বন্ধ। হকার প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরও নহে, ব্যঞ্জনও নহে—অথচ বর্ণমালাকে যদি স্বর ও ব্যঞ্জন এই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে স্বরও বলিতে হইবে, ব্যঞ্জন ও বলিতে হইবে। ইংরেজীতে an hour, an historical ইত্যাদি স্থলে হকারকে স্পষ্টতঃ স্বরবর্ণ বলিয়া ধরা হয়। এই সকল কারণে হকারকে ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে ও স্বরবর্ণের প্রারম্ভে বসানই বিধেয়। ক্ষকার সংযুক্তবর্ণ বলিয়া উহার পূর্ব্বে হকার বসিয়াছে। ঋ, ৠ, ঌ, ৡ এই চারিবর্ণের পূর্ব্বে কি পরে উ ঊকে বসান উচিত, তদ্বিষয়ে মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ব্যঞ্জনবর্ণ অগ্রে পাঠ করা উচিত, কি স্বরবর্ণ অগ্রে পঠিত হওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন স্বরবর্ণই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল,

তদনন্তর ব্যঞ্জনের কল্পনা করা হইয়াছিল। এই হেতু তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ভাষায় স্বরের সংখ্যা অধিক সেই ভাষা সমধিক প্রাচীন। কিন্তু আমার মত অন্যরূপ। আমার বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, তদনন্তর তাহা হইতে স্বরের উদ্ভাবন করা হয়। তিব্বতীয় ভাষায় দেখিতে পাই সমস্তই ব্যঞ্জনবর্ণ। উহার প্রত্যেক বর্ণে অকার অন্তর্নিহিত আছে। স্বর বলিয়া কোন পৃথক বর্ণ নাই। ই, উ, এ, ও এই চারিটী চিহ্ন তিব্বতীয় বৈয়াকরণগণ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু উহাদিগকে তাঁহারা পৃথক্ অক্ষর বলিয়া গণ্য করেন নাই। প্রাচীন মীসরীয় বর্ণমালায় আদৌ স্বরবর্ণ ছিল না। সেমিটিক জাতি স্বীয় বর্ণমালায় স্থূলভাবে কতিপয় স্বরের সংযোগ করেন। কিন্তু আর্য্যজাতির হস্তে পড়িয়া স্বর পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। হিন্দু, পারসীক ও গ্রীকগণ স্বরের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন করেন। বস্তুতঃ বর্ণমালাকে বিশ্লেষণ করিয়া উহা হইতে স্বরের আবিষ্কার অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে সম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব ব্যঞ্জনবর্ণ অগ্রে পাঠ করা উচিত। তদনন্তর স্বরবর্ণ পঠিত হওয়া বিধেয়।

করিন্থের গ্রীক অক্ষর।

(খৃঃ পূঃ ৭০০)।

অ ফ ল প উ

ব হ ম ক ফ

গ থ ন র ছ

দ ই ক্স স ব।

এ ক ও ত

বাহ্লীক বা উত্তর অশোক অক্ষর।

অশোকের সাহাবাজ গড়ী প্রস্তর-শাসন;

(খৃঃ পূঃ ২৫১)।

অ	ক	ঞ	ত	[illegible]	ল
ই	খ	ট	থ	ভ	ব
উ	গ	ঠ	দ	ম	শ
এ	চ	ড	ধ	য	ষ স
ও	ছ	ঢ	ন	র	হ
অং	জ	ণ	প		

তুরস্কবংশীয় রাজা কনিষ্কের অক্ষর।

(খৃঃ পূঃ ৩৩)।

অ	ক	ঠ	ভ	শ
ই	খ	ত	ম	ষ
উ	গ	দ	য	স
এ	চ	ন	র	হ।
ছ	প	ল		
জ	[illegible]	ব		

তিব্বতের লাঞ্ছা অক্ষর।

(খৃষ্টাব্দ ৬২৯)।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ
ঌ ৡ এ ঐ

ও ঔ অং অঃ

ক খ গ ঘ ঙ।
চ ছ জ ঝ ঞ।
ট ঠ ড ঢ ণ।
ত থ দ ধ ন।
প ফ ব ভ ম।
য র ল ব
শ ষ স হ। ক্ষ।

মিঃ বাওয়ার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মধ্যএসিয়ার অক্ষর।

(খৃঃ ৪০০-৫০০)।

অ ঋ থ জ ঢ ন ষ স্থ
আ এ গ ঝ ণ প্ন র হ
ই ঐ ঘ ঞ্চ ত ফ ল যেৎ
ঈ ও ঙ ট থ ব ব গ্রী
উ ঔ চ ঠ দ ভ শ র্ষ
ঊ ক ছ ড ধ ম য

জাপানের হোরিউজি অক্ষর।

(খৃঃ ৫০০-৫৫০)।

অ ঋ ও ঙ ট দ ভ শ স্রা
আ ৠ ঔ চ ঠ ধ ম ষ ত্র
ই ৯ ক ছ ড ন য স
ঈ ৡ খ জ ঢ প র হ
উ এ গ ঝ ণ ফ ল ৯ং
ঊ ঐ ঘ ঞ ত ব ব ক্ষ
থ

হূণরাজ তোরমাণের অক্ষর।

(খৃঃ ৪৮৪)।

অ ঘে থা ভা শ র্ম
আ চা দে মু ষা ব্রূঃ
উ জ ধে য স ষ্টা
কা ট ন রো হি স্থ
খ ণ পা ল জ্ঞা
গ তৃ ব বৈ ত্বা

মন্তব্য।

কোরিন্থের গ্রীক অক্ষর।—পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে অর্থাৎ ট্রয়ের যুদ্ধের প্রায় তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ক্যাড্‌মস্ নামক ফিনিসিয় যুবরাজ ফিনিসিয় অক্ষর গ্রীসে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ক্যাড্‌মস্ সর্ব্বপ্রথমে থের (সান্টোরিণ) দ্বীপে অনন্তর থেসোস্ নামক স্থানে এবং পরিশেষে বিয়োসিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। বিয়োসিয়ার অক্ষর কোরিন্থ প্রভৃতি

স্থানে প্রবেশ করিয়া কালসহকারে নানা আকার ধারণ করিয়াছিল। ক্যাড্মিয় অক্ষর খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে কোরিন্থে যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

অশোকের বাহ্লীক অক্ষর।—মহারাজ অশোক পঞ্জাব প্রদেশীয় সাহাবাজগড়ী ও ম্যানসেরা প্রস্তর শাসনে খৃঃ পূঃ ২৫১ অব্দে যে অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা ব্যাক্ট্রিয়রাজ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহাকে বাহ্লীক অক্ষর বলে। অশোকের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত প্রস্তর শাসনে এই অক্ষরের ব্যবহার দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে উত্তর অশোক নামে অভিহিত করিয়াছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হোরোডোটাস্ বলেন খৃঃ পূঃ ৫২০ অব্দে দরায়ুস্ পঞ্জাব অধিকার করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ কিয়ৎকাল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কেহ কেহ বলেন বাহ্লীক বা ইরাণীয় অক্ষর এই সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে প্রবেশ লাভ করে। খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে গ্রীকবীর আলেক্জাণ্ডার পঞ্জাব, বাহ্লীক প্রভৃতি দেশ অধিকার করতঃ তত্তদ্ দেশে সেলুকস্‌কে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলন্ নগরে দেহত্যাগ করেন। তদনন্তর ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসের কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরের সহ সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হন। এই সন্ধি অনুসারে সেলুকস্ বাহ্লীক, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করিয়া স্বয়ং সীরিয়া দেশে রাজত্ব করিতে থাকেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মহারাজ অশোকের সময় পর্য্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ মৌর্য্যরাজগণের অধিকার ভুক্ত থাকে।

পারসীক, গ্রীক ও মৌর্য্যরাজগণ প্রায়শঃ বাহ্লীক অক্ষর ব্যবহার করিতেন। তদনন্তর শক ও তুরস্করাজগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত অধিকার করে। ইহারা ক্রমে ক্রমে ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে ও শনৈঃ শনৈঃ গঙ্গাতীরস্থ ভারতীয় অক্ষর ব্যবহার করিতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বাহ্লীক অক্ষর ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

তুরস্কবংশীয় কনিষ্কের অক্ষর।—চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে মধ্য এসিয়ায় যে প্রবল পরাক্রান্ত যুচি জাতি বাস করিত তাহারা চীন সম্রাটের প্রতি বিরক্ত হইয়া খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে স্বস্থান ত্যাগ করতঃ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহারা সমরকন্দ প্রভৃতি স্থলে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া বাহ্লীক দেশ জয় করতঃ ক্রমে ভারতে প্রবেশ করে। এই যুচিগণ তুর্কিস্থানে বহুকাল বাস করিয়াছিল বলিয়া ইহাদিকে তুরস্ক বলে। এই যুচিজাতির প্রধান সম্প্রদায়ের নাম কুশান। কেহ কেহ বলেন কুশান ও করণ একই জাতি। রাজা কণিষ্ক এই কুশান সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীর, পঞ্জাব প্রভৃতি অধিকার করিয়া খৃঃ পূঃ ৩৩ অব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ের অক্ষর এস্থলে প্রদর্শিত হইল। এই অক্ষরের সহ বাহ্লীক অক্ষরের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। কণিষ্ক যে অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন সম্ভবতঃ উহা কুশান জাতি ভারতের বহির্ভাগ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। বোধ হয় কণিষ্কের বংশধরগণ ক্রমে ক্ষত্রিয়ত্বগ্রহণপূর্ব্বক ভারতীয় অক্ষর ব্যবহার করায় কণিষ্কের অক্ষর বিলয় প্রাপ্ত হয়।

তিব্বতের লাঞ্চা অক্ষর।—তিব্বতে উচেন্, উমে, শর্ম্ম, লাঞ্চা প্রভৃতি বহু

প্রকারের অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ উচেন্ অক্ষরে লিখিত ও রাজকার্য্য উমে অক্ষরে পরিচালিত হয়। নেপাল ও তিব্বতের লামাগণ অনেক স্থলে লাঞ্ছা অক্ষর ব্যবহার করেন। লাঞ্ছা অক্ষরের সহ ভারতীয় অক্ষরের সবিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তিব্বতের রাজা শ্রংসন্ গম্পো, নেপালের রাজা অংশুবর্ম্মের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই নেপাল রাজপুত্রী খৃষ্টীয় ৬২৯ অব্দে তিব্বতে এক প্রকার অক্ষর ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমার বোধ হয় লাঞ্ছা অক্ষর সেই নেপালী অক্ষর। কাশ্মীরের সন্নিকটে লাঞ্ছাউ নামে এক দেশ ছিল। বোধ হয় মূলে লাঞ্ছা ও বাঙ্গালা অক্ষর সেই লাঞ্চাউ দেশ প্রচলিত প্রাচীন অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মধ্য এসিয়ার বাওয়ার অক্ষর—লেফ্‌টেনাণ্ট বাওয়ার নামক কোন ইউরোপীয় সৈনিক, চীন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মধ্য এসিয়ার ইয়ারখন্দ প্রভৃতি স্থানের সন্নিধানে বহুসংখ্যক হস্ত লিখিত পুস্তক ও পত্র প্রাপ্ত হন। বাওয়ার মহোদয় ঐ সকল হস্তলিপি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীকে অর্পণ করেন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ডাক্তার হর্ণলি ভারতগবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে ও এসিয়াটিক সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে ঐ সকল লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ঐ সকল লিপির বয়ঃক্রম আন্দাজ খৃঃ ৪০০—খৃঃ ৫০০।

জাপানের হোরিউজি অক্ষর—জাপানের কিওটো নগরে হোরিউজি নামে সুপ্রসিদ্ধ বিহার বিদ্যমান আছে। যুবরাজ উময়দো যে একাদশটী সুবিখ্যাত বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, হোরিউজি উহাদের অন্যতম। উময়দো খৃষ্টীয় ৬২১ অব্দে দেহত্যাগ

করেন; অতএব হোরিউজি বিহার এই সময়ের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিহারে প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্র ও উষ্ণীষ-বিজয়-ধারণী নামে দুইখানি ধর্ম্মগ্রন্থ তালপত্রে লিখিত আছে। উহা প্রাচীনকালে মধ্যভারত (মগধ) হইতে চীনদেশে নীত হইয়াছিল। অনুমান খৃষ্টীয় ৫০০-৫৫০ অব্দ মধ্যে ঐ সকল লিপি চীনে গমন করে। ৬০৯ খৃষ্টাব্দে জাপানের সম্রাট্ মিকাডো সুইকো, চীনের সুইবংশীয় কোন নরপতির নিকট হইতে, ঐসকল ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হন। এই হেতু হোরিউজি অক্ষর সমূহকে চীনের অক্ষর বা জাপানের অক্ষর উভয়ই বলিতে পারা যায়। মূলতঃ ঐ সকল অক্ষর ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উহা অবশ্য ভারতে প্রচলিত ছিল। অধুনা কাশ্মীর, চম্বা প্রভৃতি প্রদেশে যে সারদা অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহার সহ হোরিউজি অক্ষরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বস্তুতঃ উভয় অক্ষরই এক জাতীয়। প্রাচীন সারদা অক্ষর অবশ্য কালসহকারে অনেক পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়াছে। মূলতঃ ঐ অক্ষর ও হোরিউজি অক্ষর পরস্পর অভিন্ন।

হূণরাজ তোরমাণের অক্ষর—প্রবল পরাক্রান্ত হূণজাতি প্রাচীনকালে মধ্য এসিয়ায় বাস করিত। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে উহাদের সহ যুচি জাতির সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে উভয় জাতিই মধ্য এসিয়া হইতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা কণিষ্ক যুচি জাতীয়। কণিষ্কের বংশধরগণের অধঃপাতের সঙ্গে সঙ্গে হূণ জাতির অভ্যুদয় ঘটে। ইহারা সমরকন্দ, বোখারা, কাস্পিয়ান্ হ্রদ প্রভৃতির সন্নিধানে কিয়ৎ কাল অবস্থিতি করিয়া, ক্রমে বাহ্লীক রাজ্য অধিকার করে।

ইহাদের এক সম্প্রদায় ইউরোপে প্রবেশ করিয়া রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন ও হাঙ্গেরী প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। অন্য সম্প্রদায় ভারতে আগমন করিয়া এদেশে আধিপত্য করিতে থাকে। এই হূণ জাতি হইতে তোরমাণ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গুপ্ত বংশীয় বুধ গুপ্তের ধ্বংসসাধন করিয়া এতদ্দেশে হূণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাঁর রাজত্বকাল অনুমান ৪৯০ খৃষ্টাব্দ। ইনি পূর্ব্ব মালবে রাজত্ব করিতেন। ইহাঁরই পুত্র সুবিখ্যাত মিহিরকুল। ভারতীয় নানা প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিতে এই মিহিরকুল ও তোরমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হূয়েন সাঙ্গ লিখিয়াছেন মিহিরকুল অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব রাজধানী পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকুল নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তিনি কাশ্মীরে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। মিহির কুলের বংশাবলী যথা—
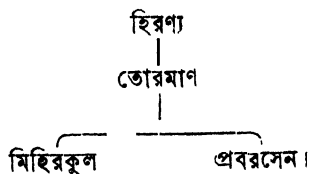
হিরণ্য গান্ধারে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যকাল খৃঃ অব্দ ৪৬৫। তোরমাণের অপর নাম মেঘবাহন বা বসুকুল। ইনি আন্দাজ ৪৯০ খৃঃ অব্দে কাশ্মীর অধিকার করেন। মিহিরকুল কাশ্মীরে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল আন্দাজ খৃষ্টাব্দ

৫১৫। প্রবরসেনের অপর নাম শ্রেষ্ঠ সেন। ইনি পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন।

লেখন ও লেপন।

প্রাচীন কালে অক্ষরনির্ম্মাণে লেখন ও লেপন উভয় প্রণালীই ব্যবহৃত হইত। কোন সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র দ্বারা অপর কোন বস্তুর উপর চিহ্ন অঙ্কিত করার নাম লেখন। প্রাচীন উৎকীর্ণ-অক্ষর সমূহ লেখন-প্রণালীর উদাহরণ। প্রস্তর, তাম্র, স্বর্ণ ইত্যাদি ধাতুপাত্রের উপর উৎকীর্ণ-অক্ষর এই লেখন প্রণালীর অন্তর্গত। অশোক শাসনসমূহ প্রস্তর, স্তম্ভ ইত্যাদির উপর অঙ্কিত আছে। পালি জাতকে দেখা যায় খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুবর্ণপাত্রের উপর অক্ষরসমূহ লিখিত হইত। ললিতবিস্তর গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, বুদ্ধদেব চন্দনকাষ্ঠের * উপর লিখিতেন। অতি প্রাচীন কালে কোমল কর্দম, দৃঢ় মৃত্তিকা এবং ইষ্টকের উপরও লেখা হইত। মীসর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

কোন তরল বস্তু দ্বারা চিহ্ন প্রস্তুত করার নাম লিপি। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলে দৃষ্ট হয়, ভূর্জ পত্রের উপর অলক্তক দ্বারা লিপি প্রস্তুত করা হইত। অধুনা প্রায়শঃ লিপিনির্ম্মাণে কালী ব্যবহৃত হয়। নীল, পীত, কৃষ্ণ, লোহিত ইত্যাদি নানা বর্ণের কালী বিদ্যমান আছে।

উল্লিখিত দুইটী প্রণালীর মধ্যে প্রথমটী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। দ্বিতীয়টী আধুনিক যুগেই সমধিক ব্যবহৃত হইতেছে। উভয়ের পরস্পর তুলনা দ্বারা দেখা যায়, উৎকীর্ণ-অক্ষরগুলি বহুকাল স্থায়ী হয়; কিন্তু কালী দ্বারা প্রস্তুত লিপি ক্ষণস্থায়ী। সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে

---

* অথ বোধিসত্ত্ব উরগসার চন্দনময়ং লিপি ফলকমাদায় দিব্য বর্ণকং সুবর্ণ তিলকং সমন্তাৎ মণিরত্ন প্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রং আচার্য্যমেবমাহ। (ললিতবিস্তর দশম অধ্যায়)।

সীসরে যে সকল অক্ষর উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। আমরা অধুনা কালী দ্বারা যে সকল লিপি প্রস্তুত করিতেছি তাহা কত দিন থাকিবে? আজকাল অক্ষরনির্ম্মাণব্যাপার অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে বটে কিন্তু উহা প্রাচীন অক্ষরের ন্যায় কালসহ নহে।

বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত লিপি।

পৃথিবীর বর্ণমালার ইতিহাস অনুসন্ধানে পরিলক্ষিত হয়, লেখনের দুইটী প্রধান রীতি প্রচলিত ছিল ও আছে। একটী দক্ষিণ হইতে বাম দিকে, ও অপরটী বাম হইতে দক্ষিণ দিকে। সেমিটিক অক্ষর দক্ষিণ হইতে বামাভিমুখে লিখিত হয়। আর্য্যঅক্ষর ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি অক্ষর বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখে লিখিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, আর্য্য-অক্ষরসমূহও প্রাচীনতম যুগে দক্ষিণ হইতে বামাভিমুখে লিখিত হইত। সংপ্রতি সিংহলে কতিপয় উৎকীর্ণ-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা বামাবর্ত্তক্রমে পঠিত হয়। কথিত আছে এই সকল লিপি মৌর্য্য-বংশের রাজত্বকালে ভারত হইতে সিংহলে নীত হইয়াছিল। ব্রিটিস্ মিউজিয়ামে যে ইরাণ মুদ্রা দৃষ্ট হয় উহা ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই মুদ্রার উপর উৎকীর্ণ-লিপি বামাভিমুখে পাঠ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত অশোকের সময়ে, উৎকীর্ণ-প্রস্তর-শাসনসমূহে, অনেক সংযুক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, যাহা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে পড়িতে হয়। যেমন "ব্র" লিখিতে দক্ষিণে "ব" ও তাহার বাম দিকে "র" লিখিত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, ভারতে প্রাচীনকালে দক্ষিণ হইতে বামাভিমুখে লেখনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। অশোকের সাহাবাজগড়ী ও ম্যান্‌সেরা প্রস্তরশাসনসমূহ সম্পূর্ণরূপে বামাবর্ত্তক্রমে পঠিত হয়। হিন্দুগণিতশাস্ত্রে এই বামাবর্ত্ত লেখার আভাষ

পাওয়া যায়। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" ইহা সকলেই জানেন। ১২৫ এই অঙ্কে দেখা যায়, যদিও প্রথমে "১" লিখিলাম কিন্তু ইহার মূল্য হইল "১০০", "২" দ্বিতীয় স্থানে লিখিত হওয়ায় উহার মূল্য হইল "২০", আর "৫" তৃতীয় স্থানে লিখিলাম কিন্তু ইহার মূল্য হইল পাঁচ একক। কিন্তু প্রাচীনকালে এরূপ ছিল না। যদি প্রাচীনকালে "নেত্রপক্ষাষ্ট-বিধু" মিত অব্দ লিখিতে হইত তাহা হইলে উহাতে "নেত্র" বা তিনকে সর্ব্ব দক্ষিণে, তাহার বামে "পক্ষ" বা দুই, তাহার বামে "অষ্ট" এবং সর্ব্বক্রমে "বিধু" বা এক লিখিত হইত। নেত্রপক্ষাষ্টবিধু = ১৮২৩ এইরূপ হইত। আধুনিক প্রথা অনুসারে উহার মূল্য হওয়া উচিত = ৩২৮১। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে কেহই বামাবর্ত্তরীতি আজিও উপেক্ষা করেন না। এই সকল দেখিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন, ভারতে প্রাচীনতম যুগে সেমিটিক জাতির অনুকরণে অক্ষর দক্ষিণ হইতে বামাভিমুখে লিখিত হইত। অশোকের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ ভারতীয় আর্য্যগণ বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখে লেখার প্রথা অবলম্বন করেন। এই অজ্ঞাত কারণটী কি?

[ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবধ ও গুরুহত্যা-পাপ আশঙ্কায় অর্জ্জুন যখন বিষাদে ম্রিয়মাণ, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, অশোচ্যের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির শোক করা উচিত নহে। একথাটি তিনি তিন প্রকারে বুঝাইলেন। প্রথম এই যে আত্মা অমর, দেহনাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ নাই; কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ন্যায় মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র। দ্বিতীয়, যদি মনে কর দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জন্ম মৃত্যু আছে, তথাপি মৃতের জন্য শোক অনুচিত, কেননা মৃত্যু অপরিহার্য্য। জীবের আদি অন্ত উভয়ই অব্যক্ত। যখন অব্যক্ত আদির জন্য কেহই শোক করে না, তখন অব্যক্ত অন্তের জন্যই বা শোক করিবে কেন? তৃতীয়তঃ, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-রক্ষণ—কর্ত্তব্যপালনের জন্যও ধর্ম্মযুদ্ধ বিহিত। এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে অখ্যাতি ও অপমান; ইহাতে জয়ী হইলে যশ ও রাজ্যলাভ, মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ। এই ত জ্ঞানের কথা—ইহারি নাম সাংখ্য যোগ। পরে যোগশাস্ত্রের উপদেশ সকল বিবৃত হইতেছে। এই যোগতত্ত্বের সার মর্ম্ম এই, কর্ম্ম ত্যাগ করা বিধেয় নহে। কর্ম্ম করিবে কিন্তু ঈশ্বরের হস্তে ফলাফল সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিবে।

সাংখ্য যোগ।

সঞ্জয়। হেরি ও করুণমূর্ত্তি, অশ্রুপূর্ণ আকুল লোচন,
বিষণ্ণ অর্জ্জুনে তবে কহিলেন শ্রীমধুসূদন। ১

শ্রীকৃষ্ণ। কোথা হতে এ সঙ্কটে
এল তব এই মোহ-জ্বর,
আর্য্য-অনুচিত যাহা,
কীর্ত্তিহর, স্বর্গ-বিঘ্নকর?
হইও না কাপুরুষ
ক্লীবসম দুর্ব্বল হৃদয়,
তোমার এ যোগ্য নয়,
উঠ উঠ, জাগ ধনঞ্জয়। ৩

অর্জ্জুন। ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য, পূজার্হ তাঁহারা, আর্য্য,
জান তুমি হে মধুসূদন,
তাঁহাদের সনে রণ, একি ঘোর আচরণ,
না সরে আমার তাহে মন।
থাকুক তাঁদের প্রাণ, যায় যাক্ ধন মান,
ভিক্ষান্ন যা' শ্রেয় গণি তাহা।
গুরুবধে মহাপাপ, রাজ্যভোগে পরিতাপ,
গুরুর রুধির-সিক্ত যাহা। ৫
না বুঝি, কৃষ্ণ, কি ভাল, বল, সখা, মোরে বল,
জয় কিবা যুদ্ধে পরাজয়;
যাঁদের মরণে হরি, আমরা বাঁচিতে নারি,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তারা রয়। ৬
আমি, নাথ, অতি দীন, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহীন,
সুধাই তোমায়, জনার্দ্দন,
শিষ্যে সুপ্রসন্ন হও, গুরুদেব শিক্ষা দেও,
শ্রেয় পথ কর প্রদর্শন। ৭
নিদারুণ এই শোকে, কিসে মুক্তি পাই লোকে,
দেখিতে না পাই কোন পথ্য।
অকণ্টক রাজ্যবৃদ্ধি, অতুল সুখ সমৃদ্ধি,
লভিলেও স্বর্গ-আধিপত্য। ৮

সঞ্জয়। এতেক কহিয়া কৃষ্ণে, পরে ধনঞ্জয়
যুদ্ধ না করিব বলি' মৌনভাবে রয়,
কুরুপাণ্ডু সৈন্য মাঝে বিষণ্ণ বদন
অর্জ্জুনে ঈষৎ হাসি কহে জনার্দ্দন। ৯-১০

শ্রীকৃষ্ণ। বিজ্ঞ তুমি, তবে কেন
শোক-মগ্ন অশোচ্যের তরে?
মৃত বা জীবিত লাগি
প্রজ্ঞাবান্, শোক নাহি করে। ১১
তুমি, আমি আর যত
ছিল না কি, না হইবে পুন?
দেখ ভেবে, ছিলে সবে,
জনমিবে পুন, হে অর্জ্জুন। ১২
কৌমার, যৌবন, জরা,
সুনিশ্চিত যেমতি দেহীর,
দেহান্তর প্রাপ্তি তথা;
জানি ধীর না হন অস্থির। ১৩
ইন্দ্রিয় বিষয় যোগে, রহে জীব শোক রোগে,
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ভোগ,
ভবে কিছু নহে স্থির, জানি ধৈর্য্য ধর বীর,
অনিত্য এ সব যোগাযোগ। ১৪
এসব বিপত্তি মাঝে,
নাহি কভু ব্যথিত যে নর,
সুখ দুখে সম ধীর
জেন, পার্থ, সে হয় অমর। ১৫
অস্থায়ী অসৎ যাহা,
সতের বিনাশ নাহি হয়,
সদসৎ পরিণাম
তত্ত্বদর্শী দেখে নিঃসংশয়। ১৬

দেহ নশ্বর আত্মা-অবিনাশী।

ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর
রহেন যে অবিনাশী প্রভু,
অব্যয় অক্ষয়—তাঁর
বিনাশ সম্ভবে নাহি কভু। ১৭
নশ্বর যদিও দেহ,
শরীরী রহেন অনশ্বর,
অপ্রমেয়, নিরাময় ;—
যুদ্ধে তবে মাত গো সত্বর। ১৮
ভাবে যেই হন্তা আমি
কিম্বা ভাবে হৈনু আমি হত,
উভয়েই ভ্রান্ত তারা,
না মারে না নিজে হয় মৃত। ১৯
শাশ্বত, পুরাণ, নিত্য,
অজর, অমর, নির্ব্বিকার,
না ছিল না হবে পুন,
দেহান্তেও অন্ত নাহি তাঁর। ২০
আত্মার নাহিক যদি
জন্ম, জরা, ক্ষয়, বৃদ্ধি, নাশ,
কার বা সে করে বধ
কারে দিয়া করয়ে বিনাশ? ২১
জীর্ণবাস পরিহরি
লোকে যথা পরে নব বেশ,
জরাজীর্ণ ত্যজি কায়
অন্য দেহে তেমনি প্রবেশ। ২২
শস্ত্রে ছিন্ন নাহি হয়,
নাহি হয় অনলে দহন,
জলে নাহি দেয় ক্লেশ,

ছেদ, ক্লেদ, শোক, তাপ,
বিরহিত জনম মরণ,
সর্ব্বগত, ধ্রুব, নিত্য,
নির্ব্বিকার বিভু সনাতন। ২৪
অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সত্য
নিরঞ্জন, অব্যয়, অক্ষয়,
আত্মার স্বরূপ জানি
কেন হও শোকেতে কাতর? ২৫
যদি তুমি ভাব অন্য,
দেহ সহ আত্মার উদয়,
দেহ সহ নাশ তার,

মৃত্যু অপরিহার্য্য। তবু শোক উচিত না হয়। ২৬
জন্ম যার ধ্রুব মৃত্যু,
মৃতের জনম পুনর্ব্বার,
ইহা ত অপরিহার্য্য
তবে, আর্য্য, শোক কেন আর? ২৭
কোথা হতে এলে হেথা, কেবা জানে যাবে কোথা,
আদি অন্ত অব্যক্ত মানবে,
জন্ম মৃত্যু মধ্যদেশ, ব্যক্ত শুধু সবিশেষ,
কেন, পার্থ, বৃথা শোক তবে? ২৮
আশ্চর্য্য কেহ বা এরে করে দরশন,
আশ্চর্য্য করে বা কেহ ইহার বর্ণন,
আশ্চর্য্য কেহ বা হয় শুনিতে শুনিতে,
শুনিয়াও কেহ তত্ত্ব না পারে বুঝিতে। ২৯
অবধ্য অব্যয় আত্মা দেহ মধ্য-স্থিত :
কোন জীব তরে শোক না হয় বিহিত। ৩০
স্বধর্ম্মে বাঁধিয়া লক্ষ্য ধর হে সাহস,
ধর্ম্ম যুদ্ধ হতে কিসে ক্ষত্রিয়ের যশ?

স্বধর্ম্ম পালন। অযাচিত স্বর্গদ্বার যখন উন্মুক্ত,
ছাড়ি এ সুযোগ কেন যুদ্ধেতে বিরক্ত?
যদি এই ধর্ম্ম যুদ্ধে হও গো বিরাগী,
তেয়াগি স্বধর্ম্ম কীর্ত্তি হবে পাপ ভাগী।
অক্ষয় অকীর্ত্তি তব রটিবে তখন,
অকীর্ত্তি হইতে প্রিয় সজ্জনে মরণ।
ভয়ে দিলে রণে ভঙ্গ শত্রুরা ভাবিবে,
বহুমান পাও যেথা অপমান পাবে,
কহিবে অকথ্য নানা, নিন্দি নানা মতে,
নিন্দিবে বিক্রম তব—কি লজ্জা এ হতে। ৩১-৩৬

মরিলে পাইবে স্বর্গ
বাঁচিলে হইবে মহীপতি,
উঠ তবে, হে কৌন্তেয়,
চল যুদ্ধে ধরি দৃঢ় মতি। ৩৭

সুখ দুঃখ জয়াজয়,
লাভালাভে সমভাবি সবে,
যুদ্ধে হও কটিবদ্ধ,
তাহে তোমা পাপ না স্পর্শিবে। ৩৮

এই ত কহিনু সাংখ্য,
যোগশাস্ত্র শোন যাহা কয়,
যোগযুক্ত হবে যবে
কর্ম্মবন্ধ সব হবে ক্ষয়।

যোগশাস্ত্র। আরম্ভে অব্যর্থ ফল,
নাহি ইথে বিঘ্ন, প্রত্যবায়,
স্বল্পধর্ম্ম লাভে নর
মহদ্ভয় হতে ত্রাণ পায়। ৪০

ব্রহ্মজ্ঞানী, একনিষ্ঠ একই পথে যায়,
কামনা-বিভ্রান্ত মতি নানাদিকে ধায়।

অবোধ যে বেদবাক্যে দৃঢ় বাঁধি হিয়া,
আর কিছু নাই বলি' রহে আঁকড়িয়া,
স্বর্গ সুখ একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান,
স্বর্গ কামনায় সব বাহ্য অনুষ্ঠান;
বহুক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ড করিয়া সাধন,
ভোগৈশ্বর্য্য প্রলোভনে হয় নিমগন;
কর্ম্মফল জন্মবন্ধ নাহি ঘুচে যায়,
নানা মতে ভ্রান্ত মত করয়ে প্রচার।
তাদের মুখেতে কত পুষ্পিত বচন,
শুনিতে যেমন মিষ্ট বিষাক্ত তেমন,
এ হেন বচনে ভুলে যেই মূঢ়মতি,
কামনা আসক্ত স্থিত, ভোগৈশ্বর্য্যে রতি,
কামকামী এরা সবে অনিশ্চিত বুদ্ধি,
কেমনে লভিবে বল সমাধির সিদ্ধি? ৪১-৪৪
ত্রিগুণ মণ্ডিত যত বেদের বিষয়,
ছেদহ ত্রিগুণ-পাশ, তুমি ধনঞ্জয়;
অচল অটল চিত্ত, নির্ভীক পরাণ,
যোগক্ষেম-দ্বন্দহীন, হও আত্মবান্। ৪৫

বহুকূপে হয় যাহা,
পারে এক মহাহ্রদে সাধিতে সকল,
একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে
সাধক লভয়ে তথা সর্ব্ববেদ ফল। ৪৬

কর্ম্মে আছে অধিকার
নাহি তব অধিকার ফলে,
সাধ জীবনের কর্ম্ম
নিরপেক্ষ হয়ে ফলাফলে। ৪৭

যোগস্থ হইয়া নিত্য
সাধ কার্য্য আসক্তি রহিত,

ফলাফলে সমদৃষ্টি—
এই যোগ জানিবে নিশ্চিত। ৪৮

বুদ্ধিযোগ বিনা কর্ম্ম নিকৃষ্ট সে অতি,
ফলকামী কর্ম্মী যারা, দীন মূঢ়মতি,
অতএব বুদ্ধি যোগে লও হে শরণ,
কর্ম্মফল ত্যজি কর্ম্ম করহ সাধন। ৪৯
যোগবলে ত্যজে যোগী সুকৃত দুষ্কৃত;
কর্ম্মের কৌশলই যোগ—শিখহ সংযত। ৫০

কর্ম্মফলে নিরাকাঙ্ক্ষী
বুদ্ধিমান্ মনস্বী যে হয়,
জনম-বন্ধন-মুক্ত
সেই পায় পদ নিরাময়। ৫১
কাটি যাবে মোহের কুহাসা যবে,
অজ্ঞান-আঁধার,
শ্রুত বা শ্রোতব্য তবে
বিষয়ের যাবে পরপার। ৫২
বেদাদি বিক্ষিপ্ত মতি
হয় যবে প্রশান্ত, নির্ম্মল,
সমাধি নিশ্চলা বুদ্ধি—
তখন লভিবে যোগফল। ৫৩

অর্জ্জুন। স্থিরবুদ্ধি সমাধিস্থ, কি তার লক্ষণ?
তাহার ভাষণ কিবা, আসন, গমন? ৫৪

শ্রীকৃষ্ণ। সকল কামনা, বিষয় বাসনা
ত্যজে সব তুচ্ছ গণি,
আপনি আপনে রহে তুষ্ট মনে,

স্থির-বুদ্ধির লক্ষণ। স্থিরবুদ্ধি সিদ্ধ মুনি;
দুঃখে নহে ক্লিষ্ট নহে সুখে হৃষ্ট,
স্পৃহাশূন্য নিরাময়,

কামনা বিহীন,　　　ভয় ক্রোধ হীন,
স্থিরবুদ্ধি তারে কয়। ৫৫-৫৬
স্নেহশূন্য ভবে,　　　আত্মপরে সবে,
শুভাশুভ নির্ব্বিশেষ,
নাহি অতি হর্ষ,　　　না হয় বিমর্ষ,
কারো না রাখে বিদ্বেষ। ৫৭
কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ
কোষ মধ্যে করে সংহরণ,
ইন্দ্রিয় বিষয় হতে
ইন্দ্রিয়ে তেমনি প্রাজ্ঞজন। ৫৮
উপবাসে বিষয় নিবৃত্তি হয় সত্য,
বিষয় বাসনা তবু জাগে মনে নিত্য,
ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বদর্শী, কিন্তু, যোগযুক্ত,
বিষয় বাসনা হতে হয় বিনির্মুক্ত। ৫৯
পুরুষ যে বিচক্ষণ
যতই করুক না যতন,
প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ
জোরে তবু হরে তার মন। ৬০
ইন্দ্রিয়সংযমী ধীর,
আমা পরে একান্ত নির্ভর,
সর্ব্বেন্দ্রিয়-বশী বীর
স্থিরবুদ্ধি ধন্য সেই নর। ৬১
সতত বিষয় ধ্যানে
আসক্তি জনমে, ধনঞ্জয়,
আসক্তি হইতে কাম,
কাম হতে ক্রোধের উদয়,
ক্রোধ হতে জন্মে মোহ,
মোহ হতে স্মৃতির বিভ্রম,

স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ,
বুদ্ধিনাশে নষ্ট নরাধম। ৬২-৬৩
রাগদ্বেষবিরহিত,
জিতেন্দ্রিয়, বশী, শুদ্ধচিত,
সংযমী বিষয় ভোগে
উপভোগে প্রসাদ নিয়ত। ৬৪
প্রসাদে ঘুচিয়া যায়
সর্ব্বদুঃখ সব অমঙ্গল,
প্রসন্ন যাহার চিত,
বুদ্ধি তার প্রশান্ত, নির্ম্মল।
অবশ ইন্দ্রিয় যার,
নাহি বুদ্ধি না তার ভাবনা,
অভাবুকে কোথা শান্তি
অশান্তের কি সুখ বল না। ৬৫
মন যদি ছুটি চলে
ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান
বায়ু যথা তরণী ডুবায়। ৬৬
কর তবে, মহাবাহু,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রাণপণ,
বাসনা-ত্যেয়াগী যেই
স্থিরবুদ্ধি জেন সেই জন। ৬৭
অন্যে যবে নিদ্রা যায়,
সংযমী জাগ্রত সে নিশায়,
অন্যে জাগে যে নিশায়,
মুনি সেথা সুখে নিদ্রা যায়। ৬৮
নদী বেগে ধায়, গিয়া যথা মিশি যায়,
পূর্ণকায়, স্থির, শান্ত সিন্ধু-সনে,

তেমনি কামনাচয়　　পশি যাতে পায় লয়,
সেই শান্তি পায়, নহে কামী জনে। ৬৯
সকল কামনা ত্যজি,
ছাড়িয়া মমতা, অহঙ্কার,
নিঃস্পৃহ বিচরে যেই
দুঃখ হতে পায় সে নিস্তার। ৭০
ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্ব-জ্ঞানী
নাহি হয় মোহে মুহ্যমান,
অন্তে করে মোক্ষ লাভ
পরব্রহ্মে লভিয়া নির্ব্বাণ। ৭১
ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়,

টিপ্পনী।

১৬। দেহ যাহা অসৎ তাহাই নশ্বর, আত্মা যাহা সৎ, তাহা অবিনাশী।

২৮। যেমন অব্যক্ত আদির জন্য শোক হয় না, অব্যক্ত অন্তেও তদ্রূপ।

২৯। শ্রবণা য়াপি বহুভি র্যোনলভ্যঃ
শৃন্বস্তোঽপি বহবো যন্নবিদ্যুঃ
আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ
কঠোপনিষদ।

অনেকে তাঁহার কথা শুনিতে না পায়,
শুনিয়াও অনেকে জানেনা তাঁরে—হায়!
আশ্চর্য্য সে তাঁর কথা বলিতে যে পারে,
নিপুণ সে অতিশয় লভে যে তাঁহারে,
আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞাতা; শিক্ষা লভিয়াছে
কি না জানি সুনিপুণ আচার্য্যের কাছে।
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

৩৯। সাংখ্য=ব্রহ্মজ্ঞান ও তজ্জনিত মোক্ষলাভ;
যোগ=সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ।

৪১। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, দুই ভিন্ন প্রকৃতির লোক।

৪২-৪৪। যাহারা আপাততঃ মনোহর শ্রবণরঞ্জন বাক্যে অনুরক্ত, নানাবিধ ফল প্রকাশক বেদবাক্য যাহাদিগের ঐকান্তিক প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গকেই একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞানে স্বর্গ কামনায় সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য লাভের সাধন বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশক বাক্যে যাহাদের মন অপহৃত, যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত অনুরক্ত, সেই অবিবেকী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা নহে, সমাধির সিদ্ধিলাভে তাহারা অসমর্থ।

৪৫। যোগক্ষেম=অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ।

৪৫। মূল শ্লোকটি এই—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে,
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

উদপান (ক্ষুদ্র জলাশয়) সর্ব্বতোভাবে জলপ্লুত হইলে যে অর্থ সাধিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদের মধ্যে সেই অর্থ গ্রহণ করেন।

৬২। চরিতার্থতার ব্যাঘাত জন্মিলে।

৭০। পরিপূর্ণ ও অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রে যেরূপ নদনদী সকল প্রবেশ করিবামাত্র তাহাতে বিলীন হয়, অথচ পূর্ণশান্ত সমুদ্র যেমন তেমনি থাকে, সেইরূপ যাঁহাতে কামনা সকল প্রবেশ করিবামাত্র লয়প্রাপ্ত হয়, সেই যোগীই শান্তি লাভ করেন, কামনাশীল ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন না।

৭২। এই স্থলে ও পরবর্ত্তী অন্যান্য শ্লোকে বৌদ্ধধর্ম্মের 'নির্ব্বাণ' শব্দ ব্যবহৃত দেখা যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতীর প্রশ্নচিন্তা

কয়েক মাস হইল, একবার রেলের গাড়ীতে এক প্রৌঢ় সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার নিবাস ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রের মালদ্বীপ। তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় প্রায় তিন মাস ছিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বাঙ্গালীকে কিরূপ দেখিলেন। উত্তরে তিনি বলেন, "বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্, কিন্তু বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। তাঁহার মালদ্বীপ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তথায় নিত্য-ব্যবহার্য্য সকল জিনিসই তৈয়ারি হয়। মালদ্বীপে তাম্র উৎপন্ন হয় না, এজন্য তথায় রন্ধনপাত্রাদি অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য। কিন্তু বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে বহুবিধ দ্রব্য স্বভাবতঃ পাওয়া যায়, অথচ কলিকাতার বাজারে কেবল বিলাতি-জিনিস-পরিপূর্ণ-দোকান দেখিতে পাওয়া যায়।" কথাটা কত সত্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। 'ভারতী'র প্রশ্নপৃষ্ঠা এ বিষয়ের সাক্ষী রহিয়াছে। গত শ্রাবণ মাসের 'ভারতীর' প্রশ্নপৃষ্ঠা দেখুন। বিলাতি কোন কোন পত্রিকায় প্রশ্ন ও উত্তর সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু 'ভারতী'র প্রশ্ন, বিলাতি কোন কাগজে দেখিয়াছেন কি? অমুক দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হইতেছে কি না, 'ভারতী'র প্রশ্ন এইরূপ। কোন বিলাতি কাগজে অন্যরূপ দেখিতাম। হয়ত দেখিতাম, গত দশ বৎসরে অমুক দ্রব্যের উৎপাদন কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিংবা উৎপাদনের অমুক প্রক্রিয়াটি কিরূপ, কিংবা অমুক প্রক্রিয়া অপেক্ষা কোন সুসাধ্য উপায় আছে, কি না। যাহা হউক, দেখা যাইবে যে, 'ভারতী'র প্রশ্নের কোনও দ্রব্য নির্ম্মাণ করা কঠিন নহে, অথচ প্রশ্ন হইতে বুঝা যাইতেছে, একটিও এদেশে নির্ম্মিত হইতেছে না। একটু ভাবিয়া দেখা যাউক।

ছুঁচ, সূতা, দেশলাই তিনটি জিনিসের নাম একত্র বহুকাল শুনিয়া আসিতেছি। 'ভারতী'র প্রশ্নে ছুঁচ ও দেশলাই আছে, সূতার উল্লেখ নাই। কাপড় সেলাই করিবার 'বাণ্ডিলের' সূতা এদেশে প্রস্তুত হইতেছে কি? এদেশে কাপড় বুনিবার সূতা হইতেছে, কিন্তু তাহাকে পাকাইয়া কাপড় সেলাই করিবার উপযোগী করিয়া কেহ বিক্রয় করিতেছে কি? সরু সূতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, মোটা সূতা পাকাইয়া আটা মাথাইয়া 'বাণ্ডিল' আকারে কেহ বিক্রয় করিতেছে কি? বাজারে বিলাতি বাণ্ডিল দেখিতে পাই, দেশী পাই না। অথচ দেশে সূতা আছে, এবং পাকাইবার কল তত জটিল নহে। কলের পরিবর্ত্তে হাত আছে, এবং অনেক লোকের হাত কর্ম্মের অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। সূতা রঙ্গান, পাকান, মাড় লাগান, তিনটি কাজের একটিও কঠিন নয়। কেহ কেহ নিজের প্রয়োজন মত সূতা প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকে।

মোটা ছুঁচ, কাঁথা সেলাই করিবার চট্ ও গুণ সেলাই করিবার ছুঁচ, এদেশে এখনও নির্ম্মিত হয়। যে কর্ম্মকার মোটা ছুঁচ করিতে পারে, সরু ছুঁচ করা তাহার পক্ষে অতিশয় কঠিন নহে। অবশ্য পয়সায় পঁচিশ ছুঁচ বিক্রয় করিতে হইলে উপযুক্ত যন্ত্র ও কর্ম্মবিভাগ আবশ্যক। কিন্তু দক্ষ কর্ম্মকার আবশ্যক যন্ত্রনির্ম্মাণ করিতে পারে, এবং দেশের স্থানে স্থানে দক্ষ কর্ম্মকারও আছে। যন্ত্র অপেক্ষা কর্ম্মবিভাগ অধিক আবশ্যক। পয়সায় পঁচিশ ছুঁচ বটে, কিন্তু প্রত্যেক ছুঁচনির্ম্মাণ সময়ে শতাধিক কর্ম্মকারের হাত ঘুরিয়া আসে। এদেশে কর্ম্মবিভাগ নাই বলিলেই হয়। ফল, পয়সায় পঁচিশ ছুঁচ মিলে না। কারিগরেরা এমন সোজা কথাটা বুঝে না কেন?

কয়েক মাস হইল সম্বলপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম, বিলাসপুরে (মধ্যভারত) দেশলায়ের কারখানা হইয়াছে, এবং আমরা অল্পদিন

মধ্যে দেশী দেশলাই পাইব। আজ তাহা ব্যবহার করিতেছি। এখানে (কটকে) পয়সায় তিনটা বাক্স বিক্রয় হইতেছে। বাক্সের গায়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা 'ভারতী'র দূর-প্রান্তবাসী পাঠকের নিমিত্ত উদ্ধৃত হইল।

Sulphur matches. The Amrit Match Factory. Kota (Bilaspur) C. P. made in India. Encourage native industry.

ইহা sulphur match, অর্থাৎ খস্‌খসে জায়গায় ঘষিলে জ্বলিয়া উঠে। তা উঠুক। বাজারে এইরূপ দেশলাই অধিক। কাঠিগুলি এখনও সুন্দর হয় নাই, এজন্য লেখকের সৌন্দর্য্যপ্রিয় কোন বন্ধু খুঁত খুঁত করিতেছিলেন। কেহ কেহ কানা-মামা চান না। কিন্তু তা বলিয়া অন্য লোকের সহিত সম্বন্ধ পাতান ভাল কি? আর এক সমালোচক বলিতেছিলেন, ঘোর বাদলার দিন কাঠি জ্বলে না। কিন্তু এখনও হাত কাঁচা, এবং না করিলে হাত পাকে না। যাহা হউক, বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালীর অনুষ্ঠিত কাজ স্থায়ী হয় না, মরাঠার হয় বলিয়া বিশ্বাস আছে।

এদেশে চিরুণি ও বুরুশ একবারে হয় না, এমন নহে। মোটা চিরুণি—কাঠের, শিঙ্গের, হাড়ের, হাতীর দাঁতের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হয়, এবং হয় বলিয়াই গৃহিণীর বরণডালায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠের চিরুণি সরু হয় না, মহিষের শিঙ্গের ও হাতীর দাঁতের হয়। হাতীর দাঁতের চিরুণির দাম বেশী। কাজেই মোটের উপর মহিষ-শৃঙ্গের চিরুণি অসৌখীন লোকেরা, বিশেষতঃ গ্রাম্য লোকেরা, এখনও ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা বাজারের সৌখীন বিলাতি চিরুণি অপেক্ষা অধিক দিন টিঁকে। কর্ম্মকার ভাল হইলে এবং ইচ্ছা করিলে শিঙ্গের সরু চিরুণি করিতে পারে। কিন্তু কেহ বড় একটা করে না।

এইরূপ, যে কর্ম্মকার একরকম বুরুশ. করিতে পারে, চেষ্টা করিলে সে নানারকম করিতে পারে। অথচ করে না!—আশ্চর্য্য নয়?

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম, সেখানে কোন কর্ম্মকার জর্ম্মণ-সিল্‌ভরের 'নিব' প্রস্তুত করিতেছে। তখনকার সংবাদে জানিয়াছিলাম, নিবের পরিকর্ম্ম (finish) উত্তম নহে। এখনকার অবস্থা জানি না। বোধ করি, জর্ম্মণসিল্‌ভরের নিব করিবার হেতু এই যে, লোহার নিব আধুনিক অম্লাত্মক কালিতে ক্ষয় পাইয়া মুখের কাছে ফাঁক হইয়া পড়ে। জর্ম্মণসিল্‌ভার ক্ষয় পায় না, এমন নহে। বোধ হয়, এই ধাতুতে কাজ করা সহজ বিবেচিত হইয়াছে। যাহাই হউক, নিবনির্ম্মাণ কঠিন নহে। লোহার (ইস্পাতের) যেমন নিব বাজারে পাওয়া যায়, লেখকের কোন উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত বন্ধু, তেমন নিব স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লেখককে উপহার দিয়াছেন। বন্ধুর অবসর অল্প, অধিক যন্ত্রাদি নাই, এবং হাতের অভ্যাসও নাই, তথাপি তিনি এক ঘণ্টায় এক ডজন করিতে পারেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, নিব প্রস্তুত করা তেমন কঠিন কাজ নয়।

ষ্টাইলো ও ফাউন্‌টেন পেন নির্ম্মাণ করিতে রববজাত এবোনাইট্ আবশ্যক। এবোনাইট্ প্রস্তুত করিতে যৎকিঞ্চিৎ রাসায়নিক জ্ঞান আবশ্যক হয়। এদেশে কেহ এবোনাইট্ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। রবরের কাজ হইতেছে না, এমন নহে। রবরের ষ্ট্যাম্প হইতেছে। চেষ্টা করিলে ষ্ট্যাম্প-নির্ম্মাতা এবোনাইট্ করিতে পারেন। দেশের রবর বিদেশে যাইতেছে। অল্প কিছু লইয়া 'ইরেজার' করিলে চলিত।

যাহা হউক এবোনাইটের অভাবে ষ্টাইলো ও ফাউন্‌টেন্ পেন হইতেছে না, এমন নহে। কলিকাতার বাজারে এবোনাইট্ পাওয়া যায়। পাওয়া না গেলে বিলাত হইতে আনাইতেও পারা যায়। লেখকের কোন বিশিষ্ট বন্ধুর স্বর্ণরূপা, মহিষশৃঙ্গ, গজদন্ত প্রভৃতি নানা

দ্রব্যের এক ছোটখাট কারখানা আছে। তথায় নির্ম্মিত দ্রব্য সকল মূল্যবান্, এবং সৌখীন লোকদিগের কাম্য বটে। এই সকল দ্রব্যের সহিত কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করি। তন্মধ্যে ষ্টাইলো একটি। কলিকাতার বাজারে এবোনাইট পাওয়া যায়, কিন্তু এবোনাইটে কাজ করিতে শিখিতে হয়। এজন্য ষ্টাইলো পেনের মস্যাধার, এবোনাইটের পরিবর্ত্তে মহিষের শৃঙ্গের কিংবা কোন ধাতুর করাই ভাল বোধ হয়। শেষে আলুমিনি ধাতু ঢালাই করিয়া মস্যাধার-নল প্রস্তুত হইয়াছিল। অল্প কাজ বাকি ছিল। বৎসরাবধি সেই অবস্থায় আছে। কিন্তু বুঝা যাইতেছে, ষ্টাইলো পেন নির্ম্মাণ করা কঠিন নহে। সে বৎসর কলিকাতার শিল্পপ্রদর্শনীতে কলিকাতাবাসী কোন ব্যক্তি স্বরচিত ষ্টাইলো পেন দেখাইয়াছিলেন। মনে হইতেছে, তাঁহার ষ্টাইলোর মস্যাধার এবোনাইটের ছিল। এবোনাইটে কাজ করিতে শিখিলে সস্তায় সরু চিরুণিও হইতে পারিত।

লোহা, পিতল, শিঙ্গ, খুর, হাড়ের বোতাম করাও কঠিন নহে। এদেশে কোন কোন স্থানে শিঙ্গের বোতাম প্রস্তুত হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি কুঁদিয়া প্রস্তুত হওয়াতে খরচ অধিক পড়ে। যন্ত্রী থাকিলে সামান্য যন্ত্রসাহায্যে ও অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ে এখন অধিক লিখিব না। কেহ প্রস্তুত করিবার চেষ্টায় আছেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এক রকম পেন্‌সিল দেখিয়াছিলাম। মনে হইতেছে, সে পেন্‌সিলের লিখিবার 'সীস' উত্তম ছিল, কিন্তু সীসটুকু কাঠের ভিতরে না থাকিয়া কাগজে জড়ান থাকিত। ছুরি ধারাল না হইলে ঐ কাগজ সুন্দররূপে কাটিতে পারা যাইত না। শুনিয়াছিলাম, সে পেন্‌সিল বোম্বায়ে প্রস্তুত হইত। এখন তাহাও দেখিতে পাই না।

লেখকের পূর্ব্বোক্ত শিক্ষিত বন্ধু পেন্‌সিলের 'সীস' প্রস্তুত করিয়া

লেখককে উপহার দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'সীস' টুকু প্রস্তুত করা কঠিন নহে। উহার নিমিত্ত যে 'কৃষ্ণসীস' বা গ্রাফাইট আবশ্যক হয়, তাহাও দুর্মূল্য নহে। দেশের গ্রাফাইট ছাড়িয়া দিলেও, দেশের পাশেই সিংহলে উৎকৃষ্ট গ্রাফাইট পাওয়া যায়, এবং গুণী লোকেরা তথা হইতে অন্য দেশে লইয়া যায়। বাঙ্গালীর ঘরের পাশেই পেন্সিলের কাঠ পাওয়া যায় না। কিন্তু দেশেই সিডার (Cedar) কিংবা জুনিপার (Juniper গাছ আছে। তা ছাড়া অন্য কাঠ বাছাই করাও চলে।

দেশে সিগারেট ঢুকিয়া অল্পদিনের মধ্যে কেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা বালকদিগের মুখ দেখিলেই বুঝিতে বাকি থাকে না যতদিন টিনের কৌটায় সিগারেটের তামাক বিক্রয় হইত, ততদিন বরং রক্ষা ছিল। এখন কলিকাতা ছাড়িয়া দূরবর্ত্তী নগরেও তৈয়ারি সিগারেট বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু সকলে জানে না, অল্প মূল্যের সিগারেট কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট বলিয়া যে তামাক চুরুট তৈয়ারির অযোগ্য, সেই তামাকে নানাবিধ মসলার জল মিশাইয়া, সিগারেট করা হইয়া থাকে। একবার 'ল্যানসেট' নামক প্রসিদ্ধ ডাক্তারি পত্রিকায় প্রায় কুড়িটি মসলার নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই শরীরের অহিতকর। মনে হইতেছে, শেঁকো বিষও ছিল। তাই বলি, যদি তাম্রকূটসেবন অবশ্য করিতে হইবে, দেশের প্রসিদ্ধ তামাক খাওয়াই ভাল। যদি সিগারেটই টানিতে হইবে, বেশী দামের কিনিয়া শরীরটা বাঁচান ভাল।

স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে, সস্তার বিলাতি জিনিস প্রায়ই খারাপ। সস্তার জিনিস ব্যবহারের পূর্ব্বে ভাবা উচিত, বিলাতে খাদ্যদ্রব্য সুলভ কি না। সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনব্যয় এদেশের অপেক্ষা কম কি ? কলে প্রস্তুত বলিয়া কোন কোন দ্রব্য সুলভ মনে হইতে পারে। কিন্তু 'খারাপ মাল' না চালাইলে অধিক সুলভ হইতে পারে না।

এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। আর একটা দেওয়া যাইতেছে। গায়ে মাখিবার সাবান একখানা এক পয়সায় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি গায়ে ক্ষার ঘর্ষণ করা সাবান মাথার উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে সস্তার ক্ষারী সাবান দূরে ফেলাই কর্ত্তব্য। তথাপি এরূপ সাবান্ বাজারে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, 'ইণ্ডিয়ার' একটি গুণ আছে;—এদেশে খারাপ মাল যেমন চলে, অন্য দেশে নাকি তেমন চলে না।

প্রসঙ্গক্রমে সাবান তৈয়ারির কথা মনে পড়িল। গত এণ্ট্রাস পরীক্ষার সময় পুরী হইতে একটি বালক এখানে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল। পরীক্ষাশেষে সে একখানি সুন্দর, সুঘ্রাণ, যথোচিত-তৈলময় সাবান লেখককে উপহার দিয়াছিল। সে সাবান তাহার নিজের হাতের তৈয়ারি। অতএব বুঝা যাইতেছে, সাবান তৈয়ারি করিতে অধিক বিদ্যা বুদ্ধি লাগে না। কিন্তু যাহা দরকার, তাহা বাঙ্গালীর আছে কি ?

এইরূপ অসংখ্য জিনিসের নাম করা যাইতে পারে। যাঁহারা কলের অভাবে কিছু করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা কিছু করিতে চান না। যাঁহারা দেশে কলের অভাব দেখিয়া "হাহতোস্মি" করিতেছেন, তাঁহারা অধিক কলার সংবাদ লয়েন নাই। কল বিনা কলার উন্নতি হয় না, একথাও সত্য নহে। অনেক জিনিস হাতে তৈয়ারি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বেড়াইবার ছড়ী ধরুন। দেশে ছড়ীর কাঠ আছে, এবং অল্প ছড়ী তৈয়ারি হইতেছে। তথাপি কলিকাতার ন্যায় বাজারে সুঠাম ছড়ীর নিমিত্ত বিলাতের ভরসা করিতে হয়। মান্দ্রাজে (ঠিক জায়গাটি মনে হইতেছে না;) অতি সুন্দর ছড়ী হয়। বিশাখাপত্তনে সাদা কাঠের ও চন্দন কাঠের মূল্যবান্ সুঠাম ছড়ী হয়। কটকে মহিষ শিঙ্গের ছড়ি হয়। পুরুলিয়ায় বাঁশের ও কাঠের ছড়ী হয়। এইরূপ

নানাস্থানে হইলেও, কলিকাতায় হঠাৎ পাওয়া যায় না। কলিকাতায় যাহা হয়, তাহা নিকৃষ্ট। বলা বাহুল্য ছড়ি হাতে হয়; তাহার নিমিত্ত কলকারখানার আবশ্যক হয় না। তথাপি এত বিলাতি ছড়ী বিক্রয় হইতে দেখি কেন?

উপরে যতগুলি জিনিসের নাম করা গিয়াছে, দেশে যন্ত্রী থাকিলে, তাহাদের অধিকাংশ অক্লেশে প্রস্তুত হইত। যদি একটি মাত্র বিদ্যার নাম করিতে হয়, যাহার অভাবে বা অবনতিতে দেশের অবস্থা দ্রুত-বেগে অধোগত হইতেছে,—তাহা যন্ত্রবিদ্যা (mechanics)। কর্ম্মকারগণ এ দেশের যন্ত্রী। কিন্তু নানাকারণে কর্ম্মকারকুল কমিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি 'সেন্‌সস্‌ রিপোর্ট' দেখিবার সুযোগ নাই; কিন্তু বোধ হইতেছে জাতিতে কর্ম্মকার থাকিলেও ব্যবসায়ে কর্ম্মকার কম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে পশ্চিমবঙ্গে যত কামারবংশ ছিল, এখন তত নাই। ইহার কারণ যাহাই হউক, ফলে যন্ত্রীর অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নিমিত্ত এই 'ভারতী'তে ম্যান্নুয়েল ট্রেনিং স্কুল বা কারুকর্ম্মশালা স্থাপনের আবশ্যকতার উল্লেখ করা গিয়াছিল। কেবল যন্ত্রী থাকিলেই পয়সায় পঁচিশ ছুঁচ পাওয়া যাইবে না। যে গুণে বিলাতে পঁচিশ ছুঁচ মিলে, সে গুণ বাঙ্গালীর আছে কি? যদি না থাকে, সে গুণ লাভ করা যাইতে পারে কি? দেশের স্থানে স্থানে যাহা কিছু যন্ত্রী দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও যদি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইত! দেশে রেল, ষ্টীমার চলিতেছে, কিন্তু কলাজাত দ্রব্য চলে না। ইহার প্রতিকার কি, এবং কে করিবে?

এদেশের যাবতীয় কলাজাত দ্রব্যেরই প্রসার দিন দিন কম হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রধান কয়েকটি কারণ এই,—(১) দেশের হাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে। এখন কলাজীবীরা চাষ ও চাকরিতে মনোযোগী হইতেছে। (২) অভাব হইলে, অভাবের পূরণ হয়। বিদেশীয় কলা-

জীবীর উদ্যোগে আমরা অভাব বোধ করিবার সুযোগ পাইতেছি না। (৩) এখন আমাদের প্রাচীন রুচি নাই। কিন্তু দেশীয় কলাজীবীরা আমাদের রুচি পরিবর্ত্তনে দৃক্‌পাত করিতেছে না। তাহারা মনে করিয়া আছে, মান্ধাতার আমল এখনও চলিতেছে। (৪) আমরা,—ক্রেতারা—দেশী জিনিস কিনিতে গেলেই, কম দাম দিতে চাই।

প্রথমোক্ত তিনটি কারণ সকলেই বুঝিয়াছেন। শেষোক্তটি সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইবেন। অনেকের কাছে কথাটা নূতনও ঠেকিতে পারে, এবং হয়ত বিলাতি ও দেশী ধুতি-শাড়ীর দৃষ্টান্ত তাঁহাদের মনে আসিবে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে কথাটা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। যে জিনিস এদেশে হয়, এবং বিলাত হইতেও আসে, এমন জিনিসের কারিগরকে জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাইবেন। দেশীর বেলা কম দাম দিতে চাই বলিয়া আমরা দেশের কত অনিষ্ট করি, তাহা সকলে ভাবেন না। কম দাম হইবে বুঝিয়া কারিগর জিনিসের বাহ্য চাক্‌চিক্যের দিকে মন দেয় না। কিন্তু আমরা ঐটিই বুঝি ভাল; বোধ হয় আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন জিনিসের অন্য দোষগুণ বুঝি না। বিলাতি নামের গুণেও আমরা মোহিত হই। নতুবা এদেশীয় কোন কোন দোকানদার নিজের নাম ছাড়িয়া বিলাতি নামে দোকান চালাইতেন না?

মোটের উপর নিরক্ষর কারিগরের যত না ত্রুটি, শিক্ষিত ভদ্রলোক-দিগের তদপেক্ষা অধিক। ইহাঁরা দেশের অবস্থা বুঝেন, কারিগরেরা বুঝে না। ইহাঁরা মনোযোগী হইলে অবস্থা ফিরাইতে পারেন, কারি-গরেরা নিরাশ্রয় দুঃখী। বাস্তবিক এ বিষয় যতই ভাবা যায়, দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রতি সম্মান ততই কমিয়া যায়। অথচ ইহাঁরাই দেশের জন্য চীৎকার করিয়া থাকেন। কারিগরেরা কাঁদে না, অদৃষ্টের দোষ দিয়া যথাকর্ত্তব্য করিয়া থাকে। তাহারা কষ্ট পায়, কিন্তু কষ্টের

জন্য কাহাকেও দোষী করে না; কারণ দোষ অদৃষ্টের। আমরা অ-দৃষ্ট মানি না, কিন্তু দৃষ্টকেও গ্রাহ্য করি না। তবু দেশের উন্নতি হইবে?

কোন কারিগর দেখিলে আমরা, ভদ্রলোকেরা দূরে সরিয়া যাই; ভয়, পাছে তাহার গায়ে গা ঠেকে। রেলের গাড়ীতে অনেকবার দেখা গিয়াছে, সমান পয়সা দিয়া বেচারা গাড়ীতে ঢুকিতে চায়, আমরা দশজন "এ গাড়ী নয়," "এ গাড়ী নয়" বলিয়া তাহাকে ঢুকিতে দিই না। এইরূপ, নানা সময়ে দেখা যায়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনুরাগ ত নাই-ই, বরং বিদ্বেষ আছে। কিন্তু কাহার বিদ্বেষ কে করে?

কারিগরেরা হাত, শিক্ষিতেরা মাথা। হাত নিজের মনে চলিয়াছে, মাথা উঁচু হইতে দেখিতেছে। মাথা হাতকে নীচু মনে করে; হাত মাথার কথায় ভুলিয়া নিজেকে নীচু মনে করিতে শিখিতেছে। মাথার ধনবল আছে, নিজের কল্যাণের নিমিত্ত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতেছে। হাতের ধনবল নাই, বুদ্ধি বিবেচনা নাই; নিজের কল্যাণচিন্তা পরের হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে। যে বড়, যে জ্ঞানী, তাহার নামা উচিত নয় কি?

প্রাচীনসমাজ এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে গ্রাম-সম্পর্ক নাই; কামার দাদা, কুমার জ্যেঠা—শিক্ষিতের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের তারতম্য ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু শিক্ষিত কি নিজের পয়সায় শিক্ষিত হইয়াছেন? কোন সরকারি কলেজে পড়েন নাই, ইহা নিশ্চিত। যাহারা শিক্ষিতের শিক্ষার নিমিত্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে, তাহারা শিক্ষিতের নিকট হেয় হয়। ইহা অপেক্ষা দুর্গতি হইতে পারে কি? আর কথা বাড়াইয়া ফল কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

নন্দোৎসব।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের প্রভাবে বিলক্ষণ অনুপ্রাণিত ; এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলা অপেক্ষা ব্রজলীলার বিশেষ পক্ষপাতী। সেই জন্যই নন্দোৎসব জন্মাষ্টমী অপেক্ষা বঙ্গে অধিক আদৃত।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় জন্মগ্রহণ করিলে রাত্রিযোগে তদীয় পিতা বসুদেব তাঁহাকে বৃন্দাবনে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়া যান। পরদিন প্রাতে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, গোপরাজ নন্দের গোপপ্রজাগণ যে অর্ঘ্যসম্ভার উপহার দিয়া নিজেদের আনন্দপ্রকাশ ও নন্দরাজকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল, সেই উৎসবই এখন পর্য্যন্ত নন্দোৎসব আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে।

বঙ্গে বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের যে কয়টি প্রধান আবাসভূমি আছে, সে গুলিকে ভক্তগণ শ্রীপাট কহিয়া থাকেন। শ্রীপাট খড়দহ, শ্রীরামপুর, মালিপাড়া, জীরাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ ইত্যাদি। এতন্মধ্যে অদ্য ইহাদের অন্যতম শ্রীপাট জীরাটের নন্দোৎসবের চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিব।

হুগলি হইতে আট ক্রোশ উত্তরে শ্রীপাট জীরাট গঙ্গাতীরে অবস্থিত। "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনে" উক্ত শ্রীপাটের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গা-দেবীর বংশজাত রামকানাই গোস্বামী প্রথম আবাস স্থাপন করিয়া গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত রাম কানাই গোঁসাই সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ও তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক শক্তির গল্প কহিয়া তাঁহার মূর্খ বংশধরেরা গর্ব্বে স্ফীত হইতে থাকেন। বর্ত্তমান গোস্বামীগণ রামকানাইর বংশধর এজন্য তাঁহারা প্রভু সন্তান

(নিত্যানন্দ প্রভু) বা গঙ্গাসন্তান বলিয়া অন্যের সম্প্রদায় অপেক্ষা বড় হইবার দাবী রাখেন।

জন্মাষ্টমীর দিন পূজা ও অভিষেক ভিন্ন অন্য কোন উৎসব হয় না। পরদিন অতি প্রত্যূষ প্রত্যেক গৃহে একটা সাড়া পড়িয়া যায়; গৃহিণী প্রাতঃস্নান করিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য মটর, কলাই, মুগ, খেরবটী প্রভৃতি শস্য ভিজান, শশা, কলা, আতা, আক, আম, আনারস, প্রভৃতি নানা প্রকার সুপ্রাপ্য দুষ্প্রাপ্য ফলমূল, মেওয়া ইত্যাদি থালে থালে প্রচুর পরিমাণে সাজাইয়া প্রস্তুত করেন; প্রাচুর্য্যের কারণ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, এবং আশা করি আমরাও অতঃপর জানিতে পারিব। পরিবারের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা কেহ বা চালের গুঁড়া করিতে ব্যস্ত, কেহ একটা চুবড়ি উপুর করিয়া নাচে একটা থাল পাতিয়া তালের আঁটি ঘসিয়া মাড়ী বাহির করিতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে।

চালের গুঁড়া ও তালের রস গুড় সংযোগে তৈলের উপর বড় আকারে ভার্জ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল, ময়দা লুচির আকার প্রাপ্ত হইল, গৃহ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। ক্রমশঃ বৈকাল হইল।

তখন সামগ্রী সকল ঠাকুরবাড়ী লইয়া যাওয়ার তাড়া পড়িয়া গেল। মন্ত্র-দীক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ও উপবীতী পুরুষেরা থালা সজ্জিত সকল উপকরণ বহন করিতে লাগিল।

এদিকে মন্দিরের চাঁদনিতে বা নাটমন্দিরে বেদীর উপর গোপীনাথ বিগ্রহ বিচিত্র সাজে শ্রীরাধিকাকে বামে লইয়া একটু হেলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যদি একটু মাথায় মাথা স্পর্শ হয়। বেদীনিম্নে 'দীর্ঘস্থান'টি ভরিয়া ভক্তগণের নানাবিধ ভোজ্য স্তরে স্তরে প্রসাদ হইবার জন্য রক্ষিত

আবশ্যক। জীয়াট, বল্যাগড়ের মধ্যে চারিঘর মাত্র বিশেষ অধিকারসম্পন্ন গোস্বামী আছেন, তাঁহারাই কেবল নন্দঘোষ বাহির করিতে পারেন। প্রত্যেকের অনুরক্ত প্রধান গোপ গোস্বামী গৃহিণীর ভাল বেণারসী শাড়ী পরিধান করে, এবং একটা সাদা চাদর লম্বালম্বি ভাবে পাকাইয়া (যথা উকিল বাবুদের দোছোট) কোমরে বাঁধিয়া দুই প্রান্ত দুই উরুতে জড়াইয়া বাঁধে, এরূপ বেশ যাত্রাদলের কৃষ্ণের দেখা যায়। তৎপরে গৃহিণীর তাবিজ, যশম, বাজু, চিক, লবঙ্গফুল, নারিকেল ফুল, গোট, প্রভৃতি গহনায় ভূষিত হইয়া, মস্তকের পাগড়িতে আম্র পল্লব গুঁজিয়া, স্কন্ধে ভার গ্রহণ করিয়া নন্দরাজ হইলেন। ভারের দুই দিকে দুইটি হাঁড়িতে দধি ও হরিদ্রার এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ রক্ষিত, তদুপরি আম্র পল্লব। সকলের বাড়ী হইতে এই স্ত্রী পুরুষের মিশ্রিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া নন্দরাজ 'বাধাই' গাহিতে গাহিতে চলিতে থাকেন, সঙ্গে তাঁহার দলের গোস্বামী কুল 'দোহারী' করিতেছেন ; অবশেষে চারিদল একত্র মিলিত হইয়া গান আরম্ভ করে। এই সকল গান প্রতি বৎসর নূতন রচিত হইয়া থাকে, এবং মান্যবর ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত স্বভাব-কবি ৺ডাক্তার হরিপ্রসাদ ঐ সকল গানের রচয়িতা ছিলেন। অনুপ্রাস ও যমকের ঘটায় গোস্বামী কুলের যে ভাব আসিত তাহা জয়দেব চণ্ডিদাসের ভক্ত ভিন্ন অন্যের সহজে বোধগম্য নহে।

ভাবোন্মাদে সকলে গান করিতেছে, ঝর ঝর ঝর শরতের বৃষ্টি নামিল, ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবল নন্দরাজদিগের মাথায় ছত্র—পাছে বহু মূল্য বস্ত্রাদি নষ্ট হইয়া যায়। দীক্ষাগুরু শিষ্যের মস্তকের উপর ছত্র ধরিয়াছেন, গোপ যে কৃষ্ণের পালক বংশ, তাই তাহাদের আজ এত সম্মান, এবং গোপবংশধরও সেইজন্য আজ গুরুদেবের সেবা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। গান করিতে করিতে সকলে ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গনে উপস্থিত, গান শেষ হইবা মাত্র নন্দরাজগণ স্ব স্ব ভার ভূমে ফেলিয়া ত্বরিত পদে অন্তর্দ্ধান হইলেন, এবং সকল ভক্ত বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সেই দধিহরিদ্রার মিকৃশ্চারের ছোড়াছুড়ি হুড়াহুড়ির মধ্যে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, মহা আনন্দের কলরব গ্রামখানিকে ধ্বনিত করিয়া গঙ্গার শুভ্র সৈকতের উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়া গেল।

উৎসব সাঙ্গ হইল; অভিষিক্ত জনগণ স্নান করিতে গেল। গৃহে গৃহে প্রসাদ বণ্টনের ধূম লাগিয়া গেল। প্রত্যেক গৃহস্থ প্রত্যেক প্রতিবেশী ও পাড়া-বাসীর গৃহে লুচি, বড়া, ফলমূল, মটর কলাই প্রভৃতির আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। গ্রামের ইতর শ্রেণীর লোকেরা প্রতি গৃহদ্বারে সমবেত হইতে লাগিল এবং হাস্যমুখে একখানি লুচি, একটি বড়া, দুটিখানি ছোলামটর প্রীতিদান প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গৃহান্তরে যাইতে লাগিল। দরিদ্রের ক্ষুধা মিটাইতে গৃহস্থের নিজস্ব ও প্রাপ্ত পরস্ব সকলই নিঃশেষ হইয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহাতেই নিজেরা সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদ পাইল।

বঙ্গের এই শুভ উৎসব দেখিয়া সূর্য্য হাস্যদীপ্ত মুখে অস্ত যাইলেন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজসেবায় হিন্দু ও মুসলমান।

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের ধারণা এই যে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা অনেক রাজকর্ম্ম বা চাকরী হইতে বঞ্চিত আছেন, এবং এই কারণে তাঁহারা হিন্দুদিগের প্রতি যত বিরক্ত, এত বোধ হয় আর কোন কারণেই নয়।

অল্পদিন হইল আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র একটী মুসলমান যুবক, একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ভূতপূর্ব্ব Inspector General খাঁ বাহাদুর দিলোয়ার হোসেন সাহেবের সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় সমালোচনায় পরিপূর্ণ। একস্থানে লিখিত ছিল, দিলোয়ার হোসেন সাহেব হিন্দুদিগের ভয়ে (for fear of Hindu cliques) তাঁহার অধীনে মুসলমানদিগকে চাকরী দেন নাই। পড়িয়া আমি লেখককে জিজ্ঞাসা করিলাম 'আমাদের রাজা কি হিন্দু?'

উ। না।

প্র। গবর্ণরজেনারেল কিম্বা লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর হিন্দু?

উ। না।

প্র। দিলোয়ার হোসেন সাহেবের ঊর্দ্ধতন অন্য কোন রাজপুরুষ হিন্দু?

উ। না।

প্র। তবে হিন্দুর পরিবর্ত্তে মুসলমানকে চাকরী দিলে উপরিস্থ কর্ম্মচারীর বিরাগের কোন ভয় ছিল না?

উ। না।

প্র। অপরাপর হিন্দুসাধারণকে ভয় করিবার কোন কারণ ছিল

(নিত্যানন্দ প্রভু) বা গঙ্গাসন্তান বলিয়া বঙ্গের অন্যান্য গোস্বামী সম্প্রদায় অপেক্ষা বড় হইবার দাবী রাখেন।

জন্মাষ্টমীর দিন পূজা ও অভিষেক ভিন্ন অত রাত্রে আর বিশেষ কোন উৎসব হয় না। পরদিন অতি প্রত্যুষ হইতেই গ্রামের প্রত্যেক গৃহে একটা সাড়া পড়িয়া যায়; গৃহিণী প্রাতঃস্নান করিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য মটর, কলাই, মুগ, বেরবটী প্রভৃতি শস্য ভিজান শশা, কলা, আতা, আক, আম, আনারস, প্রভৃতি নানা প্রকার সুপ্রাপ্য দুষ্প্রাপ্য ফলমূল, মেওয়া ইত্যাদি থালে থালে প্রচুর পরিমাণে সাজাইয়া প্রস্তুত করেন; প্রাচুর্য্যের কারণ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, এবং আশা করি আমরাও অতঃপর জানিতে পারিব। পরিবারের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা কেহ বা চালের গুঁড়া করিতে ব্যস্ত, কেহ একটা চুবড়ি উপুর করিয়া নাচে একটা থাল পাতিয়া তালের আঁটি ঘসিয়া মাড়ী বাহির করিতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতেছে।

চালের গুঁড়া ও তালের রস গুড় সংযোগে তৈলের উপর বড় আকারে ভর্জ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল, ময়দা লুচির আকার প্রাপ্ত হইল, গৃহ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। ক্রমশঃ বৈকাল হইল।

তখন সামগ্রী সকল ঠাকুরবাড়ী লইয়া যাওয়ার তাড়া পড়িয়া গেল। মন্ত্র-দীক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ও উপবীতী পুরুষেরা থালা সজ্জিত সকল উপকরণ বহন করিতে লাগিল।

এদিকে মন্দিরের চাঁদনিতে বা নাটমন্দিরে বেদীর উপর গোপীনাথ বিগ্রহ বিচিত্র সাজে শ্রীরাধিকাকে বামে লইয়া একটু হেলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যদি একটু মাথায় মাথা স্পর্শ হয়। বেদীনিম্নে 'দীর্ঘস্থান'টি ভরিয়া ভক্তগণের নানাবিধ ভোজ্য স্তরে স্তরে প্রসাদ হইবার জন্য রক্ষিত

হইতেছে। কোন্ ভক্ত সেবার বাহাদুরী দেখাইয়া অধিক প্রসাদ লাভ করিবে, যেন তাহারই চেষ্টা প্রাঙ্গনময় দেদীপ্যমান্ যখন সকলের বাড়ীর শীতল নৈবেদ্য আসিয়াছে সাব্যস্ত হইল, তখন মহা চেঁচামেচির মধ্যে আরতি ও ভোগ নিবেদন সমাধা হইল, সকলে আবার শীতল নৈবেদ্য বহিয়া গৃহে আনিতে লাগিল।

এক্ষণে নন্দঘোষ বাহির হইলেন। ইঁহার একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। জীরাট, বলাগড়ের মধ্যে চারিঘর মাত্র বিশেষ অধিকারসম্পন্ন গোস্বামী আছেন, তাঁহারাই কেবল নন্দঘোষ বাহির করিতে পারেন। প্রত্যেকের অনুরক্ত প্রধান গোপ গোস্বামী গৃহিণীর ভাল বেণারসী শাড়ী পরিধান করে, এবং একটা সাদা চাদর লম্বালম্বি ভাবে পাকাইয়া (যথা উকিল বাবুদের দোছোট) কোমরে বাঁধিয়া দুই প্রান্ত দুই উরুতে জড়াইয়া বাঁধে, এরূপ বেশ যাত্রাদলের কৃষ্ণের দেখা যায়। তৎপরে গৃহিণীর তাবিজ, যশম, বাজু, চিক, লবঙ্গফুল, নারিকেল ফুল, গোট, প্রভৃতি গহনায় ভূষিত হইয়া, মস্তকের পাগড়িতে আম্র পল্লব গুঁজিয়া, স্কন্ধে ভার গ্রহণ করিয়া নন্দরাজ হইলেন। ভারের দুই দিকে দুইটি হাঁড়িতে দধি ও হরিদ্রার এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ রক্ষিত, তদুপরি আম্র পল্লব। সকলের বাড়ী হইতে এই স্ত্রী পুরুষের মিশ্রিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া নন্দরাজ 'বাধাই' গাহিতে গাহিতে চলিতে থাকেন, সঙ্গে তাঁহার দলের গোস্বামী কুল 'দোহারী' করিতেছেন; অবশেষে চারিদল একত্র মিলিত হইয়া গান আরম্ভ করে। এই সকল গান প্রতি বৎসর নূতন রচিত হইয়া থাকে, এবং মান্যবর ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত স্বভাব-কবি ৺ডাক্তার হরিপ্রসাদ ঐ সকল গানের রচয়িতা ছিলেন। অনুপ্রাস ও যমকের ঘটায় গোস্বামী কুলের যে ভাব আসিত তাহা জয়দেব চণ্ডিদাসের ভক্ত ভিন্ন অন্যের সহজে বোধগম্য নহে।

কি? তাঁহারা কি দিলোয়ার হোসেন সাহেবের কোন ক্ষতি করিতে পারিতেন?

উ। না।

প্র। তবে কি হিন্দু সম্পাদকের সমালোচনায় ভয় ছিল?

উ। হাঁ, তাই বটে।

প্র। যদি হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান কর্ম্মপ্রার্থী অধিকতর যোগ্য হইতেন, তবে কি সম্পাদকগণ নিন্দা করিতে পারিতেন?

উ। না।

প্র। সমান যোগ্যতা স্থলেও যদি হিন্দুকে উপেক্ষা করিয়া মুসলমানকে চাকরী দিতেন, তাহা হইলেও কি সম্পাদকগণ তাঁহার দোষ দিতে পারিতেন?

উ। না।

তখন আমি পুনরায় বলিলাম 'তবেই তোমায় স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুর তুল্য শিক্ষিত মুসলমান কর্ম্মপ্রার্থী উপস্থিত ছিলেন না, এবং তদবস্থায় মুসলমান নিযুক্ত না করাই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে।' যুবক নির্ব্বাক হইলেন।

চাকরী বিষয়ে হিন্দুদের সম্বন্ধে মুসলমানদিগের কিরূপ কুসংস্কার, এই আখ্যায়িকা হইতেই তাহা অনুমান করা যায়। ফলতঃ এবিষয়ে হিন্দুগণ যত নিরপরাধ তত বোধ হয় মুসলমানদের অন্য অভিযোগ সম্বন্ধে নহে। চাকরী না পাওয়ায় যদি কাহারও অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সে মুসলমানদের নিজেদেরই অপরাধ; হিন্দুরও নয় বা অন্য কাহারও নয়।

নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুসারে নিজ হিতসাধন করিবার অধিকার এজগতে সকলেরই আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ বা আইন-বিরুদ্ধ কিছু না করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধি বা দক্ষতা দ্বারা আমি

অর্থোপার্জ্জন করিলে আমাকে দোষ দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। যিনি অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম, তিনি ভারতবাসী হইলে নিজ অদৃষ্টের, আর ইউরোপীয় হইলে নিজ বুদ্ধিহীনতা, অপটুতা বা অন্যের দোষ দিতে পারেন; কিন্তু সক্ষমের দোষ দেওয়ার কোনও হেতু দেখা যায় না। হিন্দুগণ আপনাদের যত্নবলে উপার্জ্জনশীল হন; আর মুসলমানগণ আপনাদের আলস্য বা অন্যকারণে দারিদ্র্য ভোগ করেন। ইহা কি হিন্দুর অপরাধ?

সর্ব্বসাধারণের আয়ত্ত চাকরীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লাভ ও সম্মানজনক চাকরী ওকালতী, ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারী। বঙ্গদেশে যে শ্রেণী এই তিন কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন, অন্য শত চাকরী পাইলেও তাঁহাদের অবস্থা ও সামাজিক মর্য্যাদা বিশেষ উন্নত হইবে না। কারণ, সকল চাকরীরই ক্ষেত্র অতি সংক্ষিপ্ত এবং আয়ও অল্প; কিন্তু এই তিন চাকরীর ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং আয় প্রভূত। অধিকন্তু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পক্ষে ওকালতীর ন্যায় কাজ বোধ হয় সংসারে দ্বিতীয় নাই; ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারীও সে বিষয়ে বিলক্ষণ সহায়তা করে। আর মোটামুটী হিসাবে কোন সমাজে সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের অস্তিত্ব বিলক্ষণ অনুকূল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, হিন্দুগণ কি মুসলমানদিগকে এই সকল চাকরী হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন? কোন মুসলমান বি, এল পাশ করিলে কি হিন্দুর সাধ্য আছে যে তাঁহাকে আদালতে ঢুকিতে দিবেন না? কোন মুসলমান ডিস্পেন্সারী খুলিলে কি হিন্দুগণ তাহা বন্ধ করিতে পারেন? মুসলমান রোগীদিগের আত্মীয়দিগকে অপরিচিত ও অনাত্মীয় হিন্দু চিকিৎসককে স্বগৃহে কেন আহ্বান করিতে হয়? এ সকলের জন্য মুসলমানেরা নিজেরাই দায়ী, হিন্দু প্রতিবেশীরা নয়।

এপর্য্যন্ত কোন মুসলমান ইঞ্জিনিয়ারের নাম আমরা শুনি নাই;

অথচ প্রতি বৎসর কত হিন্দু যুবক ইঞ্জিনিয়ার হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়; অথচ আজ পর্য্যন্ত মৌলবী জোহিরুদ্দীন ও আকবর খাঁ ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান ডাক্তারের নাম কর্ণগোচর হইল না। হিন্দু উকীল, মুন্সেফ ও সব্‌জজ অগণিত; কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রেও মুসলমান অতি বিরল। কোন জিলা কোর্টের ৭০।৮০ জন উকীলের মধ্যে হয়ত ৫।৭ জন মাত্র মুসলমান বাহির হইবেন। উকীল নাই, তাই মুসলমানের মধ্যে মুন্সেফ এবং জজও নাই।

মুসলমানগণ মেডিকাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নিজ নিজ সন্তানদিগকে শিক্ষাদান করেন না। সাধারণ উচ্চশিক্ষাও বেশী মুসলমানে লাভ করেন না; বি, এ, পরীক্ষার ফল দেখিলেই তাহা সুস্পষ্ট হয়। এইরূপে আপনাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষালোক হইতে সুদূরে রাখিয়া তাঁহারা চাকরী হইতে বঞ্চিত আছেন; তাই ওসব চাকরীতে হিন্দুদিগের প্রায় একচেটিয়া ভোগদখল দেখা যায়। কাজেই এ সকল চাকরী করিতে না পারাতে, মুসলমানদের হিন্দুদিগের প্রতি দোষারোপ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই।

মুসলমানগণ বলেন দরিদ্রতাবশতঃ তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। তর্কানুরোধে মানিলাম একথা যথার্থ। কিন্তু তাহাতে কি হিন্দুদের কোন অপরাধ হয়? বরং এই কথা হিন্দুদেরই পক্ষসমর্থন করে। মুসলমানেরা দরিদ্র, তাই তাঁহারা লেখাপড়া করিতে পারেন না, কাজেই তাঁহাদের চাকরী না পাওয়াই স্বাভাবিক; হিন্দুগণ তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন না। তারপর, এই দারিদ্র্যের উজুহাত কতদূর সঙ্গত, তাহাও সন্দেহের বিষয়। সাধারণ ভাবে মুসলমানেরা হিন্দুদের অপেক্ষা দরিদ্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ব্যয় বহনের যোগ্য ধনী মুসলমান কি জিলাপ্রতি ৫।৭ জনও

মিলে না? আর সাধারণ উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত ধনীও কি মুসলমান সমাজে নাই? শিক্ষার সঙ্গে ধনের সম্পর্ক আছে যথার্থ; কিন্তু বঙ্গদেশে এখনও শিক্ষা এবং ধনের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। নাম করা অনুচিত, অন্যথা আমরা নাম করিয়াই দেখাইতে পারিতাম যে, বঙ্গবিখ্যাত হিন্দু জজ, উকীল, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনেকে প্রায় ভিক্ষা করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছেন। এখনও ঘোর দরিদ্র বহু হিন্দুছাত্র স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। মোটের উপর ধনী অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত নির্ধন হিন্দুরাই অধিকতর সুশিক্ষিত। তাই বোধ হয় দারিদ্র্যই মুসলমানদিগের শিক্ষার একমাত্র বা প্রধান বাধা নয়।

মুসলমানদিগের শিক্ষার অন্তরায় গুলির উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ প্রধানতঃ কৃষিব্যবসায়ী। ইহাদের অধিকাংশই কোন কালেও লেখাপড়ার দিকে বেশী ঝোঁক দেয় নাই। কাজেই Law of heredity অনুসারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের ন্যায় তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশ হয় নাই; তাই তাঁহারা হিন্দুদের ন্যায় উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ নহে। সকলেই জানেন শিক্ষিত হিন্দুদিগের অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীভুক্ত; নিম্নশ্রেণী সমূহ তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম নহে। ইহাই বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানদিগের বান্দীরাখার প্রথা যুবক দিগের শিক্ষার অনেক ব্যাঘাত করিয়াছে। কোন কোন সুশিক্ষিত পদস্থ মুসলমানের সহিত আলাপ করিয়া ইহা জানিয়াছি। তৃতীয়তঃ, সক্ষম হিন্দুগণ সর্ব্বদাই দুঃস্থ হিন্দুদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন; কিন্তু মুসলমানসমাজে এই স্বজন পোষণের ভার অতি অল্প। এই কারণে অনেক বুদ্ধিমান্ মুসলমান বালকের লেখাপড়া হয় না। হিন্দু হইলে তাদৃশ অবস্থায় কিছুতেই লেখাপড়া বন্ধ হইত না। ইহার

পরে দারিদ্র্যও একটা প্রতিবন্ধক বটে। সম্প্রতি বঙ্গীয় মুসলমানদিগের শিক্ষার আর একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক দাঁড়াইয়াছে, পরে তাহার আলোচনা করিব।

যাহা হউক, চাকরী সম্বন্ধে মুসলমানগণ হয় ত বলিবেন যে, ওকালতী প্রভৃতি হইতে উচ্চশিক্ষার অভাবে বঞ্চিত থাকিলেও সামান্য কেরাণীগিরি প্রভৃতি তাঁহারা হিন্দুদের দরুণই পান না; অর্থাৎ, হিন্দু রাজপুরুষগণ স্ব স্ব অধীনে হিন্দু কেরাণীই নিযুক্ত করেন, তাই মুসলমানের চাকরী ঘোটে না। এই অভিযোগ অংশতঃ যথার্থ; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে।

এ বিষয়ে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে এখন পর্য্যন্ত হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীরই ন্যায়পরতার জ্ঞান এরূপ বিকাশিত হয় নাই যে, তাঁহারা নিজ কাজ ও দেশের কাজের সম্পূর্ণ পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন। আরও দীর্ঘ কাল শিক্ষাবিস্তার ও রাজনীতিতে শিক্ষানবিশী ভিন্ন এ বিষয়ে প্রতিকার হইবেনা। মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুদেরও এ সম্বন্ধে অভিযোগ আছে।

কিছুকাল গত হইল একজন শিক্ষিত মুসলমানের সহিত কংগ্রেস-সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কংগ্রেসে আপনারা যোগ দেন না কেন?'

উ। 'দুই কারণে কংগ্রেসে যোগ দেই না। প্রথমতঃ, হিন্দুদের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিব না; দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুদের নিকট আমরা ন্যায় ব্যবহার পাইব না।

প্র। প্রতিযোগিতায় হারিবার ভয় কেন করেন?

উ। মুসলমানগণ অশিক্ষিত।

প্র। মুসলমানেরা কি শিক্ষালাভ করিবে না?

উ। যখন করিবে, তখন প্রতিযোগিতায় পারিব; কিন্তু এখন সে অবস্থা নয়।

প্র। হিন্দুদের অন্যায়াচরণের ভয় কেন করেন ?

উ। হিন্দু রাজপুরুষগণ মুসলমানদের চাকরী দেন না।

প্র। মুসলমান রাজপুরুষগণও ত হিন্দুদের চাকরী দেন না।

উ। তা বটে ; কিন্তু তাতে মুসলমান-সাধারণের উপকার নাই। যে সকল মুসলমান কেরাণীগিরি পায়, তারা মুসলমান রাজপুরুষদের আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব।

প্র। হিন্দু রাজপুরুষগণ যাহাদের চাকরী দেন, তাহারাও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব মাত্র।

উ। তা সম্ভব ; কিন্তু বাহির হইতে আমরা এই মাত্র দেখি যে, হিন্দুর নিকট মুসলমান চাকরী পায়না।

বস্তুতঃ কেরাণীনিয়োগ করিতে কেহ হিন্দুমুসলমান ভেদ করেন বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। অধিকাংশ স্থলেই আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভেদ হইয়া থাকে।

মুসলমানেরা জানেন কি না বলিতে পারি না, হিন্দুমাত্রেই জানেন, যে কোন জাতিবিশেষভুক্ত কোন ব্যক্তি কোন আফিসের বড়কর্ত্তা হইলে সেই জাতিবহির্ভূত হিন্দুর সে অফিসে প্রবেশ করা কঠিন হইয়া উঠে।

এ বিষয়ে মুসলমানেরাও ন্যায়পরতার দাবী করিতে পারেন না। এমন মুসলমান কর্ম্মচারী দেখা গিয়াছে, যাঁহার অধীনে উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুর পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত মুসলমান নিযুক্ত হইতেছেন, এবং যত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন, তন্মধ্যে হিন্দু খুঁজিয়া পাওয়া ভার। হিন্দু রাজপুরুষের সংখ্যা অধিক বলিয়াই তাঁহাদের দোষ জাজ্বল্যমান হয় এবং মুসলমান রাজপুরুষদের দোষ অন্তরালে থাকে।

মুসলমানদিগের ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অন্ততঃ ইতিপূর্ব্বে সুশিক্ষিত হিন্দুকর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যার তুলনায় তাদৃশ শিক্ষিত মুসলমান কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যাও অতি অল্প ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে দেখিতে পাই, মুসলমান জমিদারদিগের কর্ম্মচারিবৃন্দ প্রায় সমস্তই হিন্দু, মুসলমান অতি অল্প। তাই বোধ হয়, হিন্দু রাজপুরুষগণ যে সুধু মুসলমানবিদ্বেষ বশতঃ হিন্দু কেরাণী নিযুক্ত করেন, মুসলমানদিগের এরূপ মনে করা ভ্রান্তিমূলক; অবশ্যই তাহার অন্য কারণ আছে। অন্যথা মুসলমান জমিদারগণ কেন মুসলমানের পরিবর্ত্তে হিন্দু দেওয়ান, নায়েব, তহশীলদার, গোমস্তা প্রভৃতি নিযুক্ত করিবেন?

মুসলমানদিগের চাকরী প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার আলোচনা করা অনিবার্য্য। প্রায় বিশ বৎসর হইল, ঢাকাবিভাগের তদানীন্তন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন সাহেব ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে কোন এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। একজন মুসলমান সেই সভায় উপস্থিত হইয়া তীব্র ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য এই ছিল যে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদের শিক্ষার জন্য অনেক করিতেছেন, কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কিছুই করিতেছেন না। এই অভিযোগে মনে হয়, যেন হিন্দুমাত্রেই গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বিনা বেতনে পড়িতে পায়, অথবা যেন গবর্ণমেণ্ট হিন্দুছাত্রদের পুস্তকাদি কিনিয়া দেন, অথবা যেন এ দেশের স্কুল-কলেজগুলিতে মুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ।

যাহা হউক, এই সকল অভিযোগ আজকাল তত শুনা যায় না; কারণ এখন গবর্ণমেণ্ট যেন প্রাণপণে বঙ্গীয় হিন্দুর প্রতি বৈমুখ ও মুসলমানের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনে তৎপর। সব্‌-রেজেষ্টারীতে মুসলমানগণ প্রায় একচেটিয়া পাইয়াছেন; স্কুল সব্ ইন্‌স্পেক্টরীতেও কিয়ৎ পরিমাণে তাই। ঢাকাবাসী পুলিস সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর হইতে পারিবে না হুকুম হইয়াছিল, কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে সে হুকুম রদ হইয়াছে। তারপর ডিপুটীগিরিতেও অনুগ্রহে যতদূর চলে, ততদূর

মুসলমান প্রবেশ করিতেছেন। অন্যান্য অনেক কাজেও খালি হইলেই শুনিতে পাই মুসলমান নিযুক্ত হইবে, হিন্দুর আবেদন অনাবশ্যক। যাহা হউক, যদিও গবর্ণমেণ্টের শ্রেণীবিশেষের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ নিতান্ত দোষাবহ মনে করি, তবুও মুসলমানদের প্রতি ইহাতে আমরা বিরক্ত নই; কারণ তাঁহারা যদি গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ পান, তবে কেন ভোগ না করিবেন?

কিন্তু এই সকল চাকরী মুসলমান-সমাজের উপকার কি অপকার করিতেছে, ঠিক বলা যায় না। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্ট কখনও ইংরেজের লভ্য কোন পদ, অনুগ্রহ করিয়া মুসলমানকে দিবেন বলিয়া আশা করিতে পারি না। কাজেই সব্‌রেজেষ্টারী কি সব্-ইন্‌স্পেক্টরী দ্বারা সমাজের বিশেষ কি গৌরব বৃদ্ধি হইবে? ধনীর ভুক্তাবশিষ্ট দ্বারা দরিদ্রের কথঞ্চিৎ সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে; তাহাও সন্দেহ স্থল। পরন্তু তাহাতে কখনও পুষ্টি জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মনে হয়, এই সকল চাকরী মুসলমান যুবকদিগকে যেন শৃঙ্খলিত করিয়া তাঁহাদের উন্নতির প্রতিকূলতা করিতেছে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে বালকদিগকে লেখাপড়ার জন্য তাড়না করিলে অনেক সময়ে মা আসিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক সক্রোধে বলিতেন—'থাক এরূপ লেখা পড়ায় কাজ নাই; আর না হয়, দারোগাগিরি করিয়া খাইবে।' সেইরূপ মুসলমানদিগেরও এখন সব্‌রেজেষ্টারী করিয়া খাওয়ার বিলক্ষণ আশা দেখা যায়। প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ বহু মুসলমান ছাত্র ও যুবকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে ও হইতেছে। ইঁহাদের মনে এই কথা বদ্ধমূলভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, 'আর না হয়, এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিতে পারিলেই হয়; তবেই একটা সব্‌রেজেষ্টারী জুটিবে।' ফলতঃ এই সকল চাকরীর আশা মুসলমানসমাজে উচ্চশিক্ষা প্রবেশের ঘোর অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের শক্তি বিকশিত হইতে পারিতেছে

না। সহজে জীবিকানির্ব্বাহ হইলে কে কঠোর চেষ্টা করে? আর কঠোর চেষ্টা ব্যতীত কখনও প্রতিভাস্ফূরণ হয় না। যে অবস্থায় অনেক মুসলমান ছাত্র এণ্ট্রান্স ফেল হইয়া স্কুল ছাড়েন, তদবস্থায় হিন্দুছাত্র বি, এ, পাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না।

তারপর মনোনয়নে ডিপুটী-নির্ব্বাচনও মুসলমানসমাজের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ কি না সন্দেহ। যোগ্যতম ব্যক্তিদিগের উচ্চতম পদলাভই সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের হেতুভূত। কিন্তু মনোনয়নে কখনও যোগ্যতম ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইতে পারেন না। মনোনয়নে যে সকল মুসলমান ডিপুটী নিযুক্ত হইতেছেন, তদপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোক কি মুসলমানসমাজে নাই? ন্যায়তঃ কি তাঁহাদেরই ডিপুটী হওয়া উচিত ছিল না? অধিকন্তু, হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে তীব্র চেষ্টাবশতঃ তাঁহাদের যে সকল গুণাবলী বিকশিত হইত, মনোনয়নে তাহাও হইতেছে না। প্রতিযোগিতায় মুসলমানগণ প্রথমে হারিতে পারিতেন; কিন্তু প্রতি পরবর্ত্তী বৎসর তাঁহারা হিন্দুদের অধিকতর সমকক্ষ হইতেন। ফলতঃ, সহজলভ্য চাকরী মুসলমানসমাজের উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং অনুগ্রহ-লব্ধ কৃতকার্য্যতা দ্বারা আত্মচেষ্টা-জনিত কৃতকার্য্যতার সম্মানও মুসলমানগণ পাইতেছেন না।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিহঙ্গ ও ব্যাধ।

ভরতপক্ষী।

কণ্ঠভরা কাকলি ছিল, কাকলি সুধামাখা,
কণকজিনি চঞ্চু ছিল, রজতজিনি পাখা ;
সরিৎ ছিল সলিল ভরা, কানন ভরা ফল,
অন্তহীন আকাশ ছিল, ডানায় ছিল বল ;—
কিরাত, ওরে কিরাত, তোর করিয়াছিনু কি ?
কি লাগি মোরে নিঠুর ডোরে করিলি বন্দী !
আপন মনে, গহন বনে বাঁধিয়া নীড় সুখে,
শক্তিহীন শাবকগুলি যতনে পালি' বুকে,
সকালে সাঁঝে মেঘের মাঝে, গলাটি দিয়া খুলি,
যেতাম গাহি আপন মনে আপন গানগুলি।
ভুলিয়া কভু কাহারো কোন ক্ষতি ত করিনি,
তবে কিরাত, তুই কি লাগি মোরে করিলি বন্দী।
গিয়াছি ভুলি মুক্তি-সুখ, গিয়াছি ভুলি গান,
শীর্ণ ম্লান ভগ্ন পাখা, কণ্ঠাগত প্রাণ,
বদ্ধগতি দৃষ্টি' পরে ঘনায় ছায়াঘোর ;—
এহেন দশা করিয়া বল্ কি সুখ হয় তোর ?

সিংহরাজ ব্যাধ।

হাসিয়া তবে কহিল ব্যাধ হায়রে পাখি, হায়,
কল্পিত এ দুঃখ তোর শুনিয়া হাসি পায়।
ব্যবসা মোর পক্ষিধরা—অর্থলাভ তরে,—
কাতর কথা, করুণ স্বরে ভুলাতে চাস্ মোরে !

এত যে বেশী যত্ন ক'রে রেখেছি তোরে তবু,
নিন্দা করা স্বভাব খানি গেল না তোর কভু ?
স্বর্ণময় পিঞ্জরেতে আরামে কর বাস,
সময় মত আহার জল জুটিছে বার মাস,
বৃষ্টিধারা ঝরেনা হেথা, ঝটিকা নাহি বয়,
বায়স নাহি পশিতে পারে, রাজার নাহি ভয়,
চিন্তাহীন, চেষ্টাহীন মাথাটি গুঁজি বুকে,
দীর্ঘ দিবা রাত্রি ধরি নিদ্রা দাও সুখে ;
ভুলিয়া গিয়া অর্থহীন পুরাণ গানগুলি,
কেবল হেথা গাহিতে হয় নূতন শেখা বুলি।—
হায়রে অকৃতজ্ঞ পাখি, ইহারে কহ দুখ ?
ক্ষুদ্র মুখে বৃহৎ কথা—একি বড় কৌতুক !

শুনিয়া পাখী মৌন রহে, নয়নে ঝরে জল,
কিরাত ভাবে পাখী আমার এতও জানে ছল !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

লঙ্কেশ্বর রাবণ।

কীর্ত্তিবাস-রচিত রামায়ণগানে আমরা রাবণের যে পরিচয় পাই, তাহা হইতেই তাঁহার চরিত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা প্রথমতঃ বিকৃত হইয়া যায়। কলুষিতচরিত্র, রৌদ্ররূপী, যথেচ্ছাচারী প্রভৃতি পৌনঃপুনিক বর্ণনাপাঠে আমাদের চিত্ত বাল্মীকিবর্ণিত রাবণ-চরিত্রের চিত্র গ্রহণ করিতে একান্ত অশক্ত। রাবণের লঙ্কাপুরীর অসামান্য সৌন্দর্য্য, বঙ্গকবি কীর্ত্তিবাসের লেখনীতে শ্রীহীন ও মন্দপ্রভ হইয়াগিয়াছে। তবে একথাও স্বীকার্য্য যে, স্থলে স্থলে, কীর্ত্তিবাস ও বাল্মীকির বর্ণনার যৎসামান্য পার্থক্যই লক্ষিত হয়।

মেঘনাদবধের অমর কবি লঙ্কাপুরীর যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলেখ্য আঁকিয়া গৌড়বাসীর আজন্ম-বদ্ধমূল কুসংস্কারস্থলে রাক্ষসজাতির প্রতি সাহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা কবির মৌলিক কল্পনা নহে; বাল্মীকিরই অনুসরণে। অধুনা প্রত্নতত্ত্বের ভূরি আলোচনায়, রাক্ষসজাতি সম্বন্ধে আমরা এক নূতন ধারণা গড়িয়া লইয়াছি। 'আর্য্যবংসাবতংস রামচন্দ্র অনার্য্যসেবিত দক্ষিণভূমে আর্য্য সভ্যতার প্রচার করেন'; এইরূপ অভিনব কল্পনাপূর্ণ পুস্তক বিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে। সুদূর অতীতে বর্ত্তমানের, ভিন্ন জাতির মধ্যে আপনাদের, কোনরূপ সাদৃশ্য আবিষ্কারই, মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ফিজিদ্বীপ-পুঞ্জে একরূপ নরমাংসভুক 'বর্ব্বর'জাতির অস্তিত্বদর্শনে রাবণকেও সেই রাক্ষসজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অনেকেই উৎসুক। ফলতঃ তাহা ঐতিহাসিক প্রগল্ভতা মাত্র।

এই সমস্ত অমূলক কল্পনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া ৺ মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধে বহু কথা বলিয়াছিলেন।

বাস্তবিক, আমাদের বিশ্বাস রামায়ণাভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই এই কথার প্রতিধ্বনি করিবেন। রামায়ণে, রাক্ষসজাতির উৎপত্তিকথায় ঐতিহাসিক আভাষ পাওয়া যায়। অবশ্য, পৌরাণিকী বার্ত্তা বলিয়াই যে, ঐতিহাসিকের নিকট তাহা একেবারে উপেক্ষনীয়, একথা তাদৃশ যুক্তিযুক্ত মনে করি না। উল্লেখ আছে, ভগবান্ রামচন্দ্র কৌতূহলী হইয়া, মহর্ষি অগস্ত্যকে রাক্ষসজাতির উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে অগস্ত্য কহিলেন।—

প্রজাপতিঃ পুরাসৃষ্ট্বা অপঃ সলিল সম্ভবঃ।
তাসাং গোপায়নে সত্ত্বান সৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ॥
তে সত্ত্বাঃ সত্ত্ব কর্ত্তারং বিনীত বদুপাস্থিতাঃ।
কিং কর্ম্ম ইতি ভাষন্তঃ ক্ষুৎপিপাসা ভয়ার্দ্দিতাঃ॥
প্রজাপতিস্তু তান্ সর্ব্বান্ প্রত্যাহ প্রহসন্নিব।
আভাষ্য বাচা যত্নেন রক্ষধ্ব মিতি মানবাঃ॥

কীর্ত্তিবাসে ইহার ভাবার্থ লিখিত হইয়াছে। যথা,—

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আগে সৃজিলেন্ প্রাণী॥
প্রাণিগণ বলে ব্রহ্মা করি নিবেদন।
কোন্ কার্য্যে আমা সবা করিলে সৃজন॥
ব্রহ্মা কন যত প্রাণী করিব উৎপত্তি।
তোমরা করিবে রক্ষা প্রাণের শকতি॥
যে যে প্রাণী সৃজন করিব এ সংসারে।
তোমরা প্রধান হয়ে পালিবে সবারে॥

অতঃপর, যাহারা 'রক্ষা করিব' ("রক্ষামঃ") বলিয়া স্বীকার করে, তাহারাই রাক্ষস নামে অভিহিত হয়। এই মাত্র রাক্ষস উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে।

বিষ্ণুপুরাণেও ঐ মত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে সমর্থিত হইয়াছে।

মৈবং ভোরক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তুতে।
উচুঃখাদাম ইত্যন্যে যেতে যক্ষাস্তুজক্ষণাৎ॥

শ্লোক কয়টী পাঠে তৎকালীন ভারতবাসিগণ রাক্ষসজাতিকে যে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না, তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। আমরা Cannibal বুঝিতে যাহা বুঝি, রাক্ষসজাতি তাহাপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উদ্ধৃত শ্লোক কয়টী যদি কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদের চক্ষে পড়িত, তবে তিনি নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক স্বরে বলিতেন, জীবজগতে মানবই শেষবর্ণিত জীব নহে; রাক্ষসই তাহার শেষ"। আমাদের মনে হয়, রাক্ষসজাতি 'মানবা'পেক্ষা উচ্চতর; অথবা সভ্যতা ও বলবীর্য্যশৌর্য্যভূয়িষ্ঠ। কারণ, যখন জগৎসৃষ্টজীবকুলের কর্ত্তৃত্ব-প্রাধান্য রাক্ষসজাতির উপর আরোপিত হইল, তখন তাহারা মানবাপেক্ষা গরিষ্ঠ, একথা স্বতঃই প্রসিদ্ধ হইল। দ্বিতীয়তঃ, রাবণ বরগ্রহণকালে "নর" এ কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন, অথবা তাদৃশ উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

"কেণিব্যাল" ও রাক্ষস।

সেই রাক্ষসকুলে হেতি ও প্রহেতি নামে ভ্রাতৃযুগল জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ; তপস্যাহেতু তপোবনে গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠ, দারপরিগ্রহ করিয়া বিদ্যুৎকেশ নামক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। তৎপুত্র সুকেশ গন্ধর্ব্ব-কন্যা দেববতীর পাণিগ্রহণ করিয়া মাল্যবান সুমালী ও মালী পুত্রত্রয় প্রাপ্ত হইলেন। এই উদ্বাহে রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব-শোণিত মিলিত হইল। তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া মেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় লব্ধবর হইয়া, দক্ষিণ সাগরোপকূলস্থ স্বর্ণতোরণ-বিভূষিত, শত্রুদুর্জ্জয় লঙ্কাদুর্গে আগমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বংশপরম্পরায় বাস ক্রমে লঙ্কার অধিবাসী মধ্যে পরিগণিত হইলেন। রাবণ এই বংশেরই বংশধর।

বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও বংশবিস্তার।

লঙ্কায় উপনিবেস স্থাপন।

আর্ষকাব্যোক্ত এই সত্য লইয়া, আমরা যতটুকু ন্যায়সঙ্গত অনুমান করিতে অধিকারী, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় রাক্ষস জাতির আদিম নিবাস জম্বুদ্বীপ,—ভারতবর্ষ। পরে বংশবিস্তার হইলে, তাঁহারা লঙ্কাদ্বীপ, তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করেন। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞভূমিতে মারীচ, মলদ ও কারুষ (বর্ত্তমান ভাগলপুরের সন্নিকটস্থ স্থান) প্রদেশে তাড়কা, অগস্ত্যাশ্রমে খরদূষণ আদি রাক্ষসবংশের কচিৎ শ্রুত-প্রসঙ্গ পাঠে আমাদের অনুমান সত্যসঙ্গত বলিয়া দৃঢ়তর প্রতীত হয়।

রাক্ষসজাতির আদিম নিবাস।

পূর্ব্বোক্ত মধ্যম পুত্র সুমালীর কন্যা কৈকসী (কীর্ত্তিবাস উক্ত 'নিকসা') পুলস্ত্যতনয়, ব্রহ্মবাদী বিশ্রবা মুনির আরাধনা করিয়া তিন পুত্রের প্রসূতি হইলেন। জ্যেষ্ঠ রাবণ, মধ্যম কুম্ভকর্ণ, কনিষ্ঠ বিভীষণ। বিভীষণের অগ্রজদ্বয় যে, ভবিষ্যতে অধর্ম্মপরায়ণ ও বিভীষণ ধার্ম্মিক হইবেন, মুনি এ কথা পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যৌন-নির্ব্বাচন-প্রথার ইষ্টানিষ্টের কি সুচতুর ব্যাখ্যা।

রাবণের জন্ম।

রাবণের শৈশবেই বীর-সুলভ উৎসাহ ও প্রাবল্য লক্ষিত হইয়াছিল। একদা রাবণের ভ্রাতা (জ্ঞাতিসূত্রে) কুবের চারুদর্শন রথে আরোহণ করিয়া পিতৃসন্নিধানে আগমন করেন। তৎকালে, রাবণজননী পুত্রকে, কুবেরের ঐশ্বর্য্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "বৎস তোমার ঈদৃশ হীনাবস্থা, ভ্রাতার বিপুল বিভবের সহিত তুলনা কর; যাহাতে তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পার, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন হও।" মাতৃবাক্যপ্রবুদ্ধ রাবণ সন্তপ্তচিত্তে গোকর্ণাশ্রমে মহতী তপস্যার জন্য গমন করিলেন; এবং উৎকট সাধনায় পূর্ণমনোরথ হইয়া লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাবণের শৈশব।

রাবণের লঙ্কাত্যাগের অব্যবহিত পরেই, রাজ্যমধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব

উপস্থিত হইল। রাক্ষসবংশ গতবীর্য্য হইয়া সিংহাসন হারাইয়া লঙ্কা ত্যাগ করিলে, রাক্ষসলক্ষ্মী যক্ষগণের অঙ্কশায়িনী হইলেন; এই সময় রাজা হইলেন—যক্ষপতি কুবের। দীর্ঘকাল গতে রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যের বিপরীত অবস্থা পরিদর্শন করিলেন। তাঁহার মাতামহ সুমালী সচিবসহ রাবণকে রাজ্যোদ্ধারের জন্য কাতর অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-বলে বা যে উপায়েই হউক, রাক্ষসবংশের পুনঃস্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইতে কহিলেন। আর কহিলেন, "রাবণই তাঁহাদের অধিপতি হইবেন।"

লঙ্কায় বিশৃঙ্খল।

রাবণ, গুরুজনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সমস্ত উপরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। বিজ্ঞ মাতামহ ভাবিলেন, বৎস সম্প্রতি তপস্যা করিয়া সাধু হইয়া উঠিয়াছে; রাজনীতির আস্বাদন পাইলে সব শ্লথ হইয়া আসিবে। নষ্টসিংহাসন পিতামহ রাজনৈতিক চাল চালিতে লাগিলেন।' কূটবুদ্ধি মন্ত্রী প্রহস্তকে রাবণের পশ্চাতে নিয়োগ করিলেন। প্রহস্ত কহিতে লাগিলেন,—"মহাবাহো, শূরগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র নাই!" ঔষধে সুফল ফলিল; রাবণ অন্তরে অন্তরে প্রহৃষ্ট হইলেন। হায় রাজ্যপিপাসা!

রাবণের অনুশংসতা।

রাবণ কুবেরের সন্নিকটে দূতপ্রেরণ করিলেন। কুবের লঙ্কা পরিত্যাগে অসম্মত হইয়া কহিলেন, "আমার যে রাজ্য পুরী আছে, তাহা রাবণকে উপভোগ করিতে বল।" নানা কারণে, কুবের রাবণের বলবীর্য্য বিবেচনা করিয়া অবশেষে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

রাবণের দূত প্রেরণ।

লঙ্কা উদ্ধার সমাপ্ত হইল। মৃগয়াশক্ত রাবণ একদিন ভ্রমণকালে ময়দানবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। দানব তখন কন্যা-দায়গ্রস্ত। বরান্বেষণে বয়স্থা কন্যাসহ ভ্রমণ করিতে-

লঙ্কা উদ্ধার ও রাবণের বিবাহ।

ছিলেন। রাবণ তাঁহাকে দায় হইতে মুক্ত করিয়া, তাঁহার জামাতা হইলেন। পরে দানবের দৌহিত্র হয়, নাম মেঘনাদ; তাহার মাতার নাম মন্দোদরী। বাঙ্গালার 'বিলক্ষণ পণ্ডিত' রসিক কীর্ত্তিবাস বালিপুত্র অঙ্গদের মুখে, রাবণের প্রতি এই উপহাসটুকু আরোপ করিবার লোভসম্বরণ করিতে পারেন নাই :

> মা তোর রাক্ষসীরে ব্রাহ্মণ তোর পিতা।
> তুই বিভা করিলি বেটা দানব-দুহিতা॥
> কুম্ভনসী ভগ্নী তোর দৈত্য নিল হরে।
> কয় জেতে তুই বেটা দেখ্ মনে করে॥ লঙ্কাকাণ্ড।

বাস্তবিক, প্রত্নতত্ত্ববাদীর নিকট এটি একটি কূটপ্রশ্ন। বলবীর্য্য-প্রদীপ্ত রাবণ, ক্রমে নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ; তৎসহ নানা অত্যাচারও আরম্ভ করিলেন। রাবণের জনক পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন, "রাবণ সুদুরাচার হইবে ;" এ কথা ক্রমেই সত্যে পরিণত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজ্য অধিকারীই যে দুরাচার, এ কথা অবশ্য বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। এই সময় হইতে রাবণের দিগ্বিজয় ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। প্রথম সমর হইল পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী কুবেরসহ। এই সংগ্রামে রাবণ সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হন, কিন্তু প্রবল উদ্যমে তাঁহার জয়লাভ হয়। রাবণ জয়শ্রী স্বরূপ পুষ্পকবিমান গ্রহণ করেন। কৈলাস হইতে প্রতিগমন করিয়া তিনি বহুতর যুদ্ধে দুর্ম্মদ্ ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করেন।

রাবণের দিগ্বিজয়।

রাবণ বহু নরপতিকে পরাভূত করিয়া অবশেষে কিষ্কিন্ধ্যাধীপ বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করেন ; কিন্তু শোচনীয় লাঞ্ছনার সহিত সন্ধি করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী হৈহয় রাজ্যের রাজধানী মাহিষ্মতি পুরী আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারেও তাঁহাকে পরাজয়

ভারতবাসীর নিকট, রাবণের পরাজয়।

স্বীকার করিতে হয়। উভয়ে সন্ধিস্থাপন করিয়া রাবণ গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

রাবণের চরিত্র।

ভগ্নীর প্ররোচনায়, সীতা হরণ করিয়া রাবণের পরিণাম কি হইয়াছিল, জগতের সকল লোকই তাহা অবগত আছেন। এস্থলে পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর বলিয়া নিরস্ত হইলাম। তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া সমাপ্তি করিব। রাবণ প্রথমতঃ অতি সুশীল ছিলেন; কিন্তু যৌবনে রাজ্যস্পৃহা, ভোগাশক্তি তাঁহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। তিনি বীর ছিলেন—যাহাকে সর্ব্ববাদিসম্মত বীর বলা যায়, তিনি সেইরূপই ছিলেন—তেজস্বী, সাধ্যায়-নিয়ত, রাজনীতিজ্ঞ ও তপস্বী ছিলেন। যদিও যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে তাঁহার সংযম কচিৎ শিথিল হইয়াছিল, তথাপি আমরা যেরূপ গভীর কলুষ-কালিমায় তাঁহার স্মৃতি অবলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি, তিনি ততদূর পাপভাক্ না হইতে পারেন। রামায়ণে একস্থলে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে;—

রাজর্ষি বিপ্র-দৈত্যানাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
রক্ষসাংচাভবন্ কন্যাস্তস্য কাম বশঙ্গতা॥ ৬৯।
যুদ্ধকামেনতাঃ সর্ব্বা রাবণেন হৃতাস্ত্রিয়ঃ।
সমদা মদনেনৈব মোহিতাঃ কাশ্চিদাগতাঃ॥
ন তত্র কাশ্চিৎ প্রমদা প্রসহ্য বীর্য্যোপপন্নেন গুণেন লব্ধাঃ।
ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্ব্বা বিনাবরার্হাং জনকাত্মজাস্তু॥ ৭১

সুন্দরাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

অর্থাৎ রাবণের পত্নীগণমধ্যে কেহ বিপ্র, কেহ দৈত্য, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ বা রাক্ষসের কন্যা ছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে বরণ করিয়াছিল। তিনি কাহাকেও বা যুদ্ধহেতু হরণ করিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও বলপূর্ব্বক হরণ করেন নাই। জনকদুহিতা ভিন্ন, আর কোন সভর্ত্তা বরবর্ণিনীকে হরণ করেন নাই।

বলা বাহুল্য সীতার পাতিব্রত্যধর্ম্ম অশোক বনে অক্ষুণ্ণ ছিল।

যদিও বিপ্রকন্যা রাক্ষসের পত্নী হওয়া অসম্ভব, কিন্তু রাবণের মাতা ব্রাহ্মণ বলিয়া, তাঁহার ব্রাহ্মণকন্যা-বিবাহে অধিকার ছিল।

"অস্য ব্রহ্ম রাক্ষসত্বাৎ অস্তি বিপ্রকন্যা বিবাহেৎ ধিকারঃ"। রামানুজকৃত টীকা।

রাবণ সাধারণ রাক্ষস হইতে উন্নত থাকিলেও, "রাক্ষসের ধর্ম্ম" ত্যাগ করেন নাই। বলপূর্ব্বক যোষিৎহরণ রাক্ষসজাতির ধর্ম্মানুগত। এজন্য ঐরূপ দুষ্কর্ম্ম জন্য তাঁহাকে নিতান্ত দোষভাগী করিতে পারি না। তিনি 'বেদ-বেদান্ত' অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি শিবোপাসক ছিলেন। রামায়ণে উল্লেখ আছে, তিনি লিঙ্গপূজা করিতেন। বলা বাহুল্য, পুরাণে এ কথার সমর্থনসূচক ইতিহাস বিরল নহে।

লঙ্কা রাজ্য।

লঙ্কারাজ্যের অবস্থিতি কোথায় ছিল?—ইত্যাদি নানা কূটপ্রশ্ন অধুনা শুনা যাইতেছে। এই প্রশ্ন উদ্ভবের কারণ, পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থে 'সিংহল' ও 'লঙ্কা' দুইটী নাম সম্পূর্ণ পৃথক্‌কৃত রহিয়াছে। অনেকের মতে, সুমাত্রাই লঙ্কা, বা অন্য কোন নিকটস্থ দ্বীপ; কিন্তু আমাদের মনে হয়, সুমাত্রা না হইয়া বর্ত্তমান Ceylon সমীপবর্ত্তী কোন অদৃশ্য দ্বীপই লঙ্কা ছিল। এইরূপ অনুমানে রামায়ণোক্ত বর্ণনার আংশিক সঙ্গতি রক্ষা হয়। প্রাচীন কাব্যকার বা পুরাণ-প্রচারকগণ অঙ্কগণনকালে, বৌদ্ধ না হইলেও, শূন্যবাদের প্রতি অধিক মাত্রায় পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন। সুতরাং তাঁহাদের যোজনাদির সংখ্যা পরিমাণ মত দেশনির্ণয় ইদানীন্তন কোনও অপক্ষপাত গণিতবেত্তার সামর্থ্য নাই। যাহা হউক, রামায়ণে লঙ্কাপুরীর যে রমণীয় চিত্র দেখিতে পাই, তাহা বর্ত্তমান 'প্রাসাদপুর'। কলিকাতা দূরে থাক্, লণ্ডন প্যারি অপেক্ষাও উজ্জ্বল।

'মণি-বিদ্রুম-বৈদূর্য্য-মুক্তাবিরচিত' তোরণ প্রাচীরাদির কথা এস্থলে

অনুল্লেখ করিলেও ক্ষতি নাই; কারণ, "লঙ্কায় সোণা সস্তা" এ প্রবাদ এ দেশে এখনও জীবিত আছে। তবে দুর্গাদির বিষয় উল্লেখ যোগ্য। যথা—

মহতী রথ সংপূর্ণা রক্ষোগণ নিষেবিতা ॥ ১০।
বাজিভিশ্চ সুসংপূর্ণাসাপুরী দুর্গমাপরৈঃ।
দৃঢ়বদ্ধ কপাটানি মহাপরিঘ বন্তি চ।
চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ ॥ ১১।
তত্রেষুপল যন্ত্রানি বলবন্তি মহান্তি চ।
আগতঃ পরসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্য্যতে ॥ ১২।
দ্বারেষু সংস্কৃতাভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ।
শতশো রচিতাবীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাং গণৈঃ ॥ ১৩।
দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ।
যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপংক্তিভিঃ ॥ ১৬।

ইত্যাদি লঙ্কাকাণ্ডে, ৪র্থঃ সঃ।

ভাবার্থ। লঙ্কা-বহুরথগজবাজিপূর্ণা দুর্গম পুরী। চারিটি মহাদ্বার মহাপরিখা বেষ্টিতা। নানাবিধ কামান, যন্ত্র, গোলাগুলি (পাঠক! হাসিবেন না) draw bridge সেতু, জলপূর্ণপরিখা, উচ্চ প্রাচীরসমন্বিতা। কলিকাতায় দুর্গ দেখিয়া, পাঠক, একবার এই বর্ণনাগুলি মিলাইয়া দেখিবেন কি?

এই সমস্ত বর্ণনাপাঠে, লঙ্কা, অসভ্য নরমাংসভোজী Cannibal প্রদেশ, কাহার মনে এই ধারণা স্থান পায়? কাহার মনে উদয় হয় রাবণ অনার্য্য, * যখন স্পষ্টতঃ উক্ত রহিয়াছে তিনি ক্ষত্রিয়?

কাহার মনে উদয় হয়, রামরাবণের যুদ্ধ পাহাড়লোফা আর বৃক্ষসঞ্চালন ক্রীড়া মাত্র? কাহার মনে স্থান পায়, রামচন্দ্রকে যুদ্ধকালে অতি কঠোর দুদ্ধর্ষ বৈরীপক্ষের সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

* সীতা, রাবণকে দু একবার 'অনার্য্য' বলিলে ইন্দ্রজিৎ রামকে 'অনার্য্য' বলিয়াছিল। যখন Vice-Versa তখন 'অনার্য্য' কথা বোধ হয় গাল্যগালির ভাষা হইবে। অনার্য্য কি তখন 'ছোটলোক' অর্থে ব্যবহৃত হইত? লেখক।

কাহার মনে কল্পনা আইসে যে, রামচন্দ্র দক্ষিণে ভূমি সভ্য করিতে বিচরণ করিয়াছিলেন? হইতে পারে, রাময়ণের উক্তি আজ কাল স্বপ্নচিত্রবৎ, তথাপি কে বলিতে পারে, ভারত যখন স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহাদের কার্য্যকলাপ, চিন্তাপ্রণালী বিস্ময়াবহ ও ঊর্দ্ধমুখী হইত না?

উপসংহার রাক্ষসজাতির বিবরণ আলোচনা করিলে বোধ হয়, রামচন্দ্রকর্ত্তৃক তাহারা নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছিল। কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রশ্ন উপসংহারকালে অনুসন্ধনীয় বলিয়া বোধ হয়। (১) রাবণ, ভারত আক্রমণ করিতেন; কোন্ পথে তাঁহার বিপুল বাহিনী পরিচালিত হইত? (২) ব্রাহ্মণের রাক্ষসবিবাহে নিষেধ ছিলনা কেন? (৩) তৎকালীন ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল?

শ্রীগোলোক বিহারী মুখোপাধ্যায়।

গৃহলক্ষ্মী

মোর মনোমরু মাঝে, তুমি, সখি, আশা-মন্দাকিনী,
অয়ি চির-আনন্দ-দায়িনি!
কে আমি? আসিনু কোন্, অজানিত জন্মস্রোতে ভাসি?-
ভাবিতে ভাবিতে তত্ত্ব, চিত্ত যবে উতলা উদাসী,
দাঁড়াও প্রদীপ হাতে চুপে চুপে আঁধার গুহায়,
জটিল-রহস্য সব লুটে পড়ে চরণছায়ায়
ভক্ত ভৃত্য প্রায়।
তুমি মোর সিদ্ধি শক্তি সংশয়নাশিনী,
হৃদি-নিবাসিনি।

২

অতীতের অস্তাচলে দৃষ্টি আর করে না প্রবেশ,
সে যে ঘোর তিমিরের দেশ।
শুভ আগমনে তব, বর্ত্তমান হ'ল আলোকিত,
আশাসিক্ত-ভবিষ্যতে করে দিল পূর্ণ পুলকিত,
বর্ত্তমান-ভবিষ্যতে হ'য়ে গেল দীপ্ত একাকার,
উচ্ছ্বসিত বক্ষমাঝে উথলিল প্রীতি-পারাবার,
অতল-অপার;
শুধু সুখ-শান্তিময় যেন এই ধরা,
নাহি মৃত্যু-জরা।

৩

চেতনা-প্রবাহ ছুটে প্রাণ-উৎসে অযুত-ধারায়
বরিষার প্লাবনের প্রায়;
সারা বিশ্ব প্রতিভাত ও অনিন্দ্য-সহাস্য আননে,
চিন্ময়তা বিরাজিত জড়ময় নশ্বর ভুবনে,

আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা ; নারীমূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ,
আমারি হৃদয়-রাজ্যে পাতিয়াছ কণক-আসন,
সার্থক জীবন !
তাই তুমি চিরপূজ্যা, তুমি বিশ্বজয়ী,
অয়ি লীলাময়ি !

৪

শূন্যতা অভাব ব্যথা সরি যায় ও লাবণ্য হেরি,
চৌদিকে পূর্ণতা আসে ঘেরি,
দুঃখ দৈন্য কোথা গেছে—কোন্ প্রান্তে পাইয়াছে লয়,
এ যে চারিদিকে শুনি বাঁশী বাজে বিশ্ব হাসিময় ;
যেখানে দাঁড়াও দেবি, পাদপদ্মে শুভ-চিহ্ন আঁকি
যার পানে ফিরে চাও সকরুণ আঁখিতারা রাখি ;
অয়ি হরিণাখি,
শোভা আভাময় হয় পদ্মরাগ সম,
গৃহলক্ষ্মী মম।

শ্রীহীরালাল সেন।

রমাসুন্দরী।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবগোপালের বিবাহের পর ছয় মাস অবধি কান্তিচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর সমক্ষে পুত্রের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। কমলা দেবী অনেকবার মনে করিয়াছিলেন নবগোপালের কথা পাড়িবেন, কিন্তু সাহস হইয়া উঠে নাই। ইদানীং কতকটা অভিমানের ভাবও তাঁহার মনে প্রবেশ করিয়াছিল। না হয় অমতে বিবাহই করিয়াছে—তাই

বলিয়া কি একমাত্র পুত্রকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে! নবগোপাল ভাল আছে, সুখে আছে,—ইহা সর্ব্বদা সংবাদ পাইয়া,—কমলা দেবীর মন নিশ্চিন্ত ছিল। তিনি মনে এক প্রকার স্থিরই করিয়াছিলেন,—নিজে হইতে কথা পাড়িবেন না,—স্বামী কতদিন এই ভাবে থাকেন তাহা দেখিবেন।

ছয়মাস পরে, এক দিন সন্ধ্যাকালে, কান্তিচন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া গৃহিণীর হস্তে এক খানি পত্র প্রদান করিলেন—তাহা নবগোপালের পত্র। গৃহিণী পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। সেদিন কান্তিচন্দ্র শুধু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"নবু ভাল আছে?"

গৃহিণী বলিলেন—"আছে।"

এই ছয় মাস পরে প্রথম নামোচ্চারণ। এখন হইতে মাঝে মাঝে কান্তিচন্দ্র স্ত্রীর নিকট নবগোপালের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু তাহার স্ত্রীর উল্লেখ কখনও করিতেন না। এক দিন গৃহিণী বলিয়াছিলেন—"নবু ভাল আছে—কিন্তু বৌমার ব্যারাম—"

কান্তিচন্দ্র শুধু বলিলেন, "হুঁ"। বলিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন না,—কি ব্যারাম, আশঙ্কার কোন কারণ আছে কি না,—কোন কথাই না।—যদিও আসলে ব্যাপার বিশেষ কিছুই হয় নাই হিম লাগিয়া রমার কয়েক দিন ধরিয়া একটুকু জ্বর হইয়াছিল মাত্র।

এইরূপে আরও মাস দুই তিন কাটিল। বৈশাখ মাসে, এক দিন সন্ধ্যাবেলায় কান্তিচন্দ্র ছাদে বেড়াইতেছিলেন। কিয়দ্দূরে অল্লান্ধকারের মধ্য দিয়া পিয়ালী নদীর জল দেখা যাইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি যাতায়াত করিতেছে। দুই একটী তীরে বাঁধা আছে,—লোকেরা নামিয়া রন্ধনাদির উদ্যোগ করিতেছে। পূর্ব্বে অনেক সময় নবগোপালের শিকারের নৌকা ঐ স্থানে দেখা যাইত।

কান্তিচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিবার পর কমলা দেবী আসিলেন।

তাঁহার হাতে পান ছিল।—গৃহিণী স্বামীর নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"পান নেবে ?"

কান্তিচন্দ্র দাঁড়াইয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন।—বহু বৎসরের কথা মনে পড়িল। ফুলশয্যা রাত্রির কথা। একটি একাদশ বর্ষীয়া বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—পান নেবে ? এই সামান্য কথা দুইটি বলিতে সে বালিকার গাল দুইটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। কান্তিচন্দ্র পান লইয়াছিলেন ;—এবং হাঁ, এই কান্তিচন্দ্রই, তখন তাঁহার বয়স নবীন ছিল,—বিষয়তৃষ্ণা তখনও তাঁহার মনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে নাই ;—কান্তিচন্দ্র তাঁহার নববধূর রক্তিম গণ্ডযুগলে দুইটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর অনেক বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ঘটনার আলোচনা হইয়াছিল। এখন অনেক বৎসর হইতে তাহা আর উত্থাপিত হয় নাই।

কান্তিচন্দ্র পান লইয়া, একটু হাসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন—"কি ?"

"একটা কথা মনে পড়িল।"

কি কথা, গৃহিণী তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তিনিও একটু হাস্য করিলেন।

অন্ধকার বাড়িতে লাগিল। নদীর জল আর দেখা যায় না। শুধু কয়েকটি আলোক ইতস্ততঃ দেখা যাইতেছে। কান্তিচন্দ্র স্ত্রীর সহিত অনেক গল্প করিলেন। নবগোপালের প্রসঙ্গও উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন রাজারা তাহার সহিত কেমন ব্যবহার করিতেছে। যাহাকে নবগোপাল পড়ায় তাহার নাম কি, বয়স কত, রাজার কে হয় ইত্যাদি।

গৃহিণী আজ সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবুকে আসতে লিখব ?"

এ কথা শুনিয়া কান্তিচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা রিয়া, গৃহিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল ?"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"না,—এখন থাক।"

গৃহিণী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এখন থাক,—তবে তদিনে আর ? এক বৎসর নবগোপাল গৃহত্যাগী।

আর এক মাস কাটিল। জ্যৈষ্ঠমাসে নবগোপালের জন্মতিথিপূজা। ত বৎসর,—প্রতি বৎসরই—খুব ধূম ধাম করিয়া জন্মতিথিপূজা শেষ র। কিন্তু এ বৎসর আর সেরূপ হইবে না। এবার দ্বাদশটিমাত্র হ্মণকে কমলা দেবী নিমন্ত্রণ করাইয়াছেন। এক দিন ইহার সম্বন্ধে হিণী স্বামীর কাছে কথা পাড়িয়াছিলেন, কিন্তু কান্তিচন্দ্র কোনও উচ্চ চ্চা করেন নাই।

বেলা দ্বিপ্রহর। পূজা হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে সিয়াছেন। ইস্কুলের পণ্ডিত মহাশয় সকল তত্ত্বাবধান করিতেছেন। হিণী পার্শ্বের একটি কক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া দিতেছেন। হিণীর পরিধানে আজ পট্টবস্ত্র। তাঁহার ললাটে চন্দনের টীকা।

হঠাৎ কান্তিচন্দ্র আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ। স্তে একখানি টেলিগ্রাম।

তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন কোনও ঃসংবাদ আছে। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে ?"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"নবুর ভারি ব্যারাম। টেলিগ্রাম্ এসেছে।"

শুনিয়া কমলা দেবী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ব্যারাম ?"

"শিকার করিতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। অচেতন অবস্থায় উঠিয়ে হাঁসপাতালে আনা হয়েছে। কুমার বাহাদুর টেলিগ্রাম্ করেছেন।"

শুনিয়া গৃহিণী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হবে?"

"ঈশ্বর যা করেন তাই হবে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত কাষ্ঠমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কান্তিচন্দ্র শেষে বলিলেন—"আমি এখনি চল্লাম কাশ্মীর। পাল্কী তৈরি করতে বলে এসেছি।"

গৃহিণী বলিলেন—"আমাকেও নিয়ে চল।"

কান্তিচন্দ্র প্রথমে সম্মত হইলেন না। অনেক দূরের পথ, বহুকষ্টসাধ্য ভ্রমণ,—গৃহিণীর তাহা সহ্য হইবে না।

গৃহিণী তখন বলিলেন—"বউমা অন্তঃস্বত্বা।"

"ক মাস?"

"আট ন মাস।"

কান্তিচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন—"তবে চল। আর এক খানা পাল্কী তৈরি করতে বলি।"

গৃহিণী বলিলেন—"আজ নবুর জন্মতিথিপূজো তা জান?"

"জানি।"

"এখনও ব্রাহ্মণভোজন শেষ হয়নি। যাও, ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাদ নাও গে। তার পর আমরা যাত্রা করব।"

দুই ঘণ্টার মধ্যেই অল্প স্বল্প জিনিষপত্র গুছাইয়া ইহারা যাত্রা করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র কান্তিচন্দ্র কাশ্মীরে কুমার বাহাদুরকে একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। বলিলেন সেই দিন সন্ধ্যার ডাকগাড়ীতে কলিকাতা হইতে সস্ত্রীক তিনি যাত্রা করিতেছেন। কুমার বাহাদুর

যেন অনুগ্রহ করিয়া নবগোপালের উপস্থিত সংবাদ দানাপুর ষ্টেশনের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিয়া জানান।

সমস্ত রাত্রি পঞ্জাব-ডাকগাড়ীতে এই চিন্তাক্লিষ্ট দম্পতি অনিদ্রায় যাপন করিলেন। গৃহিণী হরিনামের মালা হাতে করিয়া কেবল জপ করিতে লাগিলেন এবং একান্ত চিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন কল্য প্রভাতে দানাপুরে পৌঁহুছিলে সুসংবাদ প্রাপ্ত হন।

পরদিন প্রভাতে আটটার সময় দানাপুরে গাড়ী পৌঁহুছিবামাত্র কান্তিচন্দ্র নামিয়া টেলিগ্রাফ আফিসে উপস্থিত হইলেন। কোনও সংবাদ নাই; কোনও টেলিগ্রাম আসে নাই।

টেলিগ্রাফ আফিস হইতে বাহির হইয়া, প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া কান্তিচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন।—কেন সংবাদ আসিল না। তবে হয় ত সংবাদ ভাল নহে। তবে হয়ত সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এদিকে আম-লিচুওয়ালা, —নানখাটাই-বাদসাহীভোগওয়ালা,—চুরুট-দেশলাইওয়ালা, ক্রমাগত তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন—তাঁহার মুখ-ভাব অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছে;—এ অবস্থায় যদি গাড়ীতে ফিরিয়া যান তাহা হইলে স্ত্রী দ্বিগুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবেন। কান্তিচন্দ্র জলের কলের নিকট গিয়া মুখচক্ষু প্রক্ষালন করিলেন। চিত্তবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণ শান্ত করিবার জন্য প্ল্যাটফর্ম্মের অন্তর্ভাগে একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন।

গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিল। আবার একবার তিনি টেলিগ্রাফ আফিসের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। চশমাধারী একটি স্থূলকলেবর বাঙ্গালী কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট আসিলেন।—না,—তখনও কোনও টেলিগ্রাম আসে নাই।

কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"এর পর যদি আসে, তা হলে কি করে আমি পাব ?"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

"কাশ্মীর।"

"যদি আপনার টেলিগ্রাম আসে, তবে ডাকগাড়ী সে সময় যেখানে থাকবে, আমরা আন্দাজ করে সেই ষ্টেশনে রিডাইরেক্ট করে দেব এখন।"

কর্ম্মচারীকে ধন্যবাদ দিয়া কান্তিচন্দ্র গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। কমলা দেবী উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"খবর এসেছে ?"

"না।"

"তা আমি তোমার দেরী দেখেই বুঝতে পেরেছি।"

কান্তিচন্দ্র স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিবার মানসে বলিলেন—"হয়ত আমার টেলিগ্রাম কুমার বাহাদুরের কাছে বেশী রাতে পৌঁছেছিল। আজ সকালে উঠে হয়ত তিনি পেয়েছেন। তাই এখনও জবাব এসে পৌঁছয়নি।"

গৃহিণী জানালার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া শুধু বলিলেন—"মধুসূদন!"

এক ঘণ্টা পরে গাড়ী গিয়া বক্সরে দণ্ডায়মান হইল। কান্তিচন্দ্র আবার গিয়া টেলিগ্রাফ্ আফিসে জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী ছিল—সে বলিল—"নেহি বাবুজী—কোই তার নেহি আয়া।"

বক্সরে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। সাহেবদের প্রাতরাশ সম্পন্ন হইল। মোগলসরাইয়ের পূর্ব্বে গাড়ী আর কোথাও অধিকক্ষণ থামিবে না।

কিন্তু দিলদারনগরে গাড়ী থামিবামাত্র কান্তিচন্দ্র শুনিলেন কে

একজন হাঁকিতেছে—"কান্তিচন্দর বান্নুর্জী—কান্তিচন্দর বান্নুর্জী।" জানালা হইতে গলা বাহির করিয়া সে ব্যক্তিকে ডাকিলেন। খালাসী আসিয়া তাঁহার হস্তে টেলিগ্রাম প্রদান করিল।

নবগোপালের চেতনা হইয়াছিল,—কিন্তু এখনও অবস্থা বিপদাতীত নহে।

এ সংবাদে ইহাঁরা আশ্বস্ত হইলেন না। বাহিরের লোক ইহাতে আশ্বাসের কারণ দেখিতে পাইতেন—চেতনা হইয়াছিল,—বিপদাতীত না হউক, আসন্ন বিপদের আশঙ্কাও ত বর্ত্তমান নাই।—কিন্তু যেখানে স্নেহ অধিক, সেখানে আশঙ্কাও অধিক ;—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

মোগলসরাইয়ে নামিয়া কান্তিচন্দ্র কুমার বাহাদুরকে আর একখানি টেলিগ্রাম করিলেন। এই টেলিগ্রামের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিলেন,—কুমার যেন রাওলপিণ্ডির ঠিকানায় দয়া করিয়া আর একখানি টেলিগ্রাম করেন।

অনাহারে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়,—গাড়ীর কষ্টে,—গৃহিণীর দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কান্তিচন্দ্র পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর অবধি সারা পথ টোঙ্গায় যাইবেন। কিন্তু গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া তাহা করিতে আর সাহস পাইলেন না। বলিলেন—"দেখ,—সারাপথ টোঙ্গায় গিয়ে কায নেই। বরামুলা থেকে নৌকায় যাওয়া যাবে।"

"তাতে কবে পৌঁছন যাবে, কত দেরী হবে ?"

"দু দিন বেশী লাগবে।"

তাহা শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন—"বাপরে, তা আমি পারব না। ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাব।"

কান্তিচন্দ্র তখন আর অধিক কিছু বলিলেন না। ভাবিলেন—দেখা যাউক, রাওলপিণ্ডিতে পৌঁছিয়া কিরূপ সংবাদ পাওয়া যায়।

পরদিন রাওলপিণ্ডিতে আশাতিরিক্ত উত্তম সংবাদ পাওয়া গেল।—"অবস্থা অনেক উন্নত। বিপদাশঙ্কা নাই। হাঁসপাতাল হইতে গৃহে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।"

এ সংবাদ শুনিবামাত্র গৃহিণী ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। ইহা আনন্দাশ্রু—দেবতার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার অভিষেক।

* * * *

বরামুলা হইতে নৌকাপথে কান্তিচন্দ্র শ্রীনগরে পৌঁছিলেন। নবগোপাল তখন নিদ্রিত ছিল। তাহার পিতামাতা লছমীর সঙ্গে পা টিপিয়া তাহার শয্যাকক্ষে উপস্থিত হইলেন। নবগোপালের কপালে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা। দেহ ক্ষীণ হইয়াছে। প্রশান্তভাবে নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

গৃহিণী ধীরে ধীরে শয্যার নিকট গিয়া তাঁহার পুত্রের মুখে চুম্বন করিলেন। সে চুম্বনে নবগোপাল জাগিয়া উঠিল। দেখিল তাহার পিতা—ও মাতা।

কান্তিচন্দ্র সস্নেহে তাহার হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছ বাবা ?"

"ভাল আছি।"

পিতাপুত্রের সম্মিলন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা দুইজনে নবগোপালের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ইহার পর হইতে কান্তিচন্দ্র প্রায়ই পুত্রের নিকট বসিয়া থাকিতেন,—মাঝে মাঝে কুমার বলবন্ত সিংহও আসিয়া বসিতেন। ওদিকে গৃহিণী রমাকে লইয়া পড়িলেন। তাহার চুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেক

বিলাপ করিতে লাগিলেন ;—লছমীকে ভৎর্সনা করিতেও ক্রটি করিলেন না।

এক সপ্তাহ পরে নবগোপাল শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে সক্ষম হইল। কান্তিচন্দ্র সকলকে লইয়া তখনি দেশে ফিরিতেন,—কিন্তু বধূমাতাকে তখন স্থানান্তরিত করা গৃহিণী যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সুতরাং স্ত্রীকে রাখিয়া কান্তিচন্দ্র একা দেশে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রাবণ মাসে একদিন যখন বাহিরে মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল,—তখন রমার একটি সুন্দর পুত্রসন্তান জন্মিল।

খোকা এক মাসের হইল, দুই মাসের হইল। কান্তিচন্দ্র পত্রের পর পত্র লিখিতেছেন,—ইহাঁদের বাড়ী যাইবার জন্য। খোকা আর একটু বড় হোক্,—আর একটু বড় হোক্ করিয়া ইহাঁরা বিলম্ব করিতেছিলেন। শেষে খোকা যখন তিন মাসের হইল,—তখন সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন—সে এবার যথেষ্ট বড় হইয়াছে। পূজার পূর্ব্বে পঞ্চমী তিথির দিন, সকলে মিলিয়া দেশযাত্রা করিলেন।

লছমী প্রথমে বলিয়াছিল, রাওলপিণ্ডি হইতে সে একবার রাজপুতানায় যাইবে। আত্মীয়বন্ধুগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া মাস খানেক পরে আবার যাইবে। কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে, সে খোকাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না,—সকলের সঙ্গেই দেশে ফিরিয়া আসিল।

[সমাপ্ত]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারতের পল্লীগ্রাম ও বিলাতে মাল রপ্তানি।

ভারতের পল্লীগ্রাম ও বিলাতে মাল রপ্তানি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মেত্যাঁ যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

হিন্দু কৃষকের পক্ষে ক্ষেত্র-সেচন করা নিতান্তই আবশ্যক ; ভারতের সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে বিভিন্ন উপায়ে এই সেচন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ভারতবাসীর কৃষিকার্য্য-প্রকরণ নিতান্তই আদিম কালোচিত। অধিকাংশ প্রদেশেই, ভারতীয় কৃষক, নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে, ও পুনঃপুনঃ জমি পতিত রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ শস্য উৎপাদন করে। বিলাত অপেক্ষা ভারতে ভূমির উপস্বত্ব যে কম হয়, কর্ষিত জমির স্বল্পায়তন তাহার একমাত্র কারণ নহে। আসল কথা, ভারতে ভূমির সংস্কার ভালরূপ হয় না। ঘাস-জঙ্গল জ্বালাইয়া যে সার উৎপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সার কৃষকেরা জানে না। শুষ্ক গোময়ই তাহাদের একমাত্র দাহ্য ; কেননা, তাহাদের ক্ষেতের নিকট কোন অরণ্যাদি নাই ; এবং ভারতবাসীর পক্ষে কয়লাও খুব মাহার্ঘ্য।

কৃষিকার্য্যের যন্ত্রগুলিও অতীব স্থূল ধরণের, বীজ ও চারা মধ্যম শ্রেণীর, জীবজন্তু হীন-অবস্থাপন্ন, অপরিপুষ্ট, ক্ষুধা ও রোগে অবসন্ন ! গাভীগণ দুষ্টব্রণ রোগে আক্রান্ত ; মুর্গিরা কোন-প্রকারে প্রাণধারণ করে মাত্র, তাহারা অতি শীর্ণ-কায় ও জঘন্য। ভারতীয় কৃষক, অন্যের তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তাহারা যে বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে তাহাদের অজ্ঞতাই তাহার কারণ।

ভারতের কোন কৃষিযোগ্য প্রদেশের ভিতর দিয়া যদি যাওয়া যায় —যেমন, মনে কর পঞ্জাব—আর যদি তত্রস্থ কোন গ্রামদর্শনের

কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বাঁধা-রাস্তা ত্যাগ করিয়া চূর্ণ-মৃত্তিক মাঠ, ঘাস-কাটা জমি, ও নয়নান্ধকারী বালুরাশি প্রভৃতি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড পার হইয়া তবে সেইখানে পৌঁছানো যায়; ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের গ্রাম্য-বিবরণীতে যে দুঃখ নিবেদিত হইয়াছে, তাহা স্মরণপথে পতিত হয়:—"আমাদের গ্রামে একটা বাঁধা-রাস্তা আছে, কিন্তু অন্য রাস্তার অভাবে, সেখানে পৌঁছিতে পারা যায় না"! কাটা-খাল ও ব্যক্তিবিশেষের নিখাত কূপের দ্বারাই জলের যোগান্ হয়। নিজ নিজ সম্বল-অনুসারে, প্রত্যেক গ্রাম্য-মণ্ডলী সকল প্রকার শস্যই কিছু কিছু উৎপাদন করে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মের আরম্ভভাগে, রাত্রিকালে প্রচুর শিশিরবর্ষণে, কোন শস্য সতেজে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে। আবার দেখ, ঐ দিকে, আখের ক্ষেত;—ইক্ষুদণ্ডগুলি শক্ত ও সরু;— আর ঐ, শীর্ণ তুলা-গাছের ঝাড়। ঐ উভয়ক্ষেতেই জল-সেচনের প্রথা এইরূপ; জলপাত্র-সংযুক্ত কতকগুলি দন্তুর চাকা গোরুর দ্বারা চালিত হইয়া ঘূর্ণিত হয়—সেই চাকার দাঁতে যে জল বাধে, তাহা কতকগুলি কাষ্ঠের ডোঙ্গার উপর দিয়া, ক্ষেত্রমধ্যে পরিবাহিত হয়। আবার, অন্যত্র, দেখ, মটর কলাই, শাক্ সবজি, তৈলোৎপাদক শস্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। জল-সিক্ত কৃষি-ভূমির পর-পারে, অকর্ষিত বিস্তৃত ময়দান, সমুচ্চ তৃণজালে আচ্ছন্ন—সেইখান-হইতে গবাদির ভক্ষ্য বিচালি, ঘর ছাইবার খড়, ও দাহ্য সামগ্রী সংগৃহীত হয়। সুদূর দিগন্তে, রেখাকারে বিস্তৃত তরুপুঞ্জ—যাহা অরণ্য বলিয়া ভ্রম হয়—সেখান হইতে কৃষি-যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে। কেননা, লাঙ্গলগুলিও কাষ্ঠ-গঠিত। গ্রাম-বেষ্টিত মৃত্তিকা-প্রাচীর পার হইলেই দেখা যায়, সেই আদিমকালের উপযুক্ত বিবিধ যন্ত্রাদি কাষ্ঠে গঠিত হইতেছে। কোন গৃহাঙ্গনে, কাষ্ঠজাঁতার মধ্য দিয়া তৈল নিষ্কাসিত হইতেছে। গৃহাঙ্গনে গো-পরিচালিত তিনটা কাষ্ঠবেলুনের চাপে ইক্ষুদণ্ডের গুচ্ছ

পেষিত হইতেছে; তাহা হইতে নিঃসৃত রস, একটা বেলে-পাথরের পাত্রে গৃহীত হইয়া, তাহার পর একটা তাম্র কটাহে সেই রস জ্বাল হইতেছে; সেই জ্বালে যে গুড় উৎপন্ন হয়, তাহা সেই গ্রামের লোকেরাই আহার করে। কখন কখন, কোন তৃণ-বিশেষের সহিত পাক করিয়া, সেই গুড়কে পরিমার্জ্জিত করা হয়। এইরূপে যে চিনি প্রস্তুত হয়, উহা একটা বিলাসের সামগ্রী, বিবাহ-উৎসবাদিতেই ব্যবহৃত হয়।

এই কৃষিজাত দ্রব্যকে কিরূপে মূল্যবান ব্যবহার্য্য সামগ্রীতে পরিণত করিতে হয়, গ্রামবাসীরা তাহা বিলক্ষণ জানে। পুরুষেরা দুইটা তেকোণা লোহার মধ্যে রাখিয়া কার্পাসের কোষ হইতে বীচিগুলি বাহির করিয়া ফেলে; তাহার পর সেইগুলা স্ত্রীলোকদিগের নিকট অর্পণ করে। তাহারা সেই তুলা লইয়া চর্কায় সূতা কাটে; অবারিত দ্বারের মধ্য দিয়া দেখা যায়, গৃহাঙ্গনে স্ত্রীলোকেরা দলে দলে একত্র হইয়া "অপেরার" সূতা-কাটুনীদের ন্যায় গল্প ও গান করিতে করিতে সূতা কাটিতেছে। পরে, সেই সূতা তন্তুবায়ের গৃহে নীত হয়। তাছাড়া, প্রত্যেক গ্রাম্যমণ্ডলীর মধ্যে, আপনাদের নিজস্ব ছুতার আছে, কামার আছে, স্যাকরা আছে। স্যাকরা না থাকিলেই চলে না; কারণ, স্ত্রীলোকেরা স্বীয় ধনসম্পত্তি অলঙ্কারে পরিণত করিয়া, তাহাই নিজ অঙ্গে ধারণ করে। রমণীগণের পতিরা, রৌপ্যমুদ্রা ও কখন কখন সোনার গিনি-মোহর স্বর্ণকারের হস্তে অর্পণ করে। একটি ছোট তুন্দুল, দুই তিনটা মুচী, আর কতকগুলি সাদাসিধা যন্ত্র—ইহারই সাহায্যে স্বর্ণকার মুদ্রাগুলি গলাইয়া, বলয়, নূপুর, বাজুবন্দ, নথ, গুরু-ভার কানবালা, সিঁথি ইত্যাদি অলঙ্কার প্রস্তুত করে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের উদাহরণ যদি সংগ্রহ কর, তাহা হইলে দেখিবে, ছোট-খাটো বিষয়ে একটু-আধটু ইতরবিশেষ থাকিলেও

আসলে কোন প্রভেদ নাই। ভারতবর্ষের অন্তর্গত গ্রাম মাত্রই কৃষি-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় এক একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র-রাজ্যবিশেষ;—আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত;—উহারা যুগযুগান্তর হইতে একই ভাবে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে—উহাদের মধ্যে য়ুরোপ-প্রবর্ত্তিত উন্নতির চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হয় না।

ইংরেজ-সরকার-কর্তৃক একটি কৃষি-বিভাগ সংগঠিত হইয়াছে। সেই কৃষিবিভাগের কার্য্যালয় হইতে, কৃষি সম্বন্ধীয় যে সকল বার্ত্তা-বিবরণ ও গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা সুপাঠ্য ও চিন্তা-কর্ষক; কিন্তু কৃষিকার্য্য-প্রকরণে রূপান্তর সাধন করা তাহাদের সাধ্যাতীত। বিষয়টি যেরূপ গুরুতর, কৃষিকার্য্যে মূলধন প্রয়োগ করা যাহারা লভ্যজনক মনে করে, তাহাদের দ্বারাই এই উদ্যোগের প্রথম সূত্রপাত হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ লোক সাধারণতঃ মিলে না।

য়ুরোপীয়েরা যে ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যে ব্যাপৃত হয়, তাহাদের একটা বিশেষ সুবিধা আছে। ভারতীয় কৃষকেরা স্বল্পলভ্যেই সন্তুষ্ট। তাই য়ুরোপীয়েরা অতি সুলভ মূল্যে রপ্তানীর সামগ্রী তাহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। যে অহিফেন চীনদেশে প্রেরিত হয়, উহা প্রস্তুত করিবার অধিকারটি ইংরেজ-সরকারের একচেটিয়া। যে অহিফেন প্রস্তুত হয়, তাহা একযোগে থোকায় বিক্রয় করিয়া প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা, সরকারের বার্ষিক আয় উৎপন্ন হয়, অথচ যে পরিমাণ অহিফেন চালান হয়, তাহার মূল্য ৮৫।৯৫ লক্ষ টাকা মাত্র। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য যাহা বিদেশে চালান হয়, তাহার বাণিজ্য ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই পরিচালিত হয়। যথা, নীল; কৃত্রিম ধাতব রঙের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহার রপ্তানি হ্রাস হইয়াছে। তাহার পর, রেশম, তুলা এবং অন্যান্য তান্তব সামগ্রী। প্রধান রপ্তানীর সামগ্রী চাউল। ইহা পঞ্জাব-অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ ব্যাপিয়া যে গমের চাষ হয়,

উহাও য়ুরোপে চালান হয়, এবং উহার রপ্তানি ক্রমশই দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। য়ুরোপীয় ক্রেতাদিগের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়া, তাহাদের সুবিধার জন্যই হিন্দুস্থান-সরকার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শস্যের রপ্তানি শুল্ক রহিত করেন; এখনও পর্য্যন্ত—এমন কি দুর্ভিক্ষের সময়েও—উহা পুনঃ স্থাপিত হয় নাই। শস্য ক্রমশই অধিকতর পরিমাণে য়ুরোপে রপ্তানি হইতেছে; এমনকি, অধুনা এই লইয়া রুষের সহিত গুরুতর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে।

ভারত হইতে বেশীর ভাগ কৃষিজাত সামগ্রীই রপ্তানী হয়—তান্তব দ্রব্যও তাহার অন্তর্ভূত। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বৎসর ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিলে, ভারতের রপ্তানী ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। ভারতে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য অনেক পরিমাণে ছাড়াইয়া উঠে। ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১,০৫৬,৮৩৬,৯২১৲ টাকা মূল্যের মাল রপ্তানী ও ৭০৭,১১৪,৬৩৪৲ টাকা মূল্যের মাল আমদানী হয়। ১৯০০-১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১,০৪২,০৫৩,৪৮৪৲ টাকা মূল্যের মাল রপ্তানী ও ৭৬২,৭৭৪,৮৫৩৲ টাকা মাল আমদানি হয়।

আমদানি-রপ্তানীর মধ্যে এই যে আত্যন্তিক বৈষম্য, ইহার কোন বিশেষ হেতু আছে কিনা, স্বভাবতই এই জিজ্ঞাসা মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। কৃষির মজুরির স্বল্পতা হেতু এবং ব্রিটেনীয় আধিপত্যনিবন্ধন, য়ুরোপীয়দিগের নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা থাকায় রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে, সহজেই এইরূপ অনুমান হয়। কিন্তু এ কারণগুলি একটু বেশী সাধারণ, কেন না, উহা উপনিবেশ মাত্রেই বিদ্যমান।

নিরবচ্ছিন্ন রৌপ্যমুদ্রা কোন দেশে প্রচলিত থাকিলে, তাহার মূল্যের ঘাট্‌তি হয়, এ সত্যটি এক্ষণে এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধির পক্ষে ইহাকেই বিশেষ কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের রৌপ্যমুদ্রা মাটিয়া

যাইতেছে। টাকার মূল্য, যে স্থলে "ষ্টার্লিং পৌণ্ড" মুদ্রার ১/১০ অংশের সমান ছিল সেই স্থলে এক্ষণে ১/১৫ হইতে ১/১৬ অংশের অধিক দাঁড়াইতেছে না ; কিন্তু সেই অনুপাতে মজুরী ও জীবিকার মূল্য বাড়ে নাই। সুতরাং যদি টাকার দরে ভারতের কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য খরিদ করিয়া উহাই বিলাতে স্বর্ণমুদ্রার দরে বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে এই দুই বিভিন্ন আদর্শের মুদ্রার মূল্যগত তারতম্যে, বিক্রয়ের লভ্য অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এইরূপে মুদ্রা-মূল্যের তারতম্যেই রপ্তানী হুহু করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। যে দেশেই নিরবচ্ছিন্ন রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত সেই দেশেরই অবস্থা এইরূপ।

তবে ভারতবর্ষে একটু বিশেষত্ব আছে। ভারতের যেরূপ রাজস্ব-পদ্ধতি, তাহাতে ভারত রপ্তানী করিতে বাধ্য হয়। রাজস্ব হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতের বাহিরে প্রতি বৎসরে খরচ হইয়া থাকে। এই নিয়মিত খরচ কুলাইবার জন্য, যতদূর পারে ভারত তাহার কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের দ্বারা তাহা পূরণ করিতে বাধ্য হয় এবং রপ্তানীকারী য়ুরোপীয় বণিকের যাহাতে রপ্তানি করিবার সুবিধা হয় তাহারও উপায় বিধান করে ; এবং তাছাড়া রাজস্ব ঘটিত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, পাশ্চাত্য মুদ্রার হিসাবে গণনাদি করা হইয়া থাকে। আরো, ভারতবাসার অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও ভারতের মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য যতটা স্বর্ণ রৌপ্যের প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ঐ সকল ধাতু ভারতে আমদানি হয়।

শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি যে কম হইতেছে, ইহাতে (অন্য নিদর্শনের অভাবে) ইহাই সূচিত হয় যে, ভারতবাসীর ক্রয় করিবার শক্তি অতীব ক্ষীণ। ভারতীয় গ্রাম্যলোকের অবস্থা, গণিতাঙ্কের আকারে প্রকটিত করা অসম্ভব ; কিন্তু কেহই একথার প্রতিবাদ করিতে পারিবে না যে, তাহাদের কর্ষিত ভূমির আয়তন-পরিমাণ ও কৃষিজাত

দ্রব্যের মূল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, সে পরিমাণে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আদর্শ আদৌ উন্নতি লাভ করে নাই।

মিঃ ডিগ্‌বি নামক একজন ইংরাজ—যিনি দেশীয়দিগের স্বত্বাধিকার-সমর্থনের পক্ষপাতী—তিনি এতদূর পর্য্যন্ত প্রতিপাদন করেন যে, ভারতবাসীর আনুমানিক আয় নিয়মিত রূপে উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু ডিগ্‌বির গণনাদি অখণ্ডনীয় তথ্যের উপর স্থাপিত নহে। ভারতের সাধারণ দারিদ্র্য সর্ব্ববাদীসম্মত হইলেও, ভারত পূর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইয়াছে, ইহা এখনও অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। তাছাড়া, আসিয়াবাসী রাজাদিগের রাজত্বকাল-অপেক্ষা ইংরাজের রাজত্বকালে, ভারতের নিম্নশ্রেণীর অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয় নাই, একথা বলিলে ভারতের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদের নামে গুরুতর দোষারোপ করা হয়। এবিষয়ে ইংরাজ-সরকারের কতটা দোষ সে বিষয়ে আমরা অন্য স্থলে আলোচনা করিব; এখন এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে —এই দুঃখ দুর্দ্দশা, কতকটা ভারতের নিজস্ব সমাজগঠন-পদ্ধতির ও কতকটা য়ুরোপীয় বণিকদিগের বাণিজ্য-পদ্ধতির ফল।

রপ্তানিকারী বণিক য়ুরোপীয়, কৃষক দেশীয়; য়ুরোপীয়েরা এই দেশীয় কৃষকদিগের সহিত সাক্ষাৎভাবে কারবার করে না; গ্রামের যে দোকানদার তাহাকেই মধ্যে রাখিয়া, উহারা কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ঐ মধ্যস্থ ব্যক্তি, কোন কোন প্রদেশে, পার্সিদিগের ন্যায় কোন এক ক্ষুদ্র বণিক্‌-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু অধিকাংশ প্রদেশেই, ভারতের বৈশ্যজাতীয় বণিক-শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগকে "বেণিয়া" বলে; ইহারা সাধারণতঃ বাজার-মশলাদি বিক্রয় করে। বেণিয়া, কৃষককে ধারে দ্রব্যাদি ছাড়িয়া দেয়; এই সর্ত্ত থাকে, 'সেই মূল্য-প্রমাণে কৃষক তাহাকে স্বীয় ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবে। ঐ সর্ত্তে, নগদ টাকাও বেণিয়ারা কৃষককে ধার দিয়া থাকে এবং শতকরা

৫।৬ টাকা হারে মাসিক সুধ গ্রহণ করে। যখন কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হয়, তখন সেই বেণিয়া খুব অল্পমূল্যে তাহার সমস্ত শস্য হস্তগত করে; সে আবার সেই শস্যাদি তাহার স্বজাতীয় অন্য এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করে। এই শ্রেণীর বণিকেরা থোকায় খরিদ-বিক্রী করে। কি সামান্য অবস্থাপন্ন, কি ধনী—ভারতের সকল বণিক-দলের মধ্যেই একটা গুপ্ত বোঝাপড়া আছে। থোকা মালের বেণিয়া, খুচ্‌রা মালের বেণিয়ার সহিত কারবার করিয়া লাভ করে; কিন্তু সকলেই যতদূর পারে কৃষককে শোষণ করিবার চেষ্টা করে। এই সকল মালের খরিদপত্রে, প্রত্যেক বেণিয়া খুব মোটা দালালি পায়। তাহার পর, য়ুরোপীয় বণিক—সর্ব্বশেষে যাহার হাতে ঐ মাল আসিয়া পড়ে,—কৃষকের সহিত সাক্ষাৎভাবে কারবার না করিয়া, উক্ত বেণিয়াদের যোগে কাজ করায় আরো অধিক লাভবান হয়। প্রাচ্য দেশের মালপত্র খরিদ করিবার জন্য, পাশ্চাত্যদেশ হইতে যে টাকার আমদানি হয়, তাহার অধিকাংশই মধ্যবর্ত্তী বেণিয়ারাই গ্রাস করে।

এ দেশের চাষের উপর, য়ুরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। য়ুরোপীয় বাণিজ্যের প্রয়োজন-অনুসারেই কর্ষিত ভূমির ন্যূনাধিক্য হয়। বিলাতী রপ্তানির প্রয়োজন-অনুসারে, কখন তুলার ও কখন ইতর শস্যাদির অধিক চাষ হইয়া থাকে; কৃষক রপ্তানির অনুরোধে স্থানীয় ব্যবহারের শস্য যতদূর পারে কম করিয়া বুনানি করে; কখন বা প্রয়োজন-অনুসারে ইহারা বিপরীত পদ্ধতিও অবলম্বিত হয়। কখন কখন য়ুরোপীয় বণিক, দেশীয় বেণিয়াকে স্বীয় উত্তরসাধক করিয়া, অনুমান-মূলক দ্বৈধ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়। হিস্পানী-মার্কিন যুদ্ধের সময়, যখন শস্যের মূল্য ও জাহাজ-ভাড়া চড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া লইয়া, য়ুরোপীয় বণিক অতি সুলভ মূল্যে সমস্ত শস্য ক্রয় করে ও পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত জাহাজ

ভাড়া করিয়া রাখে। এই সুযোগে বণিকদিগের কিরূপ প্রভূত লাভ হইয়াছিল, তাহার কথা লোকে এখনও বলাবলি করিয়া থাকে।

যে জিনিস য়ুরোপীয়দের কাজে লাগে না, ভারতে তাহার চাষ সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ইক্ষুর চাষ হীনাবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে, কেননা, বিদেশী চিনি ভারতে আমদানি করিবার জন্য, বিলাতী মূলধন প্রযুক্ত। কিয়ৎ বৎসর হইতে অষ্ট্রিয়ার চিনির সহিত মরিচ-দ্বীপের ও অন্যান্য ইংরাজ-উপনিবেশের চিনির যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা অনেকেই করিতেছে, কিন্তু ভারতের চিনি সুরক্ষিত হয়, ইহা কোন য়ুরোপীয়ই ইচ্ছা নহে। ১৮৯৫-১৮৯৬ হইতে ১৯০০-১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় শর্করের রপ্তানি ৫,৭৪৭,৪৫০ হইতে ১,৭০৯,৫০৪ টাকার নাবিয়া আসিয়াছে; পক্ষান্তরে বিদেশী আমদানী ৩১,০৬৮,১৩০ টাকা হইতে ৫৬,৫৫২,১৬৭ টাকায় উঠিয়াছে।

ভারতে, ইংরাজ মূলধনীগণ কর্তৃক যে সকল নূতন দ্রব্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে; তাহার মধ্যে নীলগিরি পর্ব্বতে কুইনিন্ ও কাফির চাষ তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু আসামে চা-এর চাষে ক্রমশই উন্নতি হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা সিংহলই ইংলণ্ডকে বেশি চা যোগাইয়া থাকে, তাহার নীচে ভারত, তাহার নীচে চীন। চা ও কাফীর কৃষিকার্য্য য়ুরোপীয়দিগের কর্তৃকই পরিচালিত হয়। তাহারা স্বস্থানে বাস করিয়া, স্বীয় অব্যবহিত অধীনে অসংখ্য কুলী খাটাইয়া থাকে। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে ইঁহারা বড় ভূম্যধিকারী, উঁহারা সরকারী খাস-মহলের জঙ্গলাদি ক্রয় ও আবাদ করিয়া সেই ভূমিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে। ভারতে, য়ুরোপীয়দিগের ভূসম্পত্তি অধিক নাই। সমস্ত ভারতে য়ুরোপীয় ভূম্যধিকারী-কৃষকের (Planter) সংখ্যা শতাবধি মাত্র। তাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, সম্ভ্রান্ত ও ইংরাজ-সমাজে সমাদৃত। লক্ষ লক্ষ দেশীয় ভূম্যধিকারীর পার্শ্বে এই ক্ষুদ্র ধনাঢ্য-মণ্ডলী নগণ্য বলিলেই হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃথ্বিরাজ।

—o—

প্রথম অঙ্ক।

—:o:—

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর রাজবর্ত্ম।

দুইজন নাগরিক।

১ম-না। ঠাকুর দা! ও ঠাকুর দাঁ! এত ব্যস্ত হয়ে যাচ্চো কোথা?

২য়-না। যেথা যাই না, তোর বাবার কি?

১ম-না। আহা রাগ কর কেন? নগরে এত মহোৎসব কেন, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চি।

২য়-না। জিজ্ঞাসা করবার কি আর লোক পেলি না? কোথায় একটা শুভকার্য্যে যাচ্চি, না অমনি পেছু ডাকা?

১ম-না। তা আমি জানতুম না, ঠাকুরদা। সিংহলে বাণিজ্য করতে গিছলুম, এইমাত্র নগরে ঢুক্‌ছি, এখনও বাড়ী যাইনি—

২য়-না। তুমি যমালয়ে যাও।

(প্রস্থান)।

১ম-না। একি! নগরের লোকগুলো কি ক্ষেপলো নাকি? এই কমাস মাত্র আমি ছিলুম না·

[অন্য একজন নাগরিকের প্রবেশ]

কিহে ব্যাপারটা কি বল দেখি? তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, বোধ হয় গালাগালিটে আর দেবে না।

৩য়-না। তুমি কবে এলে ?

১ম-না। কবে কিহে ? এইমাত্র নগরে প্রবেশ করে, একদম ভেবাচেকা মেরে গেছি। দলে দলে সব লোক যাচ্চে, কিন্তু কাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বিদ্রূপ বা গালাগালির চোটে অস্থির করে দিচ্চে।

৩য়-না। লোকের অপরাধ নেই, আজ লোকে কোথায় যাচ্চে, একথা যাকে জিজ্ঞাসা করবে, সেই তোমাকে পাগল ঠাওরাবে। মহারাজ যুদ্ধে জয়ী হয়ে আজ কল্পতরু হয়েছেন, মুক্তহস্তে ধনবিতরণ করছেন।

১ম-না। যুদ্ধ! কোথায় ? কার সঙ্গে ?

৩য়-না। অত উতলা হয়ো না, সব বল্‌ছি, স্থির হয়ে শোন। আমাদের সীমান্তপ্রদেশে নাগরদেশ আছে জান ত ?

১ম-না। তা, আর জানি না ? সীমানির্দ্ধারণ নিয়ে পত্তনরাজের সঙ্গে ত মহারাজের কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল শুনেছিলুম।

৩য়-না। হ্যাঁ, সে কথা সত্য। তুমি বাণিজ্যে যাবার কিছু দিন পরে, নাগরদেশে ভূপ্রোথিত সত্তর লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। সেই অর্থই সমরানল প্রজ্জ্বলিত করে।

১ম-না। পত্তনরাজ আমাদের মহারাজের সহিত যুদ্ধ করতে সাহসী হলো ?

৩য়-না। কনোজেশ্বর জয়চাঁদ তারে সহিত মিলিত হয়েছিল। জান ত সে চিরকালই মহারাজের ঈর্ষা করে।

১ম-না। দিল্লীসিংহাসনই তার মূল। তুয়ারবংশীয় মহারাজ অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। শুদ্ধ তাঁর দুইটি কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠার গর্ভে রাঠোর জয়চাঁদ, আর কনিষ্ঠার গর্ভে চৌহানকুলতিলক পৃথিরাজের জন্ম হয়। বৃদ্ধ মহারাজ, কনিষ্ঠ

দৌহিত্রকে বড়ই স্নেহ করতেন; তাই দিল্লীসিংহাসনে তাঁকেই অভিষিক্ত করেন। সেই অবধি কনোজপতি, দিল্লী ও আজমীরপতি পৃথ্বিরাজের বড়ই ঈর্ষা করেন।

৩য়-না। পত্তনরাজ আর জয়চাঁদকে মিলিত দেখে, মহারাজও তাঁর ভগিনীপতি মিবারেশ্বর মহারাজা সমরসিংহের সাহায্যপ্রার্থী হলেন।

১ম-না। সমরসিংহ ও পৃথ্বিরাজ একত্রিত হলে সমস্ত পৃথিবী পরাভূত হয়, ক্ষুদ্র জয়চাঁদ ত সামান্য কথা।

৩য়-না। যুদ্ধজয়ের পর মহারাজা, ভূপ্রোথিত অর্থের অর্দ্ধেক মহারাণা সমরসিংহকে প্রদান করতে চাইলেন। কিন্তু মহারাণা সত্যই রাজর্ষি; বেশভূষা ও আকৃতি যেমন ঋষির ন্যায়, প্রকৃতিও কি সেইরূপ! তিনি সে অর্থের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করলেন না।

১ম-না। বল কি? মহারাণা কি দেবতা? পঁয়ত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার লোভ কি মানুষে সম্বরণ করতে পারে?

৩য় না। তা না হলে লোকে তাঁকে রাজর্ষি আখ্যা দেবে কেন? আমাদের মহারাজ কিন্তু পঁয়ত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মিবারের সৈন্যগণকে, আর পঁয়ত্রিশ লক্ষ আমাদের সৈন্যগণকে ও রাজ্যের দীন দুঃখীকে প্রদান করলেন।

১ম-না। মহারাজের জয় হোক। রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ। যে নরপতির হৃদয় প্রজার দুঃখে কাতর হয় না, তিনি রাজা নামেরই যোগ্য নন।

৩য়-না। যাহোক ভাই যুদ্ধে যে জয় হয়েছে এই আমাদের পরম মঙ্গল। রাজ্যের সমস্ত প্রজা মাহারাজের আশু-বিপদপাৎ-ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

১ম-না। কেন? এর কারণ কি?

৩য় না। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে মহারাজ অনঙ্গপাল যে লৌহস্তম্ভ ভূগর্ভে প্রোথিত করে যান, তোমার বোধ হয় মনে আছে।

১ম-না। হ্যাঁ, প্রবাদ এইরূপ যে, সেই স্তম্ভ বাসুকিমস্তকোপরি স্থাপিত; আর যতদিন সেই স্তম্ভ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকবে, তত দিন তাঁর বংশধরগণের রাজত্বও অক্ষুণ্ণ থাকবে।

৩য়-না। সেই প্রবাদই কাল হলো। নবীন নরপতি পৃথ্বিরাজ, সেই স্তম্ভ যথার্থ ই বাসুকির মস্তকে স্থাপিত কিনা দেখবার জন্য কুতূহলী হয়ে, বহুকষ্টে স্তম্ভ উত্তোলন করলেন।

১ম-না। সেকি! তাঁকে কেউ নিবারণ করলে না?

৩য়-না। সকলেই নিবারণ করেছিল, কিন্তু তিনি কারুর কথাই শুনলেন না। স্তম্ভ উত্তোলিত হলে, সকলে সবিস্ময়ে দেখলে যে, স্তম্ভের তলদেশ রক্তাক্ত!

১ম-না। কি ভয়ানক! তার পর কি হলো?

৩য়-না। তার পর আর কি হবে? ব্রাহ্মণেরা রাজাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করতে লাগলেন, তিনিও অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন, আর প্রজাকুল আশুবিপদপাৎ আশঙ্কায় সন্ত্রাসিত হয়ে পড়লো। মাসেক কাল মহারাজ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণপরিবেষ্টিত হয়ে, আশাপূর্ণা দেবীর মন্দিরে স্বস্ত্যয়নাদি করতে লাগলেন।

১ম-না। তারপরই কি নাগোরা যুদ্ধ হয়?

৩য়-না। হ্যাঁ, তার কিছুদিন পরেই যুদ্ধ বাধলো, কাজেই সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। এখন যে আশাপূর্ণাদেবী মুখ রেখেছেন এই আমাদের পরম ভাগ্য।

[২য় নাগরিকের প্রবেশ]

ঠাকুরদা যে! কোথায় শুভাগমন হয়েছিল?

২য়-না। (স্বগত) আরে ম'ল! ছোঁড়া এখনও এখানে দাঁড়িয়ে গা? আবার সঙ্গে আর একটা ষণ্ডা চেহারা জুটেছে দেখছি, মারবে না ত? (প্রকাশ্যে) আর দাদা, যাব আর কোথায়? এই পায়ে পায়ে একটু বাঁতের তেল আনতে গিয়েছিলুম।

৩য়-না। ভেবে উত্তর দিলে যে?

২য়-না। নাতি! সকল কার্য্য ভেবে করা ভাল, আর সকল কথার উত্তরও ভেবে দেওয়া ভাল।

১ম-না। তখন আমাকে অত গালাগালি দিলে যে?

২য়-না। কে, আমি? তোমাকে? গালাগালি?

১ম-না। যেন গাছথেকে পড়লে যে? পেছন ডেকেছিলুম বলে যে, আমাকে যমালয়ে পাঠিয়ে গেলে।

২য়-না। তাহলে চিন্‌তে পারিনি দাদা। তোমাকে গালাগালি দেব; তুমি হলে নাতি।

১ম-না। ঠাকুরদাদা কি অতিথিশালার ওধারে গিয়েছিলে, তাই পেছু ডেকেছিলুম বলে রাগ কর্‌লে?

২য়-না। আমি? অতিথিশালা? কে বল্‌লে? আমি ওধন গ্রহণ করবো?

৩য়-না। ও ধন ত গ্রহণ করবে না, কিন্তু কাল সৈনিকের পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে, মহারাজের কাছ থেকে ত তোফা দুটী স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করলে।

২য়-না। আমি? এঁ্যা আমি? তুমি বোধ হয় ভুল দেখেছ।

৩য়-না। না ঠাকুরদা! এখনও ত চল্লিশ পার হয় নি যে ঝাপসা দেখ্‌বো? তুমি ভিড়ের মাঝে চিঁড়ে চেপ্টা হয়ে যাচ্ছিলে দেখে, আমিই লোক সরিয়ে দিলুম, তবে ত তুমি স্বর্ণমুদ্রা দুটী হস্তগত করলে।

২য়-না। তা দাদা এতক্ষণ বলনি কেন, আশীর্ব্বাদ করতুম।

৩য়-না। সে স্বর্ণমুদ্রা দুটী কত সুদে ধার দিয়েছ?

২য়-না। আ আমার পোড়া অদৃষ্ট! সে কি আমার যে ধার দেব? এক জনের পা কাটা গেছে, সে আসতে পারে নি, তাই তার বরাতি গিয়েছিলুম দাদা। তা হেঁ নাতি! এত কষ্টের ধন, সব বিতরণ করে উড়িয়ে দিচ্চে কেন?

৩য়-না। আর কেন? মহারাজের তোমার মত অত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নয় বলে

১ম-না। কাল ত সৈন্য সেজে একজনের বরাতি গিছলে, আজ দুঃখী সেজে কার বরাতি গিছলে? বুড়ো বয়সে এই উন্‌ছো বৃত্তি-গুলো ছেড়ে দাও না। তোমার টাকা খাবে কে?

৩য়-না। রামচন্দ্র! কি বল নাতি? বললুম আমি বাতের তেল আনতে গিছলুম।

১ম-না। তাত গিছলে, কিন্তু ট্যাঁকে ও কি?

২য়-না। ও দুটো নতুন পয়সা। ভাবলুম অমনি বাজারটা করে যাই। তা দাদা, বাণিজ্য করতে গিছলে, ঠাকুরদাদার জন্য কি আনলে?

১ম-না। পয়সা দুটো বার কর দেখি?

২য়-না। (স্বগত) এই বার সারলে। শালারা ঠিক কেড়ে নেবে। কেন এপথে এলুম?

৩য়-না। কি দাদা! ভাবছো কি?

২য়-না। এখন বেলা হয়ে গেল, আমি যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

১ম-না। যাবে কোথা? পয়সা বার্ কর।

২য়-না। বাবারে! মেরে ফেল্লে, খুন করলে, খুন্ খুন্—

(বেগে প্রস্থান)

১ম-না। এই সকল পাপিষ্ঠই দুঃখীর মুখের গ্রাস নানা উপায়ে কেড়ে নিয়ে দেশে দারিদ্র্য বাড়ায়। এরূপ মহাপাতকীর নরকেও স্থান নাই।

৩য়-মা। চল, আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে? বাটী গমন করে বিশ্রাম করবে চল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কনোজ-রাজপ্রাসাদস্থ কক্ষ।

জয়চাঁদ।

জয়। বসুন্ধরে! কোন্ গুণে বসুরাশি
প্রদানিলে পৃথ্বিরাজ করে?
পৃথ্বিরাজ সত্যই কি পৃথিবীর রাজা?
কনোজের রাজছত্র,
ধৃত কি মস্তকে মোর,
হাস্যাস্পদ হইবারে মানব-সমাজে?
রত্নরাজি থাক রসাতলে,
নাহিক অভাব মোর;
কিন্তু এক নাগোরার রণে,
সপ্ততিসংখ্যক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাসহ,
পৃথিবীর সার রত্ন জয়লক্ষ্মী

অর্পিয়াছে কাপুরুষ জনমের মত
নরাধম পৃথ্বিরাজ করে।
পুত্রাধিক প্রজার শোণিতে,
সিক্ত করি সমর প্রাঙ্গণ,
পরাজয়-হার পরিনু গলায়!
ছি ছি অপমান-মসী মাখিয়ে বদনে,
কোন্ মুখে পশিব সভায় পুনঃ,
কলঙ্কিতে কুলসিংহাসন?
বীরাঙ্গনা পুরনারীচয়,
ঘৃণাভরে যাবে চলি দূরে,
ক্ষত্র-কুল-কলঙ্ক ভাবিয়া মোরে!
শিশুগণ দিবে করতালি,
শুনি মোর রথের ঘর্ঘর নাদ;
ক'বে সবে "আসে ওই কাপুরুষ রাজা"।
তরুণ বয়স্ক ভাবি,
না শুনিয়া সেনাপতি সূর্য্যসিংহবাণী,
পৃষ্ঠদেশ হতে পৃথ্বিরাজে দিনু হানা;
পলায়ন ভান করি অরিদল,
বহুদূরে লয়ে গেল মোরে;
আসিয়া আদিষ্ট স্থানে,
সম্মুখসমরে হলো আগুয়ান।
সহসা হইল তূর্য্যনাদ,
চেয়ে দেখি অগণন অশ্বারোহী সহ,
হস্তীপরে নির্ভীক সমরসিংহ,
আসিতেছে আক্রমিতে পশ্চাৎ হইতে;

বাগুরামাঝারে বদ্ধ ব্যাঘ্রের সমান,
গণিলাম বিষম প্রমাদ।
সূর্য্যসিংহ কহিলা ত্বরিতে,
"অরিব্যূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি,
এই বেলা ছিন্ন ভিন্ন করি
অরাতির দক্ষিণ বাহিনী,
মুক্ত কর সৈন্যগণে ;
তাহা হলে দিল্লী ও চিতোর সৈন্য মিলি,
চক্রব্যূহ করিলে গঠন,
জয়ত দূরের কথা,
হইবে সমস্ত সৈন্য-নাশ।
সেনাপতি-পরামর্শবলে
গন্ধহীন কুসুম সমান
রয়েছে এখনও দেহে প্রাণ।

[সূর্য্যসিংহের প্রবেশ]

সূর্য্যসিংহ! যশোসূর্য্য অস্তমিত এবে,
পুনঃ কভু না উদিবে ভাগ্যাকাশে মোর।
জ্বাল, জ্বাল চিতানল,
মামুদের করে পরাজিত
মহারাণা জয়পাল সম,
ভস্মীভূত করি কলেবর।

সূর্য্য। (স্বগত) সেই তব উপযুক্ত বিধি।
কাপুরুষ কনোজের রাণা!
ভাবিও না মনে, করি দাসত্ব তোমার
শূকরের ন্যায় উদর-পূরণ-হেতু।

বাল্যাবধি প্রতিহিংসানল
জ্বলিতেছে হৃদয়ে আমার।
বহুকষ্টে পাইয়ে সুযোগ,
নারিলাম পূর্ণাহুতি প্রদানিতে তায়!
ছি ছি ক্ষত্রিয়-সন্তান হয়ে,
শুধু এই কাপুরুষ-বুদ্ধি-দোষে,
রণাঙ্গণে করিয়াছি পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

জয়। নিরুত্তর কেন সেনাপতি?

সূর্য্য। হে রাজন্!
রণস্থল হতে পলায়িত ক্ষত্রিয়ের,
সত্য তুষানল প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
কিন্তু নাহিক সন্তান তব,
প্রতিহিংসা-প্রিয়মন্ত্র
প্রদানি কর্ণেতে যার
পরলোকে করিবে প্রয়াণ,
সুতরাং সে সঙ্কল্প রাখুন স্থগিত,
যতদিন পৃথ্বিরাজে
না পারি আনিতে, জীবিত কি মৃত,
দিতে রাজপদে উপহার।

জয়। সে কল্পনা,
স্বপন-ছলনা বলি হয় অনুমান,
ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না পামরের প্রতি!
নহে নৃপতি অনঙ্গপাল,
মাতামহ দুজনার,
আমার জননী জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁর

পৃথ্বিরাজ কনিষ্ঠার গর্ভজাত.
আমারে ঠেলিয়ে
পৃথ্বিরাজে বরিলে, দিল্লীসিংহাসনে!
তদবধি মরি জ্ব'লে ঈর্ষার তাড়নে।
ঈর্ষার তাড়নে নিনু করে করবাল,
ঈর্ষার তাড়নে হনু রণে আগুয়ান,
কিন্তু হায় ঈর্ষা না মিটিল।
বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা
পুনঃ যুদ্ধে জয় আশা, আশার ছলনা।

সূর্য্য। রাঠোর রাজন্!
কঠোর শাসনে যাঁর
কম্পান্বিত উত্তর ভারত,
হেন বাণী না সাজে তাঁহার;
হীনবীর্য্যজনে মানে অস্তিত্ব দৈবের।

জয়। শুন সেনাপতি!
দৈব ও পুরুষকার,
বায়ুবহ্নিসম মুখাপেক্ষী পরস্পর;
শুধু ভূগর্ভ উত্থিত জলে
সরোবর-কলেবর হয়না বদ্ধিত,
জলদনিঃসৃত নীর হয় আবশ্যক।

সূর্য্য। পুনঃ রণ পৃথ্বিরাজ সনে,
যদি না হয় ঘটন,
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হতে দিল্লীশ্বর সনে,
একান্ত বাসনা যদি তব,
দিন আজ্ঞা দাসে,

পদতলে রাখি তরবারি,
মিলি গিয়া বর্ব্বর আফগান্ সনে,
শুধু প্রতিহিংসা মিটাতে আমার।

[রাওমলের প্রবেশ]

রাওমল। ছিছি সেনাপতি!
প্রতিহিংসা করিতে সাধন,
জন্মভূমি স্বাধীনতাধন
যবনের করে দিতে চাও ডালি?
মকরন্দহীন অরবিন্দ সম
মহত্ত্ববিহীন এই বীরত্ব তোমার!

জয়। খুল্লতাত!
জ্ঞাত আছি ভবদীয় উপদেশ-বলে;
অযাচিত মন্ত্রণাপ্রদান,
রাজনীতিবিরুদ্ধ আচার!
বিশেষতঃ অন্তরালে থাকি
অন্যের অন্তরকথা করিলে শ্রবণ,
প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের বিধান।

রাও। বৎস! ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি মোর,
কিন্তু পুত্রাধিক ভাবি তোমা;
ও চাঁদবদনে
অগ্রজের মুখচ্ছবি হেরি
ভুলে যাই ভ্রাতৃশোক।
তোমার কল্যাণ তরে
এ হতে অধিক কোন অশাস্ত্র আচার

যদি হয় করিতে আমার,
অকাতরে করিব সাধন।

জয়। হে পিতৃব্য!
পরাজয়ে পুড়িছে অন্তর,
হারায়েছি হিতাহিত জ্ঞান;
করিয়াছি গুরুজন-গৌরবের হানি
ক্ষমা কর অশিষ্ট আচার।

রাও। শুন জয়!
যুদ্ধে পরাজয় এই প্রথম তোমার,
সেই হেতু এত মনস্তাপ।
না মানিয়ে নিষেধবচন,
যুদ্ধপ্রিয় পারিষদ-পরামর্শ শুনি
অন্যায় সমরে তুমি হলে আগুয়ান,
সহিবারে অকারণ অপমান-জ্বালা;
করিবারে ধনবল সৈন্যসংখ্যা হ্রাস।
যা হবার হইয়াছে,
একতা-শৃঙ্খলে এবে বদ্ধ হও সবে,
ভারতের হিন্দুস্থান নাম
ইতিহাস হতে ফেলোনা মুছিয়ে।

জয়। খুল্লতাত! বুঝিতে না পারি,
কোন্ বহিঃশত্রু-ভয়ে ভীত এবে তুমি?

রাও। নহে গ্রীসদেশবাসী বীর এবে
ভারতলুণ্ঠন তরে হয় অগ্রসর;
কিম্বা নহেক কাশেম সাহ,
অথবা সে দুর্জ্জয় মামুদ

সোমনাথ শিবলিঙ্গ চূর্ণকারী
ভারতের রত্ন চোর ;
মহম্মদঘোরী এর নাম,
গান্ধারের সিংহাসন করি অধিকার,
বুভুক্ষু কুক্কুর সম
লেলিহিয়ে রসনা করাল,
ভারতের দ্বারদেশে আছে দাঁড়াইয়ে ;
শুদ্ধ দৌবারিক পৃথিরাজ-ভয়ে,
পারে নাই এতদিন হতে অগ্রসর।
কিন্তু যদি যুদ্ধমদে মাতি পরস্পর,
ছিন্নকর একতা-শৃঙ্খল,
জানিহ নিশ্চয়,
ভারতের ভাগ্যরবি
চিরতরে হবে অস্তমিত।

জয়। যাই এবে বিশ্রাম আগারে।
ছিছি অপমানে পুড়িছে অন্তর।

[জয়চাঁদ ও রাওমলের প্রস্থান।]

পৃথ্বী। যাও ভীরু কাপুরুষদ্বয় !
এতদূর দুর্ব্বল হৃদয় যার,
রাজ্য ত্যজি বনবাস বিধেয় তাহার।
রাওমল ! ভ্রান্তিময় ধারণা তোমার !
যেই জন, অসি আর মস্তিষ্কের বলে,
সামান্য সেনানী হ'তে,
সেনাপতিপদে সমাসীন,
বুঝ বৃদ্ধ ! কত উচ্চ আশা তার।

জয়চাঁদ! ভাবিও না মনে,
বহুশ্রমে উর্ণনাভ পাতে তন্তুজাল,
বসি তাহে মলয় সেবন তরে।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিত্রশালা।

সখিগণ। (মালা গাথিতে গাঁথিতে গীত।)

লোকে রতন ফেলে যতন ক'রে
পরে গলায় কুসুমহার,
বুঝি কোমল কুসুমল গলে
বিমল শোভা বাড়ায় তার।
তোমার মুখে যাহার হাসি
দেখছি কুসুম দিবানিশি
কৃপা ক'রে কুসুম তারে দেখাও দেখি একটী বার,
তখন রতন ফেলে যতন ক'রে গলায় পরা হবে সার।

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। গাথ মালা,
আজি রাজবালা বীরাঙ্গনা বেশে,
বীরবালা বীরপুত্র চিত্রাবলী
সাজাবেন স্বহস্তে যতনে।

১মা সখী। লো সজনি! নাহি জানি,
কি এক নূতন ভাবে বিভোর ভামিনী?
আজি জন্মতিথিপূজা তাঁর;
কোথা সঙ্গীতের সুধাময় ধ্বনি,

আস্তমাঝে হাস্যের তরঙ্গ,
মধুর নর্ত্তনসনে নূপুর-শিঞ্জন
উঠিবে অম্বর পথে,
তা না হয়ে চিত্রপূজা,—
বিবাহ-বাসরে বিরহ-সঙ্গীত ?

যমুনা। সহচরি ! নাহি জান বীরনারী-রীতি ;
প্রীতি তার বীরপূজা করি।
আরাধ্য দেবতা দেখি
বুঝা যায় ভক্তের হৃদয় ;—
যথা এক কার্ত্তিকেয় বীরে
কেহ পূজে বিলাসের পুতুল গড়িয়ে,
কেহ ভজে ষড়ানন তারকারি রূপে।

[সংযুক্তার প্রবেশ]

সংযুক্তা। সত্য সখি !
শূরত্ব সৌন্দর্য্য একাধারে,
হেন বীর-প্রসূনের প্রসূতি যেজন,
রত্নগর্ভা বলি তাঁরে ;
ভাগ্যবতী সে রমণী,
যিনি সোহাগিনী এহেন পতির।

যমুনা। লো ভগিনি !
মাধবী জড়িতা হয় সহকার গায়,
তরঙ্গিনী বহে যায় সাগর উদ্দেশে।
সুলোচনে !
সুধাময়ী সুবর্ণলতিকা তুমি,
শৌর্য্য, বীর্য্য, সৌন্দর্য্যের আদর্শ আলয়,

কার্ত্তিকেয় সম শূরস্বামী,
অবশ্য লভিবে আশু।

২য়া সখী। কবে হবে হেন শুভদিন,
যবে প্রেমময় পুরুষপ্রবর
হাসি হাসি প্রণয় বাঁধনে
বাঁধিবে তোমায় সখি?

যমুনা। উপবাসী জন ভাবে অনুক্ষণ
হইবে কখন ব্রাহ্মণভোজনশেষ;
পাইয়ে প্রসাদ,
ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে নিজের।

সংযুক্তা। রাখ রঙ্গ সখি!
দিনমণি প্রহরেক প্রায় উদিত আকাশে
আন ফুলহার,
সযতনে সাজাই আলেখ্যাবলী।
যমুনে! ভগিনি! লয়ে এস,
শূলিসোহাগিনী বিচিত্র সে চিত্রপট,
পূজি আগে আদ্যাশক্তি রাজীবচরণ।

যমুনা। (চিত্র আনিয়া) বুঝিতে না পারি,
হেরি এই সংহার মূরতি,
কেন মনে যুগপৎ,
ভক্তি ভীতি হয় সঞ্চারিত? [রাওমলের প্রবেশ]

রাও। কি বুঝিতে অক্ষম নাতিনি!
কার গলে দিবে মালা?
দাও এই বৃদ্ধগলে,
শুভ্রে শুভ্র শোভিবে সুন্দর।

সংযুক্তা। খুল্ল পিতামহ!
শুনেছি শ্রীমুখে তব, পড়েছি পুরাণে,
শিবনিন্দা শুনি শিবরাণী
পিতৃগৃহে ত্যজিলা পরাণী।
কিন্তু বুঝিতে না পারি
পুনঃ কেন পদতলে দলিয়া পতিরে
করিছেন তাণ্ডব নর্ত্তন ?

রাও। প্রশ্ন গুরুতর,
তাহতে নীরসতর মীমাংসা ইহার।
পূর্ব্বকালে—শুনহ নাতিনি!
আর্য্য অনার্য্য মধ্যে ঘটিলে সংগ্রাম,
দেবদেবীকুল দনুজদলন তরে,
হইতেন রণে আগুয়ান,
আর্য্যদের সাহায্য-কারণ;
হায় গিয়াছে সে দিন এবে!
সম্মুখে নেহার সেই রূপ,
মহামায়া মায়ের আমার।
চতুর্ভুজা হের জগন্মাতা,
দক্ষিণ দুকরে বরাভয় দানি ভক্তহৃদে,
বাম দিকে এককরে প্রচণ্ড খর্পর,
অন্যভুজে দনুজের মুণ্ড ধরি,
করিছেন তাণ্ডব নর্ত্তন
নৃমুণ্ডমালিনী মাতা।
সৃষ্টিলোপ-ভয়ে,
পশুপতি পড়ি পদতলে,

করিছেন গতিরোধ।
এই মূর্ত্তি জাগে যার হৃদয়মাঝারে,
দানবিক প্রবৃত্তিনিচয়,
অন্তর হইতে তার পলায় অন্তরে;
দেবভাব অভয় পাইয়া,
জেগে উঠে উল্লসিত মনে।
কিন্তু অন্য ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার
হাসিওনা পাগলের প্রলাপ ভাবিয়া।
হের মহাকাল লুণ্ঠিত ধরায়,
হৃদয় হইতে তাঁর,
মহাশক্তি উঠিয়া আকাশে
আক্রমিছে দিকদিগন্তর.
দানবদলন তার
রক্ষিবারে দেবগণে।

সংযুক্তা। ইচ্ছা হয় তাত!
সংসারের কুটিলতা হতে
লইয়া বিদায়, শ্রবণি সতত
সুধা প্রস্রবণ সম
তব মুখবিনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভবাণী।

রাও। শুনিলাম রাজদূত-মুখে
আজি জন্মতিথিপূজা তব,
তাই আইনু হেথায়,
আনন্দ করিতে তোমা সনে,
কই উৎসবের কোন চিহ্ন
না হেরি হেথায়।

সংযুক্তা। পিতামহ!
নিরানন্দপুরে আনন্দ উৎসব?
যেই রাজ্যে রাজা প্রজা
সেনাপতি সৈন্যগণ
রণাঙ্গণে করিয়াছে পৃষ্ঠপ্রদর্শন
সে রাজ্যের পুরাঙ্গনা
উৎসবে মাতাবে প্রাণ?

রাও। বীরাঙ্গনা-উপযুক্ত-বাণী
কিন্তু পিতৃনিন্দা না সাজে তোমায়।

সংযুক্তা। তাত!
ক্ষমা কর প্রগল্‌ভতা মোর পিতা
মোর অন্তঃপুরে যতক্ষণ
জনকের যোগ্য পূজা করিব প্রদান,
কিন্তু যবে বসিবেন বিচার-আসনে
কিম্বা অসিকরে পশিবেন সমরপ্রাঙ্গনে
ততক্ষণ প্রজা আমি তাঁর
পাইব সমান অধিকার
প্রতিবাদ করিবারে অযোগ্য কার্য্যে।

রাও। রাখ বৎসে, ও সব বচন।
দেখি কোন্ রথী মহারথী
পূজা পাবে সংযুক্তার পাশে।

সংযুক্তা। হের নবদূর্ব্বাদলশ্যাম
দশরথাত্মজ রাম
ভাঙ্গিছেন হরধনু
জানকীর স্বয়ম্বরসভাতলে।

হেন স্বয়ম্বর, হেন বীরপতি,
পিতামহ, কার নহে স্পৃহনীয়।
(পুষ্প দিয়া পূজা)
হের পুনঃ পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরসভা
দিক্‌পালগণ আলোকিয়া দশদিশি
বসেছেন সভাতলে।
নেহার অদূরে পাণ্ডুকুলরবি
মহাবীর পৃথার তনয়
করিছেন লক্ষ্য ভেদ
যজ্ঞাপত্নী যাজ্ঞসেনী আশে,
ধন্য শিক্ষা ধন্য বীরবর। (পূজাকরণ)।
দেখ পিতামহ!
সুভদ্রার রথসঞ্চালন;
পতি রথী, সারথী সহধর্ম্মিণী।
হায় হায়, গেছে ভারতের
হেন গৌরবের দিন। (পূজাকরণ)।
হের রথোপরি যুঝিছেন
ভরত-কুল-প্রদীপ পার্থ মহাবীর
রামকৃষ্ণ আদি যদুকুল বীরসনে,
পত্নী করে অশ্বসঞ্চালন,
ধন্য স্বয়ম্বর, ধন্যা তুমি সুভদ্রাসুন্দরি। (পূজাকরণ)।

রাও। বুঝিয়াছি বৎসে, মনোভাব তব,
করি আশীর্ব্বাদ, লভ হেন বীরপতি,
তব স্বয়ম্বর,
ইতিহাস যেন চিরকাল করায় কীর্ত্তন।

সংযুক্তা। পিতামহ,
নেহার হেথায় শরশয্যা,
শূরকুল সোহাগের শয্যা যাহা,
তদুপরি সত্যব্রত শান্তনুনন্দন,
মরি মরি দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত বিচিত্র শয়ন
উপেক্ষিয়া অনায়াসে
স্বেচ্ছায় শায়িত কিবা!
সহস্র প্রণাম তব চরণপঙ্কজে
পুরুষপুঙ্গব! (পূজাকরণ)।

রাও। বুঝিলাম শিক্ষাকার্য্যে তব
শ্রম মম হয়েছে সার্থক,
কন্যাপ্যেব পালনীয়া,
শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।
যমুনে, ক্ষত্রকুলউজ্জলকারিণি,
নেহার সম্মুখে আদর্শ রমণী,
ভারত-সাম্রাজ্য-সিংহাসন
বসিবার সুযোগ্য আসন যাঁর।
স্ত্রীশিক্ষার পথে কণ্টক যাঁহারা,
কিম্বা উচ্চশিক্ষা-পক্ষপাতী যাঁরা,
সমভাবে মম নিবেদন
তাঁহাদের পাশে
যদি হেন শিক্ষা, হেন দীক্ষা
দাও নারীগণে,
ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, দয়া,
বীরত্ব, বাৎসল্য, স্বদেশপ্রিয়তা আদি

উচ্চবৃত্তি সব যাহে হয় বিকশিত,
উদ্দেশ্য সফল হইবে তাহে ;
সেই গর্ব্বে জন্মিলে সন্তান,
সেই মাতৃপাশে বাল্যশিক্ষা করিলে অর্জ্জন,
হবে নাকি আদর্শ পুরুষ পরিণাম ?
হের এই রাজার নন্দিনা,
চারিদিকে বেষ্টিত বিলাসে :
শুধু সুশিক্ষার গুণে
মনোবৃত্তিনিচয়ের হেন উচ্চভাব
লভিয়াছে তরুণ বয়সে।
বৎসে, করি আশীর্ব্বাদ
সুখী হও যোগ্যপাত্র করি লাভ।

চিত্রওয়ালী। আর্য্য, আনিয়াছি আদর্শ তোমার,
চারু চিত্রাবলী
নির্ব্বাচিত করি কতিপয়
করুন্ কৃতার্থ মোরে।

যমুনা। অন্য চিত্রে নাহি আজি প্রয়োজন ;
যদি তব পাশে
থাকে কোন রাজপুত্র অথবা যুবক রাজার চিত্র,
বাহুবলে ভুবনবিজয়ী যেই,
রূপে কন্দর্প জিনিয়া কান্তি যার,
দাও সেই চিত্র রাজকন্যা-করে,
নাহি অন্য প্রয়োজন।　　[পৃথ্বিরাজের চিত্রপ্রদান]

সংযুক্তা। একি কাহার এ মোহন মুরতি ?
বিস্তৃত ললাট, প্রশান্ত বদন,

উজ্জ্বল নয়নদ্বয়
প্রতিভার দেয় পরিচয়,
দূরাগত বেণুধ্বনি প্রায়
স্মৃতিমাঝে এক অস্ফুট আলোক সম
জাগিছে এ মোহন মূরতি,
বোধ হয় বালিকা বয়সে
হেরিয়াছি এর কিশোর মূরতি,
তার পর তার পর আর দেখি নাই।

যমুনা। ভগিনি, কেবা সেই ভাগ্যধর,
হেরি প্রতিকৃতি যার, চিন্তাভারে
বিকৃত বদন তব?
দেখি দেখি, কেবা সেই মহাজন, (ছবি দেখিয়া)
এযে পৃথ্বিরাজ,
পিতামহসনে, ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছিনু
দেখিবারে এঁর অভিষেকোৎসব,
তুমি বুঝি যাও নাই?

সংযুক্তা। (স্বগত) পৃথ্বিরাজ—পৃথ্বিরাজ
পিতার পরম শত্রু,
(প্রকাশ্যে) বিশালাক্ষি, প্রিয় সখি
কর তুষ্ট উপযুক্ত অর্থদানে
এই জনে, এই চিত্রবিনিময়ে;
যমুনে, ভগিনি, চল যাই,
যথা মাতা মোর পূজিতেছে পশুপতি
রাজ্যের মঙ্গলকামনা করি।
চল মোরা গিয়ে অর্ঘ্য দিয়ে আসি। [প্রস্থান।]

শ্রীমনোমোহন গোস্বামী।

বাঙ্গালী পাড়ায়।

। বিপন্নমাতৃক ।

একদিন গোধূলির সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে হ্যারিসন রোডে একটা আলোকস্তম্ভের নীচে গুটি ছয় সাত বাঙ্গালী বালককে সমবেত দেখিলাম। আবছায়ায় কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই। কেবল ঈষৎ মলিন সাদা পিরান, তদনুরূপ সাদা ধুতির কোঁচা, নগ্নপাদপিণ্ডিকা ও চটিজুতার একটা ঝাপটা চোখের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

অনুভব করিয়া দেখিলাম তাহা একটা আনন্দের ঝাপটা—অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার রেশ মনের উপর রহিয়া গেল। কিসের এ আনন্দ? কেবলমাত্র স্বজাতীয় বালকবৃন্দের মুখচন্দ্র দর্শনের, কেবলমাত্র তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূতির।

আমাদের গৃহের পশ্চাতে একটি সাধারণগম্য উদ্যান আছে। তাহাতে প্রায়ই পূর্ব্বাহ্নে ছোট ছোট জাল হস্তে পতঙ্গকামী ইংরাজ পুরুষের গতিবিধি হয়। দৈবাৎ কোন অপরাহ্নে বাঙ্গালী ছেলেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহারা আমার এই সোদরকল্প বালকেরা যখন কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে দীর্ঘিকার ধারে আসিয়া দাঁড়ায়, বৃক্ষচ্ছায়া-ঘন অন্ধকার দীঘির ধার যেন সহসা অরুণোদয়কালের প্রাচীদিকের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। সম্মুখের ময়দান এ পাড়ার বাঙ্গালী ছেলেদের প্রতিদিন ফুটবল, ক্রিকেট ও টেনিসে মাতামাতির রঙ্গস্থল। তাহারা রৌদ্র, বৃষ্টি কিছু না মানিয়া তারুণ্যোচিত স্ফূর্ত্তিতে ছুটাছুটি দাপাদাপি হাসাহাসি ও কলহ করে। এমন প্রীতিকর দৃশ্য আমার

চোখে আর কিছু লাগেনা। এমন মধুর কলরব আর কিছু মনে হয় না।

মাতা বঙ্গভূমির ঘরভরা কোলভরা ছেলে যেথানেই, যে অবস্থায়, যখনই দেখি, তাঁহার আনন্দ আমার বুকে আসিয়া সঞ্জাত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা মনে উদয় হয়। এই যে এতগুলি তরুণ ভ্রাতা আমাদের, ইহারা বিপন্নমাতৃক, ইহাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ কি হইবে? মা ইহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধা, পীড়িতা, রুগ্না, মৃতকল্পা— ইহাদের মানুষ করিয়া তুলিবে কে? ইহাদের হইয়া কে সাধনা করিবে, কে তপশ্চর্য্যা করিবে? ইহাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে কে উদ্বোধিত করিবে? ইহাদের নিকট স্নেহকঠোর করুণমন্দ্রস্বরে কে ঘোষিবে?

বরমেকো বীরপুত্রো ন চ ভীরুশতৈরপি
একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি।

২। শক্তির অংশভূতা।

একরাত্রে থিয়েটরে গিয়াছিলাম। মেয়ে মহলে ভারি ভিড়। নানা বেশভূষান্বিতা, তরুণা, প্রাচীনা, কলকলায়মানা, কত মধুর মুখশ্রী। তাঁহাদের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার কৌশল্যা, সুমিত্রা, কুন্তী, সত্যবতী, গান্ধারী, সকলকে মনে পড়িল। মনে মনে ভাবিলাম তোমাদের প্রত্যেকেরই নিকট ঐ সকল নামই অতি পরিচিত। কিন্তু কখন কি মনে করিয়াছ তাঁহারা—ঐ নামধারী রমণীরা—এই তোমরাই? হরিদ্বারের উত্তরে পাহাড় ভেদ করিয়া গঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। সেই গঙ্গার এক একটি ঢেউ ঐ সুদূর হইতে বহিয়া বহিয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়াছে, এবং কলিকাতাও ছাড়াইয়া সাগরে গিয়া পড়িতেছে। তেমনি আমরা সকলেও কালপ্রবাহে সেই অতীতকাল হইতে বর্ত্তমানে

আসিয়া উপনীত হইয়াছি। সেই অতীতের ভারতরমণীরা আর আমরা বিভিন্ন নহি। সেই কৌশল্যা, সুমিত্রা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, আমরাই; সেই ভীমার্জ্জুন, লক্ষ্মণ, ভরত আমাদেরই বীর সন্তানেরা, সেই কর্ণ, দ্রোণ, কৃষ্ণ, ভীষ্ম আমাদেরই বীর অভিভাবকেরা।

তোমরা বীরনাথিনী, বীরজননী, ভারতরমণী। তোমরা মনস্বিনী, দীপ্তশিখাসম। কত কবিকণ্ঠে দীপকছন্দে তোমাদের স্তুতি গীত হইয়াছে। আজ কেন তেজোহীনা, কুণ্ঠিতা, ভিজা ন্যাকড়ার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছ? স্বামীপুত্রের পৌরুষগর্ব্বের বিঘ্নকারিণী, জয়মদোল্লাসের ব্যাঘাতকারিণী, দেশের অকল্যাণের নিদানভূতা বলিয়া নিন্দাভাগিনী! নহ, নহ, এ সকল মিথ্যা অভিযোগ, অপবাদের যোগ্যা তোমরা নহ। তোমরা শক্তির অংশভূতা, মহাদেবী, শিবানী! ভারতরূপী বিষ্ণু মোহনিদ্রাভিভূত হইয়া রহিয়াছে। হে হরিনেত্রবাসিনি নিদ্রাস্বরূপা ভারতরমণি! ভারতের চেতনপ্রাপ্তিমানসে তাহার নিদ্রালস নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও মন হইতে বিনির্গত হও, তাহাকে জাগরিত কর। হে ভারতরমণি! তোমার প্রভাবশালিনী বিশ্বেশ্বরেশ্বরী মূর্ত্তি বিকাশ কর! আপনাকে জান! আত্মানং বিদ্ধি!

৩। আত্মজ্ঞান।

একদিন বুদ্ধদেব শিষ্যগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় সহসা বজ্রপাণি ভিন্ন আর সকল শিষ্যের চক্ষু অন্ধ করিয়া এক অত্যুজ্জ্বল ভয়ঙ্কর শিবমূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্য আবির্ভূত হইল। বজ্রপাণি তাঁহার সহচরগণকে অন্ধ দেখিয়া, সবিস্ময়ে গুরুদেবের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"প্রভো! গঙ্গার বালুকণাসম অগণিত নক্ষত্রলোক ও দেবলোকে খুঁজিয়াও এই জ্যোতিষ্মান্ মূর্ত্তিকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। বলুন ইনি কে?"

বুদ্ধ উত্তর প্রদান করিলেন—"ইনি তুমিই!"

৪। বীর জননী।

পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা কুন্তী আধুনিক বঙ্গজননীরই ন্যায় পুত্রগতপ্রাণা ও পুত্রদিগের জন্য স্নেহব্যাকুলা ছিলেন। সেই দিনকার চিত্রখানি খুলিয়া দেখ, যে দিন উদ্যানমধ্যে ক্রীড়াভিরত পরস্পরের মুখে খাদ্যদ্রব্য প্রদান-কালে পাপ দুর্য্যোধন ভীমসেনের বিনাশবাসনায় তাহার মুখে কাল-কূট মিশ্রিত ভক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল। ক্রীড়াশ্রান্ত ও কালকূটমদে বিমোহিত ভীমসেন নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলে, দুর্য্যোধন মৃতকল্প বীর ভীমকে লতাপাশ দ্বারা স্বয়ং বন্ধন করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল। ভীম ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণ নানাবিধ ক্রীড়া ও বিহার করিয়া বিবিধ যানে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন, গমনকালে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, ভীমসেন আমাদের অগ্রে গিয়া থাকিবে। কিন্তু গৃহে আসিয়া মাতার নিকট জানিলেন ভীম আসেন নাই। মাতা যখন শুনিলেন ভীম প্রসুপ্ত ছিল, পরে আসিল না, তখন নানা সন্দেহে নানা অকল্যাণ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কুন্তী হাহাকার করিতে লাগিলেন!

সেই এক দৃশ্য! আর এক দিনের দৃশ্য দেখ!

সপুত্রা কুন্তী একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে কিছুকাল বাস করিতেছিলেন। অনন্তর একদিন যুধিষ্ঠিরাদি সকলে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন, ভীমসেন সেদিন দৈবাৎ মাতার সহিত গৃহেই রহিলেন। সহসা কুন্তী ও ভীম শুনিতে পাইলেন তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে ঘোর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। কুন্তী তাহাদিগের অতিশয় রোদন ও বিলাপধ্বনি শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় কারুণ্যে মথিত হইতে লাগিল। কল্যাণী কুন্তী ভীমসেনকে কহিলেন—"পুত্র! আমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের অজ্ঞাত-সারে এই ব্রাহ্মণগৃহে সৎকৃত ও শোকরহিত হইয়া সুখে বাস

করিতেছি ; ইহাতে আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি যে যেমন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মহাত্মারা যাহার গৃহে সুখে বাস করেন, তাহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন সেইরূপ আমি কিরূপে এই ব্রাহ্মণের উপকার করিব ? পুত্র উপকার করিলে যে ব্যক্তি তাহার প্রত্যুপকার করে, সেই ব্যক্তি পুরুষ ; এবং যে পরিমাণে কেহ উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহার প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এই ব্রাহ্মণের গৃহে কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, ঐ দুঃখ পরিহারের নিমিত্ত যদি ইহার কোন সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে প্রত্যুপকার করা হয়।"

ভীমসেন কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণের যে জন্য দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনি জ্ঞাত হউন ; অবগত হইয়া তৎপ্রতীকার দুষ্কর হইলেও তাহাতে যত্ন করিব।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। কুন্তী ত্বরান্বিতা হইয়া তাহাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ ম্লানবদনে ভার্য্যা পুত্র ও দুহিতার সহিত উপবিষ্ট আছেন, এবং পরস্পরে পরস্পরের জন্য প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"তুমি অপত্যজননী, সাধ্বী, অনপকারিণী ও সতত ব্রতপরায়ণা ভার্য্যা, আত্মজীবনরক্ষার নিমিত্ত তোমাকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব ? আর যে বালকের এপর্য্যন্ত শ্মশ্রু প্রকাশিত হয় নাই, এতাদৃশ অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকেই বা কিরূপে আমি স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে পারি ? এবং মহাত্মা বিধাতা উপযুক্ত ভর্ত্তৃহস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত যে কন্যাকে আমার নিকট ন্যাসস্বরূপ রক্ষিত করিয়াছেন, সেই বালিকা দুহিতাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি ? তোমাদিগের অন্যতম একজনকেও পরিত্যাগ করিলে গর্হিত নৃশংস

ব্যবহার হয়; আর স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিলেও তোমরা আমা ব্যতিরেকে দেহত্যাগ করিবে। অতএব আমি ঘোর আপদে পতিত হইলাম! হা! এ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখি না।”

ব্রাহ্মণী নানা যুক্তি তর্ক ও সান্ত্বনাপ্রদ বাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন—“বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি না থাকিলে আমি ও এই দুইটি সন্তান এই তিন জনেরই বিনাশ হইবে, সুতরাং আমার বিবেচনায় আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনার উচিত। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ধর্ম্মবিনির্ণয় স্থলে স্ত্রীলোক অবধ্য ও রাক্ষসদিগকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন, সুতরাং সেই রাক্ষস আমাকে বধ না করিয়া পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ যে স্থলে পুরুষের বধ নিশ্চয় ও স্ত্রীলোকের বধ সংশয়িত হইতেছে, সে স্থলে আমাকেই প্রেরণ করা উচিত।”

কন্যা কহিতেছে—“কি নিমিত্ত আপনারা অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছেন? আপনারা ধর্ম্মানুসারে এক সময়ে আমাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই; অতএব অবশ্যত্যাজ্য একমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় রক্ষা করুন। পিতৃলোকের পরিত্রাণের নিমিত্তই আমা হইতে দৌহিত্র প্রত্যাশা করেন; পরন্তু আমি দৌহিত্রের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পিতার জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের পরিত্রাণ করিব। হে পিতঃ যদ্যপি আপনি পরলোক গমন করেন, অল্পকাল মধ্যেই আমার এই শিশুভ্রাতা কালকবলে পতিত হইবে সন্দেহ নাই। মাতাও স্বামী এবং পুত্রের শোকে জীবিত থাকিবেন না, আপনি ব্যতিরেকে আমাকেও অনাথা ও দীনা হইয়া যে সে স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব হে তাতঃ হে সত্তম! আমার এবং ধর্ম্ম ও বংশরক্ষার নিমিত্ত আপনাকে রক্ষা করুন। সেই আমাকে এক সময়ে অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে,

না হয় এই সময় ত্যাগ করিলেন ; অবশ্যকরনীয় বিষয়ে আর কালাতি-পাত করা উচিত নহে।”

বালকপুত্র পিতামাতা ও ভগিনী সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রসন্ননয়নে সহাস্যবদনে মধুর ও অস্পষ্টবাক্যে কহিতেছে “হে পিতঃ! ক্রন্দন করিবেন না। হে মাতঃ! রোদন করিবেন না। হে ভগিনি! বিলাপ করিবেন না।” এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এক একবার করিয়া গমন করিতেছে, এবং কখন কখন একটী তৃণ গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতেছে— “আমি সেই পুরুষাদক রাক্ষসকে এই তৃণদ্বারা বধ করিব।” অতি দুঃখেও মাতা পিতা ও ভগিনীর মনে শিশুর অস্পষ্ট বাক্যশ্রবণে হর্ষোদয় হইতেছে।

অনন্তর কুন্তী “অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার এই সময়” ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, এবং তাঁহাদের দুঃখের কারণ জ্ঞাত হইয়া কহিলেন—“হে ব্রাহ্মণ! তুমি এই ভয় হইতে কোন প্রকার বিষণ্ন হইও না, আমি সেই রাক্ষস হইতে তোমাদের মুক্তির উপায় স্থির করিয়াছি। তোমার একটী বালকপুত্র ও একমাত্র ব্রতস্থা কন্যা; তাহাদিগের কি তোমার পত্নীর, কি তোমার স্বয়ং গমন করা আমার বিবেচনায় উচিত হয় না। আমার পঞ্চ পুত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণ করিয়া সেই পাপরাক্ষসের নিকট গমন করিবে।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন—“তাহা হইতে পারে না। আমি স্বীয় জীবন রক্ষার নিমিত্ত অতিথির প্রাণ বিয়োগ করিতে পারিব না।”

কুন্তী বলিলেন—“আমারও স্থিরব্রত এই যে বিপন্ন ব্রাহ্মণকে অবশ্যই রক্ষা করিব। কিন্তু তথাপি জানিও হে ব্রহ্মণ্! শতপুত্র হইলেও কোন একটী পুত্র মাতার অনাদরের হয় না। আমার নিশ্চয় বোধ আছে

আমার তনয় বীর্য্যবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ, সুতরাং ঐ রাক্ষস তাহাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। আমার তনয়ই রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবে। আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলবান অনেকানেক রাক্ষস আসিয়া আমার বীরপুত্র হইতে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।”

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্য্যার সহিত অতিশয় হৃষ্টচিত্তে অমৃততুল্য সেই বাক্যে সমাদরপূর্ব্বক সম্মত হইলেন। পরে কুন্তী ভীমকে সেই দুরূহ কর্ম্ম করিতে আদেশ করিলেন। ভীমসেনও প্রস্তুত হইলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য পাণ্ডবেরা ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত হইলেন।

যুধিষ্ঠির আসিয়াই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভীতচিত্তে কহিলেন —“মাতঃ আপনি এ কি সুদুষ্কর ভয়াবহ সাহস করিয়াছেন? আপনি কি জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন? দুঃখহেতু আপনার কি বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে? আপনি কোন্ বুদ্ধিতে পরপুত্র রক্ষার্থ নিজপুত্র ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন? যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা সুখে শয়ন করিতেছি, যাঁহার বাহুবল অবলম্বনে আমরা ক্ষুদ্রাশয় দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি আপনি কোন্ বুদ্ধিতে সেই ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন?”

যুধিষ্ঠির যে ভীরুতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত নিবৃত্তি বাক্য বলিলেন, আজিকালকার যে কোন অগ্রজ কোন সাহসকার্য্যে প্রবৃত্ত উদারহৃদয় কনিষ্ঠের কার্য্যসম্বন্ধে পুত্রের সৎকার্য্যে উৎসাহদাত্রী জননীকে সেইরূপেই তিরস্কার করিতে পারিত।

কিন্তু সেদিনকার ধর্ম্মজ্ঞা বীরজননী কি উত্তর দিলেন? তিনি বলিলেন—“যুধিষ্ঠির! আমি বুদ্ধিহ্রাস জন্য এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। তুমি বৃকোদরের জন্য সন্তাপ করিও না। আমি লোভ কি অজ্ঞান কি

যাহহেতু ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই; বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই ধর্ম্মকার্য্যের উদ্যোগ করিয়াছি। আমি ভীমের বল অবগত আছি। ভীম আমার যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ বজ্রধারী স্বয়ং ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে। হে যুধিষ্ঠির! এই কার্য্যদ্বারা দুই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবে; এক এই যে, এই স্থানে বাস করিতেছি তাহার প্রত্যুপকার; দ্বিতীয় মহাধর্ম্ম। আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে, যিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের কোন হিত বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনি ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হন। যে ক্ষত্রিয় পুরুষ ক্ষত্রিয়ের প্রাণ রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে বিপুল যশ প্রাপ্ত হন; ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যের সাহায্য করিলে ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র প্রজা-রঞ্জক হন সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয় পুরুষ শূদ্র কি শরণাগত ব্যক্তিকে যদি বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও রাজপূজিত বংশে জন্মলাভ হয়। হে পৌরবনন্দন! পূর্ব্বকালে আশুতর বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্যাস আমাকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই জন্যই আমি এই কর্ম্ম করিতে মানস করিয়াছি।"

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞা মাতার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া চিত্ত হইতে ক্ষুদ্রতা ও ভীরুতা বিদূরিত করিয়া কহিলেন—"মাতঃ আপনি বুদ্ধিপূর্ব্বক এই যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা উত্তম।"

এই সেই কুন্তী যিনি একদিন ভীমের অদর্শনে তাঁহাকে শত্রুর চক্রান্তে বিপন্ন সন্দেহ করিয়া অধীরচিত্তা হইয়াছিলেন! আজ তিনিই উপকারী আশ্রয়দাতার জীবন-রক্ষার্থে, ধর্ম্মকার্য্যে, পুত্রকে স্বীয় জীবন সংশয় করিতে ধীরচিত্তে আদেশ প্রদান করিলেন। আজিকার ভারতের প্রত্যেক জননী জননীত্বে আপনাকে কুন্তীর অংশভূতা বলিয়া জানেন, কিন্তু শুধু জননীস্নেহে নয়, জননীর মায়াশীলতায় নহে,—জননীর ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্বে, পুত্রকে কর্ত্তব্যকার্য্যে প্ররোচনা দানেও নিজেকে পাণ্ডবজননীর যোগ্যা জানুন।

৫। আদরের পার্থক্য।

প্রাচীন ভারতে ছেলে আদর করার রীতি কেমন ছিল জানা যায় না। কিন্তু এখনকার কোন প্রভূত জীবনীশক্তিসম্পন্ন বীর্য্যশালী জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। য়ুরোপীয়া রমণী কোন আত্মীয়া বা সখির ছেলে গৃহে আসিলেই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলেন—"Oh! Isn't he heavy! Isn't he big!"—শিশুর জননী প্রীতিবিভাসিত সহাস্য আননে এই শ্রুতি-সুখকর কথাগুলি পান করেন। আর বাঙ্গালী মা হইলে ঐ কথা কটিতে মর্ম্মান্তিক চটিয়া যাইতেন, বলিতেন—"আমার বাছাকে খুঁড়লে।" আমাদের দেশের ছেলেপিলের প্রতি জননীস্থানীয়াদের স্নেহদীপ্ত সাধারণ উক্তিগুলি স্মরণ কর—"আহা বাছার গায়ে কিছু নেই" —বুকের হাড় জির্ জির্ করছে," "বাছা আমার কিছু খেতে পারে না"—ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙ্গালীর শিশু জন্মাবধি এই সব শুনিয়া শুনিয়া নিজের প্রতি অতি সকরুণ চক্ষে চাহিতে শেখে। সুতরাং যখন কোন হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের হাতে পড়িয়া উত্তমমধ্যম প্রাপ্তির সান্নিপাতিকে অপর হিন্দুস্থানীর করুণাপ্রসূত বাক্য কর্ণকুহরে পৌঁছায় —"বাঙ্গালা আদমী হ্যায়, ছোড় দেও"—তখন অপমানজ্ঞানে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলিয়া উঠিবার অবসর পায় না—সেই মা মাসি পিসি দিদি দিদিমার বাক্যগুলিই স্মরণে উদয় হয়—"আহা বাছার গায়ে কিছু নেই।"— এবং হতভাগ্য বাছা তাই মনে করিয়া আত্মকরুণায় চোখের জল সাম্লাইতে পথ পায় না।

কবে আমাদের জননীরা তাঁহাদের বাছাদের লবের মত বলিতে শিখাইবেন—কথং মাং অনুকম্পতে? কি? আমার প্রতি অনুকম্পা করিতেছে? এবং তাহাই বলিতে বলিতে নির্ধূম পাবকের ন্যায় দীপ্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করিবেন?

৬। বীরনাথিনী।

নলদময়ন্তীর মিলন ও বিরহকাহিনী কোন্ বঙ্গনারী না জানেন? দময়ন্তী যে নলকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার রূপবর্ণনা-শ্রবণে। মহাভারতকার বলিতেছেন:—"আয়তনয়না সেই বালা লক্ষ্মীর ন্যায় এমত সুরূপসম্পন্না ছিলেন যে, দেব, যক্ষ, মনুষ্য কি অন্য কোন লোকমধ্যে তাঁহার তুল্যা দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেই সুন্দরীকে দর্শন করিলে দেবগণেরও চিত্ত প্রসন্নতা জন্মিত। এদিকে নরশার্দ্দূল নলরাজাও ত্রিলোকমধ্যে অনুপম রূপসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহার রূপ দ্বারা স্বয়ং কন্দর্প যেন মূর্ত্তিমান হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লোকে কুতূহলপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ দময়ন্তী সমীপে নলের প্রশংসা ও নল সমীপে দময়ন্তীর প্রশংসা করিতে লাগিল। হে কৌন্তেয়! দময়ন্তী ও নল উভয়ে উভয়ের গুণ নিরন্তর শ্রবণ করাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কামনা গূঢ়রূপে উৎপন্ন হইল এবং অন্তঃকরণ মধ্যে মনোজের আবির্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। * * * দময়ন্তী যে হংসের সমীপে গমন করিতেছিলেন, সেই হংস মানবীয় বাক্যে তাঁহাকে কহিল, "হে দময়ন্তি! নিষধ দেশে নল নামে যে এক মহীপতি আছেন, তিনি রূপে অশ্বিনী কুমার তুল্য, তাঁহার সদৃশ কোন মনুষ্য নাই; তাঁহার রূপ দ্বারা স্বয়ং কন্দর্প যেন মূর্ত্তিমান হইয়াছেন; হে সুমধ্যমে বরবর্ণিনি! যদি তুমি তাঁহার ভার্য্যা হও, তবে তোমার জন্ম ও রূপ সফল হয়। আমরা পূর্ব্বে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষসকে দেখিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও নলসদৃশ রূপবান দেখি নাই। * * * * দময়ন্তী হংসের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নলের প্রতি একাগ্রচিত্তা হইলেন।"

অতএব দেখিতেছি নলের প্রতি দময়ন্তীর যে পত্নীনিষ্ঠা ও অনুরাগ,

যাহার বলে তিনি দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করিয়া নলের প্রতিই বুদ্ধি ও ভক্তি স্থির রাখিলেন, শারীরিক সৌন্দর্য্যপ্রীতিই তাহার প্ররোচক। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার দেখ! যখন গভীর কাননে পরিত্যক্তা দময়ন্তী নিদ্রোত্থিতা হইয়া নলকে দেখিতে না পাইয়া তীব্রশোকে আর্ত্তা ও দুঃখানলে প্রজ্জ্বলিতা হইয়া কখন ইতস্ততঃ ধাবন করেন, কখন উত্থিতা হন, কখন বিহ্বলা হইয়া পতিত হন, কখন ভূপৃষ্ঠে লীনপ্রায় হন, কখন রোদন করিয়া উঠেন, কখন নলের নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে থাকেন—তখন কোন্ নল, তাঁর সুপুরুষত্ব বা পৌরুষ, কোন্ বৈলক্ষণ্য দময়ন্তীর হৃদয়ে আধিপত্য করে? তাঁকে কোন্ বিশেষ বিশেষ উপাধিতে বিশেষিত করিয়া দময়ন্তী তাঁর নাম উচ্চারণ করেন? মহাভারতকার বলিতেছেন—

দময়ন্তী একাকিনী হইয়াও ধর্ম্মবল, যশস্কর কার্য্য, অলৌকিক শ্রী ও ধৈর্য্য দ্বারা তথায় নলকে অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীর বিপদে পরিপীড়িতা হইয়া সেই নিদারুণ অটবীস্থলে কাহারও নিকট ভীতা হইলেন না। তিনি পতিশোকে পরীতাঙ্গী ও নিরতিশয় দুঃখার্ত্তা হইয়া এক শিলাতল আশ্রয় করতঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হে দুরাধর্ষ! হে পুরুষপ্রবর! হে প্রভো! আপনি যে এতাবৎকাল পরিহাস করিলেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আমি ভয়ার্ত্তা হইয়াছি; আমাকে দর্শন দিউন!"

"হে পৃথুলবাহু মহাবাহু নিষধনাথ! আপনি অদ্য আমাকে এই বিজন বনে বিসর্জ্জন করিয়া কোথায় গমন করিলেন?

হে বীর নরেন্দ্র! আপনি ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইয়া কি নিমিত্ত আমার প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিলেন?

হে নরসিংহ! হে ক্ষত্রিয়বর! হে মহাদ্যুতে!

হে শত্রুঘ্ন! নরেশ্বর!

হা বীর! হা নল! আমি আপনার হইয়া এই ঘোর অরণ্য মধ্যে মরিলাম আপনি কি জন্য আমাকে সম্ভাষণ করিতেছেন না?

হে অরিকর্ষণ! হে মানার্হ! হে পৃথুলোচন! আমি যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় একাকিনী মহারণ্যে রোদন করিতেছি; আপনি কি হেতু আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন?

কে অদ্য আমাকে শত্রুব্যূহবিনাশক সাক্ষাৎ মহাত্মা নলকে এই বনে অবস্থিত বলিয়া সম্বাদ দিবে!

আমি বিদর্ভরাজের তনয়া ও শত্রুঘাতী নিষধাধিপতি নলের ভার্য্যা।

(এই পুণ্য গিরিরাজকে নলের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করি) হে অচলশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! আমার পিতা বিদর্ভ দেশের অধিপতি; তিনি মহারথ তাঁহার নাম ভীম.........তিনি সম্পূর্ণরূপে বিদর্ভদেশ রক্ষা করিয়া থাকেন এবং অরিকুল জয় করিয়াছেন। আমার শ্বশুর নিষধদেশের অধিপতি, তিনি বীরসেন নামে সুবিখ্যাত। ঐ রাজার পুত্র শ্রীমান্ নল পুণ্যশ্লোক বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সত্যপরাক্রম, বীর, সুপুরুষ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, বাক্‌পটু, পুণ্যকৃৎ, সোমপ, সাগ্নি, যজ্ঞানুষ্ঠাতা, দাতা, যোদ্ধা ও সম্যক্ শাসনকর্ত্তা।

সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, ধীমান্, দীর্ঘবাহু, অমর্ষণশীল, সত্ত্ববান, বীর, বিক্রমশীল, মহাযশস্বী নিষধনাথ নলকে দেখিয়াছ?

হে তপোধন বিপ্রগণ! নল নামে মহাযশস্বী, ধীমান্, সংগ্রামবিজয়ী, বিদ্বান্ বীর নৃপতি আমার ভর্ত্তা।

মহাতেজস্বী, মহাবল, অস্ত্রজ্ঞ, শত্রুমর্দ্দন, শত্রুপুরজয়ী, প্রাজ্ঞ, সত্যসন্ধ নৃপতিশ্রেষ্ঠ আমার স্বামী। সেই মহাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগ ও যুদ্ধে বিপক্ষহন্তা, তাঁহার প্রভা রবিসোমসদৃশ।

হে প্রিয়দর্শন অশোক! আমার নাম দময়ন্তী, তুমি আমার

প্রিয়পতি অরিন্দম নিষধাধিপতি সুকুমার-শরীর বীর নল রাজাকে দেখিয়াছ?

হে সার্থপতি! আমি রাজার কন্যা, রাজার পুত্রবধূ ও রাজার ভার্য্যা, নল নামে মহারাজ নিষধরাজ আমার ভর্ত্তা। আমি সেই অপরাজিত নলনৃপতিকে অন্বেষণ করিতেছি।

হে ধাত্রি! আমার ভর্ত্তা বীর ও অসংখ্যেয় গুণান্বিত!"

সত্যই নল অসংখ্যেয় গুণান্বিত; কিন্তু তাঁর আর আর সমস্ত গুণাবলীর অনুধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বীরত্বগুণই দময়ন্তীর মুখে সর্ব্বোপরি অধিকতর ব্যক্ত হইতেছে—দময়ন্তী যে বীরনাথিনী এই জ্ঞানটাই তাঁর জাজ্জ্বল্যমান্ রহিয়াছে। ধন্যা দময়ন্তী!

শুধু দময়ন্তী নহেন, মহাভারতের প্রত্যেক নারীই নিজেকে বীর-নাথিনী জানিতেন, এবং সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত থাকিতেন। একালে ... ঘাটে, রেলে ষ্টীমারে যাতায়াতকালে কতগুলি সৌভাগ্যশালিনী বঙ্গ রমণী নিজেকে তদ্রূপ বীরনাথিনী জ্ঞানে নিশ্চিন্তমনা থাকিতে পারেন? কয়টি স্ত্রী স্বামীকে 'অরিন্দম' 'শত্রুন্তপ' 'মহাতেজস্বী,' 'মহাবল,' 'অস্ত্রজ্ঞ,' 'শত্রুঘ্ন,' 'শত্রুমর্দ্দন,' 'শত্রুপুরজয়ী,' 'বিপক্ষ হন্তা,' 'বীর,' 'অপরাজিত,' 'দুর্ধর্ষ,' 'পৃথুলবাহু,' 'মহাবাহু,' 'পুরুষ প্রবর,' 'সত্ত্বান্;' 'মানার্হ'—প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের উপাধিভূষণের যোগ্য বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারেন?

কোন বঙ্গপুরুষ আমার নিকট অনুযোগস্বরে বলেন—"আমি করিব কি? যদি কাবুলী বা গোরার মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হই, আমার স্ত্রী বাধা দেয়, হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরে বসায়।"

শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম—"যদি তুমি সত্ত্বান্ পুরুষপ্রবর হইতে কোন স্ত্রীর সাধ্য থাকিত না হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া বসাইতে।

তোমার কাপুরুষতা স্ত্রীলোকের ভীরুতার দোহাই দিয়া গৃহকোণের আশ্রয় লইতে চাহে।”

হায়! আজিকার ভারতরমণী নাথবতী হইয়াও অনাথা!

৭। বীরপুত্র।

একদিন বালকেরা বঙ্গবালকদের পক্ষে অযশস্কর একটা নিতান্ত লজ্জাজনক ঘটনার বর্ণনা করিয়া আমাকে দুর্ম্মনা করিল। গত বৎসর ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে নাকি সহস্রাবধি বঙ্গ বালক দশটা ফিরিঙ্গীর তাড়নায় রণে ভঙ্গ দিয়াছিল। যে দুই একজন সম্মুখীন হইয়া যুঝিতে প্রস্তুত ছিল, তাহাদের বাকী সকলে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

শুনিতে শুনিতে আর এক দিনের একখানি চিত্রপট মনে উদিত হইল। এই ভারতের মাটিতেই সত্ত্ববান্, একটি সামর্ষ, মানী বালকের সুন্দর দীপ্ত মুখচ্ছবি মনে পড়িল।

একবার কৃষ্ণ ও বলরামের অনুপস্থিতিকালে যদুকুলারি সৌভপতি শাল্ব, প্রভূত মনুষ্য হস্তী ও সৈন্যগণের সহিত দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। যদুকুমারগণ শাল্বরাজার সৈন্য আগত দেখিয়া বহির্নির্গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণের পুত্র, সমরস্থ, মহাবাহু, বীর প্রদ্যুম্ন শাল্বনিক্ষিপ্ত বাণসমূহে কণ্ঠমূলে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় অবসন্ন হইলেন। প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধক সৈন্যসকল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল এবং শত্রুপক্ষীয় সকলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিল। সুশিক্ষিত সারথি প্রদ্যুম্নকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বেগবান অশ্বদ্বারা রণভূমি হইতে অবসৃত করিল। রথ অতি দূরে অপগত না হইতেই সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া প্রদ্যুম্ন সারথিকে কহিলেন, “সূতপুত্র! তুমি কি হেতু রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করিতেছ? বৃষ্ণিবংশীয় বীরদিগের ত যুদ্ধ বিষয়ে এরূপ ধর্ম্ম নয়। তুমি কি মহা সংগ্রাম মধ্যে

শাল্বকে দেখিয়া ভয়ে মোহিত হইয়াছ, না যুদ্ধ দর্শন করিয়া তোমার বিষাদ জন্মিয়াছে, তাহা সত্যরূপে আমাকে বল।"

সারথি কহিল—"হে জনার্দ্দন নন্দন! আমি মোহিত বা ভীত হই নাই, পরন্তু শাল্বকে পরাজয় করা আপনার পক্ষে অতিশয় ভার বোধ করিয়াছি। হে বীর! পাপিষ্ঠ শাল্ব আপনার অপেক্ষা বলবান. এই নিমিত্ত আমি আপনাকে লইয়া রণভূমি হইতে মন্দগতিতে নিঃসৃত হইতেছি। রথী শৌর্য্যসম্পন্ন হইলেও যদি রণস্থলে মোহিত হন, তবে তাঁহাকে রক্ষা করা সারথির কর্ত্তব্য। হে আয়ুষ্মন্! যেরূপ আমাকে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; সেইরূপ আপনি রথী, আপনাকেও রক্ষা করা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই আমি সংগ্রামস্থল হইতে অবসৃত হইয়াছি। হে মহাবাহু রুক্মিণীনন্দন! আপনি একক. দানবেরা অনেক, অনেকের সহিত একের যুদ্ধ করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আমি রণাঙ্গন হইতে বহির্গত হইয়াছি।"

প্রদ্যুম্ন সারথির এই উত্তর শুনিয়া অমর্ষভরে বলিলেন—"রথ ফিরাও! আমি জীবিত থাকিতে কদাপি এরূপ আমাকে রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া গমন করিও না। যে ব্যক্তি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, 'আমি তোমার' এইরূপ কথনশীল, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, বিরথ, বিক্ষিপ্ত বা ভগ্নাস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করে, সেই ব্যক্তি কখনই বৃষ্ণিবংশজাত নয়। হে সৌতে! যেহেতু তুমি বৃষ্ণিকুলের যুদ্ধস্থলীয় আচার ব্যবহার সমুদায়ই জান, সেই হেতু পুনর্ব্বার যুদ্ধস্থল হইতে কোন ক্রমে এরূপ অপগমন করিও না।

দুরাধর্ষ মাধব আমাকে যুদ্ধভূমি হইতে অপগত, পৃষ্ঠে হত, রণ-পলায়িত জানিয়া কি বলিবেন?

কেশবাগ্রজ মদোৎকট বলদেব সমাগত হইয়া আমাকে কি কহিবেন?

মহাধনুর্দ্ধর পুরুষসিংহ সাত্যকিই বা আমাকে রণ-পলায়িত জানিলে কি কহিবেন ?

শাম্ব, সমিতিঞ্জয়, চারুদেষ্ণ, গদ, সারণ, মহারাজ অক্রূর, ইহাঁরাই বা কি বলিলেন ?

বৃষ্ণিবীরদিগের স্ত্রীগণ আমাকে শূর ও সতত পুরুষাভিমানী বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বা সকলে একত্র অবস্থিত হইয়া আমার প্রতি কি বলিবেন ? তাঁহারা বলাবলি করিবেন, এই প্রদ্যুম্ন মহাযুদ্ধে ভীত হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিতেছে, ইহাকে ধিক্ !

তাঁহারা এই কথা ভিন্ন আর সাধুবাদ করিবেন না ! সৌতে ! তাঁহাদের ধিক্কার বাক্য ও পরিহাস মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। আমি ভীত রণ হইতে পলায়িত ও পৃষ্ঠভাগে শরসমূহে আহত হইয়া কোন ক্রমেই জীবনধারণ করিব না। ফিরাও ! ফিরাও ! শীঘ্র রথ ফিরাও !”

এই সেই বালক আধুনিক ক্রিকেট-ফুটবল-ম্যাচ-ক্রীড়কদিগের পূর্ব্বপুরুষ। বঙ্গের বালকগণ ! এই যদুকুমারগণ, কুরুকুমারগণ, রঘুকুমারগণ তোমরাই ! আত্মানং বিদ্ধি !

৮। সাত্ত্বিক ক্ষমা ও তামসিক ক্ষমা।

আমাদের বালকবালিকাগণ শৈশব হইতে উপদেশ পায়—“তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণু হইবে।”

ঠিক কথা ! কিন্তু আগে মহাটবী অপেক্ষা উচ্চতা লাভ কর তবেই তোমার পক্ষে তৃণাদপি সুনীচতা প্রদর্শন শোভমান হইবে। নীচ তৃণ ত [illegible]বং সুনীচতা অবলম্বন করিয়া থাকিবেই, তাহাতে আর বেশী কথ[illegible] কি হইল ? উচ্চ অটবী যে ফলভারে তৃণাদপি নম্র হয়, সেই নম্র[illegible]ই চাই,—তৃণ থাকিয়া তৃণের নম্রতায় কোন গৌরব নাই, কারণ তাহ[illegible] কোন সাধনা নাই, কোন তপস্যা নাই, কোন পুরুষকার নাই।

'তরোরিব সহিষ্ণু'র অর্থ কি ? না, শাখাপল্লব ছেদকারী, অঙ্গহানিকারী শত্রুর স্কন্ধের উপর পতিত হইয়া তাহার শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হইয়াও, তরু যে আত্মসংযম পূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকে তদ্বৎ সহিষ্ণু। সুতরাং তরোরিব সহিষ্ণুতার উপদেশ পালন করিতে হইলে প্রথমে তরোরিব শক্তি সামর্থ্যশালী হইতে হইবে।

নয়ত, অক্ষমের আবার ক্ষমা কি ? ক্ষমা সাধনের জন্য প্রথমে ক্ষমতাবান্ হওয়া আবশ্যক, ক্ষমতার চর্চ্চা প্রয়োজন। সক্ষম ব্যক্তিই ক্ষমা দেখাইতে পারে। অক্ষমের ক্ষমা হাসির কথা।

ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে বা যে কোন স্থলে আক্রান্ত বঙ্গপুরুষদের যে পৃষ্ঠে হত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক ক্ষমাচর্চ্চা, বা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিরাপদে ক্ষমাচর্চ্চা তাহা তামসিক ক্ষমা মাত্র—তাহা ক্ষমা নামেরই যোগ্য নহে। হে বাঙ্গালি! যথার্থ সাত্ত্বিক ক্ষমাবান্ হইবার প্রযত্ন কর, প্রথমে ক্ষমতাশালী হও! তামসিকতার নাগপাশ ছেদ করিয়া রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণ কর, তবেই কোন দিন সাত্ত্বিকতায় আরোহণের ভরসা রাখিতে পার। সাত্ত্বিক বশিষ্ঠ যে রাজসিক বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শতবার দ্রোহিত হইয়াও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, সেই ক্ষমাই ক্ষমা, তাহা যে অক্ষমের ক্ষমা নহে, তাহার পরিচয় বশিষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে বহুবিধ পরিচ্ছদপরিধায়ী নানাস্ত্রধারী ম্লেচ্ছ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে প্রযোজনার দ্বারা। কিন্তু বশিষ্ঠপক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে ক্রুদ্ধ হইয়াও বিশ্বামিত্রের সেনাগণের মধ্যে কাহারও প্রাণবিনাশ করিল না, তাহাদিগকে কেবল দূরে নিরাকৃত করিল।

ক্ষমা ইহাই বটে! ক্ষমতার সুব্যবহার!

বৈশাখ, ১৩১০। শ্রীমতী সরলা দেবী।

গ্রন্থ সমালোচনা।

মজার গল্প। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। বইখানি অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার পল্লীচিত্র ও পল্লীচরিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। বঙ্গ-পল্লীজননীর বুকের সন্তান যাহারা,—কামার, কুমার, ছুতার, স্যাকরা, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা; মুসলমান মাঝিমাল্লা, দোকানী পসারী চাষা, দারোগা হাকিম; হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৈদ্য;—যাহাদের লইয়া বঙ্গের বঙ্গত্ব, বাঙ্গালী শিশুর বাঙ্গালী শিশুত্ব,—সেই সকল শ্রেণীরই উচ্চনীচমধ্য-অবস্থার শিশু যুবা ও বৃদ্ধের কৌতুকালোকে সুরঞ্জিত চিত্রাবলীতে এই গ্রন্থখানি পূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে "গ্রীম্‌স্ ফেয়ারী টেল্‌স্"কে বাঙ্গালীর গৃহে অনেক প্রাপ্তবয়স্কের এবং প্রৌঢ়ের ও বৃদ্ধেরও মনোহরণ করিতে দেখিয়াছি। বাঙ্গলার এই 'মজার গল্প' খানি বাঙ্গালী সমাজে 'গ্রীম্‌স্ ফেয়ারী টেল্‌স'এর স্থান নিরাপত্তিতে অধিকার করিবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ইহা প্রকৃত ও কাল্পনিক, আধুনিক ও পৌরাণিকের সংমিশ্রণে নিতান্ত মুখরোচক হইয়াছে।

দুইটী ত্রুটী দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। এক আধ স্থলে অনাবশ্যক ভাবে সুরুচির ব্যত্যয় করা হইয়াছে এবং যে দুই একটি গল্প যুরোপীয় রচয়িতার নিকট ঋণগ্রহণ করা হইয়াছে, ভূমিকায় সেগুলি সম্বন্ধে ঋণস্বীকার করা হয় নাই।

আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই উভয় ত্রুটী সংশোধিত হইবে। এই গ্রন্থের দুই মাসের মধ্যেই যদি দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া না যায়—তাহা হইলে, আমাদের দেশের বার্ত্তাবহ প্রণালী এখনও পরিষ্কার নহে, ইহাই বুঝিব।